বিশ্বনবী

গোলাম মোস্তফা

বিপ্লবী

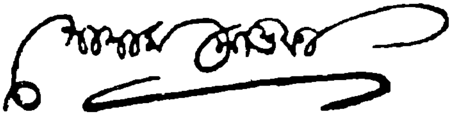

আহমদ পাবলিশিং হাউস

www.pathagar.com

প্রকাশক
মেছবাহউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১১০০

মরহুম কবির উত্তরাধিকারীদের পক্ষে
ফিরোজা খাতুন কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মুদ্রণ : অক্টোবর ১৯৪২
সপ্তবিংশতিতম মুদ্রণ
আশ্বিন ১৪০৩/অক্টোবর ১৯৯৬

The Life of Mohammed : Pariss Book Club, Pariss
গ্রন্থের চিত্র অনুসরণে শিল্পী আমান উল্লাহ খান কর্তৃক অঙ্কিত প্রচ্ছদপট
ISBN. 984—11—0302—8

মুদ্রণে
নিউ সোসাইটি প্রেস
৪৬, জিন্দাবাহার ১ম লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

আম্মা ও আব্বার
— খিদমতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, এই সংস্করণ এইবার নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে। সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন দ্বারা গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বদর-যুদ্ধ সংক্রান্ত দুইটি অধ্যায় নূতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছোট-খাটো সংশোধন অনেক আছে।

পাঠক-পাঠিকা শুনিয়া খুশি হইবেন, বিশ্বনবীর উর্দু অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন মুদ্রণ ও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহের ফলে বিশ্বনবীর একটি ভারতীয় সংস্করণও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এইবার প্রুফ দেখা হইয়াছে, কাজেই ভুল-ত্রুটি এইবার খুবই বিরল।

আমার পরম স্নেহাস্পদ শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ এই সংস্করণের প্রুফ দেখিয়া দিয়াছে। তাহার সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকিলে এবারকার এই পারিপাট্য সম্ভব হইত না।

আহমদ পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী স্নেহভাজন মহিউদ্দীন আহমদ এই সংস্করণের প্রকাশক। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ও উদ্যম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শান্তিনগর, ঢাকা।

গোলাম মোস্তফা

www.pathagar.com

পাঠক–পাঠিকার প্রতি

বিশ্বনবীর অনেক স্থানে কোরআন শরীফের আয়াত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল আরবী আয়াত না দিয়া শুধু বাংলা তর্জমা দিয়াছি। সেই সব তর্জমার কোন কোন স্থানে আল্লাহ্ সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন :

"এবং যে কেহ এই দুনিয়ায় পুরস্কার চাহে, তাহাকেও আমরা তাহাই দিব এবং যে কেহই পরকালের পুরস্কার চাহে, তাহাকেও আমরা তাহাই দিই।

আমরা কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করিব। –(১ : ১৪৪)

এখানে 'আল্লাহ্'র পরিবর্তে 'আমরা' সর্বনামের ব্যবহার দেখিয়া অনেক পাঠকের মনেই প্রশ্ন জাগে। তাঁহারা ভাবেন : আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয় ও লা–শরীক কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে 'আমরা' (বহুবচন) ব্যবহার করা যাইতে পারে না। তাই অনেকের ধারণা ইহা তর্জমার ভুল। কিন্তু তর্জমায় কোন ভুল হয় নাই। তর্জমা ঠিকই আছে। অন্য এক গূঢ় কারণে 'আমি' স্থলে 'আমরা' লিখিত হইয়াছে। আরবী ভাষায় সম্মানীয় ব্যক্তিদিগের বেলায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সম্মানার্থে 'বহুবচন' বলে। অন্যান্য ভাষাতেও এইরূপ বাক–রীতি প্রচলিত আছে। কোন রাজকীয় ঘোষণায় সম্রাট, সম্রাজ্ঞী বা রাষ্ট্রপতি উত্তম পুরুষের বহুবচন (আমরা) ব্যবহার করেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে (Queen's Proclamation) উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেখানে We ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই রীতি কোরআন শরীফের নিজস্ব। আল্লাহ্ নিজেই এই বাচনভঙ্গি শিক্ষা দিয়াছেন; 'আমি' না বলিয়া 'আমরা' বলিয়াছেন। কাজেই, তর্জমায় ভুল হইয়াছে–পাঠক যেন সেইরূপ মনে না করেন। মূলে বহুবচন আছে বলিয়াই তর্জমাতেও বহুবচন আসিয়াছে। উপরের আয়াতের ইংরাজী তর্জমাতেও এই রীতি আছে।

> "And whoever desires the reward of this world, We will give him of it and whoever desires the reward of the hereafter, We will give him of it, and We will reward the grateful."
>
> (Translation : Moulana Muhammed Ali)

আল্লামা ইউসুফ আলী একই রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। উপরোক্ত আয়াতের অনুবাদে তিনি লিখিতেছেন :

"If any do desires a reward in this life,
We shall give it to him..."

বস্তুতঃ অনুবাদ ঠিক রাখিতে হইলে মূলের সহিত তাহার মিল রাখিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, এই কারণেই বাংলা তর্জমায় আল্লাহ্‌র স্থানে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

আর একটি আরজ এই যে, 'বিশ্বনবী' কিছুটা বাক–ভঙ্গিতে লেখা। কাজেই সর্বত্র হযরত মুহম্মদের নামের পরে দরুদ পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। ভক্ত পাঠক–পাঠিকা নিজেরাই মনে মনে দরুদ পাঠ করিবেন। আরজ ইতি–

বিনীত
গোলাম মোস্তফা

মোস্তফা–মঞ্জিল,
শান্তিনগর, ঢাকা
জুলাই–১৯৬৩

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ–কথা

প্রাচীনকালের মহাপুরুষদের জীবন–বৃত্তান্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন। তার কারণ সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রমাণ রক্ষিত হয় নি এবং পরবর্তীকালের লৌকিক–অলৌকিক ঘটনাবলীর বেড়াজালে–আচ্ছন্ন হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিষম সন্দেহ–দোলায় বিপন্ন হয়েছে। তাই প্রাচীন চিন্তানায়ক, কর্মনায়ক ও ধর্মনায়কদের জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই ঐতিহাসিক যুক্তিবিচারে টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। তাঁদের অনেকেরই জীবন পৌরাণিক কল্পকথায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু সুখের বিষয়, ধর্মবীর ও কর্মবীর মহামানব হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর জীবন–কথা কর্ম ও শিক্ষা সমসাময়িক লিখন ও স্মৃতি–পরম্পরা উভয় উপায়েই অতি বিশ্বস্তরূপে সংরক্ষিত হয়েছে।

হযরত রসূল (সঃ)–এর জীবন–চরিত রচনার সমসাময়িক মূল উৎসহলো আল্লাহর কিতাব আল্–কোরআন রসূলের সুনাৎ সমসাময়িক সোলেহ্ নামা, দলিলপত্রাদি এবং সমসাময়িক আরবী কবিতা। আল্লাহ্র কিতাব হযরতের জীবনের শেষ তেইশ বছর ধরে তিনি যেভাবে জিব্রীল মারফৎ পেয়ে লিপিবদ্ধ করান এবং যেভাবে তিনি নিজে আদ্যোপান্ত গুছিয়ে সাজিয়ে মুখস্থ করান, ঠিক সেইভাবেই তাঁর ইন্তিকালের পর গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা সেইভাবেই বর্তমানকাল পর্যন্ত চলে এসেছে একথা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবিচারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।[১] ইসলাম এবং উহার প্রচারক হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর জীবন ও চরিত্র আলোচনায় কোরআনই প্রথম ও প্রধান ভিত্তি। কোরআনই তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতিগত জীবনে তাঁর চিন্তা, মত ও কর্ম, এক কথায় তাঁর সমগ্র চরিত্রে বিশ্বস্ত দর্পণ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ দ্বারা তাঁর জীবন ও কর্মকে বিচার করতে কোরআনই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি। ফলতঃ কোরআন তার চরিত্রে এমন নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের মুসলিম সমাজে একথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, কোরআনই হযরতের চরিত্র। হযরতের জীবনী ও চরিত্র আলোচনায় দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য উৎস সুনাৎ বা হাদীস। তাঁর সাহাবিগণের মধ্যে অনেকেই হযরতের উক্তি, কার্য ও সম্মতিসূচক ঘটনার বিশ্বস্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ কেউ হযরতের জীবনকালেই তা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখন স্মৃতি–পরম্পরায় বহু হাদীস প্রচারিত হলে হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে খ্যাতনামা বিদ্বানগণের যুক্তিবিচারে ও সযত্ন বাছাইয়ের ফলে সহীহাদীসসমূহ 'সিহা সিত্তা' নামে পরিচিত ছয়খানি গ্রন্থে সংকলিত হয়। এই সব হাদীসে হযরতের জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

---

১. Sir William Muir–এর লিখিত The life of Mohammad–এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য PP XX-XXIX.

www.pathagar.com

সমসাময়িক রাজন্যবর্গের নিকট ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণপত্রাদি এবং বিজিত বা বন্ধু ভাবাপন্ন শক্তি বর্গের সঙ্গে হযরতের সন্ধিপত্রাদিও হাদীস গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইহুদী, খ্রীষ্টান ও বিভিন্ন গোত্রের স্বার্থ সংরক্ষণে সনদাদি এবং হাস্‌সান ইব্‌নে সাবিত, কা'ব ইব্‌নে মালিক, কা'ব ইব্‌নে যুহয়র ও আল্‌-আ'শ প্রমুখ সমসাময়িক কবিগণের কবিতায় হযরতের জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে আরবী ভাষায় হযরতের ধারাবাহিক জীবনী সংকলন আরম্ভ হয়। এ কাজে যাঁরা ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে 'উর্‌ওয়া ইব্‌নে যুবায়র' (মৃত ৯৪ হিঃ) ও তাঁর ছাত্র উমাইয়া দরবারের ইমাম যুহরী (৭২ বৎসর বয়সে মৃত ১২৪ হিঃ) সবচেয়ে প্রখ্যাত। বিশেষতঃ হযরতের অভিযান ও যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে ইমাম যুহ্‌রী যে সব গ্রন্থ রচনা করেন তা গ্রন্থকারে না পাওয়া গেলেও তার বিষয়বস্তু পরবর্তী বিভিন্ন সীরৎ রচয়িতার গ্রন্থে রক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মূসা ইব্‌নে 'উকবা ও আবু মা'শর এবং শেষ দিকে আবু ইস্‌হাক (মৃত ১৮৮ হিঃ) এবং আল্‌-মাদাইনী সীরৎ রচনা করেন। তাঁদের গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু পরবর্তীকালের গ্রন্থাদিতে তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়। হযরতের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিত যে সব সীরৎ গ্রন্থ রক্ষা পেয়েছে। তাদের মধ্যে ১. মুহম্মদ ইব্‌নে ইসহাকের (মৃত ১৫২ হিঃ) মগাযী, ২. ইব্‌নে হিসামের (মৃত ২১৩ হিঃ) সীরাতু রসূলিল্লাহ্‌, ৩. মুহম্মদ ইব্‌নে উমর আল-ওয়াকিদীর (১৩০-২০৭ হিঃ) কিতাবুল মগাযী ও ৪. তাঁর সেক্রেটারী ইব্‌নে সা'দের মৃত (২৩০ হিঃ) আৎ-তবকাতুল-কুররা এবং ৫. ইব্‌নে জবীর তবরীর (২২৪-৩১০ হিঃ) তারীখুল্‌ উমর অল্‌-মুলুক সবচেয়ে প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য মৌলিক গ্রন্থ।

পরবর্তীকাল এই সব মূল উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনার সংযোজনসহ বহু সীরৎ গ্রন্থ রচিত হলেও ঐ সব বর্ধিত উপাদানের মূল্য নিরূপণ করা দুষ্কর। কাজেই উহা নির্ভরযোগ্য নয়।

উপরোক্ত আরবী মূল উৎসসমূহ অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় বহু সীরৎগ্রন্থ লিখিত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় লিখিত হযরতের জীবনী গ্রন্থসমূহের মধ্যে ১. ডক্টর স্প্রেঙ্গার রচিত "মুহম্মদ", ২. ওয়াশিংটন আয়ারভিং-এর "দি লাইফ অব মুহম্মদ", ৩. স্যার উইলিয়ম মূয়র লিখিত "দি লাইফ অব মুহম্মদ", ৪. সৈয়দ আমির আলীর "দি স্পিরিট অব ইসলাম", ৫. খাজা কামালুদ্দীনের "দি আইডিয়াল, প্রফেট", ৬. মারগোলিউথ-এর "মুহম্মদ", ৭. মন্টোগোমারী ওয়াট-এর "মুহম্মদ অ্যাট মক্কা" ও "মুহম্মদ অ্যাট মদিনা", ৮. কে, এল, গওবা লিখিত "দি প্রফেট অফ দি ডেযার্ট", ৯. মাওলানা মুহম্মদ আলীর "মুহম্মদ", ১০. হাফিয গুলাম সরওয়ার-এর "মুহম্মদ", ১১. স্যার সৈয়দ আহমদের "এসেয অন্‌ মুহম্মদ অ্যাণ্ড ইসলাম" এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। উর্দু ভাষায় রচিত সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে মওলানা শিবলী নু'মানী ও তাঁর ছাত্র মওলানা সুলায়মান নদবী প্রণীত ছয় খণ্ডে সমাপ্ত "সীরাতুন্নবী" সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বিখ্যাত। বাংলা ভাষাও এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ নয়। বাংলায় রচিত সীরৎ গ্রন্থগুলোর মধ্যে ১. সৈয়দ সুলতানের (১৫৫০-১৬৪৮ খ্রীঃ) 'নবী বংশ', 'রসূল বিজয়', 'শবে মে'রাজ' ও 'ওফাতে রসুল'; ২. ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'হযরত

www.pathagar.com

মুহম্মদের জীবন-চরিত'; ৩. কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মুহম্মদ-চরিত'; ৪. রামপ্রাণ গুপ্তের 'হযরত মুহম্মদ ও হযরত আবুবকর'; ৫. শেখ আব্দুর রহিমের 'হযরত মুহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' (প্রথম প্রকাশিত ১২৯৪ বাংলাব্দ: ১৮৮৭ খ্রীঃ); ৬. মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদের 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)'; ৭. তসলীম উদ্দিন আহমদের 'সম্রাট পয়গম্বর'; ৮. সূফী মধুমিয়ার 'শান্তিকর্তা হযরত মোহাম্মদ'; ৯. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'মানব মুকুট' ও 'নূরনবী'; ১০. মিসেস সারা তৈফুরের 'স্বর্গের জ্যোতিঃ'; ১১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর 'মোস্তফা চরিত'; ১২. কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' (প্রথম মুদ্রণ ১৯৪২ খ্রীঃ, ৮ম সংস্করণ ১৯৬৩); ১৩. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'মরুভাস্কর'; ১৪. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'শেষ নবীর সন্ধানে'; ১৫. মওলানা আবদুল জব্বার সিদ্দীকীর 'মানুষের নবী'; ১৬. খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁর 'শেষ নবী'; ১৭. মওলানা মোমতাজউদ্দীন আহমদের 'নবী পরিচিতি'; ১৮. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 'নবীগৃহ সংবাদ' ও ১৯. ডক্টর মোলাম মকসুদ হিলালীর 'হযরতের জীবননীতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাক্‌শিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙ্গালী অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।

'বিশ্বনবী'র বর্তমান নবম সংস্করণটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিষয়গত ত্রুটির দিকে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়োজন হয়েছে। মূল গ্রন্থের পাঠ যথাযথ রেখে পরিশিষ্টে অসঙ্গতির কারণ দূরীভূত করে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। এতে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সৈয়দ আলী আহসান
পরিচালক, বাঙলা একাডেমী

১লা জানুয়ারি-১৯৬৭

www.pathagar.com

দশম সংস্করণের ভূমিকা

কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' একটি আশ্চর্যরূপ সফল গ্রন্থ। হৃদয়ের আবেগ ও বিশ্বাস শব্দে যেভাবে সমর্পিত হয়েছে, আন্তরিক অনুভূতি বর্ণনায় যেভাবে উচ্চকিত হয়েছে এবং চিত্তের উপলব্ধিজনিত আনন্দ ভাষার আবহে যেভাবে জাগ্রত হয়েছে তার তুলনা আমাদের গদ্য সাহিত্যে সত্যিই বিরল। যদিও কখনও কখনও কবি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিষ্ঠায় যুক্তির সমর্থন খুঁজেছেন কিন্তু সে সমস্ত যুক্তি উচ্ছ্বাসে সচকিত এবং বিশ্বাসের অবিচল নিষ্ঠায় প্রবহমান।

আমাদের পাঠক-সম্প্রদায় যে কবির নিষ্ঠাকে সম্মান জানিয়েছে তার প্রামণ এ-গ্রন্থের নতুন নতুন মুদ্রণেই ধরা পড়েছে। বর্তমান সংস্করণটি দশম সংস্করণ। কবির প্রতি দ্বিধাহীন প্রীতি এবং শ্রদ্ধা নিয়ে জনাব মহিউদ্দিন আহমদ যে সততা ও বিনয়ের সঙ্গে গ্রন্থটিকে প্রকাশ করেছেন তা সর্বমুহূর্তে অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

চট্টগ্রাম
২৭ আগষ্ট, ১৯৬৮

সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

পরিচ্ছেদ	ঃ	১	আমিনার কোলে	২১
পরিচ্ছেদ	ঃ	২	কোন্ আলোকে	২৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩	প্রতিশ্রুত পয়গম্বর	২৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪	বংশ পরিচয়	৩১
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫	নামকরণ	৩৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৬	সমসাময়িক পৃথিবী	৪০
পরিচ্ছেদ	ঃ	৭	শিশুনবী	৪৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	৮	প্রকৃতির কোলে	৪৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৯	বক্ষ-বিদারণ	৪৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	১০	শিশুনবী এতিম হইলেন	৫০
পরিচ্ছেদ	ঃ	১১	সিরিয়া ভ্রমণ	৫৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	১২	আল্-আমিন	৫৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৩	শাদী মুবারক	৬১
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৪	কাবা-গৃহের সংস্কার	৬৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৫	গৃহীর বেশে	৬৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৬	সত্যের প্রথম প্রকাশ	৭২
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৭	সত্যের স্বরূপ	৭৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৮	সত্য-প্রচারের আদেশ	৭৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৯	সত্যের প্রথম প্রচার	৮১
পরিচ্ছেদ	ঃ	২০	প্রথম তিন বৎসর	৮৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	২১	সংঘর্ষের সূচনা	৮৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	২২	উৎপীড়ন	৯১
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৩	"-এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে"	৯৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৪	প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল	৯৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৫	সাহারাতে ফুটলরে ফুল!	১০২
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৬	অন্তরীণ-বেশে	১০৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৭	সর্বহারা	১১০
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৮	তায়েফ গমন	১১৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	২৯	আল-মি'রাজ	১১৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩০	অন্ধকারের অন্তরালে	১২০
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩১	হিযরতের পূর্বাভাস	১২৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩২	শিষ্যদিগের প্রস্থান	১২৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৩	হিযরত	১৩২
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৪	আল্-মদিনায়	১৩৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৫	প্রেমের বন্ধন	১৪২
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৬	ইসলামিক রাষ্ট্র-রচনা	১৪৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৭	মদিনার আকাশে কালোমেঘ	১৫০

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৮	বদর-যুদ্ধ	১৫৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩৯	বদর-যুদ্ধের পরে	১৬৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪০	ওহদ-যুদ্ধ	১৬৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪১	জয় না পরাজয়	১৭৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪২	ওহদ-যুদ্ধের শেষে	১৮৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৩	চতুর্থ ও পঞ্চম হিযরীর কয়েকটি ঘটনা	১৮৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৪	আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক-দান	১৯০
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৫	খন্দক-যুদ্ধ	১৯৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৬	ষষ্ঠ হিযরীর কয়েকটি ঘটনা	২০৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৭	হোদায়বিয়ার সন্ধি	২১০
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৮	দিকে দিকে গেল আহ্বান	২১৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪৯	খায়বার বিজয়	২২৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫০	মুলতুবী হজ্ব	২২৯
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫১	মূতা-অভিযান	২৩১
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫২	মক্কা-বিজয়	২৩৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৩	মক্কা-বিজয়ের পরে	২৪১
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৪	হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান	২৪৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৫	তাবুক অভিযান ও অন্যান্য ঘটনা	২৪৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৬	বিদায় হজ্জ	২৫৫
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৭	পরপারের আহ্বান	২৫৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫৮	শেষ কথা	২৬৩

দ্বিতীয় খণ্ড

পূর্বাভাষ

পরিচ্ছেদ	ঃ	১	হযরত মুহম্মদের জন্ম-তারিখ কবে	২৭১
পরিচ্ছেদ	ঃ	২	কাবা-শরীফ কখন নির্মিত হইয়াছিল	২৭৭
পরিচ্ছেদ	ঃ	৩	ইসলাম ও পৌত্তলিকতা	২৮২
পরিচ্ছেদ	ঃ	৪	ইসলাম ও মো'জেজা	২৮৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	৫	স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক	২৯৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৬	স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক	২৯৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	৭	বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে	৩০৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	৮	ইসলাম ও নূতন বিজ্ঞান	৩২০
পরিচ্ছেদ	ঃ	৯	মি'রাজ	৩২৪
পরিচ্ছেদ	ঃ	১০	থিওসফী ও মি'রাজ	৩৩৮
পরিচ্ছেদ	ঃ	১১	'মুহম্মদ' ও 'আহ্মদ' নাম কি সার্থক হইয়াছে	৩৪১
পরিচ্ছেদ	ঃ	১২	মুহম্মদ 'মহম্মদ' ছিলেন কি-না	৩৪৩
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৩	হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য	৩৯৬
পরিচ্ছেদ	ঃ	১৪	মুহম্মদ 'আহ্মদ' ছিলেন কি না	৪০৪

www.pathagar.com

প্রথম খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১

আমিনার কোলে

রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ।

সোমবার।

শুক্লা-দ্বাদশীর অপূর্ণ-চাঁদ সবেমাত্র অস্ত গিয়াছে। সুব্‌হে-সাদিকের সুখনূরে পূর্ব-আসমান রাঙা হইয়া উঠিতেছে। আলো-আঁধারের দোল খাইয়া ঘুমন্ত প্রকৃতি আঁখি মেলিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতি আজ নীরব। নিখিল সৃষ্টির অন্তরতলে কি যেন একটা অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার বেদনা রহিয়া রহিয়া হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। কোন্ স্বপ্নসাধ আজও যেন তার মিটে নাই। যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জিভূত সেই নিরাশার বেদনা আজও যেন জমাট বাধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আরবের মরু-দিগন্তে মক্কা-নগরীর এক নিভৃত কুটিরে একটি নারী ঠিক এই সময়ে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

নাম তাঁর আমিনা।

আমিনা দেখিতেছিলেন : এক অপূর্ব নূরে আসমান-যমীন উজালা হইয়া গিয়াছে। সেই আলোকে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা ঝলমল করিতেছে। কার যেন আজ শুভাগমন, কার যেন আজ অভিনন্দন। যুগ-যুগান্তের প্রতীক্ষিত সেই না-আসা অতিথির আগমনমুহূর্ত আজ যেন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁরই অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন এই আয়োজন। কুল-মাখলুক আজ সেই আনন্দে আত্মহারা। গগনে গগনে ফেরেশ্‌তারা ছুটাছুটি করিতেছে, তোরণে-তোরণে বাঁশি বাজিতেছে। সবাই আজ বিস্মিত পুলকিত কম্পিত শিহরিত। জড়-প্রকৃতির অন্তরেও আজ দোলা লাগিয়াছে; খসরুর রাজপ্রাসাদের স্বর্ণচূড়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে; কাবা-মন্দিরের দেব-মূর্তিগুলি ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে; সিরিয়ার মরুভূমিতে নহর বহিতেছে।

আমিনার কুটিরেই বা আজ কী অপরূপ দৃশ্য। কারা ওই শ্বেতবসনা পুণ্যময়ী নারীরা? বিবি হাওয়া, বিবি হাজেরা, বিবি রহিমা, বিবি মরিয়ম, সবাই আজ তাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান। বেহেশ্‌তী নূরে সারা ঘর আজ আলোকিত। বেহেশ্‌তী খুশবুতে বাতাস আজ সুরভিত।

এক স্নিগ্ধ পবিত্র চেতনার মধ্যে আমিনার স্বপ্ন ভাঙিল। আঁখি মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন-কোলে তাঁহার পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে সারা সৃষ্টির অন্তর ভেদিয়া ঝঙ্কৃত হইল মহাআনন্দ ধ্বনি, "খুশ আমদিদ ইয়া রসুলুল্লাহ!" "মারহাবা ইয়া

www.pathagar.com

হাবীবুল্লাহ্!" বেহেশ্তের ঝরোকা হইতে হুর-পরীরা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; অনন্ত আকাশে অনন্ত গ্রহনক্ষত্র তসলিম জানাইল। বিশ্ববীণাতারে আগমনী-গান বাজিয়া উঠিল। নীহারিকা-লোকে, তারায় তারায়, অণু-পরমাণুতে আজ কাঁপন লাগিল। সবার মধ্যে আজ যেন কিসের একটা আবেগ, কিসের একটা চাঞ্চল্য। সবারই মুখে আজ বিস্ময়! সবারই মুখে আজ কি-যেন এক চরম পাওয়ার পরম আনন্দ সুপ্রকট। প্রভাত সূর্য-রশ্মি-করাঙ্গুলি বাড়াইয়া নব-অতিথির চরণ-চুম্বন করিল; বনে বনে পাখিরা সমস্বরে কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল; সমীরণ দিকে দিকে তাঁহার আবির্ভাবের খুশ-খবর লইয়া ছুটিয়া চলিল। ফুলেরা স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া তাহাদের অন্তরের গোপন সুষমাকে নযরানা পাঠাইল। নদনদী ও গিরি-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত হইয়া আনন্দ-গান গাহিতে গাহিতে সাগরপানে ছুটিয়া চলিল। জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, তৃণে-তৃণে, ফুলে-ফলে আজ এমনি অবিশ্রান্ত কানাকানি আর জানাজানি। যার আসার আশায় যুগযুগান্ত ধরিয়া সারা সৃষ্টি অধীর আগ্রহে প্রহর গনিতেছিল, সে যেন আসিয়াছে-এই অনুভূতি আজ সর্বত্র প্রকট।

আরবের মরুদিগন্তে আজ এ কী আনন্দোচ্ছ্বাস মরি! মরি! আজ তার কী গৌরবের দিন! সবচেয়ে যে নিঃস্ব, সবচেয়ে যে রিক্ত, তারই অন্তর আজ এমন করিয়া ঐশ্বর্যে ভরিয়া গেল! চরম রিক্ততার অধিকারেই কি সে আজ এমন চরম পূর্ণতার গৌরব লাভ করিল। বেদুঈন বালারা অকস্মাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। দিগন্ত-বিস্তৃত ঊষর মরুর দিকে দিকে আজ এ কী অপূর্ব দৃশ্য। এত আলো, এত রূপ কোথা হইতে আসিল আজ? আজিকার প্রভাত এমন স্নিগ্ধপেলব হইয়া দেখা দিল কেন? খর্জুর-শাখায় আজ এত শ্যামলিমা কে ছড়ায়ে দিল? মেষ শিশুরা আজ উল্লসিত কেন? নহরে-নহরে এত স্নিগ্ধ বারিধারা আজ কোথা হইতে আসিল? কিসের উল্লাস আজ দিকে দিকে?

আকাশ পৃথিবীর সর্বত্র এমনই আলোড়ন। ছন্দ-দোলায় সারা সৃষ্টি আজ যেন দোল খাইতে লাগিল। জড়-চেতন সকলের মধ্যেই আজ চরম পাওয়ার পরম তৃপ্তি সুপ্রকট।

কোথাও ব্যথা নাই, বেদনা নাই, দুঃখ নাই, অভাব নাই, সব রিক্ততার আজ যেন অবসান ঘটিয়াছে,-সব অপূর্ণতা আজ যেন দূরীভূত হইয়াছে। বিশ্বভুবনে আল্লাহ্‌র অনন্ত আশীর্বাদ ও অফুরন্ত কল্যাণ নামিয়া আসিয়াছে। আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে, লতায়-পাতায়, জড়-চেতনে আজ যেন সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার এক মহাতৃপ্তি ভাসিয়া বেড়াইতেছে।। মহাকাল-ঋতুচক্রে আজ কি প্রথম বসন্ত দেখা দিল? প্রকৃতির কুঞ্জবনে আজ কি প্রথম কোকিল গান করিল?

কে এই নব অতিথি-কে এই বেহেশ্তী নূর-যাঁহার আবির্ভাবে আজ দ্যুলোকে ভূলোকে এমন পুলক-শিহরণ লাগিল?

এই মহামানবশিশুই আল্লাহ্‌র প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ পয়গম্বর-নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও মূর্ত আশীর্বাদ-মানব জাতির চরম এবং পরম আদর্শ-স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-বিশ্বনবী-হযরত মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায় হি অ-সাল্লাম)

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২
কোন আলোকে

কে এই মুহম্মদ?[১] তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি? সত্য পরিচয় কি?

একদিকে দেখিতেছি : তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল। অপরদিকে দেখিতেছি : তিনি পৃথিবীর মানুষ-রক্তমাংস দিয়া গড়া তাঁহার শরীর। একদিকে তিনি স্রষ্টার, অপরদিকে তিনি সৃষ্টির। কোন্ আলোকে এখন আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব? কোন্ চক্ষে দেখিব? তিনি কি মানুষ, না অতি-মানুষ?

এই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা আমরা এখানে করিব না। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে পাঠক ইহার বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। তবে এ-সম্বন্ধে এখানে দুই-একটি কথা না বলিয়াও আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনা করিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে প্রথমেই সজাগ হইতে হইবে; অন্যথায় আমরা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে চিনিতে বা বুঝিতে পারিব না-তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনাই আমাদের কাছে হয়ত বিসদৃশ বোধ হইবে।

হযরত মুহম্মদকে সত্য করিয়া চিনিবার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধাই হইতেছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির এই বিভ্রম। আমরা দোষে-গুণে জড়িত মানুষ, সীমাবদ্ধ আমাদের জ্ঞান; তাই স্বভাবতই তাঁহাকে আমাদের মতো করিয়া দেখি এবং আমাদের মাপকাঠিতে বিচার করি। কিন্তু সত্যই কি তিনি 'আমাদের মতো' মানুষ ছিলেন?

কেমন করিয়া বলি? যাঁহার জীবনে এত অতি মানবিক উপাদান রহিয়াছে তাঁহাকে শুধুই 'মানুষ' বলিতে পারি কি?

তবে কি তিনি মানুষ ছিলেন না? তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? তাঁহার জীবনের প্রতিটি ঘটনা ইতিহাসের আলোকে সমুজ্জ্বল। কে ইহা অস্বীকার করিবে?

অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা কেবলমাত্র 'অতি-মানুষ'রূপে মানব-গণ্ডির ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন, তাঁহারাও যেমন ভুল করিবেন, যাঁহারা তাঁহাকে আমাদের মতো 'মাটির মানুষ' বলিয়া ধরার ধূলায় নামাইয়া আনিবেন, তাঁহারাও ঠিক তেমনই ভুল করিবেন।

হযরত মুহম্মদ ছিলেন মানুষ ও অতি-মানুষের মিলিত রূপ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি ছিলেন মাধ্যম বা বাহন। অন্য কথায় তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র রসুল বা খলিফা। এই ভঙ্গিতে দেখিলেই তাঁহাকে চেনা সহজ হয়। আল্লাহ্ নিরাকার। তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, কাহারও দ্বারা তিনি জাতও নহেন। তিনি এক, অথচ সৃষ্টি বহু ও বিচিত্র। স্রষ্টা নিরাকার, অথচ সৃষ্টি সাকার।

কেমন করিয়া অরূপ হইতে রূপে, নিরাকার হইতে সাকারে পৌছান্ যায়? এপারে-ওপারে কি করিয়া সংযোগ রাখা সম্ভব হয়?

---

১. হযরত মুহম্মদের নামোল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর দরুদ পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। আশা করি পাঠক-পাঠিকা নিষ্ঠার সহিত সে-কর্তব্য পালন করিবেন।

www.pathagar.com

একজন বাহন বা 'মিডিয়াম'-এর এখানে নিতান্ত প্রয়োজন। খেয়া-তরীর মাঝির মতন এপারে-ওপারে সে পারাপার করে। এই মাধ্যমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদ। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে তিনি মিলন-সূত্র। একদিকে যেমন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, অপরদিকে তেমনই তিনি আমাদেরও প্রতিনিধি। একদিকে তিনি আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিয়া সৃষ্টির প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দেন, অপরদিকে তেমনি সৃষ্টির ব্যথা-বেদনা ও অভাব-অভিযোগ আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেন। কাজেই তাঁহাকে লইয়া স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই এত প্রয়োজন।

কুরআন শরীফে তাই বলা হইয়াছে :

"কুল ইয়া আইওহান্নাসো ইন্নি রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম্ জামীয়া।" অর্থাৎ : বল, হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল।

অন্যত্র তেমনি বলা হইয়াছে :

"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া।" অর্থাৎ : বল, হে মুহম্মদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ যাহার উপর অহি নাযিল হয়।

এখানে দুই দিক হইতে হযরত মুহম্মদের পরিচয় আমরা পাইতেছি। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে তিনি তাঁহার প্রেরিত রসূল : আবার মানুষের তরফ হইতে তিনি একজন মানুষ।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদ শুধু মানুষও নন, শুধু অতি-মানুষও নন। দুইয়েরই তিনি মিলিত রূপ।

হযরত মুহম্মদকে দেখিতে ও চিনিতে হইলে আমাদের দৃষ্টিকোণকে প্রথম হইতে এই ভঙ্গিতে বাঁধিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় আমরা তাঁহার সাচ্চা চেহারা দেখিতে পাইব না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩
প্রতিশ্রুত পয়গম্বর

হযরত মুহম্মদ ছিলেন প্রতিশ্রুত পয়গম্বর (promised prophet) অর্থাৎ আল্লাহ্ যে তাঁহাকে দুনিয়ায় পাঠাইবেন, একথা পূর্বেই নির্ধারিত হইয়াছিল। প্রত্যেক শিল্পবস্তুই প্রথমে শিল্পীর ধ্যানে জন্মলাভ করে, তার অনেক পরে বাহিরে প্রকাশ পায়। মুহম্মদ সম্বন্ধেও একথা সত্য। তিনি ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই তাঁহার জ্যোতির্মূর্তি আল্লাহ্‌র ধ্যানে প্রথমেই সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই জ্যোতির্মূর্তিই নূরে মুহম্মদী। সর্বপ্রথম তাই আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছিলেন মুহম্মদের নূর। একটি হাদিসে তাই আসিয়াছে :

"আউয়ালা মা খালাকাল্লাহু নূরী"

অর্থাৎ : (হযরত মুহম্মদ বলিতেছেন) "সর্বপ্রথমেই আল্লাহ্ যাহা সৃষ্টি করেন তাহা আমার নূর।" কাজেই, একথা অনায়াসে বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ তাহার জন্মের অনেক আগেই জন্মিয়াছিলেন। সারা সৃষ্টি তাঁহার নূরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। চাঁদে-চাঁদে, তারায়-তারায়, গ্রহে-গ্রহে, লোকে-লোকে, তাঁর ধ্যান-মূর্তি একটা অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তর জুড়িয়া তাই এক পরম কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল : কোথায় কবে কোন্‌খানে কিভাবে নিখিলের সেই ধ্যানের ছবি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবে।

প্রতিশ্রুত পয়গম্বরকে এই অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিশ্রুত পয়গম্বর তিনি- যাঁহার আবির্ভাব সৃষ্টির স্বাভাবিক নীতিতে পূর্বেই অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। সৃষ্টিতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে যাহা অনিবার্য, আবির্ভাবের পূর্বে তাহাই প্রতিশ্রুত। মুহম্মদ আসিবে একথা তাই বিশ্বনিখিলের অবিদিত ছিল না। হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম, হযরত ঈসা প্রমুখ পূর্ববর্তী যাবতীয় পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষই জানিতেন সেই নিশ্চিত অনাগত একদিন আসিবে; তাই তাঁহারা প্রত্যেকেই হযরত মুহম্মদের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। বেদ-পুরাণ, জিন্দাবেস্তা, দিঘা-নিকায়া, তওরাৎ, জবুর, বাইবেল প্রভৃতি পুরাকালীন প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থে মুহম্মদের গুণগান ও তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী বিঘোষিত হইয়াছে। নিম্নের কতিপয় দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক সেকথা বুঝিতে পারিবেন।

বেদ—পুরাণে : বেদ-পুরাণ এবং উপনিষদ হিন্দুদিগের বিশিষ্ট ধর্মগ্রন্থ। এইসব প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে 'আল্লাহ্' 'রসুল', 'মুহম্মদ' ইত্যাদি শব্দ কিরূপভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখুন :

'অথর্ববেদীয় উপনিষদ'-এ আছে :

অস্য ইল্ললে মিত্রাবরুণো রাজা
তস্মাৎ তানি দিব্যানি পুনস্তং দুধ্যু
হবয়ামি মিলং কবর ইল্ললাং
অল্লোরসূলমহমদকং
বরস্য অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লা ।।৯।।

www.pathagar.com

'ভবিষ্য পুরাণ'-এ আছে :

এতস্মিন্নন্তরে ম্লেচ্ছ আচার্যেন সবন্বিত: ।
মহামদ ইতি খ্যাত: শিষ্যশাখাসমন্বিত : ।। ৫ ।।
নৃপশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থলনিবাসিনম্
গঙ্গাজলৈশ্চ সংস্নাপ্য পঞ্চগব্যসমন্বিতৈ ঃ
চন্দনাদিভিরভ্যর্চ তুষ্টাব মনসা হরম্ ।। ৬ ।।
নমস্তে গিরিজানাথ মরুস্থলনিবাসিনে
ত্রিপুরাসুরনাশায় বহুমায়াপ্রবর্তিনে ।। ৭ ।।

ভোজরাজ উবাচ-

ম্লেচ্ছৈর্গুপ্তায় শুদ্ধায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
ত্বং মাং হি কিঙ্করং বিদ্ধি শরণার্থ মুপাগতম্ ।। ৮ ।।

ভাবার্থ : ঠিক সেই সময় 'মহামদ' নামক এক ব্যক্তি-যাঁহার বাস 'মরুস্থলে' (আরব দেশে)-আপন সাঙ্গোপাঙ্গসহ আবির্ভূত হইবেন। হে আরবের প্রভু, হে জগদগুরু, তোমার প্রতি আমার স্তুতিবাদ। তুমি জগতের সমুদয় কলুষ নাশ করিবার বহু উপায় জান, তোমাকে নমস্কার। হে পবিত্র পুরুষ! আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার চরণতলে স্থান দাও।

'অল্লোপনিষদ'-এর একটি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় :

হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রা :।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রহ্মাণ অল্লাম।।
অল্লোরসূলমহমদকং বরস্য অল্লো অল্লাম্।
আদল্লাহ্বুকমে ককম অল্লাবুক নিখাতকম ।। ৩ ।।

ভাবার্থ : আল্লাহ্ সকল গুণের অধিকারী। তিনি পূর্ণ ও সর্বজ্ঞানী। মুহম্মদ আল্লাহ্র রসুল। আল্লাহ্ আলোকময়, অক্ষয়, এক, চির পরিপূর্ণ এবং স্বয়ম্ভূ।

'অথর্ববেদ'-এ উল্লিখিত হইয়াছে :

ইদং জনা উপশ্রুত নরাশংসস্তবিষ্যতে ।।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চ কৌরম আরুশমেষু দবহে ।। ১ ।।

ভাবার্থ : হে লোকসকল, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। 'প্রশংসিত জন' লোকদিগের মধ্য হইতে উত্থিত হইবেন। আমরা পলাতককে ৬০,০০০ জন শত্রুর মধ্যে পাইলাম।

বলা বাহুল্য, এখানে যে হযরত মুহম্মদের কথাই বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ মুহম্মদের অর্থই হইতেছে "প্রশংসিত জন', আর মক্কার অধিবাসীদিগের তৎকালীন সংখ্যাও ছিল প্রায় ৬০,০০০।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পাঠক নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারিতেছেন যে, ্যানবলে হাজার হাজার বৎসর পূর্বেই মুহম্মদের স্বরূপ ও আবির্ভাব ্য অবগত ছিলেন।

বৌদ্ধদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'দিঘা-নিকায়া'য় উল্লিখিত হইয়াছে :

গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ভুলিয়া যাইবে, তখন আর একজন বুদ্ধ আসিবেন, (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণার বুদ্ধ।"

www.pathagar.com

আমরা নিম্নে সিংহল হইতে প্রাপ্ত (from Ceylonese sources) একটি প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতেও উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে :

"Ananda said to the Blessed One, 'Who shall teach us when thou art gone?
And the Blessed One replied :
'I am not first Buddha who came on the earth, nor Shall I be the last. In one time another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened one, endowed with wisdom in conduct.......He will Proclaim a religious life, wholly Perfect and Pure such as I now Proclaim.....
Ananda said, 'How shall we know him?
The Blessed One said, He will be known as 'Maitreya'.—

(The Gospel of Buddha by Carus, PP. 117-18)

অর্থাৎ : আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন : আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দিবে?

বুদ্ধ বলিলেন :

আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই। যথাসময়ে আর একজন বুদ্ধ আসিবেন আমার চেয়েও তিনি পবিত্র ও অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত—তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার' করিবেন—আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে আমরা চিনিব কি করিয়া? বুদ্ধ বলিলেন : তাঁহার নাম হইবে মৈত্রেয়।

এই 'শান্তি ও করুণার বুদ্ধ' (মৈত্রেয়) যে মুহম্মদ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কুরআন শরীফে মুহম্মদের বিশেষণও অবিকল এইরূপই আছে। মুহম্মদ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : তিনি 'রহমতুল্লিল্ আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্য মূর্ত করুণা ও আশীর্বাদ।

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে : পার্শীজাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দাবেস্তা' ও 'দসাতির'। জিন্দাবেস্তায় হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। এমন কি 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা মূল শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দিলাম :

Noid te Ahmad dragoyeitim fram-raomi
Spetame Zarathustra yam dahmam Vangnim afritim.
Yunad hake hahi humananghad hvakanghad
Hushyanthnad hudaenad."

(Zend-Avesta, part 1. Translated by Max Muller, P 260)

অর্থাৎ : "আমি ঘোষণা করিতেছি, হে স্পিতাম জরথুষ্ট্র, পবিত্র আহমদ (ন্যায়বানদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয়ই আসিবেন, যাঁহার নিকট হতে তোমরা সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।"

'দসাতির' গ্রন্থেও অনুরূপ আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে। উহার সারমর্ম এইরূপ : "যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলিয়া গিয়া নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে, তখন আরবদেশে এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন–যাঁহার শিষ্যেরা পারশ্যদেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করিবে। নিজেদের মন্দিরে অগ্নিপূজা না করিয়া তাহারা ইব্রাহিমের কাবা–ঘরের দিকে মুখ করিয়া

www.pathagar.com

প্রার্থনা করিবে; সেই কাবা প্রতিমা-মুক্ত হইবে। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা বিশ্ববাসীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হইবে।"

"তাহারা পারশ্য, মাদায়েন, তুস, বল্‌খ্‌ প্রভৃতি পারশ্যবাসীদের যাবতীয় পবিত্র স্থান অধিকার করিবে। তাহাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হইবেন এবং তিনি অনেক অদ্ভুত কথা বলিবেন।"

Muhammad in World Scriptrures
(by A. Haq vidyarthi. P. 47)

তওরাতে : ইহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র 'তওরাত'-এ নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী আছে :

"The Lord they God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me, Unto him ye shall hearken." (Duet. 15 : 18)

অর্থাৎ ঃ "তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে আমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিবেন; তাঁহার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিবে।"

অন্যত্র আছে :

"I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him."

(Duet. 18 : 18-19)

অর্থাৎ : "(ঈশ্বর বলিতেছেন) আমি তাহাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্য হইতে তোমার (মুসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করিব এবং তাঁহার মুখে আমার বাণী প্রকাশ করিব। তিনি তোমাদিগকে আমি যাহা আদেশ করিব তাহাই শুনাইবেন। এবং ইহা অবশ্য ঘটিবে যে, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যাহারা শুনিবে না তাহাদিগকে আমি শুনিতে বাধ্য করিব।"

আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

"And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death :
And he said, The Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them; he shined from mount Paran and he came with ten thousands of Saints; from his right hand went a fiery law for them" (Duet. 33 : 1-2)

অর্থাৎ : "এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মুসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলিয়া বনিঈসরাইলদিগকে আশীর্বাদ করিলেন :

এবং তিনি বলিলেন : প্রভু (মুসা) সিনাই পর্বত হইতে আসিলেন এবং সিয়ের (Seir) পর্বত হইতে উঠিলেন, কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ যিনি আসিবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্বত হইতে বিকীর্ণ হইল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনিলেন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হইতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বাহির হইল।"

www.pathagar.com

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন।

বাইবেলে : হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব সম্বন্ধে বাইবেল হইতেও বহু প্রমাণ দেওয়া যায়। আমরা নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি

যীশুখ্রীষ্টের সমসময়ে সাধু যোহন (St. John) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যখন সকলকে বাপ্তাইজ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীরা কতিপয় প্রাদ্রীকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া যোহনকে যে কয়টি প্রশ্ন করেন এবং যোহন তাহার যে-উত্তর দেন, তাহাতেই হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের খবর পাওয়া যায়। বাইবেলে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

> "And this is the record of John, when Jews sent Priests and Laits from Jerosalem to ask him, who art thou? And he confessed and denied not—I am not the Christ. And they asked him, what then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou THAT PROPHET? And he answered, No.........
> And they asked him and said unto him, why baptizest thou them, it thou be not Elias the Christ, not neithet that prophet?
> John answered them, saying I baptize with water, but there standeth one amongst you whom ye know not.
> He it is who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose."
>
> (John. Chap. 1 : 19-27)

অর্থাৎ : "যোহন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, যখন জেরুজালেম হইতে ইহুদীদের দ্বারা প্রেরিত কতিপয় পাদ্রী আসিয়া যোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কে? তখন যোহন স্বীকার করিলেন, আমি যীশুখ্রীষ্ট নহি। তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আপনি কে? আপনি কি ইলিয়াস? তিনি বলিলেন, আমি ইলিয়াস নহি। আপনি তবে কি সেই নবী? যোহন উত্তর দিলেন না।

তখন তাঁহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : যদি আপনি যীশুখ্রীষ্ট, ইলিয়াস অথবা সেই নবী না হন, তবে কেন বাপ্তাইজ করিতেছেন? যোহন উত্তর দিলেন : আমি পানি দ্বারা বাপ্তাইজ করি, কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাঁহাকে তোমরা জানই না।

তিনি সেই জন যিনি আমার পরে আসিয়াও আমা অপেক্ষা সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমি যাঁহার জুতার ফিতা খুলিবারও যোগ্য নহি।"

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যীশুখ্রীষ্ট এবং ইলিয়াস ছাড়া তৃতীয় আর একজন নবী যে আসিবেন, সেকথা ইহুদীরা জানিত।

এই 'সেই নবী' যে একমাত্র হযরত মুহম্মদই, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কারণ যীশুখ্রীষ্টের পরবর্তী পয়গম্বর (এবং সর্বশেষ পয়গম্বর)-ই হইতেছেন 'হযরত মুহম্মদ'।

যীশুখ্রীষ্ট নিজেও বলিয়াছেন :

> "If you love me, keep my commandments : And I will pray the Father and he shall give you another comforter that he may abide with you forever." (John. Chap. 14 15-16)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : "যদি তোমরা আমাকে ভালবাস, তবে আমার উপদেশমত কার্য করিও; আমি স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিব, যাহাতে তিনি তোমাদিগকে আর একজন শান্তিদাতা প্রেরণ করেন–যিনি চিরদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন।"

অন্যত্র আছে :

"Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away; for if I go not away, the comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him, unto you." (John. 17 : 7-8)

অর্থাৎ : যাহাই হোক, আমার উচিত যে তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি চলিয়া যাই, কারণ আমি না গেলে সেই শান্তিদাতা আসিবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।

"How be it when he the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth, for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that shall he speak, ane he will show you things to come." (John : 13-16)

অর্থাৎ : "যাহাই হউক, যখন সেই সত্য–আত্মা আসিবেন, তখন তিনি তোমাদিগকে সর্বপ্রকার সত্যপথে চালিত করিবেন, কারণ তিনি নিজের কথা কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা তিনি (ঈশ্বরের নিকট হইতে) শুনিবেন, তাহাই বলিবেন, এবং তিনি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা দেখাইবেন।"

এই 'শান্তিদাতা' (paraclete) কে? হযরত মুহম্মদকেই কি স্পষ্টাক্ষরে এখানে ইঙ্গিত করা হইতেছে না? যীশু খ্রীষ্টের পরে একমাত্র মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন পয়গম্বর আবির্ভূত হন নাই। তাহা ছাড়া paraclete শব্দের অর্থও হইতেছে 'শান্তিদাতা', অথবা 'চরম প্রশংসিত'। এই দুইটি বিশেষণই হযরত মুহম্মদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই এ–সম্বন্ধে আর কোনই সন্দেহের অবকাশ নাই।

কুরআন শরীফের বহু স্থানেও এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই আয়াতের উল্লেখ করা যায় :

"এবং যখন আল্লাহ্ সমস্ত পয়গম্বরদিগের সমক্ষে এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি যে–সমস্ত বাণী তোমাদিগকে দিয়াছি তাহা সত্য, অতঃপর একজন রসূল আসিবেন এবং তিনি আসিয়া তোমাদের নিকট যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবেন; তোমরা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবে। তিনি বলিলেন : তোমরা এই ব্যাপারে আমার কথা স্বীকার করিলে ত? তাহারা বলিল : আমরা স্বীকার করিলাম। তখন তিনি বলিলেন : তাহা হইলে সাক্ষী থাকো। আমিও তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।" (৩ : ৮০)

এই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী হইতে কি বুঝা যায়? যাঁহার প্রশংসা এবং আগমনবার্তা বহু পূর্ব হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, আল্লাহ্ যাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর ও সর্বোত্তম আদর্শরূপে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছেন, তিনি কি সাধারণ মানুষ? কখনই নহে।

অতএব হযরত মুহম্মদকে আমরা যেন সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করিয়া বিচার না করি। তাঁহার জীবনে আমরা অনেক সময় অনেক অলৌকিক মহিমার প্রকাশ দেখিতে পাইব, তাঁহার অনেক কার্য হয়ত আমাদের কাছে বিসদৃশ বা অলৌকিক বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু সেগুলিকে আমরা যেন ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪

বংশ পরিচয়

হযরত মুহম্মদ কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিলেন, ইতিহাসের দিক দিয়া এইবার তাহা আলোচনা করিব।

ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হযরত ইব্রাহিমই হইতেছেন হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁহারই বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম এবং তিনিই তাঁহার পূর্বপুরুষ। কাজেই, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের আদি বৃত্তান্ত জানিতে হইলে হযরত ইব্রাহিমের সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু জানিতে হয়।

এখন হইতে আনুমানিক ৪০০০ বৎসর পূর্বে বর্তমান মেসোপোটেমিয়ার অন্তর্গত 'বাবেল' শহরে হযরত ইব্রাহিমের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল আযর।[১] তিনি কুম্ভকারের কার্য করিতেন। তিনি ছিলেন পৌত্তলিক। দেবমূর্তি নির্মাণই ছিল তাঁহার ব্যবসায়। হযরত ইব্রাহিমের কিন্তু এই জড়ধর্ম ভাল লাগিল না। পৈতৃক ধর্ম না মানিয়া তিনি হইলেন তৌহিদবাদী। নিরাকার আল্লাহ্‌র এবাদত এবং মানুষের সহিত প্রেমই হইল তাঁহার ধর্মের মূলমন্ত্র। বলা বাহুল্য, পুত্রের এই নবধর্মমত পিতা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পিতা-পুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রকে স্বমতে আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন পিতা পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়া বাদশার নিকট ধরাইয়া দিলেন।

বাদশাহ ছিলেন নমরুদ। তিনি ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া পুড়াইয়া মারিবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু তাও কি হয়? আল্লাহ্‌র নবীকে পুড়াইয়া মারিবে কে? ইব্রাহিম আগুনে পুড়িলেন না। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে, তিনি রক্ষা পাইলেন।

অতঃপর ইব্রাহিম শিষ্যবৃন্দের সহিত প্যালেষ্টাইন প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পর হযরত ইব্রাহিম তাঁহার স্ত্রী বিবি সারাকে সঙ্গে লইয়া মিসর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসরের বাদশা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং হাজেরা নাম্নী তাঁহার এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে ইব্রাহিমের সহিত বিবাহ দিলেন। সারা ও হাজেরাকে লইয়া পুনরায় তিনি বাবেলে ফিরিয়া আসিলেন।

বিবি সারা ছিলেন বন্ধ্যা। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। বিবি হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন তাঁহার প্রথম পুত্র ইসমাইল।

---

১. হযরত ইব্রাহিমের পিতার নাম আযর ছিল কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কুরআন শরীফে (সুরা আনাম, ৭৫ আয়াত) যদিও আযরকে হযরত ইব্রাহিমের পিতা বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে, তবু অনেকের মতে আযর ছিলেন ইব্রাহিমের চাচা অথবা পিতামহ, কারণ আরবীতে 'আব' অর্থে পিতা, চাচা অথবা বংশের পূর্বতন যে-কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝায়। ঐতিহাসিকগণ তাই বলেন : হযরত ইব্রাহিমের পিতা আযর ছিলেন না, ছিলেন তারেখ বা তেরাহ্ (Terah); এই নাম বাইবেলের আদিপর্বেও দেখা যায়। আযর ছিলেন পৌত্তলিক কিন্তু তারেখ ছিলেন তৌহিদবাদী বা আল্লাহ্-বিশ্বাসী। (দেখুন : সেদ্দানুল আরব)

www.pathagar.com

কিন্তু সপত্নীর ঈর্ষার ফলে বিবি হাজেরা স্বামীর সহিত বাস করিতে পারিলেন না। আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে তখন হযরত ইব্রাহিম শিশুপুত্র ইসমাইলসহ হাজেরাকে আরবের এক মরুপ্রান্তরে নির্বাসন দিয়া আসিলেন।

বিবি হাজেরার তখন কি ঘোর বিপদ! বিজন মরুভূমি। কোথাও জনমানবের বসতি নাই। খাদ্য নাই। পানি নাই। শিশু ইসমাইল তৃষ্ণায় অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন! ব্যাকুলা জননী শিশুকে একস্থানে শোয়াইয়া রাখিয়া অদূরবর্তী সাফা-মারওয়া পাহাড়ে পানির সন্ধানে ছুটাছুটি করিতেছেন। কিন্তু কোথাও পানি মিলিতেছে না।

হাজেরা গভীর নিরাশায় দৌড়াইয়া শিশুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চোখ জুড়াইয়া গেল। তিনি দেখিতে পাইলেন, শিশুর চরণাঘাতে কঠিন প্রস্তর ভেদ করিয়া এক চমৎকার ঝর্ণা-ধারা বহিয়া চলিয়াছে। আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। আল্লাহ্‌র অসীম করুণার কথা মনে করিয়া বারে বারে তিনি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন।

এই ঝর্ণা-ধারাই সেই পবিত্র জমজম—ইসলামের অন্তর্বিগলিত সুধানির্ঝর মুসলিমের জীবনামৃত-আবে কওসর!

ইহার কিছু পরেই কতিপয় সওদাগর সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখিয়া এবং জমজমের সুপেয় পানির সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সেইখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। এইরূপে বিশ্ব মুসলিমের মিলন-কেন্দ্র পবিত্র মক্কা-নগরীর ভিত্তিপাত হইল।[২]

ইসমাইল সেইখানে ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। আরব হইল তাঁহার স্বদেশ, আরবী হইল তাঁহার মাতৃভাষা।

হযরত ইব্রাহিম বিবি হাজেরাকে চিরতরে নির্বাসন দেন নাই। হাজেরা ও ইসমাইলকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন; তাই মাঝে মাঝে তিনি আসিয়া স্ত্রী-পুত্রের খবর লইয়া যাইতেন। পরবর্তীকালে তিনি মক্কা-নগরে আসিয়াই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। ইসমাইলের কুরবানির ব্যাপার এই মক্কা-নগরেই সংঘটিত হয়।

ইসমাইল যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন, তখন হযরত ইব্রাহিম তাঁহাকে মক্কার জুরহাম গোত্রের মাদাদের কন্যা সাঈদার সহিত বিবাহ দিলেন।

মক্কায় অবস্থানকালে একদিন হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইল তথায় 'বায়তুল্লাহ' বা কাবা-গৃহের পুনর্নির্মাণের জন্য আল্লাহ্‌র 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন। এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী তাঁহারা কাবা-গৃহের নির্মাণকার্যে অগ্রসর হইলেন। নির্মাণ-শেষে পিতাপুত্র মিলিতভাবে প্রার্থনা করিলেন :

"হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে তোমার অনুগত কর এবং আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে একটি মহাজাতি সৃষ্টি কর এবং আমাদিগকে তোমার

---

২. কিন্তু এ কথার অর্থ এ নয় যে, এর পূর্বে মক্কা-নগরীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। মক্কা দুনিয়ার সর্বপ্রথম মানব-বসতি। হযরত আদমই মক্কা-নগরীর প্রকৃত স্থাপয়িতা। এজন্যই কুরআন-মজিদে আল্লাহ্‌তায়ালা মক্কাকে 'উম্মুল-কোরা' (বসতি-জননী)এবং কাবাকে 'প্রথম গৃহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২য় খণ্ড দেখুন)

www.pathagar.com

ইবাদতের (উপাসনা) পদ্ধতি শিক্ষা দাও এবং আমাদের প্রতি করুণা কর। নিশ্চয়ই তুমি (করুণার প্রতি) চির-প্রত্যাবর্তনশীল এবং দয়াময়।"
"হে আমাদের প্রভু, আমাদের বংশধরদিগের মধ্য হইতে (সেই) একজন রসূল উত্থিত কর যিনি তাহাদের নিকট তোমার বাণী প্রচার করিবেন এবং কিতাব (কুরআন) শিক্ষা দিবেন, জ্ঞান দান করিবেন এবং তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন। নিশ্চয়ই তুমি শক্তিমান এবং পরম জ্ঞানী।" (সূরা বাকারা : ১২৮-১২৯)

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌তায়ালা এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারেই পরবর্তীকালে ইসমাইলের বংশে হযরত মুহম্মদের জন্ম হইল।

হযরত মুহম্মদের বংশ তালিকা[৩]

১.	আদম	২৯.	মোয়াসির
২.	শীশ	৩০.	ঈহাম
৩.	ইউনুস	৩১.	আফতাদ
৪.	কাইনান	৩২.	ঈসা
৫.	মহলিল	৩৩.	হাসান
৬.	ইয়ার্দ	৩৪.	আনাফা
৭.	ইদ্রিস	৩৫.	অরওয়া
৮.	মাতুশালাখ	৩৬.	বলখী
৯.	লমক	৩৭.	হারী
১০.	নূহ	৩৮.	হারী
১১.	শাম	৩৯.	ইয়াসিন
১২.	আরফাখশাদ	৪০.	হমরান
১৩.	সালেহ্	৪১.	আলরুযা
১৪.	আইবর	৪২.	ওবাইদ
১৫.	কালিস্	৪৩.	আনুফ্
১৬.	রাউ	৪৪.	আস্‌কী
১৭.	সরুজ	৪৫.	মাহী
১৮.	নাহুর	৪৬.	মাখুর
১৯.	তারিহ (আযর)	৪৭.	ফাজিম
২০.	ইব্রাহিম	৪৮.	আলেহ্
২১.	ইসমাইল	৪৯.	বদলান
২২.	কাইজার	৫০.	ইয়ালদারুম
২৩.	আওয়ান	৫১.	হেররা
২৪.	ঔস	৫২.	নাসিল
২৫.	মরূরহ্	৫৩.	আবিল আউয়াম
২৬.	সমূঈ	৫৪.	মতাবিল
২৭.	রোজাহ্	৫৫.	বরু
২৮.	নাজিব	৫৬.	ঔস

৩. এই তালিকা রসূলুল্লাহ্‌র প্রাথমিক জীবনী-লেখক ইবনে ইসহাক প্রণীত 'সীরাৎই-রাসুল্লাহ্' এবং স্যার সৈয়দ আহমদ প্রণীত "Essays on Muhammad and Islam" হইতে গৃহীত।

—৩

www.pathagar.com

৫৭.	সল্‌মান	৭৪.	মুদ্‌রিকা
৫৮.	হামিসা	৭৫.	খুজাইমা
৫৯.	উদ্‌দ	৭৬.	কিনান
৬০.	আদনান	৭৭.	নযর
৬১.	মুঈদ	৭৮.	মালিক
৬২.	হমল	৭৯.	ফিহির (কোরেশ)
৬৩.	নবিত	৮০.	গালিব
৬৪.	সলমান	৮১.	লোবাই
৬৫.	হমিসা	৮২.	কা'ব
৬৬.	আল-ঈসাউ	৮৩.	মোরা
৬৭.	উদূদ	৮৪.	কিল'ব
৬৮.	উদ্‌	৮৫.	কাসাই
৬৯.	আদনান	৮৬.	আবদুল মন্নাফ
৭০.	মা'দ	৮৭.	হাশিম
৭১.	নজর	৮৮.	আবদুল মুত্তালিব
৭২.	মুদার	৮৯.	আবদুল্লাহ্‌
৭৩.	ইলিয়াস	৯০.	মুহম্মদ

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, হযরত মুহম্মদের মধ্যে তিনটি স্বতন্ত্র রক্তধারার মিশ্রণ হইল। হযরত ইব্রাহিমের মধ্য দিয়া আসিল পারশ্যের রক্তধারা, বিবি হাজেরার মধ্য দিয়া আসিল মিসরের রক্তধারা এবং বিবি সাঈদার (ইসমাইলের স্ত্রী) মধ্য দিয়া আসিল আরবের রক্তধারা। তিনটি বিশিষ্ট প্রাচীন সভ্যতার-মিলন-মোহনায় জন্ম হইল এই মরুপয়গম্বরের। পক্ষান্তরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের কেন্দ্রভূমিও হইল আরবদেশ। কাজেই হযরত মুহম্মদের মধ্যে যে ফুটিয়া উঠিবে একটি উদার বিশ্বজনীন রূপ-ইহাতে আর আশ্চর্য কি!

কোরেশ বংশ : হযরত মুহম্মদের ঊর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহির। তিনি 'কোরেশ' নামেও অভিহিত হইতেন। এই কারণে তাঁহার বংশধরগণ কোরেশ নামে খ্যাতি লাভ করে। এই হিসাবেই হযরত মুহম্মদ কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে কোরেশদিগের মধ্যে নানা শাখার উদ্ভব হইয়াছিল এবং নানা গোত্রে তাঁহারা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত মুহম্মদের জন্মগ্রহণের প্রাক্কালে এই কোরেশগণই মক্কানগর শাসন করিতেছিলেন। হযরতের পিতামহ আবদুল মুত্তালিব একজন ধার্মিক লোক ছিলেন। মক্কার কাবা-গৃহে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে তীর্থযাত্রীরা তীর্থ করিতে আসিত। আবদুল মুত্তালিবের উপর এইসব তীর্থযাত্রীদের পানি সরবরাহের ভার ন্যস্ত ছিল। তীর্থের সময় প্রতি বৎসর সুপেয় পানির অভাব ঘটিত। আবদুল মুত্তালিব ইহাতে বিচলিত হইয়া পানি সরবরাহের কোন নূতন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছিলেন। সহসা তাঁহার মনে এক অদ্ভুত খেয়াল চাপিল। হযরত ইসমাইলের সময়কার সেই বিখ্যাত 'জমজম' উৎসটি কালক্রমে মাটির তলে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই হারানো উৎসটি পুনরাবিষ্কারের জন্য আবদুল মুত্তালিব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি উৎসটির কোনই সন্ধান পাইলেন না। লোকে তখন তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে আবদুল মুত্তালিবের বয়সও দিন দিন বর্ধিত হইতেছিল, অথচ কোন সন্তান-সন্ততি জন্মিতেছিল না। এই জন্যই তিনি একদিন কঠোর প্রতিজ্ঞা করিলেন : "যদি আমার দশটি পুত্র জন্মে এবং যদি আমি জমজম উৎসের আবিষ্কার করিতে পারি, তবে একটি পুত্রকে হযরত ইব্রাহিমের ন্যায় আমিও কুরবানি দিব।"

আশ্চর্যের বিষয়, কালক্রমে তিনি জমজম উৎসের আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন এবং একে একে দশটি পুত্র-সন্তান লাভ করিলেন।

তখন আবদুল মুত্তালিব পূর্ব-প্রতিশ্রুতি মত একটি পুত্রকে কুরবানি দিতে মনস্থ করিলেন। পুত্রদিগের মধ্যে ভাগ্য পরীক্ষা (লটারী) করান হইল। ফলে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহর নাম উঠিল।

আব্দুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌কে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালবাসিতেন, তবু কর্তব্যের খাতিরে তাহাকেই কুরবানি দিবার জন্য কাবা-গৃহে লইয়া গেলেন। লোকেরা তাঁহাকে এ কার্য করিতে নিষেধ করিল।

অনেক বুঝাইবার পর আবদুল মুত্তালিব 'শিয়া' নামক একজন ভবিষ্যৎ বক্তার নিকটে গিয়া পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। শিয়া এই নির্দেশ দিলেন : আবদুল্লাহ্‌র বিনিময়ে দশটি উট নির্ধারিত করিয়া উট ও আবদুল্লাহ্‌র মধ্যে ভাগ্য-নির্ণয় কর। যতক্ষণ না উটের নাম উঠিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক বার উটের সংখ্যা দশটি করিয়া বাড়াইয়া দাও। এইরূপে যখন উটের নাম পাওয়া যাইবে, তখন নির্দিষ্ট সংখ্যক উট কুরবানি করিও।

ঠিক তাহাই করা হইল। দশমবারের বার উটের নাম উঠিল। কাজেই উটের সংখ্যা দাঁড়াইল একশত। তখন আবদুল মুত্তালিব সন্তুষ্টচিত্তে ১০০টি উট কুরবানি দিলেন। সেই হইতে কাহারও প্রাণের বিনিময়ে একশত উট কুরবানি করিবার প্রথা আরবে প্রচলিত হইয়া গেল।

এইরূপে আবদুল্লাহ্ নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। পরবর্তীকালে যিনি বিশ্বনবীর পিতা হইবার গৌরব অর্জন করিবেন, তাঁহার জীবন এইরূপভাবে হেলায় নষ্ট হইলে চলিবে কেন? অনন্ত করুণা ও কল্যাণের উৎস-মুখ কি এত সহজেই রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে?

ক্রমে ক্রমে যখন আবদুল্লাহ্ বিশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন, তখন কোরেশ বংশের বনিযোহ্‌রা গোত্রের ওহাবের কন্যা রূপে-গুণে অতুলনীয়া পুণ্যময়ী আমিনার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার কিছুদিন পরেই বাণিজ্য ব্যাপদেশে আবদুল্লাহ্ সিরিয়া যাত্রা করিলেন। তখন আমিনা গর্ভবতী।

সিরিয়া হইতে আবদুল্লাহ্ মদিনা নগরে কয়েক দিন বিশ্রাম করিতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার কঠিন পীড়া হইল। এই সংবাদ পাইয়া আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ্‌কে গৃহে আনিবার জন্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হারিসকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু হায়! হারিস আবদুল্লাহ্‌কে না আনিয়া আনিলেন তাঁহার নিদারুণ মৃত্যু-সংবাদ। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব ও আমিনার হৃদয় শোকে-দুঃখে একবারে ভাঙিয়া পড়িল।

এইরূপে মাতৃগর্ভে থাকিতেই বিশ্বনবী পিতৃহীন হইলেন। বেদনার অমৃত মুখে লইয়াই তিনি ধরায় আসিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫
নামকরণ

বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিব তখন কাবা-গৃহে বসিয়া আপন গোত্রের লোকদিগের সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। একটি অভূতপূর্ব নৈসর্গিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সকলেই বিস্ময় গনিতেছিলেন। এমন সুন্দর প্রভাত ত তাঁহারা আর কখনও দেখেন নাই! এমন সময় সংবাদ আসিল-আমিনা এক পুত্ররত্ন প্রসব করিয়াছে। হর্ষ ও বিষাদে আবদুল মুত্তালিবের হৃদয় ভরিয়া গেল। আজ তাঁহার প্রিয়পুত্র আবদুল্লাহ্‌র বিয়োগ-বেদনা বড় করুণ হইয়া বাজিয়া উঠিল। পক্ষান্তরে এই মৃতপুত্রের স্মৃতি বহন করিয়া আসিল এই নবাগত তরুণ অতিথি। এ-সংবাদও ত তাঁহার জীবনে কম আনন্দের নহে! সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি আমিনার গৃহে উপস্থিত হইয়া আবদুল্লাহ্-তনয়ের মুখ দর্শন করিলেন। কী সুন্দর জ্যোতির্ময় বেহেশ্‌তী মুখশ্রী! আবদুল মুত্তালিবের চোখ জুড়াইয়া গেল। আকুল আগ্রহে শিশুটিকে কোলে লইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি কাবা-মন্দিরে আসিয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলেন। অতঃপর শিশুটিকে দোলা দিতে দিতে লইয়া গিয়া আমিনার কোলে ফিরাইয়া দিলেন। তখন কি জানিতেন কাহাকে তিনি দোলা দিতেছেন!

সাত দিন পরে আরবের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আবদুল মুত্তালিব শিশুর 'আকিকা' উৎসব করিলেন। মক্কার বিশিষ্ট কোরেশ নেতৃবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেওয়া হইল। উৎসব-শেষে কোরেশ দলপতিগণ শিশুকে দেখিয়া খুশি হইলেন এবং কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "শিশুর নাম কি রাখিলেন?"

"মুহম্মদ"।

কোন্ এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আবদুল মুত্তালিব এই কথা বলিয়া ফেলিলেন।

"মুহম্মদ! এমন অদ্ভুত নাম ত আমরা কখনও শুনি নাই! দেবতার নামের সঙ্গে নাম মিলাইয়া রাখিলেন না কেন?"

তৎকালে কোরেশদিগের মধ্যে ইহাই ছিল প্রথা। দেবদেবীর নামের সঙ্গে মিলাইয়া শিশুর নামকরণ করা হইত।

বৃদ্ধ বলিলেন : "আমার এই স্নেহের নাতিটি বিশ্ববরেণ্য হইবে-সমগ্র জগতে ইহার মহিমা ও প্রশংসা পরিকীর্তিত হইবে-এই জন্যই ইহার নাম রাখা হইয়াছে মুহম্মদ।"

সকলে শিশুকে আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে বিবি আমিনাও গর্ভাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেন তাঁহার প্রাণের দুলালের নাম যেন 'আহমদ' রাখা হইয়াছে। এইজন্য 'মুহম্মদ' নামের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'আহমদ' নামও রাখিয়া দিলেন।

এইরূপে নূরনবী দুই নামে অভিহিত হইলেন : মুহম্মদ ও আহমদ। 'মুহম্মদের' অর্থ 'চরম প্রশংসিত' আর 'আহমদের' অর্থ 'চরম প্রশংসাকারী'। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

মুসলিম জগতে এই দুইটি নাম চির-পরিচিত। প্রত্যেকেই আমরা হযরতকে এই দুই নামে ডাকি, চিনি এবং পরিচয় দিই। কিন্তু এই দুইটি নামের ব্যাখ্যা কি, তাৎপর্য কি, হযরতের জীবনে ইহাদের কোনো সার্থকতা আছে কিনা, একটি নামের পরিবর্তে দুইটি নামের প্রয়োজনীয়তাই বা কেন হইল, সে কথা কি আমরা কখনও গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি?

'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নামের মধ্যে একটি গভীর দার্শনিক রহস্য লুক্কায়িত আছে। হযরতের পূর্ণ পরিচয়ের জন্য দুইটি নামেরই নিতান্ত প্রয়োজন। শুধু 'মুহম্মদ' বা 'আহমদ' দ্বারা তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। দুইটি মিলিয়া এক হইলেই তবে তাঁহাকে সত্যরূপে চেনা যায়। কাজেই বলা যাইতে পারে, নাম দুইটি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই দুইটি চুম্বক শব্দের ব্যাখ্যা করিলেই হযরতের গোটা সত্তা এবং স্বরূপ আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হইবে।

পাঠক দেখিতেছেন, এক নামে তিনি 'মুহম্মদ', অন্য নামে তিনি 'আহমদ' অর্থাৎ একদিকে তিনি 'চরম প্রশংসিত' অপরদিকে 'চরম প্রশংসাকারী'। কিন্তু বলিতে পারেন কি, কাহার দ্বারাই বা তিনি চরম প্রশংসিত। আর কাহারই বা তিনি চরম প্রশংসাকারী? আল্লাহ্‌র দ্বারাই তিনি চরম প্রশংসিত হইয়াছেন, আবার আল্লাহ্‌কেও তিনি চরম প্রশংসা করিয়াছেন। অন্য কথায় : যে চরম প্রশংসা ও সম্মান মুহম্মদ লাভ করিয়াছেন, অন্য কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; পক্ষান্তরে মুহম্মদ আল্লাহ্‌র যে প্রশংসা ও যে গুণকীর্তন করিয়াছেন, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভব হয় নাই। উভয়দিক হইতেই প্রশংসা ও গৌরব দানের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

এখন দেখা যাউক-এই 'চরম প্রশংসিত' ও 'চরম প্রশংসাকারী' কে হইতে পারে।

'চরম' প্রশংসিত' একমাত্র সে-ই হইতে পারে-যাহার মধ্যে চরম পূর্ণতা আছে। সর্বশ্রেষ্ঠ না হইলে কেহ কখনও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করিতে পারে না। যাহার মধ্যে অপূর্ণতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, তাহাকে কেহই চূড়ান্ত প্রশংসা করে না-করিতে পারা যায় না। কাজেই 'চরম প্রশংসিত' বলিলেই এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বপ্রথমেই আমাদের মনে জাগে। 'চরম প্রশংসিত' হইতে হইলে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বা অনুপম হইতে হয়। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যে মুহম্মদকে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে প্রদর্শন করিবেন, সমস্ত পরিপূর্ণতা যে তাঁহাকে দিবেন, তাঁহাকে যে চরম এবং পরম আদর্শরূপে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন, এই ইঙ্গিতই পাইতেছি আমরা তাঁহার 'মুহম্মদ' নামের মধ্যে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সত্য পরিচয় যে মুহম্মদের দ্বারাই সারা জগতে বিঘোষিত হইবে, মুহম্মদের হস্তেই যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘটিত হইবে, এই ইঙ্গিতই পাইতেছি আমরা তাঁহার 'আহমদ' নামের মধ্যে। কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর চরম প্রশংসা কেবলমাত্র তিনিই করিতে পারেন-যিনি সেই ব্যক্তি বা বস্তুর রূপ ও গুণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান রাখেন। কাজেই মুহম্মদ যে আল্লাহ্‌র প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হইবেন, এবং তাঁহার সত্য-পরিচয় যে একমাত্র তিনিই দিতে পারিবেন, এই কথারই আভাস পাইতেছি তাঁহার 'আহমদ' নামের মধ্যে।

অতএব দেখা যাইতেছে আল্লাহর বিচিত্র লীলা প্রকাশের জন্য মুহম্মদ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। অবশ্য আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সকল অভাব ও সকল প্রয়োজনের

www.pathagar.com

অতীত। জানি, তবু বলিব : সৃজনলীলার সার্থকতার জন্য মুহম্মদকে কল্পনা না করিয়া তিনি পারেন নাই। নিখিল সৃষ্টির মূলে যদি কোন উদ্দেশ্য নিহিত থাকিয়া থাকে, তবে সে হইতেছে আল্লাহ্‌রই আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ তাঁহার এই সৃষ্টি-লীলার মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিতে চান। আপন মহিমায় অন্তর্লীন হইয়া থাকিলে কে তাঁহাকে চিনিত? শুধু স্রষ্টা থাকিলেই হয় না, দ্রষ্টাও চাই, নতুবা স্রষ্টার সৃষ্টি সার্থক হইবে কেন? দ্রষ্টা না থাকিলে কে স্রষ্টার মহিমা পরিকীর্তন করিবে? উপযুক্ত গুণীর কদর করিবার জন্য তাই প্রয়োজন হয় উপযুক্ত গুণগ্রাহীর। আল্লাহ্‌তায়ালাও তাই আত্ম-অভিব্যক্তির জন্য এমন একজন উপযুক্ত গুণগ্রাহী বা অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্রয়োজন অনুভব করিতেছিলেন-যাহার নিকট তিনি আপন স্বরূপ উদঘাটন করিতে পারেন এবং যিনি সেই মহাসত্যের বেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য রাখেন এই জন্যই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এমনই একজন উপযুক্ত মহাপুরুষের সৃজন অনিবার্য হইয়াছিল।

সেই ভাগ্যবান পুরুষই হইতেছেন মুহম্মদ।

দেশের সম্রাট যদি তাঁহার অধীন কোন কর্মচারীর সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিতে চান, তবে পূর্ব হইতেই তাঁহাকে উচ্চপদ ও খেতাব দিয়া মৈত্রী স্থাপনের উপযুক্ত করিয়া লন। বিদ্যুৎ প্রবাহকে কোথাও সঞ্চারিত করিতে হইলে তাহার ধারক যন্ত্র (receiver)-কেও তদনুযায়ী শক্তিশালী করিয়া লইতে হয়। হযরত মুহম্মদকে ঠিক তাহাই করা হইয়াছিল। আপন সৃষ্ট 'বান্দা' হইলেও আল্লাহ্ তাঁহাকে সর্বগুণে গুণান্বিত করিয়া বিশ্বের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌র বিরাটত্বের খাতিরে মুহম্মদকেও বিরাট করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। পূর্ণ আল্লাহ্‌র পূর্ণ পরিচয়ের জন্য একজন পূর্ণ মানুষেরই ত প্রয়োজন!

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে : মুহম্মদের পূর্বে তবে কি জগতে কোন পূর্ণ-মানুষ আসে নাই? অথবা জগদ্বাসী কি আল্লাহ্‌র পূর্ণ পরিচয় পায় নাই? উত্তর : না। মুহম্মদের পূর্বে বহু পয়গম্বর ও তত্ত্বদর্শী সাধুপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু নিজেদের ধারণ ক্ষমতার অপূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ ও ব্যাপক পরিচয় কেহই তাঁহারা নিজেরাও পান নাই, অপরকেও দিতে পারেন নাই। সে গৌরব সঞ্চিত হইয়াছিল পূর্ণ-মানব মুহম্মদের জন্য। কাজেই আমরা বলিতে পারি, মুহম্মদের পূর্বে কোন পূর্ণ মানুষকে আমরা দেখি নাই-পূর্ণ আল্লাহ্‌কেও দেখি নাই।

মুহম্মদের 'আহমদ' রূপ এখনও প্রকটিত হয় নাই। আল্লাহ্‌তায়ালাকে তিনি কিরূপ প্রশংসা করিবেন, কিভাবে তাঁহার পরিচয় দিবেন এবং সে প্রশংসা ও পরিচয় চরম এবং পরম হইবে কিনা, তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। মুহম্মদের জীবনশেষে সে বিচার আমরা করিব।

মুহম্মদকে আল্লাহ্ 'হাবীব' বা 'দোস্ত' বলিয়া পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি যে 'রহমতুল্লিল আলামিন'-অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির বুকে আল্লাহ্‌র মূর্তিমান করুণা ও আশীর্বাদ, এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। চরম প্রশংসার সঙ্গে চরম প্রেম এবং আশীর্বাদও জড়িত থাকে। শিল্পী যাহাকে আপন মনের সমস্ত মাধুরী ও সুষমা মিশাইয়া নিখুঁতভাবে রচনা করে, তাহাকে সে কেবল প্রশংসাই করে না, ভালও বাসে। বিশ্বশিল্পী তবে কেন তাঁহার এই শ্রেষ্ঠ শিল্পকে ভালবাসিবেন না? এই জন্যই মুহম্মদ আল্লাহ্‌র মাহবুব বা প্রেমাস্পদ। শুধু তাহাই নহে। যেহেতু

www.pathagar.com

মুহম্মদকে আল্লাহ্ ভালবাসেন, এ কারণে মুহম্মদকে যাঁহারা ভালবাসেন, অথবা মুহম্মদ যাঁহাদিগকে ভালবাসেন, তাঁহাদিগকেও আল্লাহ্ ভালবাসেন। কাজেই মুহম্মদের আবির্ভাব বিশ্ব-মানুষের জন্য এক অপূর্ব কল্যাণের উৎস হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের ধর্মই এই!

'মুহম্মদ' হইলে যেমন তাঁহাকে 'হাবীব' হইতে হয়, তেমনি তাঁহাকে 'আহমদ' না হইয়াও উপায় নাই। 'মুহম্মদ' এমন শব্দ—যাহার মধ্যে 'হাবীব' ও 'আহমদের' ধারণা ওতপ্রোতভাবেই নিহিত থাকে। শ্রেষ্ঠ শিল্প শুধু শিল্পীর শ্রেষ্ঠ প্রেম লাভ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনিময়ে শিল্পীর শ্রেষ্ঠ মহিমাও সে ঘোষণা করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পী আত্মপ্রকট হয়। শিল্পের প্রশংসা তাই প্রকৃতপক্ষে শিল্পীরই প্রশংসা। শিল্প অচেতন হইলে শিল্পীর প্রশংসা সে নীরবে করে, সচেতন হইলে প্রকাশ্যে করে। ঠিক যে-পরিমাণে শিল্প সার্থক ও সুন্দর হয়, সেই পরিমাণে শিল্পীও সার্থক ও সুন্দর হইয়া দেখা দেয়। কাজেই শিল্প যদি চরম প্রশংসিত ও পরম পূর্ণ হয়, তবে শিল্পীও তখন তার মধ্য দিয়া চরম প্রশংসিত এবং চরম পরিচিত না হইয়াই যায় না।

আদর্শ শিল্পের মধ্যে শিল্পীর সমগ্র অন্তর-মানুষটি ধরা পড়ে। শিল্পীর যাহা কিছু অনুভূতি, যাহা কিছু প্রেরণা, যাহা কিছু দরদ এবং যাহা কিছু গুণপনা বা কলা-কৌশল সমস্তই রূপায়িত ও লীলায়িত হয় তাহার সেই শিল্পের মধ্যে। শিল্প যেমন করিয়া শিল্পীকে জানে, তেমনটি আর কে জানে? শ্রেষ্ঠ শিল্প জানে তাই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ পরিচয়, আর এই কারণেই করিতে পারে সে তার চরম প্রশংসা।

'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' তাই একই ব্যক্তি না হইয়া পারে না। স্রষ্টার দিক্ দিয়া যিনি মুহম্মদ, সৃষ্টির দিক্ দিয়া তিনিই আহমদ।

ইহাই হইতেছে 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নামের দার্শনিক তাৎপর্য। এই দুইটি নামই মুহম্মদের স্বরূপ-প্রকাশের দুই প্রতীক শব্দ (symbol) মুহম্মদের সমগ্র জীবন ও কর্ম এই দুই নামেরই বিশদ ব্যাখ্যা বা তফসীর। এই দুইটি নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে কি না, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চরম প্রশংসা তিনি লাভ করিয়াছেন কিনা—পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহ্‌র চরম প্রশংসা করিতে পারিয়াছেন কিনা—ইহাই হইবে তাঁহার জীবনালোচনার দুই প্রধান লক্ষ্যবস্তু—ইহাই হইবে তাঁহার সাফল্য বিচারের দুই প্রধান মাপকাঠি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৬

সমসাময়িক পৃথিবী

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট, মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, সুবেহ্-সাদিকের সময় হযরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন।[১]

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে জগতের ধার্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কিরূপ ছিল?

এক কথায় উত্তর দিতে গেলে বলিতে হয় : সে সময় জগতে সত্যই আঁধার যুগ নামিয়া আসিয়াছিল। আরব, পারশ্য, মিসর, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি তৎকালীন সভ্য জগতের সর্বত্রই সত্যের আলো নিভিয়া গিয়াছিল। জবুর, তওরাত, বাইবেল, বেদ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছিল, ফলে স্রষ্টাকে ভুলিয়া মানুষ সৃষ্টির পায়েই বারে বারে মাথা নত করিতেছিল। তৌহিদ বা একেশ্বরবাদ জগৎ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; প্রকৃতি-পূজা, প্রতিমা-পূজা, প্রতীক-পূজা পুরোহিত-পূজা অথবা ভূতপ্রেত ও জড়-পূজাই ছিল তখনকার দিনে মানুষের প্রধান ধর্ম। রাষ্ট্রীক সামাজিক বা নৈতিক শৃঙ্খলা কোথাও ছিল না। অনাচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে ধরণী পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা একে একে সমস্ত দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে এইখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষ : সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নিরাকার পরব্রহ্মের আরাধনা ধর্ম হিসাবে ভারতবর্ষে কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বেদের কোন কোন সূক্তে 'অজ', 'অকায়ম' ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম' ঈশ্বরের উল্লেখ থাকিলেও আর্যগণ দেবদেবীর আরাধনাই করিতেন। জনৈক খ্যাতনামা লেখক বৈদিক যুগের ধর্ম ও সংস্কার সম্বন্ধে বলিতেছেন : "বৈদিক কালের ধর্ম ছিল ভৌতিক প্রকৃতির প্রত্যক্ষগোচর পদার্থের বা দৃশ্যের আরাধনা। এই সমস্ত পদার্থ বা দৃশ্যকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া উপাসকরা অন্ন-ধন-পুত্র-পরিজন লাভের জন্য এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখ-পরিহার বা শত্রুপরাভবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ও স্তুতি করিতেন এবং অগ্নিতে সেইসব দেবতার উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এই হিসাবে বেদের ধর্ম বহু দেববাদ বলা যাইতে পারে।"

"প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ব্যাপার যেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল, পার্থিব বহু বস্তুও তেমন দেবত্ব লাভ করিয়াছিল। ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, উষা, রাত্রি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে জল, নদী, পর্বত, ওষধি, গাভী, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতিও দেবাত্মা বলিয়া বন্দিত হইত।"[২]

বৈদিক যুগের কিছুকাল পরেই আর্যদিগের মধ্যে বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চারি বর্গে গোটা হিন্দু সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র ব্রাহ্মণদের বেদপাঠের এবং পৌরোহিত্য করিবার অধিকার

---

১. এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিস্তৃত আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

২. শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদবাণী' : ১৪ ও ২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

থাকায় ব্রাহ্মণেতর লোকদিগের কোন ধর্মাধিকারই ছিল না। বহু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। শূদ্রদিগের বেদপাঠ করা ত দূরের কথা, বেদমন্ত্র শ্রবণ করিলেও উত্তপ্ত সীসা কানে ঢালিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুশাস্ত্রকার মনু বলিতেছেন :

"যো হ্যস্য ধর্মাচষ্টে কশ্চৈবাদিশতি ব্রতম!
সোহসংবৃতং নাম তমঃ নহ তেনৈব মজ্জতি।"

মনুসংহিতা : ৪/৮১

অর্থাৎ "যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন হইবেন।"

নারী জাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। প্রাচীন ভারতে সীতা, সাবিত্রী, অহল্যা প্রমুখ বহু মহিয়সী আর্যনারীর দৃষ্টান্ত থাকিলেও সাধারণভাবে নারীর স্থান অত্যন্ত হীন ছিল। বেদমন্ত্রে তাঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। নারীকে পুরুষের দাসীরূপেই গণ্য করা হইত: কোনরূপ সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা তাহার ছিল না। রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, ক্ষেত্রজ পুত্র ইত্যাদি প্রথাই তাহার প্রমাণ। নারীর চরিত্র বা প্রকৃতি সম্বন্ধেও তখনকার যুগে অত্যন্ত হীন ধারণাই লোকে পোষণ করিত। স্বয়ং মনু বলিতেছেন :

"নাস্তি স্ত্রীনাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি মর্মোব্যবস্থিত
নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহইতমিত স্থিতি :।" ৩১৮

অর্থাৎ : মন্ত্রদ্বারা স্ত্রীলোকদিগের সংস্কারাদির ব্যবস্থা হয় না, এ কারণে উহাদের অন্তঃকরণ নির্মল হইতে পারে না।

এইরূপে সমাজের প্রতি স্তরে বহু পাপ ও বহু জঞ্জাল পুঞ্জিভূত হইয়াছিল।

চীন : চীনাদের অবস্থা ভারতীয়দিগের অপেক্ষাও শোচনীয় ছিল। ধর্মপ্রচারক হিসাবে চীনদেশে 'কনফুসিয়াস' ও 'তাও'–এর নাম শুনা যায়, কিন্তু তাঁহাদের যে কী ধর্মমত ছিল, তাহা সম্যক বুঝিয়া উঠা কঠিন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনাদিগের মধ্যে প্রকৃতি পূজা, পুরোহিত পূজা ও পূর্বপুরুষ পূজার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল। এক কথায় বলিতে গেলে, নর–পূজাই ছিল তাহাদের প্রধান ধর্ম। অতঃপর বৌদ্ধধর্ম যখন চীন দেশে প্রবেশ লাভ করে, তখনও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বরং বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদ চীনাদের জীবনে আরও ঘোরতর অধঃপতন আনয়ন করিয়াছিল। চীনারা নৈরাশ্যবাদী নাস্তিক হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধের মূর্তি পূজা এবং নৃপতি পূজাই তাহাদের সার ধর্মে পরিণত হইয়াছিল।

পারস্য : অতি প্রাচীনকাল হইতেই পারস্যে অগ্নি উপাসনা ও প্রকৃতি পূজার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পারশিকদের ধর্মগুরু ছিলেন জরদস্ত্ (জরথুস্ত্র) বা Zoroaster এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম ছিল জিন্দাবিস্তা। জরদস্ত্ প্রচার করেন : দুইজন দেবতার দ্বারা জগতের সমুদয় মঙ্গল–অমঙ্গল সাধিত হইতেছে : মঙ্গলের দেবতা 'আহুর মাজদ্' অথবা 'হরমজদ্' আর অমঙ্গলের দেবতা 'আহ্রিমান'। উভয় দেবতার মধ্যে দিবানিশি

৩. The status of Women in Ancient India by Prof. Indra দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

সংঘর্ষ চলিতেছে, সেই সংঘর্ষে হরমজ্‌দ্‌ই জয়লাভ করিতেছেন। এই আহুর মাজ্‌দ্‌-এর পূজাই ছিল পারশিকদের প্রধান ধর্ম।

কালক্রমে এই ধর্মও লোপ পাইল, তখন পৌত্তলিকতা তাহার সমস্ত অভিশাপ লইয়া পারশিকদিগের মধ্যে আসন পাতিল। পুরোহিতদিগের অত্যাচারে পারস্যবাসীরা জর্জরিত হইয়া উঠিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহাদের সমাজবন্ধন একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। দুর্নীতি ও কুসংস্কারের অন্ধকারে পারস্য ডুবিয়া গেল।

ইহুদী জাতি : ইহুদী জাতির দশা চিন্তা করিলে সত্যই দুঃখ হয়। এই জাতি পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার 'অনুগৃহীত' জাতিরূপে পরিগণিত ছিল। ইহাদেরই উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মুসা, হযরত দাউদ, হযরত সোলায়মান প্রমুখ পয়গম্বরদিগকে প্রেরণ করেন এবং 'জবুর' ও 'তাওরাত' নামক দুইখানি ধর্মগ্রন্থ ইহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু এত বড় স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করা সত্ত্বেও আপন কর্মদোষে ইহারা আজ অবলুপ্ত ও নিগৃহীত। বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতা ছিল ইহাদের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, হযরত মুসা, হযরত ঈসা, হযরত মুহম্মদ প্রমুখ পয়গম্বরদিগের সহিতও ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে ছাড়ে নাই। হযরত মুসাকে ইহারা ভীষণভাবে নির্যাতন করিয়াছে; যিশুখ্রীষ্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াছে এবং হযরত মুহম্মদকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, এই জাতির নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন কী ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। বড় বড় পয়গম্বরগণ যাহাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই, সে জাতির অভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না।

খ্রীষ্টান জাতি : ষষ্ঠ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান জাতির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। যিশুখ্রীষ্টের শিক্ষা ও বিধান পাদ্রী ও সাধু পুরুষদিগের হস্তে এতই বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে স্বয়ং যিশু ফিরিয়া আসিলেও উহাকে আর নিজ ধর্ম বলিয়া চিনিতে পারিতেন না। যিশুখ্রীষ্ট পবিত্র তৌহিদবাদই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সাধু পল, পিটার প্রমুখ ধর্মযাজকেরা উহাকে ত্রিত্ববাদে (Trinity) পরিণত করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। যে যিশু মূর্তিপূজা দূর করিতে ধরায় আসিলেন, সেই যিশুর মূর্তিই খ্রীষ্টানরা পূজা করিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতা মেরীও ঈশ্বরের এক তৃতীয়াংশরূপে সর্বত্র পূজিত হইতে লাগিলেন। শুধু কি তাই? স্বয়ং পল এবং পিটারের মূর্তিও গির্জায় স্থাপিত হইল। জীবনে যে যত পাপ করুক, ত্রাণকর্তা যিশুকে ভজনা করিলেই সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে, এই বিশ্বাস প্রত্যেক খ্রীষ্টানের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। কালে কালে 'Holy Roman Empire' নামে স্বতন্ত্র খ্রীষ্টজগৎ রচিত হইল এবং রোমের পোপ খ্রীষ্টানদিগের যাবতীয় ধর্মসংক্রান্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ধর্ম ও ঈশ্বরের নামে পোপেরা যে বীভৎস লীলাখেলা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠক তাহা জানেন। তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন : স্বর্গের চাবি তাঁহাদের হাতে। যত বড় পাপীই হউক, উপযুক্ত মূল্যে পোপের নিকট হইতে স্বর্গের 'পাসপোর্ট' ক্রয় করিলে আর তাহার কোন ভয় নাই; নির্ঘাৎ সে স্বর্গে যাইবে! বলা বাহুল্য, ইহার ফলে খ্রীষ্টান জগতে যে দুর্নীতি ও পাপের স্রোত বহিয়া গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

www.pathagar.com

আরব জাতি : আরবের অবস্থা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল। চুরি, ডাকাতি, মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, অবিচার, মদ্যপান, নারীহরণ প্রভৃতি যত রকমের পাপ ও দুর্নীতি থাকিতে পারে, আরব চরিত্রে তাহার কোনটিরই অভাব ছিল না। আল্লাহ্‌কে তাহারা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিল। বুৎপুরুস্তি (মূর্তিপূজা) ও কুসংস্কারের অন্ধকারে সারাদেশ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌তায়লার ইবাদতের জন্য যে কাবা ঘর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই 'খোদার ঘরেই' আরবেরা ৩৬০টি দেবমূর্তির[৪] প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিল।

নারীজাতির অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। গৃহপালিত পশুর মতন তাহাদিগকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা হইত। পিতার মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী-কন্যাগণও পুত্রের ভোগে আসিত। কন্যা সন্তানকে অনেক সময় জীবন্ত প্রোথিত করা হইত। বিবাহিতা স্ত্রীদিগকে যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত। পক্ষান্তরে একই নারী একই সময়ে বিভিন্ন পুরুষকে বিবাহ করিয়া উৎকট সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিত।

আরবে দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে দাস দাসীর ক্রয় বিক্রয় চলিত। সময়ে সময়ে কাবা গৃহে নরবলিও হইত! ইহাই ছিল আরব জাতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

আঁধার যুগের অবস্থা এইরূপই ভয়াবহ ছিল। মানুষ পশু হইয়া গিয়াছিল। সেই নরপশুদিগের বীভৎস তাণ্ডব-লীলায় ধর্ম ও নীতির অস্ফুট আর্তনাদ কোথায় তলাইয়া গিয়াছিল। এই চরম দুর্গতি হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব তাই আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

---

৪. আঁধার যুগে আরবের ধর্ম যে নিছক পৌত্তলিকতা ছিল, এরূপ মনে হয় না। হযরত ইব্রাহিমের প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ তখনও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আল্লাহ্‌কে, পয়গম্বরদিগকে এবং ফেরেশ্‌তাদিগকে অনেকেই মনে মনে মানিত এবং পরকালে বিশ্বাস করিত। কিন্তু আল্লাহ্‌কে তাহারা অত্যন্ত ভয় করিত বলিয়া সরাসরি তাঁহার সঙ্গে কোন প্রকার যোগস্থাপন করিতে সাহস করিত না। তাই ফেরেশ্‌তাদিগকে বা গ্রহ নক্ষত্রকে তাহারা তাহাদের সুপারিশকারী বা মাধ্যম স্বরূপ মনে করিত। ইহা হইতে পরে মূর্তিপূজার সূচনা। Washington Ireving এ সম্বন্ধে বলেন :

"In its original state the Sabean faith was pure and spiritual, including a belief in the unity of God, the doctrine of a future state of rewards and punishments and the necesity of a virtuous and holy life to obtain a happy immortality....In addressing themselves to the stars and other celestial, luminaries there-fore, the Sabeans did not Worship them as deties, but sought only to propitiate their angelic occupants as intercessors With the Supreme Being looking up through these created things to God, the great Creator."

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৭
শিশুনবী

হযরত মুহম্মদের জন্মের কয়েকদিন পরেই মরুভূমি হইতে বেদুঈন ধাত্রীরা শিশুসন্তানের অনুসন্ধানে মক্কা নগরে আসিয়া উপনীত হইল। তখনকার দিনে আরবে স্তন্যদান ও লালন-পালনের ভার ধাত্রীর হস্তে ন্যস্ত করা হইত। অবশ্য এজন্য ধাত্রীরা উপযুক্ত পুরস্কার ও বেতন পাইত।

এই প্রথানুযায়ীই প্রতিপাল্য শিশুদিগের সন্ধানে মাঝে মাঝে ধাত্রী ব্যবসায়ী বেদুঈন রমণীরা শহরে আসিত। বলা বাহুল্য, এই উপায়ে তাহারা বেশ কিছু উপার্জন করিয়া লইত। অবস্থাপন্ন ঘরের শিশুদিগের প্রতিই তাহাদের অধিকতর আকর্ষণ ও লক্ষ্য থাকিত। এজন্য ধাত্রীদের মধ্যে প্রথমত : কেহই বিধবা আমিনার পুত্রকে গ্রহণ করিতে রাযী হয় নাই। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহের সন্তান লাভের প্রতিই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল।

ধাত্রীদিগের সকলে মনের মত এক একটি শিশু সন্তান লাভ করিয়া ফিরিয়া গেল, কিন্তু ধাত্রী হালিমার ভাগ্যে মুহম্মদ ছাড়া অন্য কোন শিশু জুটিল না। তখন হালিমা স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, "শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইয়া লাভ কি? এই এতিম শিশুটিকেই গ্রহণ করি, কি বল?"

স্বামী উত্তর দিলেন : "নিশ্চয়ই! মুহম্মদকেই গ্রহণ কর। হয়ত ইহার মধ্য দিয়াই আমাদের নসীব বুলন্দ হইবে।"

হালিমা তখন শিশু মুহম্মদকে গ্রহণ করিলেন।

হালিমা ছিলেন বনিসা'দ গোত্রের মেয়ে। এই সা'দ বংশের লোকেরা সে যুগে বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিবার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শহরের ভাষা নানান ধারার সংমিশ্রণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষা এই গোত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আরবে তখন অন্যান্য কুপ্রথা বিদ্যমান থাকিলেও কাব্যচর্চা ও সুললিত ভাষার খুবই আদর ছিল। যাহার ভাষা যত উদ্দাম ও সাবলীল হইত, সর্বসাধারণ তাহাকেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের চোখে দেখিত। আশ্চর্যের বিষয়, কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে শিশু মুহম্মদের লালন-পালনের ভার গিয়া পড়িল এই মার্জিত রুচি ও উন্নতমনা সা'দ বংশের উপরে। পরবর্তীকালে হযরত মুহম্মদ যে কথাবার্তায় মিষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহার অন্যতম কারণ এইখানে মিলিবে।

শিশু মুহম্মদকে লইয়া হালিমা নিজ গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। বিবি আমিনা প্রাণের দুলালকে ধাত্রী হস্তে সমর্পণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাঁহার কল্যাণ প্রার্থনা করিলেন। সেই নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখখানি দেখিয়া তাঁহার সাধ যেন আর মিটিতে চাহে না। করুণ নয়নে তিনি পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে হালিমার উট দৃষ্টি-সীমার আড়ালে চলিয়া গেল।

মুহম্মদকে নিজ গৃহে লইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে হালিমা এক আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার গৃহপালিত মেষগুলি অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দান করিতে লাগিল। খর্জুর বৃক্ষে প্রচুর পরিমাণে খর্জুর ফলিতে লাগিল; কোন দিক দিয়াই তিনি আর কোন অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন না। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, শিশু নবী যখন হালিমার স্তন্য

www.pathagar.com

পান করিতেন, তখন মাত্র একটি স্তন্যই পান করিতেন, অন্যটি করিতেন না। মনে হইত মুহম্মদ যেন জানিয়া শুনিয়াই অপর স্তন্যটি তাঁহার দুধ ভাই-হালিমার আপন পুত্রের জন্য রাখিয়া দিতেন। এই সমস্ত ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া হালিমা প্রথম হইতেই এই অনুপম শিশুর প্রতি কেমন যেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।

হালিমার এক পুত্র, তিন কন্যা ছিল। পুত্রটির নাম আবদুল্লাহ্ এবং কন্যা তিনটির নাম আনিসা, হোজায়ফা এবং শায়েমা। শায়েমার বয়স তখন সাত আট বৎসর। মুহম্মদের লালন-পালন কার্যে শায়েমা সর্বদা মাতাকে সাহায্য করিত। মুহম্মদকে সে বড়ই ভালবাসিত। সেই অপরূপ মুখশ্রী, সেই ভুবন ভুলানো হাসি, স্নিগ্ধ চাহনি দেখিয়া শায়েমার কচি মন বালিকাসুলভ আনন্দে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। আপন সহোদরের মতই সে তাহাকে স্নেহ করিত। মুহম্মদকে কোলে লইয়া দোলা দিতে দিতে সে প্রায়ই সুললিত কণ্ঠে গান গাহিত :

"বেঁচে থাকুক মুহম্মদ-সে দীর্ঘজীবী হোক,
চির-তরুণ চির-কিশোর চির-মধুর রো'ক।
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান,
শত্রু তাহার ধ্বংস হউক-ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও,
চিরস্থায়ী গৌরব যা-তাই তাহারে দাও।"

কী সুন্দর দৃশ্য এ! বিশ্বনবীকে দোলা দিয়া খেলা করিতেছে এক বেদুঈন বালিকা। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর—খোদার পিয়ারা নবী—তাঁহার খেলার সাথী শায়েমার এই গৌরব—এই আনন্দের তুলনা কোথায়? পরবর্তীকালে হযরত মুহম্মদের জীবনের সহিত কত সাহাবা, কত জ্ঞানী-গুণীর কত সম্বন্ধই না স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু শায়েমা ও শিশু-নবীর এই সম্বন্ধটুকু একেবারে অনবদ্য। এ যেন একটি ছোট বেহেশ্‌তী ফুল, সকল দৃষ্টির অন্তরালে কালের এক নিভৃত কোণে চিরদিনের মত অক্ষয় ও ভাস্বর হইয়া আছে।

দুই বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। হালিমা মুহম্মদকে আমিনার নিকট লইয়া আসিলেন। আমিনা পুত্রের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মধুর মূর্তি ও দিব্যকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। হালিমার উপরেও তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন।

এই সময় মক্কায় অত্যন্ত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। এ কারণে আমিনা মুহম্মদকে আরও কিছুদিন হালিমার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন। বৃদ্ধ মুত্তালিবও এ-প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। পুনরায় মুহম্মদ হালিমার গৃহে ফিরিয়া চলিলেন।

মহাপুরুষদিগের জীবনের গতি কত বিচিত্র, কত রহস্যপূর্ণ। পিতৃহীন হইয়াই মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিলেন; এক সপ্তাহ বয়স হইতে না হইতেই জননীর স্নেহের নীড় ছাড়িয়া সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনের মধ্যে গিয়া পড়িলেন, দুই বৎসর পরে যদিও বা জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও মাতৃস্নেহ ভোগ করিবার মত অবসর তাঁহার জুটিল না! জননীর স্নেহ, গৃহের মায়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেম—কোন কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিল! ঘর তাঁহার পর হইল পর তাহার আপন হইল বেদুঈন পল্লীর সেই নিভৃত কুটিরে আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৮
প্রকৃতির কোলে

দিগন্ত বিস্তৃত মরুভূমির মধ্যে হালিমার কুটির। বেদুঈন জীবনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সেখানে বিদ্যমান। চতুর্দিকে মুক্ত স্বাধীন প্রকৃতি—মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত প্রান্তর, তারি মাঝে মুক্ত মানুষের মুক্ত মন। কোথাও বাধা নাই, বন্ধন নাই, জীবনযাত্রার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নাই, প্রকৃতির সঙ্গে চমৎকার সুসঙ্গতি তার। শুধু জড়-জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও হাসি-কান্নাই এ জীবনের সবটুকু নয়। এর খানিকটা বাস্তব, খনিকটা স্বপ্ন; খানিকটা কঠোর, খানিকটা কোমল; খানিকটা গদ্য, খানিকটা কবিতা। প্রভাত আলোর ঝর্ণা-ধারায় প্রাতঃস্নান করা; ঘোড়া ছুটাইয়া দূর-দিগন্তে বিলীন হইয়া যাওয়া, মরু উদ্যানের খর্জুর বীথিতে ডেরা ফেলিয়া বাস করা, চাঁদনি রাতে নহর কিনারে ভ্রমণ করা, কখনও বা মরু সাইমুম ও মরু ঝটিকার সম্মুখীন হওয়া-এ সমস্তই বেদুঈন জীবনের রোমান্সের দিক। জীবনের চারিপাশে এই রোমাঞ্চকর পরিবেশ, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই মিশামিশি, আলো-ছায়ার এই লুকোচুরি খেলা, এই আধ-জাগরণ আধ-স্বপ্নের সংমিশ্রণ, ইহাই মানুষের স্বাভাবিক জীবন। প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে জীবন, তাহার কোন মাধুর্য নাই। প্রকৃতির সহিত মানুষ যেখানে মিলিয়া যায়, সেইখানেই জীবনের চমৎকারিত্ব। সাধে কি কবি গাহিয়াছেন :

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুঈন
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।"

এমনি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে শিশু-নবীর জীবনযাত্রা আরম্ভ হইল। শৈশবকাল শিক্ষার সময়; এই সময় শিশুর মনে যে শিক্ষা ও যে আদর্শের রেখাপাত করা যায়, তাহাই স্থায়ী হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয়, হযরত মুহম্মদের সেরূপ কোন শিক্ষার ব্যবস্থাই হইল না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? মুহম্মদের শিক্ষার কি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই?

নিশ্চয়ই হইয়াছে। পিতা নয়, মাতা নয়, শিক্ষক নয়, সমাজ নয়—স্বয়ং আল্লাহ্‌তায়ালাই তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবী রসূলদের শিক্ষা ত এইভাবেই হইয়া থাকে। মানুষের শিক্ষা ও কৃত্রিম জ্ঞান ত তাঁহাদের জন্য নয়। তাঁহাদের শিক্ষার পদ্ধতি ও উপাদান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কী অদ্ভুতভাবেই না শিশু নবীর জীবন আরম্ভ হইল! সাধারণ মানব-জীবনের সহিত এ জীবনের কত পার্থক্য! খোদা যেন কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মুহম্মদকে বারে বারে ঘর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলুষিত আদর্শের ছাপ পড়িবার পূর্বেই তিনি তাঁহাকে সরাইয়া অনিয়া বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত পটভূমিতে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন, একে একে তাঁহাকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাতের অরুণ-রাঙা আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা 'লু' ভরা বাতাস; নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি-উপত্যকার ধূসর শ্রী, মরু-দিগন্তের মায়া-মরীচিকা, সমস্তই তাঁহার মনে এক অপূর্ব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে যে

www.pathagar.com

একজন নিয়ন্তা আছেন, তিনি যে আড়ালে থাকিয়া নানা বর্ণে, নানা গন্ধে, নানা গানে, নানা ছন্দে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, এ সত্য তিনি তাঁহার অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে বেদুঈন জীবনের সহজ সরল প্রকাশভঙ্গি, তাহাদের তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রেম-এ সমস্তও তাঁহার শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। এইরূপ অদ্ভুত পদ্ধতিতেই শিশু-নবীর শৈশব শিক্ষা আরম্ভ হইল। সকল জ্ঞানের সকল সত্যের সকল তথ্যের উৎসমুখ যেখানে—সেখানে বসিয়াই তিনি জ্ঞানামৃত পান করিতে লাগিলেন। মানুষের রচিত বিকৃত শিক্ষা কেন তিনি গ্রহণ করিবেন? বিশ্বগুরু হইবার জন্য যিনি ধরায় আসিলেন, তিনি কেন অপরকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করিবেন? তাই তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন—'উম্মি' ছিলেন—ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিকই হইয়াছিল। অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট হইয়া যাইতেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাঁহার মনের উপর একটা পর্দার আড়াল টানিয়া দিত; চিরজ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃপুঞ্জ তখন আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চিত্তে আসিয়া প্রতিফলিত হইতে পারিত না। এই কারণেই বোধ হয় আল্লাহ্‌তায়ালা সতর্ক অভিভাবকের মত শিশু-মুহম্মদকে সমাজের বিকৃত আবহাওয়া হইতে সরাইয়া লইয়া নির্জন মরুবক্ষে রাখিয়া দিয়াছিলেন। সৃষ্টিলীলার সমস্ত গোপন রহস্য ও মূল সত্যগুলি জানা হইলেই ত সব জানা হইয়া যায়। সেই জ্ঞানই ত পরম জ্ঞান। মুহম্মদ সেই স্বর্গীয় জ্ঞানেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। বস্তুত হযরত মুহম্মদ সত্যই যে জগদ্‌গুরু ছিলেন, তাহার এক বড় প্রমাণ তিনি নিরক্ষর ছিলেন—তাঁহার কোন গুরু ছিলনা।

মুহম্মদের বয়স ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে লাগিল। তিনি এখন পাঁচ বৎসরের বালক। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার এখন প্রাথমিক জ্ঞান জন্মিয়াছে। দুধ-ভাইবোন ও অন্যান্য বেদুঈন বালক-বালিকাদের সঙ্গে তিনি এখন খেলিয়া বেড়ান।

কিন্তু এই অল্প বয়সেই মুহম্মদ অতিমাত্রায় চিন্তাশীল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সকল কাজে, সকল কথায়, সকল হাবভাবেই কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। কখনও তিনি উন্মনা, কখনও বা তিনি উদাস, কখনও বা তিনি ভাবগম্ভীর। অন্তর তাঁহার সুদূরের পিয়াসী, দৃষ্টি তাঁহার দিগন্ত-বিসারী। দূরের পানে আঁখি মেলিয়া সর্বদাই তিনি কি যেন কি ভাবেন। আকাশ যেন নীল নয়ন মেলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, চাঁদ যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকে, তারারা যেন তাঁহাকে দেখিয়া মিটিমিটি করিয়া হাসে, বাতাস যেন তাঁহার কানে কানে গোপন বাণী কহিয়া যায়। দৃশ্য জগতের অন্তরালে ভাঙা-গড়ার যে লীলা চলিতেছে, তাহার রহস্য যেন তিনি পূর্বে জানিতেন, কিন্তু আজ আর মনে নাই। অর্ধবিস্মৃত স্বপ্নের মত এই নিখিল মখ্‌লুকাত কেবলি তাহাকে উতলা করিয়া তুলে। চেনা-অচেনার আলো-ছায়ায় মন তাঁহার সতত দুলিতে থাকে। সেই পূর্বস্মৃতি মনে পড়িতেই যেন তিনি মাঝে মাঝে এমন বিমনা হইয়া পড়েন।

এমন যে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! মহাপুরুষদিগের জীবন-প্রভাত এমনই বিচিত্র ও সুন্দর।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৯
বক্ষ-বিদারণ

হালিমার গৃহে অবস্থানকালে হযরত মুহম্মদের জীবনে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। ঘটনাটি এইরূপ :

একদিন শিশু-মুহম্মদ তাঁহার দুধ-ভাই ও অন্যান্য বালকদিগের সহিত মাঠে মেষ চরাইতে গিয়াছেন, এমন সময় একজন ফেরেশ্‌তা তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মুহম্মদের হাত ধরিয়া তাঁহাকে তিনি একটু আড়ালে লইয়া গেলেন। তারপর তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া তাঁহার বুক চিরিয়া কি যেন বাহির করিলেন। মুহম্মদ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। দূর হইতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালকেরা ভয়ে দৌড়াইয়া গিয়া বিবি হালিমাকে বলিল : "দেখ গিয়া মুহম্মদ নিহত হইয়াছে"। সংবাদ শ্রবণমাত্র হালিমা এবং তাঁহার স্বামী ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন মুহম্মদ বাস্তবিকই অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন। তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সেবা-শুশ্রূষা করিয়া উভয়ে মুহম্মদকে গৃহে লইয়া আসিলেন।

এই ঘটনা পরবর্তীকালে হাদিস শরীফে নিম্নরূপ উল্লেখিত হইয়াছে :

"আনাস বলিতেছেন : একদা হযরত বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা তথায় উপস্থিত হইলেন। জিব্রাইল হযরতকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন, তারপর তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিণ্ডটিকে বাহিরে আনিয়া তাহার মধ্য হইতে খানিকটা জমা রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন : শয়তানের অংশ যেটুকু তোমার মধ্যে ছিল তাহা এই। তার পর সেই হৃৎপিণ্ডটিকে একটি সোনার তশ্‌তরিতে রাখিয়া জমজমের পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করিলেন, অতঃপর সেটিকে জোড়া লাগাইয়া পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। বালকেরা দৌড়াইয়া গিয়া হালিমাকে বলিল : 'দেখ গিয়া, মুহম্মদ নিহত হইয়াছে'। তখন সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মুহম্মদ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া আছেন। আনাস বলিতেছেন : আমি হযরতের বুকে সেলাইয়ের দাগ দেখিয়াছি।"

শুধু যে আনাসই এ হাদিসটি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে। ইবনে-হিশাম এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইবনে হিশাম বলিতেছেন :

"হালিমা বলিয়াছেন : মুহম্মদ একদিন তাঁহার দুধ-ভাইদের সহিত বাড়ীর নিকটে মেষ চরাইতেছিলেন। এমন সময় বালকেরা ছুটিয়া আসিয়া আমার নিকট বলিল যে, দুইজন শ্বেতবাস পরিহিত লোক আসিয়া তাহাদের কোরেশ ভাইকে ধরিয়া তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। আমি এবং আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, মুহম্মদ বিবর্ণ ও ভীত অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমরা বালকটিকে আলিঙ্গন করিলাম এবং এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন বালক উত্তর দিল : দুইটি শ্বেতবাস পরিহিত লোক আমার নিকট আসিয়া আমাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া আমার কলিজা বাহির করিয়া লইল এবং উহার মধ্য হইতে একটা কিছু বাহির করিয়া ফেলিল। সে যে কি জিনিস, আমি জানি না।"

www.pathagar.com

হযরতের বক্ষ-বিদারণ লইয়া অনেকেই অনেক প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইউরোপীয় লেখকরা এ-ঘটনা স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে হযরতের Epilepcy বা Falling diseas-অর্থাৎ 'মূর্চ্ছা' বা 'মৃগীরোগ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা 'Possessed' অর্থাৎ 'ভূতে পাওয়া' বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। এইরূপ ব্যাপারে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শুধু ইউরোপীয় লেখকদেরই বা দোষ দিই কেন, বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারটিকে স্বয়ং বিবি হালিমা এবং তাঁহার স্বামীও এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। শিশু-মুহম্মদের এই আবিষ্টভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা হইয়াছিল, হয়ত ছেলেটিকে ভূতে পাইয়াছে বা জ্বীনে ধরিয়াছে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরাইয়া দিবার জন্য হালিমা তাই মুহম্মদকে আমিনার নিকট লইয়া গেলেন। কিন্তু আমিনা এই কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন : "তুমি কি মনে করিতেছ যে, আমার পুত্রের উপর ভূত-প্রেতের আসর হইয়াছে?" হালিমা উত্তর করিলেন : "হ্যাঁ, সেইরূপই মনে হয়।" আমিনা বাধা দিয়া বলিলেন : "অসম্ভব! উহার উপর ভূত-প্রেতের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটি পবিত্র ভাব নিহিত আছে। উহা সেই ভাবেরই প্রকাশ।"

বক্ষ-বিদারণ ঘটনাটি সম্বন্ধে মন্তব্য করা অত্যন্ত কঠিন। রসূলুল্লাহ্‌র জীবনে যেসব অতি-স্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ আছে, বক্ষ-বিদারণ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ঘটনাটি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মত ও ব্যাখ্যা আছে। কেহ বলেন, দৈহিকভাবেই এই বক্ষ ছেদন হইয়াছিল। আবার অনেকেই মনে করেন : ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। তাঁহারা বলেন, বক্ষ সম্প্রসারণকে রূপকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নবী, রসুল, দার্শনিক ইত্যাদি অসাধারণ ব্যক্তিদিগের হৃদয় স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রসারিত করা হইয়া থাকে। মহাকার্য সাধনের জন্য হৃদয়ের পরিব্যাপ্তির একান্ত প্রয়োজন। হৃদয়ক্ষেত্র বিশাল না হইলে মহাসত্যের স্থান হয় না। রসূলুল্লাহ্‌র বক্ষ-বিদারণকে তাঁহার এই দার্শনিক আলোকেই গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেন।[১]

আমাদের মতে বক্ষ-বিদারণের উপযুক্ত কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ইহাকে একটা প্রচলিত প্রবাদরূপে মানিয়া লওয়াই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

---

১. এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। হার্ট বা অন্য যে কোন অঙ্গের অপারেশনের বেলায় ক্লোরোফরম্ বা ঐ জাতীয় কোন anaesthetic দিয়া অনুভূতিকে লোপ করিয়া দিতে হয়। রসূলুল্লাহ্‌র মারফত চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই জগদ্বাসী এই অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির সন্ধান পায় নাই কি? ঘটনাটির ব্যাখ্যা যেরূপই হউক, নূতন আইডিয়া হিসাবে ইহার মূল্য আছে।

—৪

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১০

শিশুনবী এতিম হইলেন

বিবি হালিমা শিশু-মুহম্মদকে আমিনার নিকট ফিরাইয়া দিলেন। পাঁচ বৎসর পর শিশু নবী জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন। ধাত্রী-গৃহের শৈশব জীবন এখানে তাঁহার শেষ হইল।

ইহার পর বিবি হালিমা এবং শায়েমা ঘটনার অন্তরালে সরিয়া যাইবেন, আর তাঁহাদের সহিত পাঠকের বড় একটা সাক্ষাৎ হইবে না। হযরতের জীবনের বিপুল পরিসরের মধ্যে খুব একটা ক্ষুদ্র অংশের সঙ্গেই তাঁহারা জড়িত ছিলেন; কিন্তু কত অনিন্দ্য সেই সম্বন্ধটুকু। মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা হযরত একমাত্র তাঁহাদের নিকট হইতেই লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হযরতের জীবনে একমাত্র তাঁহারাই পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির ছাপ দিতে পারিয়াছিলেন। হৃদয় ও মন কত উদার ও কোমল হইলে সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া অপর নারীর একটি শিশুপুত্রকে স্নেহ মমতা দিয়া বশ করিয়া রাখা যায়! হালিমার হস্তে শিশু মুহম্মদ কোন দিনই মাতৃ-স্নেহের অভাব অনুভব করেন নাই। এতই মধুর ছিল তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ।

অন্যদিকে হযরত মুহম্মদ যে কিরূপ মাতৃভক্ত ছিলেন এবং ভাই-বোনদিগকে তিনি যে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহার প্রমাণ পাই আমরা এই হালিমা ও শায়েমার প্রতি তাঁহার আদর্শ ব্যবহার দেখিয়া। আপন মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁহার জুটে নাই। জন্মের পূর্বেই পিতাকে এবং অতি শৈশবেই মাতাকে তিনি হারাইয়াছিলেন। কাজেই পুত্ররূপে হযরতকে আমরা দেখিতে পাইব না। কিন্তু হালিমার প্রতি তিনি যে অকপট ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝিতে আমাদের কষ্ট হয় না যে, আবদুল্লাহ্ ও আমিনা জীবিত থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগকে কিরূপ ভক্তি করিতেন। "বেহেশ্‌ত জননীর চরণ তলে মাতৃভক্তি যে একেবারে অতুলনীয় হইত উহা বুঝাইয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত মুহম্মদ কোনদিনই এই দুধ-মা ও দুধ-বোনকে ভুলিতে পারেন নাই। যতদিন হালিমা জীবিত ছিলেন, ততদিন হযরত তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া গিয়াছেন। হালিমা যখনই হযরতের সহিত দেখা করিতে আসিতেন, তখনই হযরত পরম শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেন এবং যথোপযুক্ত উপহারাদি দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিতেন। একবার হযরত তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হালিমা হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। হযরত তাঁহাকে দেখিবামাত্র আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজের শিরস্ত্রাণ বিছাইয়া তাঁহাকে বসিতে দিয়া সকলের নিকট এই বলিয়া পরিচয় দিলেন : "মা! আমার মা!"

বিবি খাদিজার সহিত হযরতের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি এই দুধ-মা ও দুধ-বোনকে আনিতে ভুলেন নাই। আবার যখন আরবে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখন হালিমা হযরতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে হযরত সন্তুষ্টচিত্তে এক উট বোঝাই খাদ্যদ্রব্য এবং চল্লিশটি মেষ তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন।

www.pathagar.com

শায়েমার স্মৃতিও হযরত কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তায়েফনগর অবরোধ-কালে শায়েমা বন্দিনী হন। হযরত তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়া আপন পরিবারের লোকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। শুধু তাহাই নহে, সমগ্র বনি সা'দ গোত্রের প্রতিই চিরদিন তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

বিবি হালিমা হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, তিনি সে সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বিবি হালিমার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজ সহস্র সালাম। এমন সেবাপরায়ণা পুণ্যময়ী জননীর স্পর্শ মানুষের জীবনে এক মস্তবড় আশীর্বাদ। হযরত জননী যেন দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইরূপে দেখা দিয়াছিলেন। আমিনা ছিলেন তাঁহার গর্ভধারিণী জননী, আর হালিমা ছিলেন তাঁহার স্তন্যদায়িনী জননী। অমৃত যেন এক, শুধু পাত্রের বিভেদ! ধন্য হালিমা! অনন্তকালের জন্য তুমি হযরত-পরিবারের সহিত জড়াইয়া গিয়াছ! তোমার আসন চিরকালের মত বিবি আমিনার পার্শ্বে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র অনন্ত রহ্‌মত তোমার উপর বর্ষিত হউক।

বালক মুহম্মদ মক্কায় আসিলেন। নূতন করিয়া আবার তাঁহার জীবনযাত্রা শুরু হইল। মরুভূমির বেদুঈন-জীবন ছাড়িয়া এবার তিনি নাগরিক জীবন আরম্ভ করিলেন। এই জীবনের পারিপার্শ্বিকতা এবং আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর আমিনা আপন দুলালকে বুকে পাইয়া আনন্দ অনুভব করিলেন। বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবও এই সুন্দর পৌত্রটির মুখশ্রী ও অসামান্য হাবভাব লক্ষ্য করিয়া মুগ্ধ হইলেন। স্নেহ দিয়া, মমতা দিয়া তাঁহার এই বালককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন।

কিন্তু হায়! এ-সুখ মুহম্মদের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইল না। আমিনার সাধ জাগিল, তাঁহার প্রাণের দুলালকে একবার মদিনায় লইয়া গিয়া পিতৃকুলের[১] সকলকে দেখাইয়া আসেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি উম্মে, আইমান নাম্নী একটি পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া মদিনা যাত্রা করেন। মদিনায় পৌঁছিয়া আমিনা শিশু-মুহম্মদকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামীর কবর জিয়ারত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অতীত দিনের কত স্মৃতি আজ তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। বালক মুহম্মদও আজ স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পিতৃহীন। তাঁহার কচিমনেও একটা বেদনার দোলা লাগিল।

একমাস পিতৃগৃহে[২] কাটাইয়া আমিনা পুনরায় মুহম্মদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন তিনি মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন, তখন অকস্মাৎ তাঁহার এক সাংঘাতিক পীড়া জন্মিল। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে তিনি সেইখানেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

কী করুণ দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল সেই মরুভূমির মধ্যে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত মরুভূমি, মাথার উপরে উন্মুক্ত নীল আকা ! পিতা নাই, মাতা নাই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহ কাছে নাই। মরুপ্রান্তরে শুধু একটি দাসী আর এই বালক, আর

---

১. প্রকৃতপক্ষে শ্বশুরের মাতৃকুলের : অষ্টম সংস্করণ, সংশোধনী দ্রঃ।
২. শ্বশুরের মাতুল গৃহে।

www.pathagar.com

পার্শে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের উট! শিশু মুহম্মদ জীবনে এই প্রথম ভীষণতার সম্মুখীন হইলেন। আমিনাকে কোন মতে সেইখানে কবর দিয়া উম্মে-আইমান মুহম্মদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন।

নিয়তির এ কি বিচিত্র লীলা! মক্কা হইতে মদিনা ২৫০ মাইলের পথ। এই দীর্ঘ মরুপথ আমিনা একাই অতিক্রম করিয়া মদিনায় পৌঁছলেন। সঙ্গে তাঁহার শিশুপুত্র আর দাসী। এই দুঃসাহসিক কার্যে কে তাঁহাকে প্রেরণা দিল? কোন প্রয়োজনে তিনি এত অসতর্কভাবে মদিনায় আসিলেন? এই কার্যের পশ্চাতে ছিল নিশ্চয়ই একটা গূঢ় ইঙ্গিত। পিতৃকূল পরিদর্শন নয়, শিশু পুত্রসহ আবদুল্লাহ্‌র কবর জিয়ারত করাই ছিল আমিনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমিনা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কী রত্ন তিনি প্রসব করিয়াছিলেন। অথচ এহেন পুত্ররত্নের সান্নিধ্য বা দর্শনলাভের আনন্দ হইতে স্বামী তাঁহার চিরবঞ্চিত। পরস্পরের মধ্যে একটা সংযোগের প্রয়োজন যেন তিনি অনুভব করিতেছিলেন। স্বামীর মাজারে পুত্রকে লইয়া না গিয়া তিনি শান্ত হইতে পারেন নাই। এরপরই মনে হইয়াছে যেন তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়াছে। বিশাল পৃথিবীর উন্মুক্ত বুকে শিশু-মুহম্মদকে সমর্পণ করিয়া পরম নির্ভাবনায় চিরতরে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। শিশু-নবীর দুঃখের পিয়ালা এখনও পূর্ণ হয় নাই। এ পিয়ালা পূর্ণ হইল তখনই—যখন ইহার দুই বৎসর পরে বৃদ্ধ আবদুল মুত্তালিবও মুহম্মদকে ছাড়িয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন।

একে একে সকল বন্ধনই কাটিয়া গেল। পূর্বনির্ধারিত একটা গোপন অভিপ্রায় অনুসারে যেন এই বন্ধন-মুক্তির পালা শুরু হইয়াছিল। মুহম্মদ এখন মুক্ত। মনের চারিপাশে তাঁহার আর কোন বন্ধন নাই। বিশ্বের বুকে তিনি এখন একা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবার তিনি পথে বাহির হইলেন। অসহায় বালক, সম্মুখে দুর্গম গিরিকান্তার। সহায় নাই, সঙ্গী নাই, পথ নাই, পাথেয় নাই। তবু তিনি বুঝিলেন, এই দুস্তর প্রান্তর একাই তাঁহাকে পাড়ি দিতে হইবে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১১
সিরিয়া ভ্রমণ

দিন যায়। বালক মুহম্মদ কৈশোরে পদার্পণ করিলেন।

নবুয়ত বা পয়গম্বরী লাভ করিবার জন্য হযরত মুহম্মদকে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁহার জীবনে ব্যর্থ যায় নাই। বিশ্বনবীর গুরুদায়িত্ব বহন করিবার জন্য এই দীর্ঘদিন ধরিয়া আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলেন—একে একে বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া তাঁহার পয়গম্বর জীবনের বুনিয়াদকে মজবুত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। কাজেই বলা যাইতে পারে এই যুগ তাঁহার গঠনের যুগ—আয়োজনের যুগ। এখন হইতে হযরতের জীবনে যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিবে, পাঠক দেখিতে পাইবেন, তাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে।

মক্কায় প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হযরতের জীবনে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। প্রকৃতির পাঠ শেষ করাইয়া আনিয়া আল্লাহ্ এবার মানব সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর দিকে হযরতের দৃষ্টি ফিরাইলেন। সমাজ-জীবনের বিচিত্র ধারা দেখিয়া কিশোর নবী অবাক হইলেন। ইহুদী, খ্রীষ্টান, আরব, পারশিক—কত জাতির কত বৈশিষ্ট্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বাণিজ্যব্যাপদেশে অথবা কাবা-মন্দিরের তীর্থ উপলক্ষে যখন নানা দেশ হইতে নানা জাতীয় লোক আসিয়া মক্কা-নগরে সমবেত হইত, তখন বালক মুহম্মদ নীরবে তাহাদের গতিবিধি ও আচার-অনুষ্ঠান লক্ষ্য করিতেন। কত মানুষের কত ধারা মক্কাতীর্থে আসিয়া মিলিত হইত, আবার দুই-দিন পরেই কোথায় মিলাইয়া যাইত। বাহিরের বিশ্ব যে কত বিরাট কত বিচিত্র তখন হইতে তিনি তাহা ভাবিতে শিখিলেন। কেমন করিয়া কোথায় কোন্ জাতি বাস করে, কেমন তাহাদের দেশ, কেমন তাহাদের জীবন, জানিবার জন্য স্বভাবতই তাঁহার মনে কৌতূহল জন্মিল।

তৎকালে সিরিয়া ও এয়ামন প্রদেশের সহিত আরবের বাণিজ্য চলিত। ব্যবসায়ীগণ উটের কাফেলা লইয়া যাত্রা করিত। বালক মুহম্মদ দূর হইতে মক্কার তোরণে এই সকল কাফেলার যাওয়া-আসা লক্ষ্য করিতেন। কৌতূহলী মন তাঁহার কোন্ সুদূরে উধাও হইয়া যাইত। জন্মভূমির বাহিরে যে বিশাল জগৎ পড়িয়া আছে, সেই জগতের সহিত পরিচিত হইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। কেমন করিয়া মক্কার সীমাপ্রাচীর পার হইয়া বাহিরের জগতের সন্ধান লইবেন তাহাই তিনি ভাবিতেন।

সুখের বিষয়, এই সাধ তাঁহার অচিরেই পূর্ণ হইল।

মুহম্মদের বয়স তখন বারো বৎসর। আবুতালিব অন্যান্য মক্কাবাসীদিগের সহিত মালপত্র বোঝাই করিয়া যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় মুহম্মদ আসিয়া বলিলেন, "চাচাজান, আমিও যাইব"।

আবুতালিব মুহম্মদকে এতই স্নেহ করিতেন যে, তিনি তাঁহার এই অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মুহম্মদ যেরূপ অসাধারণ মেধাবী ও সচ্চরিত্র ছিলেন,

www.pathagar.com

তাহাতে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলে যে আবুতালিবের লাভ ছাড়া কোন ক্ষতির সম্ভাবনাই নাই, তাহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। হাসিমুখে তাই আবুতালিব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

হযরতের জীবনে আজ এক নতুন দিন। ভাবী বিশ্বনবীর আজ প্রথম বিশ্ব-পরিচয়। আনন্দ ও কৌতূহলে তাঁহার সারা প্রাণ দুলিয়া উঠিল। উটের পিঠে চড়িয়া তিনি মরুভূমি পার হইয়া চলিলেন। নিখিলের চিরসুন্দর সৃষ্টি—আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী মুহম্মদ আজ ঘর ছাড়িয়া সর্বপ্রথম বিদেশে যাইতেছেন, বহিঃপ্রকৃতি আজ তাই যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল। কোন রাজপুত্র দেশ ভ্রমণে বাহির হইলে যে পথ দিয়া তিনি যান সে-পথের উভয় পার্শ্বে যেমন করিয়া সাড়া পড়িয়া যায়, হযরতের পথের দুই ধারেও তেমনি চাঞ্চল্য জাগিল। বিশ্বের সমস্ত উপাদানই আজ যেন মুহম্মদকে একটু সেবা করিতে পারিলে পরম ধন্য হয়।

কাফেলা ধীরে ধীরে গন্তব্য পথের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বহু প্রাচীন নগরীর সহিত মুহম্মদের পরিচয় ঘটিল। হেজাজ নামক নির্জন পার্বত্য মরু-প্রান্তরে উপনীত হইলে মুহম্মদ জানিতে পারিলেন এই সেই প্রাচীন নগরী—যেখানে 'সমূদ' জাতির বাসস্থান ছিল। হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের পূর্বে এই দুর্ধর্ষ জাতি এখানে বাস করিত। ইহারা ঘোর পৌত্তলিক ছিল, আল্লাহ্‌কে কিছুতেই ইহারা স্বীকার করিত না। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাদিগকে হেদায়েত করিবার জন্য হযরত সালেহ্ পয়গম্বরকে পাঠাইয়া দিলেন। সমূদগণ প্রথমত তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। নিকটবর্তী একটি পর্বতগুহার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল "যদি ঐ গুহার মধ্য হইতে তুমি একটি গর্ভবতী উট আমাদের সম্মুখে বাহির করিয়া আনিতে পার, তবেই বুঝিব যে তুমি পয়গম্বর।" এই কথা শুনিয়া হযরত সালেহ্ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন। শীঘ্রই পর্বতগুহা হইতে একটি উট বাহির হইয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরই একটি শাবক প্রসব করিল। সমূদদিগের অনেকেই এ অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া হযরত সালেহ্‌কে পয়গম্বর বলিয়া মানিয়া লইল এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। তখন হযরত সালেহ্ সেই উটটিকে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন : "সাবধান, তোমরা এই উটকে কখনও মারিয়া ফেলিও না। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার দান। যদি উহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার কর তবে আল্লাহ্‌র গজব তোমাদের উপর নামিয়া আসিবে।"

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সমূদগণ ক্রমে ক্রমে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গিয়া পুনরায় মূর্তিপূজা আরম্ভ করিল এবং অবশেষে একদিন উটটিকেও মারিয়া ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-পথে ভীষণ বজ্রধ্বনি ও ভূমিকম্পের শব্দ উত্থিত হইল। নিমেষের মধ্যে রোজকিয়ামত ঘটিয়া গেল। পরদিন দেখা গেল, সমগ্র সমূদ জাতি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের দেশ একটা বিজন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

সমূদ জাতির এই কাহিনী শুনিয়া এবং স্বচক্ষে তাহাদের দেশের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া হযরতের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

www.pathagar.com

মরুভূমি পার হইয়া কাফেলা বসরা–সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল। এইবার আর এক নূতন দৃশ্য হযরতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এতদিন তিনি প্রকৃতির রুদ্রগম্ভীর রুক্ষ মূর্তিই দেখিয়া আসিয়াছেন, স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি দেখেন নাই। এইবার তাহা দেখিতে পাইলেন। বসরার তরুলতার কী শ্যামল শ্রী, ছায়াঢাকা পাখীডাকা কুঞ্জতল, শাখায় শাখায় ফুল ও ফল, কোথাও বা উচ্ছল কলকল নদীজল। সৃষ্টির এই রূপ বৈচিত্র্য দেখিয়া তাঁহার কিশোর কল্পনা কাহার সন্ধানে কোন্ অনন্তের পানে ছুটিয়া চলিল। আল্লাহ্তায়ালার অস্তিত্ব, একত্ব এবং সৃজনলীলার চমৎকারিত্ব একসঙ্গে যেন জোর করিয়া তাঁহার মনের উপর দাগ কাটিয়া বসিয়া গেল।

মোয়াবাইট ও এমনাইটদিগের প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া কাফেলা বসরা নগরে উপনীত হইল। তৎকালে এই নগরী নেষ্টরীয় খ্রীষ্টানদিগের বাসভূমি ছিল। প্রতি বৎসর এখানে একটি প্রকাণ্ড মেলা বসিত। নানা দূরদেশ হইতে সওদাগরগণ এখানে বাণিজ্য করিতে আসিত।

এখানে আসিয়া আবুতালিব তাঁবু ফেলিলেন। নিকটেই ছিল একটি মঠ। বহিরা নামক জনৈক খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী এই মঠে বাস করিতেন। অনতিবিলম্বে বহিরা মঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কাফেলার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মুহম্মদের হস্ত ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিতেন, "এই তো সেই বিশ্বমানবদের পথপ্রদর্শক। এই তো সেই যিশুর প্রতিশ্রুত শান্তিদাতা! আল্লাহ্ ইহাকেই ত সকল জগতের আশীর্বাদস্বরূপ পাঠাইয়াছেন" বাইবেলে বর্ণিত অনাগত মহানবীর সমস্ত লক্ষণ তিনি মুহম্মদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাই তিনি মুহম্মদকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

বহিরা ছিলেন নেষ্টরীয় খ্রীষ্টান। খ্রীষ্টানদিগের অন্যান্য সম্প্রদায় তখন পৌত্তলিকতার পাপপঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কিন্তু নেষ্টরীয় সম্প্রদায় আদৌ কোন পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন না, এমন কি ক্রুশচিহ্নকেও তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া বর্জন করিতেন। যিশুখ্রীষ্টের প্রচারিত ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহাদের ধর্মজীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সব কারণে সাধু বহিরা বাইবেলে বর্ণিত যিশুর পরবর্তী নবীর আগমন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন এবং সেই ভাববাদীর আবির্ভাব যে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন। নানা নৈসর্গিক পরিবর্তন ও অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাদৃষ্টে তৎকালীন অনেক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুপুরুষই এই কথা বিশ্বাস করিতেন। কাজেই বহিরার পক্ষে হযরত মুহম্মদকে চিনিতে পারা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার হয় নাই।

বহিরা হযরত মুহম্মদের সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করিয়া আবুতালিব ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই উপলক্ষে হযরত মুহম্মদের সহিত তাঁহার নানা বিষয়ে আলাপ–আলোচনা হইল। বহিরা আবুতালিবকে মুহম্মদ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে উপদেশ দিলেন। সিরিয়ার ইহুদীদিগের হস্তে যাহাতে এই বালক না পড়ে সেজন্য তিনি বিশেষভাবে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিলেন, কারণ তাঁহার শঙ্কা হইল, ইহুদীরা যদি এই মহাপুরুষের সন্ধান পায়, তবে নিশ্চয় ইহাকে মারিয়া ফেলিবে।

www.pathagar.com

বহিরার সহিত আলাপ-আলোচনার ফলে মুহম্মদ খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ করিলেন। বাহিরে খ্রীষ্টান জাতির বিকৃত রূপ এবং নেষ্টরীয় সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার পার্থক্য দেখিয়া খ্রীষ্টান ধর্মের ভিতরকার চিত্র তাঁহার চোখে সম্যক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই জ্ঞান পরে তাঁহার কাজে লাগিয়াছিল।

আবুতালিব মুহম্মদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন। ইহুদীদিগের সম্পর্ক যথাসম্ভব এড়াইয়া সেবারকার মত তিনি বাণিজ্যযাত্রা শেষ করিলেন।

হযরতের সিরিয়া ভ্রমণের মধ্যে আল্লাহ্‌র কতকগুলি প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। বসরার শ্যামল শস্যক্ষেত ও পুষ্পবিতানের মধ্যে কিশোর নবী দেখিতে পাইয়াছিলেন আল্লাহ্‌র সৃষ্টিলীলার কমনীয় রূপ; সমুদ জাতির বাসভূমির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দেখিয়াছিলেন পৌত্তলিকতা ও খোদাদ্রোহিতার ভয়াবহ পরিণাম, আর বহিরার সহিত সাক্ষাতের ভিতর দিয়া লাভ করিয়াছিলেন খ্রীষ্টধর্মের সত্যিকার পরিচয়। তিনটিই তাঁহার জীবন-সাধনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১২
আল্‌-আমিন

আবুতালিব সিরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিলেন। সেবার বাণিজ্যে তাঁহার প্রচুর লাভ হইল।

ইহার পর আরও কয়েকবার হযরত মুহম্মদ বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন। ইহুদী, খ্রীস্টান, পারশিক প্রভৃতি তৎকালীন জাতিসমূহের ধর্ম-সংস্কার ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপেই তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন।

অবসর সময়ে হযরত মেষ চরাইতেন। মেষচারণের সহিত পয়গম্বর জীবনের এক আশ্চর্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক পয়গম্বরই মেষপালক ছিলেন। ইহার একটা গূঢ় কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। উন্মুক্ত নীল আকাশের তলে বিশাল প্রান্তরে একপাল মেষ আর তার একজন চালক। কোন মেষ যাহাতে বিপথগামী না হয়, অপরের শস্যক্ষেত্র নষ্ট না করে, হারাইয়া না যায়, বাঘে না ধরে, অথচ প্রত্যেকেই উপযুক্ত আহার পাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া সন্ধ্যাকালে প্রভুর গৃহে নির্বিঘ্নে ফিরিয়া আসে, ইহাই থাকে মেষ-চালকের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য। এই কর্তব্য ও লক্ষ্যের সহিত পয়গম্বর জীবনের কর্তব্য ও লক্ষ্যের কত নিকট-সম্বন্ধ! পয়গম্বরও এক একটা জাতির এমনি পরিচালক। মেঘ-চালকের মত তিনিও ত নর-চালক। খোদার বান্দার পিছনে থাকিয়া তাহাদিগকে সুপথে চালনা করা এবং ইহলোকের ও পরলোকের খোরাক যোগাইয়া পরিপুষ্ট অবস্থায় সকলকে প্রভুর ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহার কর্তব্য। এই কর্তব্য ও দায়িত্বকে বাস্তবরূপে উপলব্ধি করিবার জন্যই পয়গম্বর মেষ চালনা করিতে ভালবাসিতেন। লোকালয়ের বাহিরে নির্জন পাহাড়ের ধার, উপরে নীল আকাশ, নিম্নে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, সমাজ ও সংসারের কলকোলাহল হইতে সে স্থান চিরমুক্ত। চমৎকার পারিপার্শ্বিকতা। প্রকৃতির নিবিড় নীরবতার মধ্যে যে-প্রশান্তি লুকাইয়া থাকে, এইখানে আসিলেই তাহা উপলব্ধি করা যায়। অসীমের স্পর্শ মনকে যেন উতলা করিয়া তুলে। বনানীর পত্রমর্মর, গিরিনির্ঝরের কুলুকুলু-ধ্বনি, কুসুমের স্নিগ্ধ হাসি, বিহঙ্গের কলগীতি—সমস্তই মনকে পবিত্র করে। এইখানে চিরমৌনা প্রকৃতি যেন কথা কহিতে চাহে। নীরবতার অতল গহনে মন এখানে ডুবিয়া যায়, অসীমের কত কী গোপন বাণী সে শুনিতে পায়। এইখানেই ত সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ধরা পড়িবার কথা! আল্লাহ্‌র বাণী নামিয়া আসিবার পক্ষে ইহাই ত উপযুক্ত ক্ষেত্র!

ভিতরে-বাহিরে এমনি করিয়া হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনের গঠনকার্য চলিতেছে। একদিকে বাহির হইতে তিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন, অপর দিকে ভিতর হইতে তাঁহার মন প্রস্তুত হইতেছিল।

এই সময়ে তিনি এক নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। বৎসরের এক-একটি নির্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে তখনকার দিনে এক-একটি মেলা বসিত। এ সমস্ত মেলায় বিবিধ পণ্যদ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ত হইতই, অধিকন্তু কাব্যযুদ্ধ, ঘোড়দৌড়, জুয়াখেলা ইত্যাদিও চলিত। দলে দলে লোক আসিয়া ঐসব মেলায় যোগদান করিত। বিভিন্ন গোত্রের দলপতিরাও উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে কবিরা আপন আপন গোত্রের বংশ-মর্যাদা ও অন্যান্য কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া

www.pathagar.com

নিজেদের কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দিত। কখনও বা কোন বীর নিজের রণনৈপুণ্য ও বিজয়-গাথার আবৃত্তি করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর গোত্রের কাপুরুষতা ও কুৎসা-কাহিনী বর্ণনা করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। এই সমস্ত ব্যাপার হইতেই বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি ও গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হইত।

একবার এইরূপ একটি দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। তখন যতগুলি মেলা হইত, তাহাদের মধ্যে 'ওকাজ' মেলাই ছিল সর্বপ্রধান। এই মেলা হইতেই স্বাভাবিকভাবে একটি কলহের সৃষ্টি হইল এবং পরে সেই কলহই ভীষণ যুদ্ধে পরিণত হইয়া আরবের সকল গোত্রের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর ধরিয়া এ গৃহযুদ্ধ চলিয়াছিল এবং হাজার হাজার লোক ইহাতে মারা গিয়াছিল। ইতিহাসে এই যুদ্ধ 'হর্‌বে-ফোজ্জার' (অন্যায় সমর) নামে অভিহিত।

হাশিম-বংশও এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে আবুতালিব ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনও ছিলেন। শেষদিকে হযরত মুহম্মদকেও পিতৃব্যের সহিত এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তবে তিনি কার্যত যুদ্ধ করেন নাই, পিতৃব্যদের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের তীর কুড়াইয়া দিতেন মাত্র।

এই যুদ্ধে কোরেশদিগের কোনই দোষ ছিল না। বিপক্ষগণ অন্যায়ভাবে তাঁহাদিগের উপর আক্রমণ করাতেই কোরেশগণ যুদ্ধে নামিতে বাধ্য হন।

হযরত মুহম্মদের যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রথম। এই যুদ্ধে তিনি কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ না করিলেও একটা মস্তবড় লাভ তাঁহার হইয়াছিল। আরবদিগের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা লুকাইয়া ছিল তাহা যেন মূর্তি ধরিয়া তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বিনা কারণে মানুষ মানুষের প্রতি এত নিষ্ঠুর হইতে পারে। বিনা কারণে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপান করিতে পারে! সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর ধরিয়া কত ঘরেই না কত ক্রন্দন কত হাহাকার উত্থিত হইয়াছে। কত নারীই না বিধবা হইয়াছে, কত শিশুই না পিতৃহীন হইয়াছে। এই অন্যায় যুলুমের কি কোন প্রতিকার নাই?

মুহম্মদ বসিয়া বসিয়া ভাবেন।

সুখের বিষয়, এই চিন্তায় তিনি একজন দোসর পাইলেন। ইনি মুহম্মদের কনিষ্ঠ পিতৃব্য জুবায়ের। এই তরুণ যুবক ছিলেন নিশান-বরদার, কাজেই তিনিও বাস্তব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই। একজন নিশানধারী, আর একজন তীর সংগ্রহকারী। এই কারণেই রণক্ষেত্রে কী বীভৎস লীলা চলিয়াছে তাহা সম্যকরূপে দেখিবার ও ভাবিবার মত মনের অবস্থা উভয়েরই ছিল। যুদ্ধে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহারা ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে না। যাহারা দর্শক, তাহারাই তাহা সঠিকভাবে বুঝিবার সুযোগ পায়! হযরত মুহম্মদ ও জুবায়েরও এই কারণেই এই ভয়ারহ-যুদ্ধের স্বরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

একটা সন্ধির দ্বারা আত্মঘাতী এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করা হইল। কিন্তু হযরতের মন তখনও শান্ত হইল না। আর্ত, পীড়িত, ব্যথিত, অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচারীকে বাধা দিবার জন্য-তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। পূর্বে আরবের প্রথা ছিল যে, স্বগোত্রের কোন লোক কোন অন্যায় করিলেও তাহাকে দলগতভাবে সমর্থন করা হইত। হযরত দেখিলেন, এই কুৎসিত মনোবৃত্তিই সকল সর্বনাশের মূল।

www.pathagar.com

যে কেহই অন্যায় করুক, তাহা অন্যায়ই এবং তাহাকে রোধ করিতেই হইবে—ইহাই হইল তাঁহার দৃঢ় পণ।

এতদুদ্দেশ্যে আরবের কতিপয় উৎসাহী যুবককে লইয়া তিনি সেবা সংঘ গঠন করিলেন। সেবকগণ আল্লাহ্‌র নামে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন :

১. আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদিগকে সেবা করিব।
২. অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দিব।
৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করিব।
৪. দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিব।
৫. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করিব।

এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা-বাণীর নাম হইল 'হিল্‌ফ-উল-ফুযুল'।

তরুণের কী সুন্দর ও শাশ্বত আদর্শই না আমরা এখানে পাইলাম। উপরোক্ত পাঁচটি আদর্শ যুগে-যুগে দেশে- দেশে সকল তরুণেরই অনুকরণীয় নহে কী? আর্তকে সেবা করা, অত্যাচারীকে বাধা দেওয়া, উৎপীড়িতকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল ও মৈত্রী স্থাপন করা-ইহাই ত তরুণের ধর্ম। এই তরুণকেই ত আমরা কামনা করি। তরুণের এক হাতে থাকিবে সেবা প্রেম ও সংগঠনের উপচার, অন্য হাতে থাকিবে নাঙ্গা তলোয়ার, সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে সে বরণ করিবে—অসত্য,অসুন্দর ও অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সে জেহাদ করিবে। তরুণকে আসিতে হইবে ফুলের মত সুন্দর হইয়া-ফলের অন্তহীন সম্ভাবনা লইয়া। বাহিরে সে হইবে উচ্ছল লীলা-চঞ্চল, কিন্তু ভিতরে সে হইবে একজন সংযমী সাধক। সে আসিবে প্রাণের প্রাচুর্য লইয়া—রিক্ত হস্তে নহে। দক্ষিণ-সমীরণে সে হাসিবে, নাচিবে, খেলিবে বটে, কিন্তু বিদায় বেলায় সে রাখিয়া যাইবে তাহার প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়কে ঐ পুরাতন বৃক্ষের কাণ্ডে কাণ্ডে, ডালে ডালে। তরুণের হাতে এমনি করিয়া বর্ষে বর্ষে আসিবে পুরাতনের পুষ্টি ও নবজীবনের উল্লাস। তরুণের বিদ্রোহ হইবে তাই সৃষ্টিধর্মী; তাহার জীবনের লীলা প্রকাশ পাইবে পুরাতনকে অস্বীকার করিয়া নহে সহজভাবে তাহাকে স্বীকার করিয়া;স্বতন্ত্র হইয়া নহে তাহাকেই আশ্রয় করিয়া। এত প্রাণ-প্রাচুর্য লইয়া সে আসিবে যে, প্রাচীনের সমস্ত দৈন্য ও অভাব ঢাকিয়া দিয়াও প্রাণশক্তি যেন যথেষ্ট অবশিষ্ট থাকে। প্রাচীনকে তাই সে ভয় করিবে না বা অস্বীকার করিবে না, তাহার সব অক্ষমতাকে মানিয়া লইয়াই তাহাকে আসিতে হইবে, এইখানেই ত তরুণের কৃতিত্ব। তরুণ হইবে একজন 'মর্‌দ্-ই-মুমীন'-শৌর্যে বীর্যে, জ্ঞানে-গুণে বলিষ্ঠ কর্মবীর। এই আদর্শ তরুণ বেশেই আমরা দেখিলাম যুবক নবী মুহম্মদকে। এই তরুণের সেদিনও যেমন প্রয়োজন ছিল, আজও আছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন। দেশ ও জাতি এই তরুণকে আজ সারা প্রাণ দিয়া কামনা করে।

হযরতের প্রতিষ্ঠিত সেবা সংঘ বেশ ভালভাবেই চলিতে লাগিল। হযরত ইহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোথায় কোন্ অনাথ বালক ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন্ দুঃস্থ পীড়িত রুগ্ণ ব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছে, কোথায় কোন্ বিধবা নারী নিরাশ্রয় হইয়াছে, তাহাই তিনি সন্ধান করিয়া ফিরিতেন। কোথাও বা তিনি এতিম শিশুকে কোলে লইয়া আদর করিতেন, কোথাও বা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার পরিচর্যা করিতেন, কোথাও বা অন্য কোন কল্যাণকার্যে

www.pathagar.com

আত্মনিয়োগ করিয়া প্রতিবেশীকে সাহায্য করিতেন। এমনিভাবে লোকসেবায় তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন।

এই সেবা, এই ত্যাগ, এই মানব-প্রীতি কি কখনও ব্যর্থ যাইতে পারে? সত্যিকার কল্যাণচেষ্টা ও নিঃস্বার্থ সেবা মানুষ কতদিন অস্বীকার করিয়া চলিবে? আরবগণ তাই দিনে দিনে মুহম্মদের প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। মুহম্মদ যে ভণ্ড নয়, এই বিশ্বাস সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অবশেষে এমন হইল যে, আরবগণ একবাক্যে তাঁহাকে 'আল-আমিন' অর্থাৎ বিশ্বাসী; এই উপাধি দান করিয়া ফেলিল। মুহম্মদ নাম চাপা পড়িয়া গিয়া আল-আমিন নামই ভাসিয়া উঠিল। দেখা হইলেই লোকেরা বলিয়া উঠিত : "এই যে আমাদের 'আল্-আমিন' আসিতেছেন"।

নীতিধর্মবিবর্জিত ঈর্ষাবিদ্বেষকলুষিত পরশ্রীকাতর দুর্ধর্ষ আরব-চিত্তে এতখানি স্থান লাভ করা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না। অনুপম চরিত্র-মাধুর্য, সততা, আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম মানব-প্রেম ছিল বলিয়াই মুহম্মদের পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

বস্তুত হযরতের 'আল্-আমিন' উপাধি লাভের মধ্যে এই সত্যই আমরা উপলব্ধি করিলাম যে, ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত সার্থকতা নির্ভর করে বাল্য জীবনের চরিত্র-মাধুর্যের উপরে। সত্যবাদিতা সেই চরিত্র গঠনের প্রথম উপকরণ।

আমাদের অভিভাবকদিগকে এইখানে পাঠগ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৩
শাদী মুবারক

এই সময়ে মক্কানগরে কোরেশ গোত্রে এক সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা বাস করিতেন। তাঁহার নাম খাদিজা। এমন সতীসাধ্বী নারী তখনকার দিনে আরবে আর দ্বিতীয়টি ছিল না। সমগ্র দেশ জুড়িয়া যেখানে নারীজাতির লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা ছিল না, নারী যেখানে কেবলমাত্র ভোগের বস্তুরূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেখানে এই মহীয়সী মহিলা আপন মর্যাদা বাঁচাইয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। অন্তরের শুচিতায় ও শুভ্রতায় এতই তিনি যশস্বিনী হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে খাদিজা না বলিয়া 'তাহিরা' (পবিত্র) বলিয়া ডাকিত।

খাদিজার শুধু অন্তরের ঐশ্বর্যই ছিল, তাহা নহে; প্রভূত ধনসম্পত্তিরও তিনি অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার দুইবার বিবাহ হইয়াছিল; কয়েকটি পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। দ্বিতীয় স্বামী মৃত্যুকালে অগাধ ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন; সেই সূত্রেই তিনি এমন সম্পদশালিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কর্মচারী দ্বারা তিনি নানা দেশে বাণিজ্য চালাইতেন এবং নিজেই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। একজন নারীর পক্ষে এতবড় একটা ব্যবসায় পরিচালনা করা তখনকার দিনে কম কৃতিত্বের পরিচয় ছিল না।

এদিকে 'আল–আমিন'–এর গুণ–গরিমাও আরবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ত্যাগ, সেবা, সততা ও চরিত্র–মাধুর্য দ্বারা তিনি সারা আরবের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, বৈষয়িক বুদ্ধিতেও মুহম্মদ সকলকে হার মানাইয়াছেন। যতবারই তিনি বাণিজ্য করিতে গিয়াছেন ততবারই প্রচুর লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই ধীশক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান যুবকটির কীর্তিকথা বিবি খাদিজার কর্ণে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটে নাই। অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁহার সাধ জাগিতেছিল এই চরিত্রবান যুবকটির উপর যদি তাঁহার বাণিজ্য ভার অর্পণ করিতে পারিতেন!

এই উদ্দেশ্যে খাদিজা একদিন মুহম্মদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দূর সম্পর্কে মুহম্মদ তাঁহার চাচাতো ভাই হইতেন। মুহম্মদ আসিলে খাদিজা বলিলেন : "ভাইজান, আমার একটি অনুরোধ আপনি রাখিবেন কি?"

মুহম্মদ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "কি অনুরোধ বলুন?"

"আমার এই তেজারতির ভার আপনাকে লইতে হইবে। ইহার জন্য আপনাকে আমি দ্বিগুণ পারিশ্রমিক দিব।"

হযরত মনে মনে খুশি হইলেন, তবে তিনি তখনই কোন চূড়ান্ত জবাব দিলেন না। বলিলেন : "চাচাজীর মতামত লইয়া আপনাকে জানাইব।"

মুহম্মদ আসিয়া আবুতালিবকে এই কথা বলিলেন। আবুতালিব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অবস্থা ত তাঁহার স্বচ্ছল ছিল না; তাই এই প্রস্তাব তিনি সর্বান্তকরণে সমর্থন করিলেন।

কাফেলা প্রস্তুত হইল। মুহম্মদ বাণিজ্যে চলিলেন।

www.pathagar.com

এইবার দামেশ্‌ক অভিমুখে। ইয়াস্রেব, হাইফা, জেরুজালেম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্য দিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে মুহম্মদ দামেশ্‌কে পৌঁছিলেন। সর্বত্রই তাঁহার প্রভূত লাভ হইল।

অন্যান্যবার হযরত বাণিজ্য করিতে যাইতেন পিতৃব্যের সহকারীরূপে, এইবার গিয়াছিলেন বিবি খাদিজার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরূপে। কাজেই এবারকার বাণিজ্যে একটা স্বাধীনতার আনন্দ ছিল। আপন অন্তর্নিহিত শক্তি ও গুণাবলীকে তিনি এইবার কাজে লাগাইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। আশানুরূপ লাভ হওয়ায় হযরত তাই মনে মনে একটা আত্মপ্রত্যয় ও নব-সৃষ্টির উল্লাস উপভোগ করিলেন।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়াছে। বিবি খাদিজা মুহম্মদের আসা-পথ চাহিয়া আছেন। একটা কিসের যেন অশান্তি ও উদ্বেগ তাঁহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। মুহম্মদের প্রশান্ত কমনীয় মূর্তি নিশিদিন তাঁহার মনে জাগিতেছে। এই অহেতুক ব্যগ্রতা ও আকুলতার কারণ কি? এ কি প্রেম? কে বলিবে! বিধবা হইবার পর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি খাদিজাকে বিবাহ করিবার জন্য পয়গাম পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তিনি কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। আজ এ কী নূতন অনুভূতি তাঁহার অন্তর-তলে দেখা দিল? জীবনের সুপ্ত সাধ এই অবেলায় কেন আবার জাগিয়া উঠিল? খাদিজা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। একটা নূতন প্রেরণা আসিয়া যেন তাঁহার অন্তরকে বাহিরে টানিয়া লইয়া চলিল, কিছুতেই তিনি আপনাকে আপনার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

একদিন অপরাহ্নে খাদিজা আপন গৃহের চত্বরে দাঁড়াইয়া দিগন্তের পানে চাহিয়া আছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন মরুভূমির ওপার হইতে উটের পিঠে চড়িয়া মুহম্মদ ফিরিয়া আসিতেছেন। একদৃষ্টে তিনি সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইতে লাগিল একটি বেহেশ্‌তী রঙিন স্বপ্ন যেন ধীরে ধীরে তাহার নয়ন-পথে রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে।

মুহম্মদ আসিয়া সমস্ত হিসাবপত্র ও টাকাকড়ি বুঝাইয়া দিলেন। প্রচুর লাভ হইয়াছে দেখিয়া খাদিজা মুহম্মদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার সততা ও বিশ্বস্ততা দেখিয়াও তিনি মুগ্ধ হইলেন। প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়া তিনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

দিন যায় খাদিজার অন্তর ক্রমেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে তিনি সত্যই বুঝিতে পারিলেন, মুহম্মদকে তিনি ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। মুহম্মদকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি তাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

নফিসা নাম্নী খাদিজার এক সহচরী ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষেরই আত্মীয়া। খাদিজা তাঁহার নিকটে আপন প্রাণের গোপন কথা ব্যক্ত করিলেন। মুহম্মদের মতামত জানিবার জন্য তিনি তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন।

নফিসা মুহম্মদের নিকট পৌঁছিয়া প্রসঙ্গটি অতি সুন্দরভাবে উত্থাপন করিলেন। বলিলেন : "আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন?"

স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া মুহম্মদ বলিলেন : "কে আমাকে বিবাহ করিবে? বিবাহ করিবার মত সামর্থ্য আমার কোথায়?"

নফিসা : "যদি তাহার সুব্যবস্থা হয়?"

মুহম্মদ : "তার মানে?"

www.pathagar.com

নফিসা : "মনে করুন যদি কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা যিনি রূপে-গুণে, ধনে-মানে অতুলনীয়া-আপনাকে বিবাহ করিতে চাহেন?"

মুহম্মদ : "কে তিনি? শুনিতে পারি কি?"

নফিসা : "তিনি বিবি খাদিজা।"

মুহম্মদের প্রাণ দুলিয়া উঠিল। তিনিও মনে মনে এই অনুমানই করিতেছিলেন। বিবি খাদিজার প্রতি তাঁহার অন্তরও আকৃষ্ট না হইয়া পারিল না। খাদিজা পরিণতবয়স্কা এবং বিধবা হইলেও তাঁহার মধ্যে একটা শান্তশ্রী ও স্বর্গীয় সুষমা লুকাইয়া ছিল। সেই পবিত্র সৌন্দর্য লালসার দৃষ্টিতে কখনও ধরা পড়ে না, শুচি-শুভ্র অন্তর্দৃষ্টি দিয়া তাহা দেখিতে হয় এবং তাহা ভোগ করিতে হইলে সংযম ও সাধনা দ্বারা হৃদয়কে পূর্ব হইতেই পবিত্র করিয়া লইতে হয়।

মনে মনে মুহম্মদ খুশি হইলেন। কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন : "কি করিয়া আপনি জানিলেন যে, বিবি খাদিজা আমাকে বিবাহ করিতে চাহেন?"

নফিসা হাসিয়া উত্তর দিলেন : "আমি জানি এবং আমি ইহা ঘটাইয়াও দিব।"

এইবার মুহম্মদ নিজেকে ধরা দিয়া বলিলেন : "বেশ, তিনি যদি রাজী হন, আমিও রাজী।"

তখনা উভয়পক্ষের অভিভাবকদিগের মধ্যে যথারীতি প্রস্তাব ও আলোচনা আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষই সম্মত হইলেন। বিপুল উৎসাহ ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়া মুহম্মদ ও খাদিজার শুভপরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে তাঁহার চাচা আবুতালিব এবং খাদিজার পক্ষে তাঁহার চাচা আমর-বিন্-আসাদ অভিভাবকত্ব করিলেন। মাত্র সাড়ে বারো 'উকিয়া' (তৎকালীন মুদ্রা) পণ নির্ধারণে এই শুভশাদী সুসম্পন্ন হইল।

কী অপূর্ব এই মিলন! একটি পঁচিশ বৎসরের তরুণ যুবক—রূপে-গুণে যাহার তুলনা নাই—তিনি বিবাহ করিতেছেন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিগতযৌবনা এক বিধবা নারীকে! ইচ্ছা করিলে তিনি অনায়াসেই কোন পরমাসুন্দরী আরব তরুণীকে বিবাহ করিতে পারিতেন। জানিয়া শুনিয়াই তবে কেন তিনি এই বিবাহে স্বীকৃত হইলেন? মুহম্মদের জীবনে কি তবে যৌবনের স্বভাবধর্ম প্রকাশ পায় নাই? তাঁহার মনে কি কোন সৌন্দর্যানুরাগ ছিলনা?-নিশ্চয়ই ছিল। তবে সে সৌন্দর্যানুভূতি স্থূল নহে-সূক্ষ্ম। দেহের ক্ষুধা, যৌবনের স্বপ্ন বিলাস, কামনার ফেনিলোচ্ছ্বাস তাঁহার মধ্যে ছিল না। দেহের অন্তরালে অন্তর্লোকের যে গোপন সুষমা; মুহম্মদ ছিলেন তাহারই পিয়াসী। সেই সৌন্দর্য খাদিজার ভিতরে পরিপূর্ণ মাত্রায় ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বস্তুত এই বিবাহের ঘটকও নফিসা নহে, মুহম্মদ-খাদিজারও এই বিবাহ নহে। এই বিবাহের ঘটক স্বয়ং আল্লাহ্ এবং প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল 'আল-আমিন' ও 'তাহিরা'র মধ্যে—সত্য ও পবিত্রতার মধ্যে। একদিকে সত্য ও বিশ্বাসের জ্বলন্ত প্রতীক মুহম্মদ, অপরদিকে পূর্ণ ও পবিত্রতার শুভ্র প্রতিমূর্তি খাদিজা- কেন তবে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট না হইবে।

সত্য ও পবিত্রতার আর্কষণ এমনই সুন্দর ও স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য, এই বিবাহও হযরতের পয়গম্বর-জীবনের আয়োজন মাত্র। হযরতের নবুয়তের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য খাদিজার সহয়োগিতা প্রয়োজন ছিল, তাই আল্লাহ্

www.pathagar.com

এমনভাবে এই মিলন সংঘটিত করিয়া দিয়াছিলেন। এই মিলন যতটা দৈহিক, তাহার চেয়ে বেশী আত্মিক। ইহার মধ্যে এক অপার্থিব সম্পদ নিহিত ছিল। তাহা না হইলে এইভাবে একজন প্রতিভাবান যুবক তাঁহার সমগ্র যৌবন নির্বাণোন্মুখ একটি নারীর জন্য অকাতরে বিলাইয়া দিতে পারিতেন না। একদিনের জন্য নহে, দুইদিনের জন্য নহে, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরকাল মুহম্মদ এই স্ত্রীর সহিত হাসিমুখে কাল কাটাইয়াছেন। খাদিজা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মুহম্মদ দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেন নাই। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার যখন মৃত্যু হয়, তখন মুহম্মদের বয়স ৫০ বৎসর। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একদিনের তরেও হযরত খাদিজার উপর বিরক্ত হন নাই, সমগ্র যৌবন বিফলে গেল বলিয়াও কোনদিন অনুযোগ করেন নাই। পরম তৃপ্তি এবং সন্তোষের মধ্য দিয়াই তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। স্বার্থসিদ্ধির মানসে নহে, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের মতলবে নহে, নিতান্ত অকৃত্রিম প্রেম প্রীতির বন্ধনেই এই দুইটি হৃদয় চিরদিন সমভাবে নিবদ্ধ ছিল। শুধু তাহাই নহে, খাদিজার স্মৃতিকে পরম শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া চলিতেছিলেন। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর প্রয়োজনবোধে তিনি আরও কয়েকটি বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সকল স্ত্রীর উর্ধ্বে ছিল খাদিজার আসন। পরবর্তীকালে তরুণ-বয়স্কা বিবি আয়েশা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন : "হে রসুলুল্লাহ্, আপনি সর্বদা বিবি খাদিজার প্রশংসাই কেন করেন? খাদিজার চেয়েও আমার রূপ-গুণ কি কম?" তদুত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন : "আয়েশা, বিবি খাদিজা যাহা ছিলেন, তুমি তাহা নও।" ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, খাদিজার মধ্যে মুহম্মদ কী অপরিসীম বেহেশ্‌তী সওগাত লাভ করিয়াছিলেন।

জগতে বহু পয়গম্বর আসিয়াছেন এবং অনেক বিবাহও করিয়াছেন কিন্তু এমন সুস্পষ্টভাবে অপর কাহারও বিবাহ আমরা দেখিতে পাই নাই। এ যেন আমাদেরই কোন প্রতিবেশীর বিবাহ-একেবারে বাস্তব আধুনিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

এই বিবাহ দ্বারাই আল্লাহ্‌র রসূল সত্যিকারভাবে মাটির মানুষ সাজিলেন, মানবীয় আবেষ্টনের মধ্যে এইবার তিনি সম্পূর্ণভাবে ধরা দিলেন। আকাশচারী নন্দনপাখী মাটির পৃথিবীতে যেন নীড় রচনা করিল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৪

কাবা-গৃহের সংস্কার

মক্কার কাবা-গৃহ চির প্রসিদ্ধ। ইহার নাম ছিল 'বায়তুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র ঘর। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই গৃহটি জগতের সর্বপ্রধান ভজনালয়রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। অন্ধ কুসংস্কারের মোহে পড়িয়া কোরেশগণ এই পবিত্র গৃহে বহু দেবদেবীর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া রাখিলেও মনে মনে তাহারা একথা জানিত যে, ইহা সত্যই আল্লাহ্র ঘর এবং ইহার রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্। কাবা-শরীফ সম্বন্ধে এই ধারণা যে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, একটি প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাহা সুপ্রকট হইয়া আছে।

ঘটনাটি এই :

হযরত মুহম্মদ যে-বৎসর ভূমিষ্ঠ হন, সেই বৎসর (অনেকের মতে তাঁহার জন্মদিনেই) কাবা-গৃহের উপর এক ভীষণ বিপদ আপতিত হয়। এয়মনের খ্রীষ্টান শাসনকর্তা আবরাহা এক বিপুল হস্তিসেনা বাহিনী লইয়া মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। স্বীয় রাজধানীতে তিনি এক বিরাট গির্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয় ও তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার সাধ জাগিয়াছিল। কিন্তু মক্কার কাবা-গৃহই তাহার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, কারণ পৃথিবীর প্রচীনতম ধর্মগৃহ বলিয়া তখন ইহার খ্যাতি দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য মনে মনে তিনি কাবা-মন্দিরের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে থাকেন এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহাই ছিল আবরাহার মক্কা-অভিযানের মূল কারণ ও লক্ষ্য।

তখন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন কাবা-গৃহের সংরক্ষক এবং কোরেশদিগের দলপতি। আবরাহা যখন মক্কার উপকণ্ঠে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন, তখন ঘটনাচক্রে আবদুল মুত্তালিব এই সংবাদ পাইয়া আবরাহার শিবিরে উপস্থিত হন এবং তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। আবরাহা ভাবিলেন, আবদুল মুত্তালিব নিশ্চয়ই ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন। ইহাই ভাবিয়া তিনি আবদুল মুত্তালিবের প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আবদুল মুত্তালিব আবরাহার নিকট উপস্থিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন "দয়া করিয়া আমার উটগুলি ফিরাইয়া দিন।" আবরাহা আশ্চর্যন্বিত হইয়া বলিলেন : "বেশ ত মজার লোক আপনি! একটু পরে আমি আপনার কাবা-মন্দিরকেই ধূলিসাৎ করিয়া দিব, সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া আপনি শুধু আপনার কয়েকটি উটের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি!" এই বলিয়া তিনি একটু বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। তখন আবদুল মুত্তালিব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কাবা-গৃহের জন্য আমার মাথাব্যথা নাই। কাবার মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ই উহা রক্ষা করিবেন। উটের মালিক আমি, তাই উটগুলি রক্ষা করিতে আসিয়াছি।"

আবরাহা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

যথাসময়ে তিনি সসৈন্যে কাবা-মন্দির আক্রমণ করিতে চলিলেন। অগণিত শত্রু সেনার বিরুদ্ধে বাধা দেওয়া নিরর্থক মনে করিয়া কোরেশগণ মক্কা ছাড়িয়া পর্বতগুহায়

www.pathagar.com

আশ্রয় লইল। তখন আবদুল মুত্তালিব কাবা-গৃহের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন : "হে আল্লাহ্ আমরা দুর্বল, তোমার ঘর তুমি রক্ষা কর।"

আবদুল মুত্তালিবের এই প্রার্থনা আল্লাহ্ সত্যিই কবুল করিয়াছিলেন। আসন্ন বিজয়গর্বে উন্মত্ত হইয়া আবরাহার সৈন্যদল কাবা-মন্দির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল, তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া বসিল। আবরাহার হস্তী কিছুতেই আর কাবার দিকে অগ্রসর হইতে চাহে না, কাবার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াইয়া সে শুইয়া পড়ে। তাহাকে কত মারধর করা হইল কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অন্য যে কোন দিকে মুখ ফিরাইয়া দিলে সে উঠিয়া হাঁটা দেয়, কিন্তু কাবার দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে এক দারুণ বিপদ দেখা দিল। হঠাৎ কোথায় হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে 'আবাবীল'[১] পাখী উড়িয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেকের মুখে এক একটি কঠিন প্রস্তরখণ্ড। প্রস্তরখণ্ডগুলি তাহারা বৃষ্টির ধারার মত আবরাহার সৈন্যদিগের মস্তকে অবিরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেনাদল দিশাহারা হইয়া ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কেহই রেহাই পাইল না; যে যেখানে ছিল, সেইখানে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এইরূপে নিমিষের মধ্যেই আবরাহা ও তাঁহার বিপুল বাহিনী নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।[২]

কুরআন-শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন .

"তুমি কী দেখ নাই, তোমার প্রভু কেমন করিয়া গজপতির সহিত ব্যবহার করিলেন? তিনি কি তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন নাই? ঝাঁকে ঝাঁকে 'আবাবীল' পক্ষীকে তাহাদের উপর পাঠান নাই—যাহারা তাহাদিগকে শক্ত পাথর ঠুকিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল? এইরূপে তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত তৃণের ন্যায় নিশ্চিহ্ন করিয়া ছাড়িয়াছেন।"

(সূরা ফিল)

এমনই ছিল কাবা-গৃহের মাহাত্ম্য।

হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবকালে কাবা-গৃহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার চতুষ্পার্শ্ব প্রাচীর-বেষ্টিত না থাকায় বর্ষার সময় ভিতরে পানি ঢুকিয়া পড়িত। তাহা ছাড়া উপরে কোন ছাদ ছিল না বলিয়া সময়ে সময়ে উহার আসবাবপত্রও চুরি যাইত। এইসব কারণে কোরেশগণ বহুদিন কাবা-গৃহের মেরামতের জল্পনা করিতেছিলেন।

এই সময় জেদ্দা-বন্দরে হঠাৎ একখানি জাহাজ বানচাল হইয়া যাওয়ায় কোরেশদিগের কাবা-মেরামতের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। জাহাজখানির তক্তাগুলি তাঁহারা সস্তাদরে কিনিয়া আনিলেন এবং তাহা দিয়াই মেরামতকার্য আরম্ভ করিলেন। কোরেশ দলপতিগণ সকলেই বেশ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটি বিভ্রাট ঘটিল। কাবা-গৃহের প্রাঙ্গণে যে কৃষ্ণ-প্রস্তরখানি ছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে কাহারা স্থাপন করিবে, ইহাই লইয়া দলপতিদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। প্রস্তরখানির সহিত সামাজিক মর্যাদা ও কুলগত প্রাধান্যের সম্বন্ধ ছিল।

---

১ আবাবীল কোন পাখীর নাম নহে। উহার অর্থ ঝাঁকে ঝাঁকে। অষ্টম সংস্করণ, সংশোধনী দ্রঃ।
২ ইবনে ইসহাক (ইংরেজি) হইতে গৃহীত।

www.pathagar.com

কাজেই প্রত্যেক গোত্রই উহা তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। প্রথমে বচসা তারপর তুমুল দ্বন্দ্ব-কোলাহল আরম্ভ হইল। চারিটি দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু কোনই মীমাংসা হইল না। তখন চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন : "ক্ষান্ত হও, আমার কথা শোন। সামান্য কারণে কেন রক্তপাত করিবে? ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা কর। আমার প্রস্তাব : যে ব্যক্তি আজ সর্বপ্রথম কাবা-মন্দিরে প্রবেশ করিবে তাহার উপরেই বিবাদের ফায়সালার ভার অর্পণ করা হউক। সে যে সিদ্ধান্ত করিবে, তাহাই আমরা মানিয়া লইব। ইহাতে তোমরা রাজী আছ?"

বৃদ্ধের প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন।

তখন প্রথম আগন্তুকের আগমন প্রতীক্ষায় সকলেই উদগ্রীব হইয়া রহিলেন। প্রত্যেকের মনে কত চিন্তার উদ্রেক হইতে লাগিল। যে আসিবে সে কেমন লোক হইবে, কোন্ পক্ষে সে রায় দিবে, তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি সকলের মনঃপূত না হয়, তখন কি ঘটিবে, ইত্যাদি ভাবের নানা চিন্তা প্রত্যেকের মনে খেলিয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল : "এই যে আমাদের 'আল্-আমিন' আসিতেছেন। আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানিয়া লইব।" মুহম্মদ তখন তরুণ যুবকমাত্র! কিন্তু তবু মক্কাবাসীদের কী অগাধ বিশ্বাস তাঁহার উপর!

মুহম্মদ আসলে সকলে তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিলেন। তখন তিনি বলিলেন : "বেশ, ভাল কথা। যে-সকল গোত্র কৃষ্ণ-প্রস্তর তুলিবার দাবী করিতেছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজেদের মধ্য হইতে এক একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করুন।"

তাহাই করা হইল। তখন সেই প্রতিনিধিদিগকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ-প্রস্তরের নিকট উপস্থিত হইলেন। একখানি চাদর বিছাইয়া নিজে সেই প্রস্তরখানিকে উহার মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন। তার পর প্রতিনিধিগণকে বলিলেন : "এইবার আপনারা প্রত্যেকেই এই চাদরখানির এক এক প্রান্ত ধরিয়া পাথরখানিকে যথাস্থানে লইয়া চলুন।"

সকলে তাহাই করিলেন। গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলে মুহম্মদ পুনরায় প্রস্তরখানি নিজহস্তে তুলিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন।

এই বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। মুহম্মদের বিচক্ষণতায় একটা আসন্ন সমরানল হইতে আরব ভূমি রক্ষা পাইল।

এই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গূঢ় তাৎপর্য নিহিত আছে।

'হয্‌রে-আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ-প্রস্তরখানি ইসলামের এক অতি পবিত্র বস্তু। হযরত আদমের স্পর্শ, ফেরেশ্‌তাদিগের স্পর্শ ও হযরত ইব্রাহিমের স্পর্শ উহাতে জড়িত রহিয়াছে। ঐ প্রস্তরখানি হইতেছে 'আল্লাহ্‌র ঘরের' ভিত্তি-প্রস্তর। কাজেই সেই 'আল্লাহ্‌র ঘরের' নবপ্রতিষ্ঠার দিনে সেই পবিত্র প্রস্তর কি হযরত মুহম্মদের হস্তেই স্থাপিত হওয়া সঙ্গত ও সুশোভন হয় নাই? কোরেশ দলপতিদের মধ্যে পরস্পর কলহ এবং অপ্রত্যাশিতভাবে হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব—ইহা দ্বারা আল্লাহ্‌র এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতই যেন ধরা পড়ে। পক্ষান্তরে ইসলামের ভবিষ্যতের একখানি উজ্জ্বল চিত্রও ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম লইয়া জগতে বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং সে বিরোধের মীমাংসা না করিতে পারিয়া অবশেষে সকলেই যে

www.pathagar.com

একজন আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিবে এবং বিবদমান সকল পক্ষই যে তাঁহারই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবে, সমস্ত বিরোধ ও বৈষম্য দূর করিয়া তিনিই যে সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন-এই মহাসত্যই যেন এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়া রূপয়িত হইয়া উঠিল।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত কৃষ্ণ-প্রস্তরখানি কাবা-শরীফে একইভাবে শোভা পাইতেছে। হজযাত্রীরা প্রতি বৎসর মক্কায় গিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত এই প্রস্তরখানিকে চুম্বন করিয়া থাকেন। এই চুম্বনের মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক উল্লাস আছে। ইহা ত প্রস্তরে চুম্বন দান নহে। বিদ্যুৎবেগে ইহা প্রবাহিত হয় রসুলুল্লাহর নিকট হইতে হযরত ইব্রাহিমের হস্তে-সেখান হইতে হযরত আদমের হস্তে-সেখান হইতে ফেরেশ্তাদের হস্তে-সেখান হইতে আল্লাহতায়ালার দরবারে। একটি চুম্বনে এতগুলি সংযোগ-কেন্দ্রে আলোড়ন জাগে। আধ্যাত্মিক প্রেমের এ একটা গোপন প্রবাহ! ভক্তের হৃদয় হইতে উৎসারিত হইয়া বিভিন্ন বাহনের (medium) মধ্য দিয়া এই প্রবাহ পৌঁছে গিয়া অবশেষে সেই আল্লাহ্তায়ালার রহমত ও প্রেমের দরিয়ায়। তাই ইহা হজের একটা প্রধান অঙ্গ। আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে কত যুগের মানুষের কত চুম্বন বহন করিয়া চলিয়াছে এই প্রস্তরখানি! কত পবিত্র হস্তের-কত পবিত্র আত্মার সুরভি জড়ানো রহিয়াছে ইহার অণু-পরামাণুতে! এই প্রস্তরখানি তাই গোটা মানব জাতির এক পরমাশ্চর্য স্মৃতিফলক! একে স্পর্শ করিলে যেন গোটা মানব জাতিকেই স্পর্শ করা হয়; সৃষ্টির আদিম রূপকে যেন অনুভব করা যায়।

অনেকে এই প্রস্তর চুম্বনের মধ্যে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান, কিন্তু ইহার নাম পৌত্তলিকতা নহে। ইসলামের মূল সুরই হইতেছে সংস্কার বা শুদ্ধিকরণ-সংহার বা মূলোৎপাটন নহে। কৃষ্ণ-প্রস্তরের ব্যাপারে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয়। প্রত্যেক কার্যের দোষগুণ তাহার নিয়মের উপর নির্ভর করে। মূর্তি অঙ্কিত মুদ্রা অহরহ ব্যবহার করিলেও যেমন তাহা মূর্তির পূজা হয় না, বৃহত্তর মানবতার স্বার্থে কৃষ্ণ-প্রস্তরকে চুম্বন করিলেও তেমনি তাহাকে মূর্তিপূজা বলা যায় না। ইহা যেন মানব জাতির অতীত কাহিনীর এক প্রস্তরীভূত ইতিহাস। এক চুম্বনে ইহাকে পড়িয়া শেষ করা যায়। ইহা ইসলামের ঐতিহাসিক চেতনার এক সুন্দর নিদর্শন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৫

গৃহীর বেশে

মুহম্মদ এখন সংসারী হইয়াছেন। খাদিজা তাঁহার যথাসর্বস্ব স্বামীর চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ভোগ-বিলাসের মধ্যে পড়িয়াও হযরত একেবারে নির্বিকার। বাহিরের কোন আকর্ষণই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারিল না। কী অসীম মনোবল আত্মসংযম এই মহামানবের। কত বিভিন্নমুখীন—কত ব্যাপক তাঁহার জীবনের প্রকাশ। অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় 'কামিনী -কাঞ্চনের' ভয়ে তিনি সংসার ছাড়িয়া বনবাসী সন্ন্যাসীও হইলেন না, আবার ভোগ-লালসার মায়াজালেও জড়াইয়া পড়িলেন না। শক্তির প্রাচুর্যে জীবন তাঁহার বলিষ্ঠ ও বেগবান। তাঁহার জীবনের পরিসর এত বিপুল যে, বাসনা-কামনা ও সংযম-সাধনাকে তিনি এক পংক্তিতে বসাইতে পারেন। যাঁহার জীবনের পটভূমি যত ব্যাপক, তাঁহার তত বিচিত্র। অসীম অনন্ত আকাশের পরিসরে তাই ত কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্রের এমন সুন্দর সমাবেশ!

মুহম্মদ এখন খাদিজার বিশাল বাণিজ্যের অধিকারী। কখনও বা তিনি এই বাণিজ্যের তত্ত্বাবধান করেন, কখনও বা নিজেই বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য করিতে যান।

বাণিজ্যের প্রতি মুহম্মদ এত অনুরক্ত ছিলেন কেন? ইহারও একটা কারণ ছিল। বাণিজ্যই ত মানুষের অন্তর্নিহিত বহু গুণের প্রকৃষ্ট বিকাশক্ষেত্র। একদিকে নানা দেশের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ, অপর দিকে নানা মানুষের মনের সঙ্গে নিত্য নব নব পরিচয়। একদিকে ধনাগম, অপরদিকে সততা, সাধুতা, মিতব্যয়িতা, দূরদর্শিতা, বিশ্বস্ততা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি নানা বৃত্তির উন্মেষ ও পরীক্ষা-এই সমস্তই বাণিজ্যের শিক্ষা। বস্তুত মানুষের অভ্যন্তরীণ বহু সুপ্ত শক্তি ও প্রতিভা বাণিজ্যের ভিতর দিয়াই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হইতে পারে। এর মধ্যে আছে একটা সৃষ্টির উল্লাস, আছে একটা স্বাধীনতার আনন্দ, আছে একটা আত্মপ্রত্যয়ের গৌরব। এই জন্যই ত হযরত বাণিজ্যকেই জীবিকা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

মুহম্মদ খাদিজার নিকট হইতে তিনটি পুত্র এবং চারটি কন্যা লাভ করেন। পুত্রদিগের নাম কাসেম, তাহের ও তৈয়ব। কন্যাদিগের নাম জয়নব, রোকাইয়া, উম্মে-কুলসুম এবং ফাতিমা। পুত্র তিনটি হযরতের নবুয়ত লাভের পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। কন্যাদিগের মধ্যে বিবি ফাতিমাই হযরতের মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন। হযরত আলির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহাদের দুই পুত্র-ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেন।

মুহম্মদের পুত্রসন্তান একটিও জীবিত না থাকায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মনে মনে দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু আল্লহ্তায়ালা এক উদ্ভুত উপায়ে তাঁহাদের এই পুত্র-সুখের কামনা পূর্ণ করিয়া দিলেন।

'ওকাজ' মেলা হইতে বিবি খাদিজা 'জায়েদ' নামক একটি দাস বালককে ক্রয় করিলেন। বলা বাহুল্য, তখন পৃথিবীর সর্বত্র দাস ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। হাটে-বাজারে

www.pathagar.com

দাস–দাসীদের ক্রয়–বিক্রয় চলিত। দাস–দাসীর প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়নের সীমা ছিল না। প্রভুরা দাস–দাসীকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিতেন।

বিবি খাদিজা এই জায়েদকে খাস করিয়া মুহম্মদের খিদমতের জন্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

কিন্তু ইহার ফল হইল বিপরীত। বিশ্বমানুষের যিনি মুক্তিদাতা, তিনি কি নিজে কাহাকেও দাসত্বের শৃংখলে বাঁধিতে পারেন? এক আল্লাহ্ ছাড়া যিনি অন্য কাহাকেও প্রভু বলিয়া স্বীকার করেন না, সব মানুষই যাঁহার নিকট ভাই–ভাই, তিনি কি নিজেই অপর একজন মানুষের প্রভু হইতে পারেন? কখনই না। মুহম্মদ কিছুতেই ইহা বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি জায়েদকে মুক্ত করিয়াা দিয়া বলিলেন : "জায়েদ আজ তুমি আযাদ!"

মুহম্মদ জায়েদকে এতই স্নেহ করিতে লাগিলেন যে, জায়েদকে সকল লোকে 'জায়েদ–বিন–মুহম্মদ' অর্থাৎ 'মুহম্মদের পুত্র জায়েদ' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিল।

কিছুদিন পরে জায়েদের পিতা হারিস এবং পিতৃব্য কা'ব জায়েদের সন্ধানে মক্কায় আসিলেন। মুহম্মদের নিকট আসিয়া তাঁহারা বিনীতভাবে এই আর্জি পেশ করিলেন : "হুজুর, আমরা জায়েদকে ফিরিয়া পাইতে চাই, দয়া করিয়া একটু বিবেচনার সহিত আপনি উহার মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়া দিন।"

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন : "এই কথা? ইহার জন্য এত কাকুতি–মিনতি কেন? জায়েদকে ত মুক্তি দিয়াছি। ইচ্ছা করিলে সে এখনই চলিয়া যাইতে পারে।"

বিনাপণে মুক্তিদান! তখনকার দিনে এ যে একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার! জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য অবাক হইয়া মুহম্মদের পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্তানকে ফিরিয়া পাইবার আসন্ন আনন্দে উভয়ের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাঁহাদের এ সাধ পূর্ণ হইল না। জায়েদ মুহম্মদকে ছাড়িয়া কিছুতেই পিতার সহিত দেশে ফিরিয়া যাইতে রাযী হইলেন না। মুহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হযরত, আপনিই আমার পিতা, আপনার খিদমতে খুশ্‌নবীস হইতে এ অধমকে বঞ্চিত করিবেন না।"

কোন্ যাদুমন্ত্রে এমন হইল? মুক্তি–ভিখারী দাস–বালক মুক্তিকে পায়ে ঠেলিয়া বন্ধনকে মানিয়া লইল? আপন পিতাকে ভুলিয়া পরকে পিতা করিল?

জায়েদের পিতা ও পিতৃব্য সম্মত হইলেন। সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহারা জায়েদকে মুহম্মদের নিকট রাখিয়া ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু মুহম্মদ বুঝিলেন, এরূপভাবে জায়েদকে নিজের কাছে রাখিয়া দিলে লোকে তাহাকে ক্রীতদাসই বলিবে; স্বাধীন মানুষের মত উন্নত মস্তকে সে চলাফেরা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জায়েদের পিতামাতা ও আত্মীয়–স্বজনের মনে চিরদিন একটা প্রচ্ছন্ন গ্লানি ও হীনতার ভাব জাগিয়া থাকিবে। ইহাই ভাবিয়া তিনি জায়েদকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ কাবাগৃহে যাইয়া সমবেত কোরেশ নেতাদিগের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "সকলে সাক্ষী থাকো, এই জায়েদ আমার পুত্র; সে আমার উত্তরাধিকারী, আমি তাহার উত্তরাধিকারী।"

বিস্মিত জনমণ্ডলী অবাক হইয়া রহিল।

www.pathagar.com

কোথায় অজ্ঞাতকুলশীল একটি ক্রীতদাস, আর কোথায় জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী! দোযখ্ হইতে একেবারে বেহেশ্‌তে উন্নয়ন! লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানবাত্মাকে এর চেয়ে বড় কী সম্মান দেওয়া যাইতে পারে? মানব-কল্যাণের এখানে একেবারে চরম হইয়া গেল না কি?

পরবর্তীকালে এই জায়েদই যুদ্ধ-অভিযানে সেনাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে কত শক্তি ও সম্ভাবনাই না এমনি করিয়া লুকাইয়া থাকে। সুযোগ ও সহানুভূতি পাইলে কত 'ছোটলোক'ই না এমনি বড় হইতে পারে। মুহম্মদ যদি জায়েদকে এই সুযোগ না দিতেন তবে সে চিরদিন ক্রীতদাসই রহিয়া যাইত, সেনাপতি হইতে পারিত না। এইখানেই ইসলামের বিশেষত্ব। "সব মানুষই সমান" এই সাম্যবাণী দ্বারা মানুষের অন্তরের অপরিসীম শক্তি ও সম্ভাবনাকে সে স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের আত্মপ্রকাশের পথকে একেবারে মুক্ত করিয়া দিয়াছে। তাই ত পরবর্তীকালে দেখিতে পাই, ক্রীতদাস হইয়াও বেলাল মুসলমান জাতির মুয়াজ্জিন হইয়াছেন, কুতুবুদ্দিন ভারতের প্রথম মুসলমান-সম্রাট হইবার গৌরব অর্জন করিয়াছেন। যুগে যুগে কত অস্পৃশ্য, কত শূদ্র, কত পতিতই না ইসলামের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এইরূপে জ্ঞান-গুণে বিশ্ববরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। বস্তুত আল্লাহ্ কোন মানুষকেই ছোট করেন নাই, মানুষ মানুষকে ছোট করিয়াছে। কোটি কোটি মানুষ এইরূপে যুগ যুগ ধারিয়া মানুষের অত্যাচারে নিগৃহীত পদদলিত ও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন :

"What man has made of man!"

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৬

সত্যের প্রথম প্রকাশ

সব আয়োজন শেষ হইয়াছে। বিশ্বনবীর আত্মপ্রকাশের আর বেশী বিলম্ব নাই।

খাদিজার সহিত বিবাহের পর হইতে হযরত মুহম্মদ অভাব ও দৈন্যের হাত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, তাই তিনি আত্মচিন্তায় অধিকতর নিমগ্ন হইবার সময় ও সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মুহম্মদ শৈশব হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। সে-চিন্তার কোন কালেই বিরাম ছিল না। কোন্ অজানা রহস্য-লোকের সহিত তাঁহার আত্মার যোগাযোগ ছিল—সর্বদা তিনি সেই অতীন্দ্রিয় লোকে যাওয়া-আসা করিতেন। সেই আধ্যাত্মিক জগতের কত দৃশ্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। এক এক সময় তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, কে যেন তাঁহার কানে কানে কি কহিয়া গেল, কে যেন তাঁহাকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, কে যেন তাঁহার নয়ন-কোণে নিমেষের জন্য প্রতিভাত হইয়া নিমেষেই মিলাইয়া গেল। এক এক সময় তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিতেছে, "মুহম্মদ তুমি আল্লাহ্‌র রসূল।" পাহাড়-পর্বত, তরুলতা সকলেই যেন তাহাকে চিনে, সকলেই যেন তাঁহাকে তাযীম করে। মুহম্মদ কিছুই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না, কেবলি ইহাদের কথা ভাবেন।

পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স মুহম্মদ আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। আপন অন্তরের প্রদীপ্ত চেতনায় আপনি অধীর হইয়া ঘরে-বাইরে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। একটা শঙ্কা, একটা ভীতি, একটা উদ্বেগ, সঙ্গে সঙ্গে অজানাকে জানিবার জন্য একটা দুর্জয় কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। এই সময় হইতে তিনি মানস-নেত্রে এক অপূর্ব জ্যোতি দর্শন করিতে লাগিলেন। কোন্ সুদূর হইতে যেন এক সুললিত সুর-তরঙ্গ ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। সংসারের কর্ম-কোলাহলে পাছে তাঁহার এই আধ্যাত্মিক চেতনা ব্যর্থ হইয়া যায়, সমাজ-জীবনের পঙ্কিলতার মধ্যে পাছে সেই পবিত্র জ্যোতির গতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তিনি মক্কার অনতিদূরে 'হেরা' নামক এক নিভৃত পর্বত-গুহায় আশ্রয় লইলেন। বিবি খাদিজাও প্রকৃত সহধর্মিণীর ন্যায় স্বামীর এই কার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। তিনি দুই-তিন দিনের মত খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুত করিয়া দিতেন, মুহম্মদ তাহাই লইয়া প্রস্থান করিতেন। সেই খোরাকী ফুরাইয়া গেলে পুনরায় গৃহে আসিয়া ঐরূপ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া যাইতেন। খাদিজা সতর্ক দৃষ্টিতে স্বামীর গতিবিধি ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। মুহম্মদ যে একজন প্রেরিত পুরুষ, তাঁহার ভিতরে যে একটা দারুণ অন্তর্বিপ্লব চলিতেছে, খাদিজা তাহা ভালভাবেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আর বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ত তিনি স্বামীর আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গিনী হইতে পারিয়াছিলেন।

রমযান মাস। মুহম্মদ রোযা রাখিয়া নিশিদিন ইবাদৎ-বন্দেগী করেন। হেরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে সারারাত্র জাগিয়া কাটান।

তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসর।

www.pathagar.com

কয়েকদিন হইতে ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে তিনি কাল কাটাইতে ছিলেন। নিশিদিন অবিশ্রান্ত কে যেন তাঁহার কানে কানে বলিয়া যাইতেছে : "ইয়া মুহম্মদ, আন্তা রসূলুল্লাহ্।"-হে মুহম্মদ, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল। চিরবাঞ্ছিতকে পাইবার প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়, মুহম্মদের ঠিক তাহাই হইয়াছে।

রজনী গভীর। মুহম্মদ ধ্যানমগ্ন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে : "মুহম্মদ!"

মুহম্মদ নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, এক জ্যোতির্ময় ফেরেশ্‌তা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাঁহারই জ্যোতিতে গুহা আলোকিত হইয়া গিয়াছে।

ইনিই আল্লাহ্‌র বাণীবাহক ফেরেশ্‌তা 'জিব্রাইল'।

মুহম্মদ তখন স্তম্ভিত। বাহিরের জ্ঞান তাঁহার লোপ পাইয়াছে, এক মহামুহূর্তের তিনি সম্মুখীন হইয়াছেন।

সহসা নূরের আখরে লেখা এক জ্যোতির্ময়ী বাণী মুহম্মদের নয়ন কোণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। জিব্রাইল মুহম্মদকে বলিলেন : "পাঠ কর।"

মুহম্মদ কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন : "আমি পড়িতে জানি না"।

জিব্রাইল যখন মুহম্মদকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন। মুহম্মদের মনে হইল তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব আলোকময় হইয়া গেল।

ফেরেশ্‌তা পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন : "পাঠ কর।[১]"

মুহম্মদ এবারও পূর্ববৎ উত্তর দিলেন : "আমি পড়িতে পারি না"।

জিব্রাইল তখন আবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপ তিন বার করিবার পর মুহম্মদের মুখ হইতে নিঃসরিত হইল :

ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকাল লাজি খালাক–
"পাঠ কর তোমার সেই প্রভুর নামে–
যিনি সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন–
যিনি এক বিন্দু রক্ত হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,
পাঠ কর– তোমার সেই মহিমময় প্রভুর নামে,
যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,
যিনি মানুষকে অনুগ্রহ করিয়া অজ্ঞাতপূর্ব জ্ঞান
দানকরিয়াছেন।"

নূর! নূর! সমস্তই নূর! মুহম্মদের ভিতরে বাহিরে শুধুই নূরের জৌলুস। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে লৌহপিণ্ড যেমন স্বতন্ত্র হইয়াও অগ্নিময় হইয়া উঠে, মুহম্মদের সমস্ত দেহমনও সেইরূপ জ্যোতিঃস্নাত হইয়া উঠিল।

---

১ When it was the night on which God honoured him with his mission and showed mercy on his servant thereby, Gabriel brought him the Command of God, 'He come to me,' said the Apostle of God, 'while I was asleep, with a coverlet of brocade whereon was some writing and said, 'Read'. —(Ibn-i-Ishaq : p. 106)

www.pathagar.com

মুহম্মদ অভিভূত হইয়া রহিলেন। মহাসত্যের প্রথম উপলব্ধির এই মহামুহূর্তে তাঁহার চিত্তে কী যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা শুধু অনুভব করিবারই কথা, বর্ণনা করিবার নহে।

মুহম্মদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। দেখিলেন, আকাশ-পথে জিব্রাইল তখনও দাঁড়াইয়া আছেন! তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। দিশাহারা হইয়া তিনি খাদিজার নিকট ছুটিয়া চলিলেন।

তখন রজনী প্রভাত হইয়া আসিয়াছে। অরুণরাগে পূর্বগগন রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। স্নিগ্ধ নয়ন মেলিয়া ভোরের তারা ধরণীর পানে চাহিয়া আছে। ঘুমন্ত মক্কানগরী একখানি অস্পষ্ট ছবির মত আলো-আঁধারের শোভা পাইতেছে। প্রশান্ত নীরবতার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি স্ফুটনোন্মুখ শতদলের মত দাঁড়াইয়া আছে।

এমন সময় খাদিজার গৃহদ্বারে কে নাড়া দিয়া উঠিল। খাদিজা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দেখিলেন মুহম্মদ। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ব্যাপার কী?"

মুহম্মদ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন : "আমায় আবৃত কর! আমায় আবৃত কর! আমার বড় ভয় হইতেছে।"

খাদিজা তাহাই করিলেন। তিনি মুহম্মদকে একটি কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সান্ত্বনা ও অভয় দিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে মুহম্মদ খাদিজাকে সকল ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। খাদিজা উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে আবুল কাসেম (কাসেমের পিতা), কোন ভয় নাই। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি আপনাকে কখনও অপদস্থ করিবেন না। আপনি আত্মীয়-স্বজনের কল্যাণ করিয়া থাকেন, অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচন করিয়া থাকেন, দুঃস্থপীড়িতদের সেবা ও সাহায্য করিয়া থাকেন, মেহ্‌মানকে আশ্রয় দিয়া থাকেন, ঘোর বিপদেও আপনি সত্য পালন করিয়া থাকেন। কেন তবে আল্লাহ্ আপনার প্রতি বিমুখ হইবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কোন মহান উদ্দেশ্যই আপনার দ্বারা সাধিত হইবে।"

সহধর্মিণীর উপযুক্ত কথাই বটে! হৃদয় যাঁহার পবিত্র, সত্যের উপলব্ধি তাঁহার কাছে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠে।

এইখানে ইবনে-ইসহাক একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। হযরত মুহম্মদের পয়গম্বর-জীবনে বিবি খাদিজা যে কত বড় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নীরবে তিনি রসূলুল্লাহ্‌কে যে কতভাবে প্রেরণা ও সৎসাহস দিয়াছিলেন এই ঘটনায় তাহার প্রমাণ মিলিবে। রসূলুল্লাহ্ হেরা গিরিগুহা হইতে যখন খাদিজার নিকট ফিরিলেন, তখন তাঁহার অভিভূত অবস্থা। বারে বারে তিনি জিব্রাইল ফেরেশ্‌তাকে চোখে দেখিতে পাইতেছিলেন এবং শুনিতেছিলেন : "হে মুহম্মদ, তুমি আল্লাহ্‌র রসূল আর আমি জিব্রাইল।"- সেই রূপ, সেই বাণী কিছুতেই তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না। কেমন যেন একটা আবিষ্টতার ভাব তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুহম্মদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া খাদিজা বুঝিতে পারিতেছিলেন না তিনি সত্যই ফেরেশ্‌তার আশ্রিত, না শয়তান তাঁহাকে দাগা দিতেছে। ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য খাদিজা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিলেন। রসূলুল্লাহ্‌কে ধরিয়া তিনি তাঁহার বাম উরুর উপর বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন : এখনও কি আপনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন?

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ বলিলেন : হ্যাঁ। তখন বিবি খাদিজা স্বামীকে দক্ষিণ উরুর উপর বসাইলেন। বলিলেন : এখন দেখিতে পান? রসূলুল্লাহ বলিলেন : হ্যাঁ। তখন খাদিজা তাঁহাকে আপন কোলের উপর বসাইয়া পুনরায় একই প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন : হ্যাঁ, এখনও দেখিতেছি। খাদিজা তখন দেহের বস্ত্র খানিকটা উন্মুক্ত করিয়া রসূলুল্লাহ্‌কে বলিলেন : এখনও আপনি কাহাকেও দেখিতেছেন? রসূলুল্লাহ্ বলিলেন : না। যিনি ছিলেন, তিনি এখন অন্তর্হিত হইলেন। তখন বিবি খাদিজা উল্লসিত হইয়া বলিলেন : হে পিতৃব্যপুত্র, আনন্দ করুন। যিনি আপনাকে দেখা দিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা- শয়তান নহে। শয়তান হইলে সে বেহায়ার মত আমার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

বিবি খাদিজার এই চিত্রের তুলনা নাই।

খাদিজা যথাসাধ্য মুহম্মদকে সান্ত্বনা দিলেন। মুহম্মদের মন হইতে তবু ভয় দূর হইল না। এই ভয় অন্য কিছু নহে। তড়িৎ-প্রবাহের প্রথম স্পর্শে যেমন তড়িৎ-শলাকায় কম্পন জাগে, চিরজ্যোতির্ময়ের প্রথম স্পর্শে তাঁহার প্রাণেও ঠিক তেমনি করিয়া শিহরণ জাগিয়াছিল।

মুহম্মদ সারা দেহ আবৃত করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া খাদিজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চাচাতো ভাই 'অর্কার' নিকট গমন করিলেন। অর্কা তখনকার দিনে আরবের একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। কোরেশদিগের পৌত্তলিক মতবাদকে সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই জ্ঞানবৃদ্ধ তাপস হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত ব্যাপারটি অবগত হইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : "কুদ্দুসুন! কুদ্দুসুন! পবিত্র! পবিত্র! হযরত মুসা ও ঈসার প্রতি আল্লাহ্ যে 'নামুস-ই-আকবর' (মহান নিদর্শন) প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই নামুস! হায় মুহম্মদ! তোমার দেশবাসী তোমার উপর অত্যাচার করিবে, তোমাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবে। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করিব।"

খাদিজা পুলকিত হইলেন। তাড়াতাড়ি তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৌরবে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল। তিনি নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন মুহম্মদের মধ্যে অনাগত যুগের মহাপয়গম্বর জন্মলাভ করিতেছেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৭

সত্যের স্বরূপ

আল্লাহ্‌র পাক-কালামের প্রথম প্রকাশ। কত সুন্দর, কত মধুর! যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে-মহাসত্যের জন্য ধরণী প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল, যে-বাণী প্রেরণ করিবেন বলিয়া আল্লাহ্ বহুযুগ পূর্ব হইতেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছিলেন, সেই বাণী আজ অবতীর্ণ হইল। যে বাণীর আরম্ভই হইল : পাঠ কর-অর্থাৎ জ্ঞান লাভ কর। সমগ্র কুরআনের সর্বপ্রথম বিষয়বস্তুই হইল জ্ঞান। জ্ঞানের প্রসঙ্গ লইয়াই সূচিত হইল হযরতের পয়গম্বর জীবন, আর ইসলামের নূতন জয়যাত্রা। জ্ঞানের প্রতি কত বড় মর্যাদা! এই উন্নত আলোকের যুগে ইসলাম বিশ্বের সম্মুখে গর্ব করিয়া বলিতে পারে : জ্ঞান-সাধনাই হইতেছে তাঁহার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান পয়গাম।

পক্ষান্তরে কী গভীর দার্শনিক তাৎপর্যই না নিহিত আছে এই প্রথম অবতীর্ণ ক্ষুদ্র আয়াত কয়টির মধ্যে। পাঠক হয়ত ভাবিতেছেন সমগ্র কুরআন-শরীফের তুলনায় এই 'ইকরা' সূরার বিশেষত্ব ও গুরুত্ব এমন কী-ই বা বেশী, যার দরুণ ইহা প্রথম অবতরণের মর্যাদা লাভ করিল? সূরা 'ফাতিহা', সূরা 'এখলাস' প্রভৃতি গভীর তত্ত্বপূর্ণ কোন একটি সূরা বা আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হইলেই ত হইত। এই কথা আমার মনেও থাকিয়া থাকিয়া জাগিত। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, কুরআনের এই অংশটুকুই প্রথম নাযিল হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা রাখে। এই তিনটি লাইনের মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআনের সারাংশ এবং ইসলামের অন্তর্নিহিত মূল সত্য ধরা পড়িয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার যাহা কিছু বলিবার ছিল বিশ্ববাসীর নিকট যে—বাণী পৌঁছাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল তাহা তিনি চুম্বক মুখবন্ধেই বলিয়া ফেলিয়াছেন। এই বাণী-এই মহাসত্য প্রচার করিবার জন্যই তিনি হযরত মুহম্মদকে দুনিয়ায় পাঠাইয়াছিলেন। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে এই সত্য পুরোপুরিভাবে কেহ জানিতও না, মানিতও না। কাজেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই ক্ষুদ্র আয়াত কয়টিতে মাত্র তিনটি বিষয়ে অবতারণা করা হইয়াছে : (১) আল্লাহ্, (২) মানুষ, (৩) জ্ঞান। প্রথমেই আল্লাহ্ আত্মপরিচয় দিয়া বলিতেছেন : তিনিই বিশ্বনিখিলের একমাত্র প্রভু তিনিই 'রব'-অর্থাৎ তিনিই সৃজনকারী-পোষণকারী এবং নিয়ামক। এইখানে প্রচলিত বহু ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন হইয়া যাইতেছে। জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, পুরুষ ও প্রকৃতিই সৃষ্টির দুই মৌলিক উপাদান, ঈশ্বরের ন্যায় জড়পদার্থও (Matter) আদি ও অনন্ত (coeternal), এই বিশ্বের কোনই স্রষ্টা নাই, ইহা স্বয়ংসৃষ্ট অথবা একাধিক ঈশ্বর ও দেবদেবীর দ্বারা বিশ্ব রচিত ও পরিচালিত- ইত্যাদি ধরনের যাবতীয় মতবাদকে আল্লাহ্ এখানে বাতিল করিয়া দিতেছেন এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছেন যে, একমাত্র তিনিই ইহার স্রষ্টা ও নিয়ামক। তারপর আসিল মানুষের পরিচয়। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কে পয়দা করিল? সে পরিচয় দিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন : মানুষকে আল্লাহ্‌ই পয়দা করিয়াছেন সামান্য রক্ত-কণিকা হইতে। এখানেও বলা হইল যে, মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি তাঁহার অংশ নহে, অথবা স্বয়ম্ভূও নহে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন। এইখানে বিবর্তনবাদ

www.pathagar.com

বা 'Theory of Evoulution'—এর কথা আসিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র একটি রক্তবিন্দুর মধ্যে আল্লাহ্ মানুষের সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনাকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, তারপর ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সেই রক্তবিন্দুকে তিনি জ্ঞানবিবেকসম্পন্ন শক্তিশালী মানুষে পরিণত করিতেছেন। অবশেষে আসিল জ্ঞানের কথা। মানুষের জ্ঞান কোথা হইতে আসিল? আল্লাহ্ বলিতেছেন : তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন। এই জ্ঞান দুই প্রকারের : লেখনীলব্ধ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং লেখনীর বহির্ভূত, অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহলব্ধ। জগতের দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-ইতিহাস যাবতীয় বিষয় লেখনীলব্ধ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ কোন-না-কোন উপকরণ সাপেক্ষ। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর এক প্রকারের জ্ঞান আছে-যাহা লাভ করিতে হইলে কোন উপকরণ বা বাহনের প্রয়োজন হয় না, আল্লাহ্ যাহাকে অনুগ্রহ করিয়া দান করেন, সেই তাহা পায়। ইহা অধ্যাত্মজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান (ইল্‌মে-এলাহী)। এই জ্ঞানের উপকরণ অনুভূতি-যুক্তি-তর্ক বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নহে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্যদর্শন বা সত্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধি (intuition)।

আর কী চাই? সকল জ্ঞানের, সকল তথ্যের ইহা ত সার কথা। সমগ্র দর্শনশাস্ত্রের (Philosophy) বিষয়বস্তুও ত এই। God (আল্লাহ্) Man (মানুষ) এবং Knowledge (ইল্‌ম্), অর্থাৎ স্রষ্টা, মানুষ এবং জ্ঞান-এই তিনটির স্বরূপ ও সম্বন্ধ নির্ণয়ই ত হইতেছে দর্শনের আলোচ্য বিষয়। স্রষ্টা কে, তাঁহার স্বরূপ কী, সৃষ্টি কেমন করিয়া সম্ভব হইল, মানুষ কোথা হইতে আসিল, জ্ঞান কেমন করিয়া জন্মিল, জ্ঞান কয় প্রকারের, কতদূর তাহার সীমা-ইত্যাদি সমস্যার সমাধানই হইতেছে দর্শনশাস্ত্রের প্রাতিপাদ্য বিষয়। বহু বাদানুবাদ ও যুক্তি-তর্কের পর দর্শন আজ এই সত্যে উপনীত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে একজন নিয়ন্তা আছেন, তাঁহারই ইঙ্গিতে বিশ্বজগৎ পরিচালিত হইতেছে, সমস্ত সৃষ্টি তাহা হইতেই আসিয়াছে, মানুষকে তিনিই পয়দা করিয়াছেন এবং জ্ঞান দিয়াছেন। এই জ্ঞান দুই প্রকারের : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

এইবার দেখা যাউক, আল্লাহ্ যাহা বলিতেছেন, আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের সহিত তাহার কতদূর মিল আছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন : নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা তিনি। দর্শন বলিতেছে : এই বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা (Prime Mover) আছেন-যিনি আড়ালে থাকিয়া সমস্ত পরিচালনা করিতেছেন। আল্লাহ্ বলিতেছেন : মানুষকে তিনি একবিন্দু রক্ত-কণিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; দর্শন বলিতেছে প্রোটোপ্লাজম (Protoplasm) নামক সূক্ষ্ম পদার্থ হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ্ বলিতেছেন : দুই প্রকারে মানুষ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, প্রথমত লেখনীর সাহায্যে, দ্বিতীয়ত প্রত্যক্ষভাবে। দর্শন বলিতেছে : জ্ঞান দুই প্রকারের-প্রথম : ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান বা (Reason), দ্বিতীয়ত : প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা Intuition।

আল্লাহ্র বাণী এবং দার্শনিক সত্যের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি? সপ্তসমুদ্র মন্থন করিয়া দর্শন আজ যে-সত্যে উপনীত হইয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা কত সহজে কত অল্প কথায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

অতএব, এখন আমরা বলিতে পারি, সমস্ত মানবীয় জ্ঞানের (human knowledge) সার কথাই হইতেছে :

www.pathagar.com

১. আল্লাহ্ই নিখিল বিশ্বের প্রভু।
২. মানুষকে তিনিই সৃজন করিয়াছেন।
৩. তিনিই মানুষকে সর্ব প্রকার জ্ঞান দান করিয়াছেন।

এই মহাসত্য আল্লাহ্ সর্বপ্রথম তাঁহার রসূলকে চুম্বকে দান করিলেন। আল্লাহ্র যে-কথা বলিবার ছিল যে-বাণী বিশ্ববাসীর প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিবার প্রয়োজন ছিল তাহা এই। বড় কোন কথা নহে, জটিল কোন তথ্য নহে-এই সহজ সরল সত্য প্রকাশই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মহাসত্য চিরদিন এমনই সহজ ও সরল।

হযরত মুহম্মদ এই মহাসত্যের প্রচারক-এই মহাবাণীরই তিনি দূত। সমগ্র কুরআন এই মহাসত্যেরই বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। ইসলাম মানুষকে শুধু এই তিনটি কথাই উপলব্ধি করিতে বলে : সে চায় যে, মানুষ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করুক যে, আল্লাহ্ই নিখিল বিশ্বের একমাত্র প্রভু, মানুষকে তিনিই সৃজন করিয়াছেন এবং যাহাকিছু জ্ঞান তিনিই দিয়াছেন। এই তিনটি সত্য উপলব্ধি করিলেই তাঁহার আর পথ ভুল হইবে না; 'সিরাতাল মুস্তাকিম' (সরল পথ) দিয়াই সে চলিবে এবং অবশেষে তাহার লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবে। মানুষ যদি জানে এবং মানে যে, এই বিশ্বনিখিলের সৃজনকারী, রক্ষাকারী ও ধ্বংসকারী একমাত্র আল্লাহ্-তিনিই আমাদের জীবন-মরণের প্রভু, তিনি ছাড়া আর কেহ আমাদের প্রভু নাই, শরণ নাই; আদি তিনি, অন্ত তিনি, তবে আর সে কেমন করিয়া আল্লাহ্কে ছাড়িয়া অপর কাহারও পূজা করিবে? নতমস্তকে তাহাকে বলিতেই হইবে : প্রভু হে, একমাত্র তুমিই আমাদের 'রব', তুমি ছাড়া আর আমাদের কোন সমস্য নাই, উপাস্য নাই, তোমাকেই আমরা আরাধনা করি, তোমারই নিকট সাহায্য চাহি। তারপর নিজের দিকে তাকাইয়া সে যদি বুঝিতে পারে যে, কত নিঃসহায় আবস্থা হইতে আল্লাহ্ তাহাকে জ্ঞান-বিবেকসম্পন্ন মানুষে পরিণত করিয়াছেন, তবে আল্লাহ্র অসীম করুণা ও কুদ্রতের কথা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার মাথা সেই রহ্মানুর-রাহিম ও রাব্বুল-আলামিনের উদ্দেশ্যে নত না হইয়া পারিবে না। আবার, সে যদি বুঝিতে পারে যে, আল্লাহ্ই সকল জ্ঞানের উৎস এবং সে জ্ঞানলাভ ছাড়া সৃষ্টিলীলার কোন রহস্যই সে বুঝিতে পারিবে না, তবে আল্লাহ্র নামে জ্ঞান সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেই। রাষ্ট্র, সমাজ ও জীবনের অন্যান্য সমস্যা এই তিনটি উপলব্ধি হইতেই আসিবে এবং তাঁহার চিন্তা ও কর্ম নব নব পথে প্রভাবিত হইবেই। আল্লাহ্র সহিত জ্ঞানের সংযোগ সাধিত হইলে সেই জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিবে এবং সেই জ্ঞানই অশেষ, কল্যাণের উৎস হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে, 'ইকরা বিসমি' সূরার এই ক্ষুদ্র অংশটুকু সমস্ত জ্ঞানের সারাংশ। ইসলামের ইহাই মূল সত্য। আল্লাহ্তায়ালা হযরত মুহম্মদের অন্তরে সর্বপ্রথম এই মূল সত্যেরই রেখাপাত করিলেন। কোন লোককে কোন ধর্মে মুরিদ করিতে হইলে পীর যেমন তাহার কর্ণে প্রথম সেই ধর্মের মূল কলেমা (creed) দান করেন এবং পরে একে একে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া মূল বস্তুকে বুঝাইয়া দেন, আল্লাহ্ও তাঁহার প্রিয়নবী মুহম্মদকে লইয়া সেইরূপ করিলেন। মূল সত্য ও লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে আভাস দিয়া তিনি কার্য আরম্ভ করিলেন।

এমন সুন্দর সহজ অথচ গভীর অর্থপূর্ণ সূরাই সর্বপ্রথম ভূমিকাস্বরূপ ধরায় অবতীর্ণ হইল। প্রথম অবতণের উপযুক্ত বাণীই বটে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৮
সত্য—প্রচারের আদেশ

মুহম্মদ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঝড়ের পরে প্রকৃতি যেমন শান্ত হয় তেমনি একটা প্রশান্তি তাঁহার চোখ-মুখে নামিয়া আসিল।

কিছুদিন যাবৎ আর কোন বাণীই অবতীর্ণ হইল না। ইহাতে মুহম্মদ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হয়ত বা কোন ত্রুটি ঘটিয়া গিয়াছে যাহার জন্য আল্লাহ্ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

প্রায় ছয়মাস এইভাবে কাটিয়া গেল। অবশেষে নিরাশা ও অধৈর্যের মাত্রা যখন চরমে উঠিল তখন জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা আবির্ভূত হইয়া হযরতকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন ঃ

"উষার শপথ
এবং অন্ধকার রজনীর শপথ।
তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, কিংবা অসন্তুষ্ট হন
নাই। নিশ্চয়ই তোমার ভবিষ্যৎ তোমার অতীত অপেক্ষা উজ্জ্বল।
এবং শ্রীঘ্রই তোমার প্রভু তোমার উপর এমন কিছু দান করিবেন,
যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।
তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নাই এবং আশ্রয় দান
করেন নাই? এবং তিনি কি তোমাকে পথহারা অবস্থায় দেখেন নাই
এবং তোমাকে সুপথ দেখান নাই?
এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেন নাই এবং অভাবমুক্ত
করেন নাই। অতএব যে অনাথ, তাহাকে তুমি উৎপীড়ন করিও না।
যে ভিক্ষুক, তাহাকে তুমি তিরস্কার করিও না, এবং তোমার প্রভুর
অনুগ্রহের কথা প্রচার কর।" —(সূরা আদ্-দোহা)

কতবড় প্রেরণা এ! মুহম্মদের ব্যাকুল হৃদয় এইবার শান্ত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এই গুরুদায়িত্বভার শীঘ্রই তাঁহার মাথায় নামিতেছে।

মন যখন ভিতরে প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন পুনরায় এই আয়াত নাযিল হইল :

"হে আমার রসুল,
তোমার প্রভু তোমাকে যে সত্য দান করিয়াছেন, তাহা প্রচার কর।"

সব সন্দেহ দূর হইয়া গেল। আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াতেই হযরত মুহম্মদকে সর্বপ্রথম "হে আমার রসুল" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই দিন হইতেই হযরত বুঝিতে পারিলেন, তিনি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র রসুল। জীবনের লক্ষ্য ও গতিপথ এখন তাঁহার সুনির্দিষ্ট হইল। নিশ্চিত হইয়া একনিষ্ঠভাবে তিনি এখন হইতে সত্য প্রচারে ব্রতী হইলেন।

এরপর আর ভয় কী? আর কুণ্ঠা কী? আসুক বাধা, আসুক বিপদ, আসুক অত্যাচার-দুঃখ নাই। জীবন যাইবে? যাউক। আল্লাহ্‌র জন্য না হয় জীবনপাতই বা হইল। তিনি রসুল, তিনি যে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক। এ দৌত্যকার্য তাঁহাকে সমাধা

www.pathagar.com

করিতেই হইবে। যে পয়গাম তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা মানুষের প্রাণের দুয়ারে পৌঁছাইয়া দিতেই হবে, নতুবা তাঁহার 'রসূল' নাম সার্থক হইবে কেন?

মুহম্মদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্যের সুদৃপ্ত ধর্মে আচ্ছাদিত হইয়া বিপুল উদ্যোমে তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন :

"লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"

এইখানে মানবজীবনর একটি নিগূঢ় তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইল। কোন সত্য শুধু উপলব্ধি করিলেই হয় না, সেই সত্যকে বাহিরে প্রচার করিতেও হয়। সত্য তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির বস্তু নহে—প্রচারেরও বস্তু। অপ্রচারিত সত্যের কোন মূল্য নাই। যে-কোন সত্যকে জয়যুক্ত করিতে হইলে তাহার প্রচার বা প্রোপ্যাগাণ্ডা করা দরকার। ' প্রোপ্যাগাণ্ডা' কথাটি আজকাল খারাপ শোনায়, কিন্তু আসলে তাহা নহে। জগতের সমস্ত ধর্মগুরু তাঁহাদের উপলব্ধ সত্যকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, সে সত্যকে বাহিরেও ছড়াইয়া দিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম এইভাবেই প্রচারিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্মের মূলেও আছে পাদ্রীদের ব্যাপক প্রচার। এমন কি বর্তমান যুগে কমিউনিজমের প্রসারও একনিষ্ঠ প্রচারের ফল। কাজেই সত্যের সঙ্গে প্রচারের নিকট–সম্বন্ধ রহিয়াছে। প্রচার না করা পর্যন্ত কোন সত্যই পূর্ণ হয় না। অবশ্য মৌলিক প্রচারণার সঙ্গে সত্যের বাস্তব রূপায়ণও দরকার। সেও ত আর এক প্রচারণা।

এই জন্যই আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে সত্য প্রচারের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, কার্যকরী প্রচারের দ্বারাই ইসলাম জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ: ১৯

সত্যের প্রথম প্রচার

হযরত মুহম্মদের জীবনের এইবার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল। এখন হইতে প্রকাশ্যভাবে তিনি আল্লাহ্র রসুলরূপে আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। সত্য প্রচারই এখন তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়া দাঁড়ইল।

প্রথম প্রচার কোথায় আরম্ভ হইল? কে তাঁহার হস্তে প্রথম বয়েৎ হইলেন? কে তাঁহার এই নূতন সত্য প্রথম বিশ্বাস করিলেন?

সে তাঁহারই আপন সহধর্মিণী বিবি খাদিজা। এই মহীয়সী নারীই ইসলামের সর্বপ্রথম মুরিদ। প্রথম মুসলিমের গৌরব তাই একজন নারীর।

ইহা খুবই স্বাভাবিক হয় নাই কি? খাদিজা অপেক্ষা মুহম্মদকে কে বেশী চিনিতে পারিয়াছেন? কে তাঁহার ভিতর-বাহির এমন সুন্দর করিয়া দেখিয়াছেন? খাদিজা তো দূরের কেহ নহেন, মুহম্মদেরই জীবন-সঙ্গিনী। কাজেই মুহম্মদের অন্তরে যে-সত্য প্রতিভাত হয়, খাদিজাকে তাহা স্পর্শ না করিয়া যায় না। এই জন্য সহজেই তিনি স্বামীর ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। যুক্তি-তর্কের কোনই প্রয়োজন হইল না। সমসূত্রেগ্রথিত বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় একটির সঙ্গে সঙ্গে অপরটিও জ্বলিয়া উঠিল।

বস্তুত ইসলামের জয়যাত্রার পথে খাদিজার দান ও নৈতিক সহযোগিতার তুলনা নাই। চারিপাশে যখন সংশয়, ভয়ভীতি ও নিরাশার অন্ধকার, যখন কোথায়ও কোন বন্ধু নাই, সহায় নাই, সমব্যথী নাই তখন এই নারীই সর্বপ্রথম মুহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিলেন। এইরূপে মুহম্মদের মনোবলকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। সত্যের অভিযানের প্রথম পদক্ষেপেই রসুলুল্লাহ্ তাঁহার আপন স্ত্রীর মধ্যে একজন অকৃত্রিম দোসর খুঁজিয়া পাইলেন। আদর্শ জীবন-সঙ্গিনীর ইহাই ত কতর্ব্য।

পক্ষান্তরে হযরত মুহম্মদ যে আল্লাহ্র সত্য পয়গম্বর, তাঁহার ধর্মমত যে মিথ্যা নহে, কৃত্রিম নহে-ইহার প্রমাণও পাই আমরা বিবি খাদিজারই এই ইসলাম গ্রহণের মধ্যে। স্বামীর মধ্যে কোন শঠতা বা ভণ্ডামি থাকিলে স্ত্রীই তাহা ভাল বুঝিতে পারেন। ভণ্ডামির পরিচয় পাইলে খাদিজার মত তেজস্বিনী ও সত্যপরায়ণা নারী কখনই এত সহজে স্বামীর নূতন ও বিপজ্জনক ধর্মমত গ্রহণ করিতেন না। ইসলামের কঠিন দিনে খাদিজার এই সমর্থন সমগ্র নারী জাতিকে মহিমান্বিত করিয়াছে।

বাহিরে অজ্ঞানতার ঘন-অন্ধকার, সমগ্র দেশ ডুবিয়া আছে সেই অন্ধকারে। তাহারই মাঝখানে শুধু দুইটি নিভৃত হৃদয় নির্জনে একটি সত্যের দীপশিখা আগুলিয়া বসিয়া আছে।

দিন যায়।

ইত্যবসরে জিব্রাইল আসিয়া মুহম্মদকে নামায পড়িবার পদ্ধতি শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা 'সূরা ফাতিহা' তখন অবতীর্ণ হইয়াছে-

'আল্হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন-

"সব গুণগান সেই আল্লাহ্র

www.pathagar.com

যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পরম করুণাময়
যিনি বিচার-দিনের প্রভু
(হে আল্লাহ্) আমরা তোমারই ইবাদৎ করি,
তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।
আমাদিগকে সেই সরল পথ দেখাও।
যে-পথে তোমার অনুগৃহীত প্রিয়জনেরা চলে
নহে তাহাদের পথ-যাহারা অভিশপ্ত ও পথভ্রান্ত।"[১]

গভীর রাত্রে সুললিত কণ্ঠে এই 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করিয়া হযরত বিবি খাদিজার সহিত নামায পড়েন। মক্কা-নগরী তখন বাহিরে ঘুমায়।

একটি বালক লুকাইয়া লুকাইয়া এই পবিত্র দৃশ্য দেখে আর কেবলই চিন্তা করে। কে এই বালক?

ইনি মুহম্মদের পিতৃব্য-পুত্র আলি। আবুতালিবের তিন পুত্র ছিলেন, আলি, জাফর এবং আকিল। পিতৃব্যের অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া খাদিজকে বিবাহ করিবার পর মুহম্মদ আলির লালন-পালনের সম্পূর্ণ ভার লইয়াছিলেন। সেই হইতে আলি মুহম্মদের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন। হযরতের নবুয়ত লাভের সময় আলি একজন বালক মাত্র। বয়স তাঁহার বারো-তেরো।

মুহম্মদ্ ও খাদিজার নূতন উপাসনা-পদ্ধতি দেখিয়া আলি একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন : "আপনারা কাহাকে এমনভাবে সিজ্‌দা (প্রণতি) দেন, ভাইজান?"

মুহম্মদ বলিলেন : "অদ্বিতীয়, লা-শরীক সেই পরমসুন্দর আল্লাহ্‌কে—যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা—যিনি রহমানুর রাহিম—যিনি সর্বশক্তিমান।"

আলি বলিলেন : "আমিও তবে আপনার ধর্ম গ্রহণ করিব। আমাকে নামায পড়া শিখাইয়া দিন।"

মুহম্মদ বলিলেন : "তোমার আব্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

আলি উত্তর দিলেন : "না আল্লাহ্‌র খিদমতের জন্য আব্বাকে জিজ্ঞাসা না করিলেও চলিবে। আল্লাহই যখন আমার স্রষ্টা এবং আমার জীবন-মরণের প্রভু তখন কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমি তাঁহার বন্দেগী করিব।"

আলি বয়েৎ লইলেন। এইরূপে আলিই পুরুষদিগের মধ্যে প্রথম শিষ্য হইবার গৌরব লাভ করিলেন।

বালকের সৎসাহস দেখিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। এই বালক যে কালে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ হইবেন, তখনই তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এদিকে আবুতালিব যখন জানিতে পারিলেন যে, আলি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তিনি আলিকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ?"

---

১ সূরা ফাতিহার অবতরণ-কাল লইয়া কিছু মতভেদ আছে। অধিকাংশ তফসীরকারের মতে অবতরণের ক্রম হিসাবে সূরা ফাতিহা দ্বিতীয় স্থানীয়। অর্থাৎ ইকরা সূরার প্রথমাংশের পরেই সূরা ফাতিহা নাযিল হয়। এই মত সমর্থনযোগ্য।

www.pathagar.com

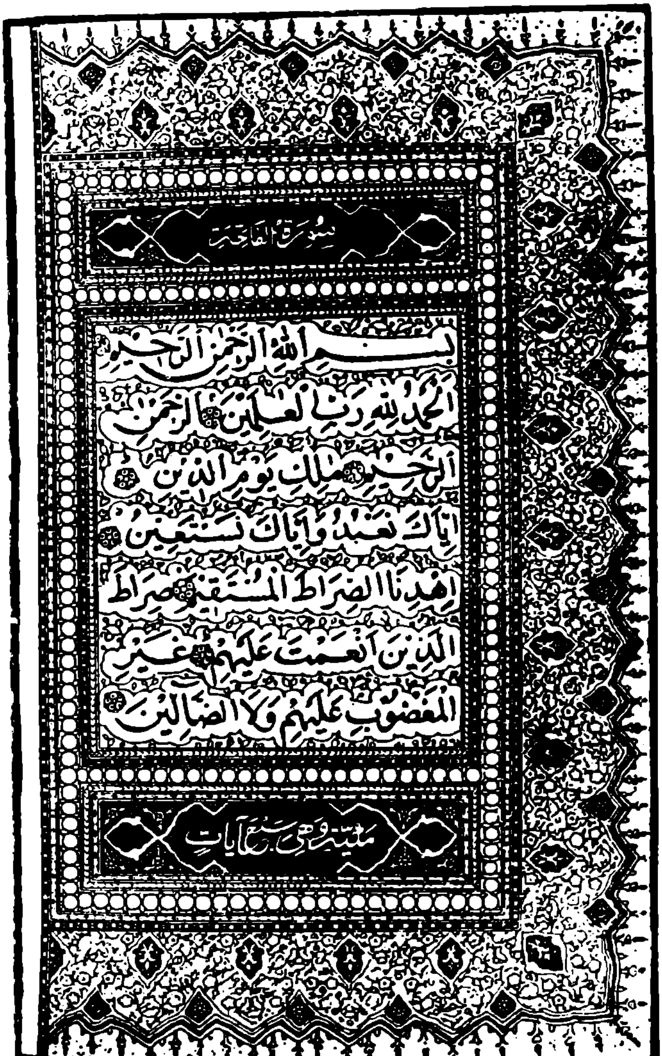

সূরা ফাতিহা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন : "জ্বি হ্যাঁ। এই ধর্মই সত্য বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আব্বা।"

আবুতালিব তখন মুহম্মদের নিকট গিয়া বলিলেন, 'মুহম্মদ বলত, তোমার এই নূতন ধর্মের মর্ম কী?"

মুহম্মদ বলিলেন : "ইহাই আল্লাহ্‌র ধর্ম। যে-ধর্ম আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস্‌সালাম পালন করিতেন, ইহা সেই ধর্ম। লা-শরীক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করাই এই ধর্মের সারকথা। ইহাই ইসলাম।"

"আর তুমি কে?"

"আমি আল্লাহ্‌র রসূল। চাচাজান, আমার বিনীত অনুরোধ আপনিও এই সত্যধর্ম গ্রহণ করুন। বুৎপোরস্তি (মূর্তিপূজা) ছাড়িয়া দিন, উহা মহাপাপ।"

আবুতালিব মুহম্মদকে প্রাণ হইতে ভালবাসিতেন, তাই এই কথাতে তিনি তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইলেন না। একটু কোমল সুরে বলিলেন : "মুহম্মদ আমি জানি, তুমি সত্যবাদী। কিন্তু কি করিয়া পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করি, বল? আমি তাহা পারি না। তবে এই কথা বলিতে পারি, আমি যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন তোমাকে কোরেশদিগের যুলুম ও দাগাবাজি হইতে রক্ষা করিব।"

ইহাই বলিয়া আলিকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস।"

আলি হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হযরতের মুখের দিকে একবার চাহিলেন। হযরত তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "যাও ভাই, চাচাজান বলিতেছেন।"

আলির দিল্ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। একদিকে পিতার আদেশ, অপরদিকে সত্যের আহ্বান। কোন্ দিকে যাইবেন? মুহূর্ত মধ্যে মন স্থির করিয়া তিনি বলিলেন : "আব্বা, বেয়দবী মাফ করিবেন। আল্লাহ্ এবং রসূলের সেবায় এই জীবন সমর্পণ করিয়াছি। এখন আর ফিরিতে পারি না। আপনাকে ছাড়িতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্‌র রসূলকে ছাড়িতে পারি না।"

বালকের কথায় একটা তেজোব্যঞ্জক দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল।

আবুতালিব মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "বেশ, তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, এস না। আমি জানি মুহম্মদ তোমাকে কখনও বিপথে চালিত করিবে না।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কী অদ্ভুত চরিত্র এই আবুতালিবের। যুল্‌মাৎ-রাতে ঘরে তাহার প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই দীপশিখাকে বাহিরের ঝন্‌ঝা হইতে বাঁচাইয়া আপন কক্ষকে সে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু হায়! তাহার আপন হৃদয় যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২০
প্রথম তিন বৎসর

প্রথম তিন বৎসর গোপনে গোপনেই প্রচার-কার্য চলিল। আলির পরে হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তারপর আবুবকর, ওসমান এবং আরও কয়েকজন। মহিলাদিগের মধ্যে আবুবকরের কন্যা আস্‌মাও ওমরের ভগিনী ফাতিমা প্রমুখ প্রথম বয়েৎ গ্রহণ করেন

মুহম্মদ যে একটি নূতন ধর্মমত প্রচার করিতেছিলেন এবং কেহ কেহ যে গোপনে সে ধর্ম গ্রহণও করিয়াছে, মক্কাবাসী কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাহা জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহারা বিচলিত হয় নাই। এমন ধর্মবিপ্লব ত কত আসে, কত যায়। কত কোরেশ খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করিয়াছে, তাহাতে কাবা-মন্দিরের বা আরাধ্য দেব-দেবীদের কতটুকু ক্ষতি হইয়াছে? ধর্মদ্রোহী মুহম্মদ কী করিবে? ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ মুহম্মদের ধর্মমতকে প্রথম প্রথম উপেক্ষা করিয়াই চলিল।

হযরত গোপনে গোপনে ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেশীদিন গোপন প্রচার চলিল না। শীঘ্রই প্রকাশ্য-প্রচারের আদেশ আসিল। মুহম্মদ তখন একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। একদিন তিনি আত্মীয়-স্বজন ও কোরেশ দলপতিদিগকে দাওয়াত দিয়া নিজগৃহে ডাকিয়া আনিলেন। প্রায় চল্লিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইলেন। আহারাদির পর মুহম্মদ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হে আমার দেশবাসী, শ্রবণ করুণ। এক অপূর্ব বেহেশ্‌তী সওগাত আমি আপনাদের জন্য লইয়া আসিয়াছি। আল্লাহ্‌র পাক কালাম আমি লাভ করিয়াছি। আপনারা আর মূর্তিপূজা করিবেন না। একমাত্র আল্লাহ্‌র উপাসনা করুন। বলুন : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্‌'। ইহাই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। এই ধর্ম গ্রহণ করুন ইহকাল ও পরকালে আপনাদের কল্যাণ হইবে। আপনাদের মধ্যে কে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবেন? কে এই সত্য-প্রচারে আমাকে সাহায্য করিবেন? আসুন।"

কোরেশগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মুহম্মদের উপরে মনে মনে তাহারা ভীষণ চটিয়া গেল। মুহম্মদের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় ধৃষ্টতা বলিয়া তাহাদের মনে হইল।

বিখ্যাত কোরেশ নেতা আবু লাহাব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল : "মুহম্মদ ধৃষ্টতা পরিত্যাগ কর। তোমার পূজনীয় পিতৃব্য ও খুল্লতাত ভ্রাতৃগণ এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে বাতুলতা করিও না। তুমি কুলাঙ্গার। তোমার আত্মীয়গণের উচিত যে তোমাকে কয়েদ করিয়া রাখে।"

এই বলিয়া সে একটি শোরগোল পাকাইয়া তুলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তখন বালক আলি সম্মুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : "হে রসুলুল্লাহ্‌ আমি আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি। আল্লাহ্‌র কসম, আজ হইতে আমার এই জীবন আপনার সেবায় নিয়োজিত করিলাম।"

সকলে আলির প্রতি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এতটুকু বালকের বেয়াদবী দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল। আবুতালিবকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিল : "আপনার

www.pathagar.com

ভ্রাতৃষ্পুত্রের কল্যাণে এখন বুঝি আপনাকে এই পুত্ররত্নের আদেশই মানিয়া চলিতে হইবে?" এই বলিয়া সকলে প্রস্থান করিল।

প্রথম দিনের এই ব্যর্থতায় হযরত বিচলিত হইলেন না। দ্বিতীয়বার আহ্বানের জন্য তিনি সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আরবে একটি প্রথা ছিল। বিপদের সময় নগরবাসীকে আহ্বান করিতে হইলে, অথবা কোন বিষয়ে কেহ বিচারপ্রার্থী হইলে, মক্কার সাফা পর্বতের শীর্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে কতিপয় সাঙ্কেতিক শব্দ উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে হইত। সেই সঙ্কেত-ধ্বনি শুনিয়া নাগরিকগণ পর্বতের পাদদেশে আসিয়া সমবেত হইত। সঙ্কেতদাতা তখন তাহার বক্তব্য সকলকে বুঝাইয়া বলিত।

একদিন এক সুন্দর প্রভাতে মুহম্মদ সেই সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া সেইরূপ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোন কিছু বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া একে একে সকলে ছুটিয়া আসিল। তখন মুহম্মদ প্রত্যেক গোত্রের লোকদিগের সম্বোধন করিয়া ঊর্ধ্ব পর্বত-শীর্ষ হইতে বলিতে লাগিলেন : "আজ যদি বলি এই সাফা পর্বতের অন্তরালে একদল প্রবল শত্রু তোমাদিগকে হামলা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তবে কি তোমরা সেই কথা বিশ্বাস করিবে?"

সকলে উত্তর দিল : "নিশ্চয়ই করিব; কারণ, তুমি 'আল-আমিন'। এই পর্যন্ত তোমাকে আমরা কোনদিন মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই।"

মুহম্মদ বলিলেন : "তাই যদি হয়, তবে বিশ্বাস কর-এক মহাবিপদের তোমরা সম্মুখীন হইয়াছ; সত্যই একদল শয়তানী ফৌজ তোমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। আল্লাহ্-বিস্মৃতি ও প্রতিমাপ্রীতি, কাপট্য ও লাম্পট্য, অত্যাচার ও ব্যাভিচার এবং আরও শত প্রকারের পাপ ও মলিনতা তোমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ওরে ধ্বংসপথের যাত্রীদল, হুঁশিয়ার হও, এখনও সময় আছে, এখনও পথ আছে। যদি বাঁচিতে চাও, তবে কাবার দেবমূর্তিগুলি ভাঙিয়া ফেল, উহারাই তোমাদের সেই প্রবল শত্রু। এক-আল্লাহ্‌রা উপাসনা কর, অন্তরকে শুচিসুন্দর কর, তাহা হইলেই দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের মঙ্গল হইবে।"

মুহম্মদের কথা শুনিয়া আবু লাহাব ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল :

"জাহান্নামে যাও হতভাগা! এই জন্যই বুঝি তুমি আমাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছ?"

সকলেই তখন আবু লাহাবের পক্ষ সমর্থন করিল। মুহম্মদকে গালি দিতে দিতে তাহারা চলিয়া গেল।

মুহম্মদের আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না বটে, কিন্তু ঐ আহ্বান বিফলেও গেল না। মক্কার ঘরে-ঘরে পথে-প্রান্তরে সকলের মধ্যেই আল্লাহ্ ও রসুলের নাম আন্দোলিত হইতে লাগিল। বিরোধ ও অস্বীকৃতির মধ্য দিয়াই ইসলামের বাণী কোরেশদের অন্তর্লোকে অনুপ্রবেশ করিল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২১
সংঘর্ষের সূচনা

মুহম্মদ এতদিন বাহিরেই প্রচার করিতেছিলেন। এইবার কাবাগৃহের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। 'আল্লাহ্‌র ঘর' হইতে আল্লাহ্‌ নির্বাসিত হইয়াছেন, আর সেই ঘরে আজ বিরাজ করিতেছে কল্পিত দেব-দেবীর পাষাণ-প্রতিমা। হযরত তাই 'আল্লাহ্‌র ঘরে' আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। একদিন তিনি কাবা-গৃহে প্রবেশ করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিলেন : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ"। সমস্ত কাবা-গৃহ সেই মহাসত্যের কল-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। দেবমূর্তিগুলি যেন থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

ব্যাপারটা বুঝিয়া দলে দলে কোরেশগণ ছুটিয়া আসিল। মুহম্মদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন : "হে কোরেশগণ, এই দেবমূর্তিগুলি ভাঙিয়া ফেল, আল্লাহ্‌র উপাসনা কর। একমাত্র তিনি ছাড়া আমাদের আর কেহ উপাস্য নাই, আর কেহ সাহায্যকারী নাই।"

শুনিয়া কোরেশগণ একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দেব-দেবীদিগের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাদের এমন বেইজ্জতী-এমন অপমান! মুহম্মদের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস ত কম নহে! সকলে মুহম্মদকে গালাগালি দিতে লাগিল এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য উদ্যত হইল। ইহা দেখিয়া বিবি খাদিজার পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র তরুণ যুবক হারিস বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কোরেশগণ তখন তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। ফলে এই তরুণ যুবকটি সেইখানে শহীদ হইলেন।

সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংঘর্ষ এইখান হইতেই আরম্ভ হইল। প্রথম দিনেই একজন মুসলিম তরুণ রক্ত দান করিলেন। শহীদের পুণ্যরক্তে গোসল করিয়া শিশু-ইসলাম অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কোরেশগণ এইবার সংঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আবু লাহাব, আবু যহল, আবু সুফিয়ান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাহাদিগের অধিনায়ক হইল।

মুহম্মদ কিন্তু কোন বাধা-বিঘ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অটল অচলভাবে তৌহিদের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন।

মুহম্মদের প্রতি কোরেশদিগের আক্রোশ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহারা একদিন আবুতালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :

"হে আবুতালিব, আপনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়। কিন্তু আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে আমাদের মধ্যে শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আপনার নিজের মত কী তাহাও আমরা ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের আচরণ কি আপনি সমর্থন করেন? তাহার সম্বন্ধে পূর্বেই আপনাকে বলিয়াছি কিন্তু আপনি কোনই প্রতিকার করেন নাই। আজ আবার বলিতেছি, আপনি যদি তাহাকে নিবৃত্ত না করেন, তবে আপনাকেও আমরা মুহম্মদের সঙ্গী বলিয়া মনে করিব এবং নিজেরাই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব।"

www.pathagar.com

কোরেশ দলপতিদিগের ভীতি-প্রদর্শনে আবু তালিব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তাহাদের সম্মুখেই মুহম্মদকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন : "মুহম্মদ, তোমার এই নূতন ধর্ম পরিত্যাগ কর। অনর্থক আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দা করিও না। ইহাতে খামখা দুশ্‌মনি বাড়িবে বৈ ত নহে?"

তদুত্তরে মুহম্মদ বলিলেন : "দুশ্‌মনির জন্য আমি ভয় করি না, চাচাজান। শুধু কোরেশ কেন, সমগ্র জগৎ যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবু আমি আমার সত্য প্রচারে বিরত হইব না। আমি ত ইচ্ছা করিয়া আপনাদের দেব-দেবীর নিন্দা করি না। ইসলাম প্রচার করিতে গেলেই দেব-দেবীকে মিথ্যা না বলিয়া উপায় থাকে না। তৌহিদের অর্থই হইল দেব-দেবীর অস্বীকার। কাজেই বাধ্য হইয়া দেব-দেবীকে মিথ্যা বলিতেই হয়। আপনারা ভাবিতেছেন, আমি আপনাদের দুশ্‌মন। কিন্তু আমি দুশ্‌মন নই, আমি আপনাদের দোস্ত। আমার কথা শুনুন, ইসলাম কবুল করুন, আপনাদের মঙ্গল হইবে।"

কোরেশগণ এই কথায় আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা মুহম্মদকে নানারূপ ভয় দেখাইয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু মুহম্মদ বিচলিত হইল না। যথারীতি তৌহিদ প্রচার করিয়া চলিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

কিছুদিন পরে কোরেশ প্রধানগণ আর একদিন আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্বের ন্যায় অভিযোগ করিল। আবু তালিব পুনরায় মুহম্মদকে ডাকিয়া বলিলেন : "বাবা, আমি যে ভার বহিতে পারি না, তাহা আমার ঘাড়ে চাপাইও না।"

মুহম্মদ বুঝিলেন, তাঁহার পার্থিব জীবনের প্রধান অবলম্বন আবু তালিবও বুঝি তাঁহাকে ছাড়িয়া যান। কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? দৃঢ়কণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন : "চাচাজান, আপনারা সবাই যদি আমাকে ত্যাগ করেন তাহাতেও আমি ভীত হইব না। আমি আমার সত্য প্রচার করিবই।"

কোরেশদিগের ক্রোধের মাত্রা এবার চরমে উঠিল একবাক্যে তাহারা বলিয়া উঠিল, "মুহম্মদ, সাবধান! যদি বেশী বাড়াবাড়ি কর, তোমাকে খুন করিয়া ফেলিব।"

মুহম্মদের অমঙ্গল আশঙ্কায় আবু তালিবের দুর্বলতা কাটিয়া গেল। তিনি কোরেশ দলপতিদিগকে বলিতে লাগিলেন : "থামো! উত্তেজিত হইও না। তোমরা এক সময়ে মুহম্মদকে 'আল-আমিন' উপাধি দিয়াছিলে। আজ কেন তবে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?"

অনেক বাদানুবাদের পর কোরেশগণ সেদিনকার মত প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেলে আবু তালিব মুহম্মদকে বলিলেন : "আল্লাহ্‌র কসম আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। তোমার কর্তব্য তুমি করিয়া যাও।"

মুহম্মদ খুশী হইয়া বলিলেন : "তবে কেন আপনি ইসলাম কবুল করিতেছেন না, চাচাজান? বলুন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-"

আবু তালিব বাধা দিয়া বলিলেন : "থাক্ থাক্ সে পরে হইবে।"

মুহম্মদকে কিছুতেই নিরস্ত করিতে না পারিয়া কোরেশগণ এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। একদিন তাহারা ওমারা-বিন-অলিদ নামক একটি সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল : "এই ধনবান

www.pathagar.com

খুবসুরৎ যুবকটিকে আপনি গ্রহণ করুন, আর ইহার বিনিময়ে মুহম্মদকে আমাদের হস্তে দিন, আমরা তাহাকে খুন করিব।”

আবু তালিব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন, “হুঁশিয়ার হইয়া কথা বলিও। আবুতালিব এত নীচ নহে যে, তুচ্ছ ধনসম্পদের লোভে মুহম্মদকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করিবে।”

কোরেশগণ ভয় দেখাইতে দেখাইতে চলিয়া গেল। আবুতালিব তৎক্ষণাৎ হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সকলকে ডাকিয়া এই বিপদের কথা বলিলেন। সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহারা মুহম্মদকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বেশী বাড়াবাড়ি করিলে তাঁহারাও যে কোরেশ নেতাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন, একথা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২২
উৎপীড়ন

এইবার সত্যসত্যই উৎপীড়ন আরম্ভ হইল। প্রথমেই হযরতের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হইবে না ভাবিয়া কোরেশগণ হযরতের শিষ্যদিগের উপর অত্যাচার করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু ইসলামের কী অপূর্ব প্রাণশক্তি! নিষ্পেষণের মাত্রা যতই বাড়িতে লাগিল, ভিতর হইতে ততই সে শক্তিশালী হইতে লাগিল। আগুনকে আঘাত করিলে সে যেমন আরও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, আঘাত খাইয়া ইসলামও ঠিক তেমনিভাবে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময়ে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মোট সংখ্যা ৪০-এর বেশী হইবে না। এই মুষ্টিমেয় নও-মুসলিমদিগের ঈমানের তেজ দেখিলে সত্যই মুগ্ধ হইতে হয়। একে ত নূতন ধর্ম, তাহাতে আবার প্রচলিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহার পশ্চাতে না ছিল কোন রাজশক্তি না ছিল কোন বল-প্রয়োগ, না ছিল কোন আকর্ষণ, না ছিল কোন প্রলোভন। পক্ষান্তরে পদে পদে ছিল লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অপমান-নির্যাতন, ধনহানি ও প্রাণহানির আশঙ্কা। এই সমস্ত জানিয়া শুনিয়াই এই শিষ্যগণ একে একে দিনে দিনে মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠক, চিন্তা করুন, অন্তর-তলে কতখানি সত্যাগ্রহ জাগিলে এমনটি সম্ভব হয়। বিপদে ভয় নাই, উৎপীড়নে দুঃখ নাই, জীবনদানে কুণ্ঠা নাই-এমনি জিন্দাদিল্ কতিপয় লোক বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এক একজন করিয়া দিনে দিনে হযরতকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শুধু পুরুষ নহে নারীরাও এই কঠিন পথে পা বাড়াইল। যুগসঞ্চিত সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের মোহ এড়াইয়া এইরূপ বিপদসঙ্কুল নূতন পথে নিঃসঙ্গ অবস্থায় চলিবার সৎসাহস কয়জন রাখে? সত্যের জন্য এমন আত্মোৎসর্গ, এমন যথাসর্বস্ব ত্যাগ জগতের ইতিহাসে বাস্তবিকই বিরল। প্রাথমিক যুগের এই শিষ্যবৃন্দকে দেখিলে মনে হয়, ইঁহারা যেন এক একটি হীরক খণ্ড—ঈমানে অটল, চরিত্রে উজ্জ্বল! ইঁহারা ভাঙিয়া পড়েন, নত হন না। এতখানি চরিত্রবল ছিল বলিয়াই ত এই ভক্তদলের প্রত্যেকেই ইসলামের ইতিহাসে এমন অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কোরেশগণ নও-মুসলিমদিগের প্রতি কিরূপ অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হইতেই পাঠক তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন :

১. সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে আমাদের বেলালের কথা। বেলাল ছিলেন একজন কাফ্রী ক্রীতদাস। দেখিতে তিনি অত্যন্ত কৃষ্ণকায় ও কদাকার ছিলেন। কিন্তু হইলে কি হয়! বাহিরটা তাঁহার কালো হইলেও ভিতরটা যে আলোয় আলোময়! কালো কয়লার খনির তলে যেমন করিয়া উজ্জ্বল হীরক-খণ্ড লুকাইয়া থাকে, বেলালের কুৎসিত দেহের মধ্যে তেমনি ছিল একটি সুন্দর জ্যোতির্ময় আত্মা!

বেলালের প্রভুর নাম ছিল উমাইয়া। বেলাল গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিশিদিন আল্লাহ্র গুণগান করিতেন। এই কথা জানিতে পারিয়া উমাইয়া একেবারে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত হইয়া উঠিল। বেলালকে তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আনিয়া মারিতে মারিতে বলিতে লাগিল : "যদি ভাল চাস ত এখনি মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর"। কিন্তু বেলাল

www.pathagar.com

কিছুতেই রাযী হইলেন না। অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলিল, বেলাল কিন্তু একেবারেই অনমনীয়।

তখন উমাইয়া এক অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থা করিল। বেলালের গলায় দড়ি বাঁধিয়া পশুর মত টানা-হেঁচড়া করিবার জন্য তাঁহাকে মক্কার বালকদিগের হস্তে সমর্পণ করা হইল। বালকেরা প্রত্যহ তাহাকে রাজপথে টানিয়া লইয়া বেড়াইত এবং নানাভাবে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন করিত। তারপর সন্ধ্যার সময় অর্ধমৃত অবস্থায় উমাইয়ার বাড়িতে রাখিয়া আসিত। উমাইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেলালকে জিজ্ঞাসা করিত : "কেমন, এখনো মুহম্মদের ধর্ম পালন করিবার সাধ আছে নাকি?"

বেলাল নির্ভীক চিত্তে উত্তর দিতেন : "জীবন থাকিতে এই ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পরিবনা"।

বেলালকে কিছুতেই যখন নিরস্ত করা গেল না, তখন উমাইয়া অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। বেলালকে হাত-পা বাঁধিয়া মধ্যাহ্ন-সূর্যের প্রখর অপদগ্ধ মরুবালুকার উপরে চিৎ করিয়া শোওয়াইয়া দেওয়া হইল এবং যাহাতে সে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে পাষণ্ডেরা তাঁহার বুকের উপর এক প্রকাণ্ড পাথর চাপাইয়া দিল। এই অবস্থায় উমাইয়া তাঁহাকে শাসাইয়া বলিল, "বেলাল যদি ভাল চাও তবে এখনও মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর।" কিন্তু বেলাল প্রশান্ত মুখে উত্তর দিলেন : "আহাদুন। আহাদুন। এক-সেই অদ্বিতীয় এক!"

বেলালকে কখনও বা অনাহারে রাখা হইত। সারাদিন ক্ষুধার যন্ত্রণায় বেলাল যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন উমাইয়া তাঁহাকে চাবুক মারিতে মারিতে বলিত : "কেমন, এখনও মুসলমান হবার সাধ আছে তোমার?"

বেলালের মুখে সেই একই বাণী : আহাদুন! আহাদুন!

কী পবিত্র দৃশ্য এ! ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বেত্রাঘাতে দেহ জর্জরিত, শোণিত ধারায় সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত; অথচ তার মধ্য হইতে ঝঙ্কৃত হইতেছে শুধু সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র জয় ঘোষণা।

কিছুদিন এইরূপে কাটিয়া গেল। তারপর নামিল আল্লাহ্‌র করুণা। আবু বকরের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। বেলালের দুর্দশার কথা জানিতে পারিয়া তিনি বহু অর্থের বিনিময়ে অতি কষ্টে উমাইয়ার নিকট হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

এই বেলাল-এই কাফ্রী বেলালই-মুসলিম জগতের প্রথম মুয়াজ্জিন। ইহারই কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাইয়াছি তৌহিদের অগ্নিবাণী : "আল্লাহ আকবর"।

মুসলিম জগতের প্রবলপ্রতাপান্বিত খলিফা হযরত ওমর পরবর্তীকালে এই বেলাল সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : "আমাদের হযরত আবুবকর আমাদের হযরত বেলালকে মুক্ত করিয়াছিলেন"।

মানুষ মানুষকে ইহা হইতে বেশী শ্রদ্ধা দেখাইতে পারে না।

২. ইয়াসির এবং তাঁহার স্ত্রী সুমাঈয়া ও পুত্র আম্বরের উপরেও কোরেশ পশুগণ অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছিল। ইয়াসিরের দুই পায়ে দুইটি দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়ির প্রান্তদ্বয় দুইটি উটের পায়ের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়া বিপরীত দিকে উট তাড়না করা হইল। ফলে ইয়াসিরের দেহ চিরিয়া দুই-টুকরা হইয়া গেল; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। আম্বরকেও প্রহার করিতে করিতে অচেতন

www.pathagar.com

করিয়া ফেলা হইল। ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও বিবি সুমাঈয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তিনি পূর্ববৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" কলেমা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। পাষণ্ড আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বিবি সুমাঈয়াকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। নারীদিগের মধ্যে বিবি সুমাঈয়া প্রথম শহীদ।

৩. ওসমান ছিলেন বুনিয়াদী ঘরের ছেলে। ইঁহার সহিত হযরত আপন এক কন্যাকে বিবাহ দিয়াছিলেন এবং কালে ইঁনিই তৃতীয় খলিফারূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এই ওসমানও যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন, তখন কোরেশগণ একেবারে হিংস্র পশুর ন্যায় ক্ষেপিয়া গেল। ওসমানের পিতৃব্যের সহিত যোগ দিয়া তাহারা ওসমানকে হাত-পা বাঁধিয়া প্রত্যহ নির্মমভাবে প্রহার করিত। ওসমান আল্লাহ্‌র নামে সমস্তই সহ্য করিতেন।

৪. খাব্বার নামক একজন ভক্তকে কোরেশগণ জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শোওয়াইয়া দিয়া তাঁহার বুকে পা দিয়া চাপিয়া রাখিত। এই ধরনের আরও বহু অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইত। খাব্বারের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু চিরদিনের মত তাঁহার পৃষ্ঠে ধবল কুষ্ঠের মত সাদা দাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

৫. জেন্নিরা নাম্নী এক মুসলিম নারীর উপর এমন অত্যাচার করা হইয়াছিল যে, চিরদিনের জন্য তাঁহার চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

৬. শোয়েব নামক আর একজন ভক্ত ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। বহু রকম অত্যাচারের পর কোরেশগণ বলিল : "তোমার ঘর-বাড়ী, বিষয়-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সব যদি পরিত্যাগ করিয়া দেশত্যাগী হইতে পার, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি"। শোয়েব তাহাতেই রাযী হইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন : "এইসব বিষয়-সম্পত্তি আল্লাহ্‌র রসূলের।

নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের উপর কোরেশগণ এমনই শয়তানি যুলুম আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য! অনন্ত জীবনের সন্ধান পাইয়া ভক্তবৃন্দ এই তুচ্ছ জীবনের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হযরত নীরবে সমস্তই দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। কী আর করিবেন? আল্লাহর নামে ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার জন্য তিনি সকলকেই উপদেশ দিলেন। বিপদের ইহাই যে শেষ নহে, ইহাই যে আরম্ভ, এই কথা তিনি পরিষ্কারভাবে শিষ্যদিগকে বুঝাইয়া দিলেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোরেশদিগের উপর তিনি একটুও ক্রুদ্ধ হইলেন না। তিনি জানিতেন, উহারা ক্রোধের পাত্র নহে, কৃপার পাত্র।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৩
"–এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে"

পাঁচটি বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। হযরত আপন শিষ্যদিগের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কোরেশদিগের ভক্তগণ আদৌ ধর্মকর্ম পালন করিতে পারেন না, প্রকাশ্যভাবে কুরআন পাঠ করিতে পারেন না, নামায পড়িতে পারেন না। এমনই তাঁহাদের দুর্দশা। সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া তাই হযরত স্থির করিলেন : অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

এই সময়ে আবিসিনিয়ার খ্রীষ্টান সম্রাট নাজ্জাশী অতিশয় ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কাবাসীগণ কোন কোন সময় আবিসিনিয়ায় গমন করিতেন, এই কারণে এই দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু খবর রাখিতেন। এই আবিসিনিয়া দেশেই একদল উৎপীড়িত শিষ্যকে পাঠাইয়া দেওয়া হযরত সঙ্গত মনে করিলেন।

পাছে এই দেশান্তরের কথা জানিতে পারিয়া কোরেশগণ একটা অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কায় গোপনে গোপনে সমস্ত আয়োজন করা হইল। দশজন পুরুষ ও চারিজন নারী ঘর–বাড়ী, আত্মীয়–স্বজন, স্বদেশ ও স্বজাতিকে ছাড়িয়া দুর্গম অজানা দেশে হিযরত করিলেন।

নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রথম দলে ছিলেন :

ওসমান ও তাঁহার স্ত্রী রোকাইয়া (রসুলুল্লাহ্‌র কন্যা), আবু হোজাইফা ও তাঁহার স্ত্রী সাহলা, আবু সালমা ও তাঁহার স্ত্রী উম্মে সালমা, আমর–বিন–রাবিয়া ও তাঁহার স্ত্রী লায়লা।

পাঠক মনে করিতে পারেন, যাঁহাদের সাহায্য করিবার কেহই ছিল না, তাঁহারাই বুঝি এমন করিয়া দেশত্যাগী হইলেন কিন্তু তাহা মোটেই নহে। চৌদ্দজন নর–নারীর মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং সঙ্গতিসম্পন্ন। হযরতের কন্যা রোকাইয়া ও তাঁহার স্বামী ওসমানও এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, শরীফ ও অবস্থাপন্ন ঘরের নর–নারীও কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পায় নাই। পক্ষান্তরে বেলাল, আম্বর প্রভৃতি যাঁহারা সর্বাপেক্ষা নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা হযরতকে একা ফেলিয়া কিছুতেই দেশ ত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। বস্তুত যাঁহারা দেশত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা করেন নাই, তাঁহাদের কেহই মহত্ত্ব ও ত্যাগ কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সমস্ত ছাড়িয়া অজানা দেশে প্রস্থানের মধ্যে যেমন ধর্মানুরাগ, সৎসাহস, ত্যাগ ও মহত্ত্বও ছিল, সমস্ত বিপদকে বরণ করিয়া হযরতের পাশে দাঁড়াইয়া থাকিবার মধ্যেও ছিল তেমনি আল্লাহ্‌ ও রসূলের প্রতি অপূর্ব ভক্তি, সত্যাগ্র ও চরিত্রবল।

যাহা হউক, কোরেশগণ যখন জানিতে পারিল যে, কতিপয় শিকার তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা হিংস্র হইয়া উঠিল। পলাতক মুসলিমদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তাহারা একদল লোককে জেদ্দা বন্দরের দিকে প্রেরণ

www.pathagar.com

করিল। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, কোরেশদিগের লোকজন জেদ্দায় পৌঁছিয়াই শুনিল, একটু পূর্বেই আবিসিনিয়ার জাহাজ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া কোরেশদিগকে এই নিরাশার সংবাদ দিল। পরাজয়ের কলঙ্ক ও গ্লানিতে তাহারা তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কেমন করিয়া তাহারা ইহার প্রতিশোধ লইবে, ভাবিতে লাগিল।

নও-মুসলিমগণ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় উপনীত হইলেন। নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে আদর করিয়া নিজ রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি দিলেন। নির্বিঘ্নে তাঁহারা সেখানে ধর্মকর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে হযরতের আদেশে আলির ভ্রাতা জাফরের অধীনে আরও ৮৩ জন মুসলিম নরনারী আবিসিনিয়ায় হিযরত করিলেন।

হযরতের শিষ্যগণ এইভাবে নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কোরেশ দলপতিগণ বিচলিত হইল। তাহারা তখন পরামর্শ করিয়া দুইজন প্রতিনিধিকে নাজ্জাশীর নিকট পাঠাইতে মনস্থ করিল। উদ্দেশ্য : ফেরারী আসামীরূপে মুসলমানদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে জব্দ করা। আব্দুল্লাহ্-ইব্‌নে-আবু রাবিয়া এবং আমর-বিন্-আ'স নামক দুইজন বিচক্ষণ লোক এই কার্যের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইল।

কোরেশগণ নাজ্জাশী ও তাঁহার সভাসদবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানাবিধ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাইয়া দিল। প্রতিনিধিদ্বয় আবিসিনিয়ায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সভাসদবর্গকে সেইসব উপহার দিয়া বশীভূত করিয়া ফেলিল। তাহারা তাহাদিগকে বুঝাইল যে পলাতক মক্কাবাসীরা তাহাদেরই লোক; না বলিয়া তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে; লোকগুলি ভীষণ বদমায়েশ; উহাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্যই এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহারা আবিসিনিয়ায় আসিয়াছে। অতএব দয়া করিয়া যেন লোকগুলিকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

পরিষদবর্গ কোরেশ প্রতিনিধিদিগের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন এবং তাহাদের জন্য সম্রাটের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে কোরেশদূতগণ রাজদরবারে হাজির হইয়া সম্রাটকে উপঢৌকনাদি প্রদান করিল সম্রাট খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : তোমরা কেন আসিয়াছ"।

আবদুল্লাহ্ এবং আমর বলিল : "জাঁহাপনা আমাদের নেতৃবৃন্দ আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের দেশের কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ধর্মদ্রোহী নরনারী আপনার রাজ্যে পলাইয়া আসিয়াছে। তাহারা পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এক অদ্ভুত নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। উহা না আমাদের ধর্ম, না আপনাদের ধর্ম। কাজেই উহাদের আত্মীয়-স্বজন ও মনিবগণ আমাদিগকে হুজুরের নিকট পাঠাইয়াছেন দয়া করিয়া উহাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করুন"।

একথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদবর্গ বলিয়া উঠিলেন ঃ "হাঁ, হাঁ, এই প্রার্থনা খুবই সঙ্গত বটে"। নাজ্জাশী কিন্তু এই কথা সমর্থন করিতে পারিলেন না। বলিলেন : "অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনিয়া আমি হুকুম দিতে পারি না। লোকগুলিকে দরবারে হাজির কর।"

www.pathagar.com

আদেশক্রমে মুসলমানগণ রাজদরবারে হাজির হইলেন। তখন নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে বলিলেন : "তোমরা কোন ধর্ম পালন কর?"

মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে জাফর উত্তর দিলেন : "ইসলাম"।

"এই ধর্মের ব্যাখ্যা কী?"

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্"-ইহাই হইতেছে এই ধর্মের মূল কলেমা। আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া আমরা এতদিন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করিতাম। আমাদের মন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পূর্ণ ছিল। নানা পাপ কাজে আমরা লিপ্ত ছিলাম। ঠিক এই দুর্দিনে আল্লাহ্‌র রসুল মুহম্মদ আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন। তিনিই আমাদের পথ প্রদর্শক। আল্লাহ্‌র পাক-কালাম তিনি লাভ করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এক-আল্লাহ্‌র ইবাদৎ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে মনকে পবিত্র রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, সত্যাশ্রয়ী ও পরোপকারী হইতে বলিয়াছেন, বিধর্মীদিগের সহিত শান্তিতে বাস করিতে বলিয়াছেন; আর্ত, পীড়িত ও ব্যথিতকে সেবা করিতে বলিয়াছেন, মানুষকে ঘৃণা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহাই আমাদের ধর্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এই পবিত্র ধর্ম আমরা গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও কোরেশ দলপতিগণ আমাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছেন। আমরা তিষ্টিতে না পারিয়া দেশত্যাগী হইয়াছি। বাদশা নামদারের ন্যায় বিচারের কথা শুনিয়া স্বয়ং হযরত মুহম্মদ আমাদিগকে আপনার রাজ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া গিয়া পুনরায় অত্যচার করিবার মানসেই এই কোরেশ দূতগণ আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। শাহিনশাহ্ যদি ইহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন, তবে এবার আর আমাদের রক্ষা নাই। হে সম্রাট, আমরা আপনার অনুগত ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

জাফরের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। সম্রাট বলিলেন : "তোমাদের নবী যে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছেন তাহার কোন অংশ আমাকে শুনাইতে পার?"

জাফর তখন যিশুখ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতা মরিয়ম সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলি সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিলেন।[১] সম্রাট মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে বলিলেন : "যিশুখ্রীষ্টের বাণী যেখান হইতে আসিয়াছে এই বাণীও ঠিক সেইখান হইতেই আসিয়াছে। কোরেশদূতগণ, তোমরা চলিয়া যাও, তোমাদের প্রার্থনা না-মঞ্জুর।"

কোরেশ প্রতিনিধিগণ বিমর্ষ হইয়া সেদিনকার মত রাজসভা পরিত্যাগ করিল। পরদিন পুনরায় তাহারা সম্রাটের নিকট আসিয়া বলিল : "সম্রাট এই নূতন ধর্মাবলম্বীরা যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে অত্যন্ত জঘন্য ধারণা পোষণ করে, তাহারা যিশুকে 'খোদার বেটা' বলিয়া স্বীকার করে না। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন।"

পুনরায় মুসলমানদিগকে ডাকিয়া পাঠান হইল। এইবার তাহারা বিপদ গনিলেন। যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে যে-মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, খ্রীষ্টান মতের সহিত তাহার ঘোর বিরোধ। এই কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁহার সভাসদবর্গ যে আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদিগের উপর বিরূপ হইয়া পড়িবে, অত্যন্ত

---

[১] দেখুন : সূরা মরিয়ম, -২ রুকু।

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবেই এই আশঙ্কা তাঁহারা করিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌ও রাসূলের নামে যাঁহারা দেশত্যাগী হইয়াছেন সত্যের জন্য যাঁহারা নিজেদের কুরবান করিয়া দিয়াছেন, তাহারা কি সত্যের অপলাপ করিতে পারেন? নির্ভীক চিত্তে জাফর দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন : "হে সম্রাট, আমাদের পয়গম্বর যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, আমরা তাহাই বিশ্বাস করি। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন না। তিনি বলিয়াছেন : যিশু খ্রীষ্ট আল্লাহ্‌র পুত্র নহেন, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহারই মত আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁহারই মত আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন নবী। বিবি মরিয়মের নিকট তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।"[২]

নাজ্জাশী তখন সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন : "শুনিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের ধর্মে এবং তোমাদের ধর্মে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তোমরা নির্বিঘ্নে এখানে বাস করিতে থাক। তোমাদের কোন ভয় নাই"।

কোরেশ দূতগণের শেষ প্রচেষ্টাও এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। হতাশ প্রাণে তাহারা আবিসিনিয়া ত্যাগ করিল।

এশিয়া ছাড়িয়া এইরূপে আফ্রিকা মহাদেশের মরুভূমির মধ্যে ইসলামের জ্যোতি ছড়াইয়া পড়িল।

---

২ দেখুন : কুরআন : ৫ : ৭২—৭৫ : ১১৬—১১৮

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৪
প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল

কোরেশ প্রতিনিধিগণ আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজেদের ব্যর্থতার কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন কোরেশ দলপতিদিগের মাথায় যেন বজ্রঘাত হইল। ক্ষোভে, দুঃখে ও অপমানে তাহারা একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। দ্বিগুণ উৎসাহে আবার তাহারা অত্যাচারের পালা শুরু করিল।

এইবার স্বয়ং হযরত মুহম্মদের উপরেই তাহাদের সমস্ত ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইল। তাঁহাকেই ভালরূপে শিক্ষা দিবার জন্য কোরেশগণ পণ করিল।

কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়া এইবার আরম্ভ হইল। গরল সমুদ্র মন্থর করিতে গিয়া অমৃত উঠিল।

একদিন হযত সাফা পর্বতের নিভৃত গুহায় বসিয়া ধ্যানমগ্ন আছেন, এমন সময় আবুযহল গিয়া সেখানে উপস্থিত। প্রথমে সে হযরতকে নানারূপ গালাগালি দিতে লাগিল, কিন্তু হযরত তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন সে তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে নানা কুৎসা আরম্ভ করিল। ইহাতেও হযরতের কিছুমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল না। তখন নরাধম একখণ্ড প্রস্তর ছুঁড়িয়া হযরতের মস্তকে আঘাত করিল। আঘাতের ফলে দর দর করিয়া লোহু ঝরিতে লাগিল। সেই রক্তে দেহ রঞ্জিত হইয়া গেল। কিন্তু তখনও সেই পবিত্র মুখে এতটুকু ক্রোধ বা অভিশাপের চিহ্ন নাই। শোণিতসিক্ত দেহে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিলেন না।

একজন ক্রীতদাসী দূরে দাঁড়াইয়া এই ঘটনা দেখিতে পাইয়াছিল। সে আসিয়া হামজার নিকটে বলিয়া দিল।

হযরতের অন্যতম পিতৃব্য বীরকেশরী হামজা তখন মৃগয়া হইতে সবেমাত্র ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "কী! এত বড় স্পর্ধা! মুহম্মদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র কাহার কী ক্ষতি করিয়াছে? কী অপরাধ করিয়াছে? মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া এক-আল্লাহ্‌র ইবাদৎ করিতে বলা কি এতই অপরাধের কাজ? না হয় সে একটা নূতন ধর্মই প্রচার করিতেছে, তাই বলিয়া সে ত জোর করিয়া কাহারও উপর সে-ধর্ম চাপাইয়া দিতেছে না। সে শুধু প্রচার করিয়া যাইতেছে মাত্র। ইহার জন্য এত অত্যাচার? এত যুলুম? আমি নিজে না হয় তাঁহার ধর্মমত না-ই গ্রহণ করিয়াছি, তাই বলিয়া কি অপরে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিবে, আর আমি নীরবে সহ্য করিব? কখনই না।" বলিতে বলিতে তিনি সেই বেশেই বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

আবুযহল তখন কাবা-মন্দিরে বসিয়া অন্যান্য কোরেশদিগের সহিত এই প্রস্তর-নিক্ষেপ ব্যাপার লইয়া বেশ খানিক কৌতুক করিতেছিল; এমন সময় হামজা গিয়া সেখানে উপস্থিত। আবুযহলকে দেখিতে পাইয়া হামজা ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিয়া তাহার উপর আপতিত হইলেন এবং স্বীয় স্কন্ধ-বিলম্বিত ধনুক দ্বারা তাহার মস্তকে ভীষণভাবে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন : "শয়তান, মুহম্মদের গায়ে হাত দিয়াছিস? জানিস না, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র?"

www.pathagar.com

আবু যহল বিপদ গণিল। ভীতকণ্ঠে বলিল : "ধর্মের জন্য একাজ করিয়াছি।"

হামজা উত্তরা দিল : "ধর্মের জন্য? তবে শোন, আজ হইতে আমিও মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্!"

আবু যহল স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হামজার মত বীর মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিল? কোরেশদিগের পক্ষে এ যে মস্ত বড় পরাজয় ও দুর্ভাবনার কথা!

আবু যহলের দুর্দশা দেখিয়া তাহার পক্ষের অন্যান্য লোকজন ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আবু যহল দেখিল, এখন যদি একটা খুন-খারাবি হইয়া যায়, তবে তাহার পরিণাম ফল শুভ হইবে না। হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলে অনেকেই বিগড়াইয়া যাইবে। তাই সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল : "হামজাকে কেহ কিছু বলিও না। আমি বাস্তবিকই মুহম্মদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি!" এই বলিয়া আবু যহল ব্যাপারটাকে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে দিল না। হামজাকে শান্ত করিয়া সেদিনকার মত ফিরাইয়া দিল।

হামজা গৃহে ফিরিলেন। যে পথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়াই চলিলেন; কিন্তু মনে হইতে লাগিল, সবই যেন নূতন-তিনিও নূতন, পথও নূতন!

হামজা সোজাসুজি হযরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। হামজার ন্যায় বীরপুরুষের ইসলাম গ্রহণে হযরত অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। আঘাতের সকল বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল।

এদিকে কোরেশগণ মহাচিন্তিত হইয়া পড়িল। দিনে দিনে মুসলমানদিগের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে, কিছুতেই এই নূতন ধর্মীয় উৎপাতটিকে দূর করা যাইতেছে না, ইহা তাহাদের পক্ষে মস্ত একটা দুর্ভাবনার কথা হইয়া দাঁড়াইল।

উৎপীড়নে কোনই সুফল ফলিল না দেখিয়া এইবার তাহারা এক নূতন চাল চালিল। একদিন মুহম্মদ কাবা-গৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময় কোরেশদিগের প্রতিনিধি-স্বরূপ ওৎবা হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল : "দেখ মুহম্মদ, তুমি আমাদের পর নও, আমরাও তোমার পর নই। সর্বদা আমরা তোমার মঙ্গল কামনাই করিয়া থাকি। তুমি বল কি তোমার উদ্দেশ্য? তুমি কি দেশের নেতৃত্ব চাও? রাজমুকুট চাও? ধনসম্পদ? সুন্দরী কন্যা? বল, যাহা চাও, তাহাই আমরা তোমার চরণ-তলে আনিয়া দিব। কিন্তু দোহাই তোমার, ঐ অদ্ভুত নূতন ধর্মমত আর প্রচার করিও না।"

হযরত ধীর-গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন : "যদি তোমরা আমার এক হাতে সূর্য এবং আর এক হাতে চন্দ্র আনিয়া দাও, ত' আমি এই সত্য প্রচারে বিরত হইব না"।

বলিতে বলিতে তিনি কোরআন শরীফের 'হা-মিম' সূরা পাঠ করিতে লাগিলেন :

"(হে মুহম্মদ) বল, আমিও তোমাদের মত মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র অদ্বিতীয় সেই আল্লাহ্। অতএব সরল পথ অনুসরণ কর এবং তাঁহার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং পৌত্তলিকদিগের জন্য দুঃসংবাদ।" (৪১ : ৬)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৫

সাহারাতে 'ফুটলরে ফুল'!

কোরেশগণ দেখিল তাহাদের কোন চেষ্টাই ফলবতী হইতেছে না। ক্ষুব্ধ অভিমানে তাহারা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিল, মুহম্মদকে দূর করিতে না পারিলে তাহার ধর্মকে দূর করা সম্ভব নহে।

এই উদ্দেশ্যে তাহারা আবার একটি জরুরী সভা ডাকিল। আবু যহল, আবু লাহাব, অলিদ, ওমর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সমবেত হইল। আবু যহল দৃপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল : "হে কোরেশ বীরগণ, আর কতকাল এমন নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকিবে? আমাদের কওম, আমাদের দীন, আমাদের সম্মান, আমাদের প্রতিপত্তি-সবই আজ বিপন্ন। নগণ্য একটি লোক এতবড় বিপ্লব আনিল, অথচ তোমরা তাহার কিছুই করিতে পারিলে না। তোমাদের বাহুতে কি কুওৎ নাই? প্রাণে কি উৎসাহ নাই? অন্তরে কি ঘৃণা নাই? ক্রোধ নাই? প্রতিহিংসা নাই? ধিক্ তোমাদের বীরত্বে! ধিক্ তোমাদের জীবনে! আজ আমি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেছি : তোমাদের মধ্য হইতে যে আজ মুহম্মদের মাথা কাটিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এবং একশত উট পুরস্কার দিব। কে প্রস্তুত আছ, বল?"

উত্তেজিত জনতার মধ্য হইতে উন্নতশির বিশালবক্ষ-তরুণ যুবক মহাবীর ওমর উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়া উঠিলেন : "আমি প্রস্তুত। মুহম্মদের শির আমি আনিয়া দিব। মুহম্মদকে কত্ল না করিয়া ফিরিব না-এই পণ করিলাম।" এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা করিলেন।

সমবেত জনতার উল্লাস-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিল। সকলে বুঝিল ওমরের মত বীর যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন এইবার আর মুহম্মদের রক্ষা নাই।

ওমর চলিয়াছেন এক মনে, এক ধ্যানে মুহম্মদের সন্ধানে! হস্তে নাঙ্গা তলোয়ার, মুখে তেজোদৃপ্ত ভঙ্গি! দেখিলে মনে ত্রাস জন্মে।

হঠাৎ পথিমধ্যে নঈমের সহিত সাক্ষাৎ। নঈম তাঁহার দোস্ত্। "কি হে ওমর, খবর কি? কোথায় চলিয়াছ এই বীর বেশে?" নঈম জিজ্ঞাসা করেন।

ওমর গম্ভীর স্বরে উত্তর দেন : "মুহম্মদের মুণ্ডপাত করিতে।"

নঈম গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ওমরের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। বলিলেন : "সর্বনাশ! এতখানি তোমার দূরাশা! ক্ষান্ত হও। এ কাজ কখনও করিতে যাইও না। তুমি ইহা পারিবে না।"

ওমর একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন : "কেন?"

নঈম জবাব দিলেন : "ঐ যে একটি মেষশিশু খেলা করিতেছে, উহাকে ধরিয়া দাও ত?"

ওমর মেষটিকে ধরিতে গেলেন। কিন্তু পারিলেন না। তখন নঈম একটু হাসিয়া বলিলেন : "নিরীহ একটা মেষ শিশুকে ধরিতে পারিলে না। আল্লাহ্‌র বাঘকে কেমন করিয়া ধরিবে?"

www.pathagar.com

ওমর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন : "বুঝিয়াছি, হতভাগা! তুই বুঝি মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস?"

নির্ভীক চিত্তে নঈম উত্তর দিলেন : "সে কথা পরে হইবে। কিন্তু স্বয়ং তোমার ভগিনী ফাতিমা এবং তাঁহার স্বামী যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে খবর রাখ? নিজের ঘর আগে সামলাও, তারপর মুহম্মদের মাথা কাটিও।"

"কী! আমার ভগিনী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? এত বড় স্পর্ধা? আচ্ছা, তারই আগে মুণ্ডপাত করিয়া আসি।"

বলিতে বলিতে ওমর ফাতিমার গৃহপানে অগ্রসর হইলেন।

অস্তগামী সূর্যের রক্ত আভায় তখন পশ্চিম-গগন রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে; ঊষার প্রকৃতির নিস্তব্ধ নির্জনতা মনের উপর ছায়া ফেলিয়াছে, ভুবনে ভুবনে চিরবিরহের সুর ধ্বনিত হইতেছে। দিন-রজনীর এই সন্ধিক্ষণে মানবের মন স্বভাবতই যেন কাহার চরণে মাথা নত করিতে চায়, কাহার আকর্ষণ যেন সে অনুভব করে—বহির্জগতে অন্যান্য সকলের ন্যায় মানুষের মনও যেন ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। এই সুন্দর সন্ধ্যায় সাঈদ ও ফাতিমা কোরআনের 'তা-হা' সূরা পাঠ করিতেছিল, এমন সময় ওমর আসিয়া তথায় উপস্থিত।

ওমর প্রথমেই ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। ধীর পদক্ষেপে গৃহের নিকটে গিয়া কান পাতিয়া রহিলেন। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তাঁহার কানে আসিল। ওমরের সন্দেহ আরও গভীর হইল।

বেশীক্ষণ নীরব থাকা সম্ভব হইল না। ক্রুদ্ধ ওমর সশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ওমরের সাড়া পাইয়াই ফাতিমা তাড়াতাড়ি কোরআনের লিখিত আয়াতগুলি নিজের বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া ফেলিলেন। ওমর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "কি পড়িতেছিলে তোমরা বল?"

ফাতিমা বলিলেন : "কই, তুমি কি কিছু শুনিতে পাইয়াছ?"

ওমর উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন : "ন্যাকামি রাখ! আমার বুঝি কান নাই?" অতঃপর সাঈদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন : "ওরে হতভাগা, তোরা বুঝি মুসলমান হইয়াছিস্? তবে দ্যাখ্ মজা"-এই বলিয়াই তিনি সাঈদকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফাতিমা স্বামীকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। ওমর তখন ফাতিমাকে প্রহার করিতে শুরু করিলেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিতে গিয়া উভয়েই প্রহৃত ও আহত হইলেন। সহসা ওমর ফাতিমার অঙ্গে রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন। প্রহার বন্ধ করিয়া বলিলেন : "বল্ হতভাগিনী, মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিস্?"

ফাতিমা নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন : হ্যাঁ, করিয়াছি। আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আনিয়াছি। জীবন গেলেও আমরা ধর্ম পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তোমার যাহা খুশি করিতে পার।"

ওমর একটু সুর নরম করিয়া বলিলেন : "দেখি, তোমরা কি পাঠ করিতেছিলে?

ফাতিমা বলিলেন : "না দিব না; তুমি ছিঁড়িয়া ফেলিবে।"

ওমর বলিলেন : "বিশ্বাস কর, ছিঁড়িব না।"

www.pathagar.com

ফাতিমা বলিলেন : "তবে অযু করিয়া আইস। না-পাক অবস্থায় আল্লাহ্‌র কালাম স্পর্শ করিতে নাই।"

ওমর ওযু করিয়া আসিলেন। তখন ফাতিমা কোরআনের সেই লিখিত অংশগুলি ওমরের হস্তে প্রদান করিলেন। ওমর পড়িতে লাগিলেন :

"(হে মানুষ) তোমাদিগকে কষ্টে ফেলিবার জন্য আমরা এই কোরআন নাযিল করি নাই।

ইহা তাহাদের জন্যই সতর্কবাণী—যাহারা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। এই বাণী তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছে-যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন এই পৃথিবী আর ঐ সুউন্নত আকাশ। যিনি পরম করুণাময় এবং আপন শক্তিতে অটুট। আসমান-যমিনে, অথবা উভয়ের মাঝখানে অথবা মাটির নিচে যাহা কিছু আছে-সকলেরই উপর তাঁহার সর্বময় প্রভুত্ব! এবং তুমি যাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত কর তাহার গূঢ় মর্ম তিনি জানেন, আরও জানেন সেই কথা-যাহা তুমি গোপন করিয়া রাখো"। (২০ : ১-৭)

ওমর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কোন্ এক পবিত্র ভাবের দ্যোতনায় বারে বারে তাঁহার অন্তর শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! এক নূতন আলোক-লোকের তিনি সন্ধান পাইলেন। অপূর্ব ভাবাবেশের মধ্যে তিনি ঘোষণা করিয়া উঠিলেন : "আশ্‌হাদু আল্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু অ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু"-আমি সাক্ষ্য দিতেছি : এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই উপাস্য নাই; তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। আরও সাক্ষ্য দিতেছি মুহম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসুল।

কী অপূর্ব দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল আজ ফাতিমার গৃহে। স্বামী-স্ত্রী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল বেহেশ্‌ত যেন দুনিয়ায় নামিয়া আসিল। মুহূর্ত পূর্বে দারুণ অগ্নিবাণে যেখানে দোযখের দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সহসা সেইখানেই হইল অমৃত-বৃষ্টি, আর হাসিয়া উঠিল একটি অনবদ্য বেহেশ্‌তের ফুল। প্রাণহীন পাষাণস্তূপের অন্তস্থল হইতে অকস্মাৎ যেন উৎসারিত হইল। এক স্নিগ্ধ সুধানির্ঝর।

ওমর আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। "কোথায় হযরত? নিয়ে চল আমাকে তাঁহার চরণ তলে!" আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বার বার তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন।

ওমরকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ সাঈদ প্রস্থান করিলেন।

হযরত তখন আরকাম নামক শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আবু বকর, হামজা, আলি প্রমুখ তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। শিষ্যবৃন্দের মধ্যে বসিয়া হযরত সকলকে নসিহৎ করিতেছিলেন, এমন সময় খবর পৌঁছলো : ওমর আসিতেছে। ওমরের আগমনের অর্থ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ হযরতের জীবন রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ওমর সাড়া দিতেই হযরত সকলকে ক্ষান্ত করিয়া বলিলেন : "ওমরকে কিছু বলিও না; তাহাকে আসিতে দাও, আমি একাই তাহার সম্মুখীন হইব।"

ওমর ভিতরে আসিলে হযরত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল সজোরে আকর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন : "আর কতকাল অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইবে, ওমর? আর কতকাল সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে?"

www.pathagar.com

হযরতের পবিত্র করস্পর্শে সর্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। অবনত মস্তকে তিনি উত্তর দিলেন : "যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, এখন আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছি। দয়া করিয়া এই অধমকে আপনার পাক কদমে স্থান দিন।" এই বলিয়া তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন : "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্!"

ওমরের মুখে আল্লাহ্ ও রসুলের নাম! হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। সমবেত কণ্ঠে সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন : "আল্লাহু আকবর!" সেই তক্বীর ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল। দূরের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠিল : "আল্লাহু আকবর!"-"আল্লাহু আকবর!"

হযরতের নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ওমরের ইসলাম-গ্রহণ বাস্তবিকই এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার! শির লইতে আসিয়া শির দান করিবার দৃষ্টান্ত এমন আর কোথাও দেখি নাই! কিন্তু এই ব্যাপার বিস্ময়কর হইলেও অস্বাভাবিক নহে। সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইসলামকে লইয়া এই সত্য যুগে যুগে প্রকটিত হইয়াছে। যতবারই ইসলামের শিরে আঘাত আসিয়াছে ততবারই আঘাতকারী পরাজিত হইয়াছে-ভক্ষক বেশে আসিয়া রক্ষক বেশে ফিরিয়া গিয়াছে। কত নমরুদ, কত ফেরাউন, কত আবরাহা, কত এজিদই না ইহার শিরে আঘাত হানিয়াছে। কত নাসারা, কত কোরেশ, কত তাতার,কত সেলজুকই না ইহাকে ধ্বংস করিতে প্রায়াস পাইয়াছে। কিন্তু ইসলাম কোথায়ও মরে নাই। প্রতি কারবালায় এজিদই নিহত হইয়াছে। হোসেনের মৃত্যু হয় নাই।

ইহাই ইসলাম। আগুনে পোড়ে না, পানিতে ডোবে না, পিপাসায় কাতর হয় না। দুঃখ দৈন্য, ঝঞ্ঝা-বিপদের মধ্য দিয়াই তাহার জয়যাত্রা।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৬
অন্তরীণ-বেশে

মুহূর্ত মধ্যে মক্কার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া গেল ওমর ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ওমর নিজেও কোরেশ দলপতিদিগের বাড়িতে বাড়িতে গিয়া ঘোষণা করিয়া আসিলেন : "আর আমি তোমাদের দলে নহি, এখন আমি মুসলমান।" ক্ষোভে দুঃখে অপমানে কোরেশগণ জ্বলিয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু সহসা ওমরকে কেহই কিছু বলিতে সাহস করিল না।

এদিকে ওমরকে লাভ করিয়া স্বয়ং হযরত এবং নও-মুসলিমগণ যারপরনাই অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলেন। আবু বকর, আলি, হামজা, ওমর প্রমুখ বিশিষ্ট শিষ্যগণ এইবার হযরতের পার্শে দাঁড়াইয়া প্রচারকার্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। ওমর একদিন হযরতকে বলিলেন : "হযরত আর কতকাল আমরা এমন ভয়ে ভয়ে চলিব? কোরেশগণ আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া মিথ্যা দেব-দেবীর পূজা করে, আল্লাহ্‌র ঘরে তাদেরই অধিকার। আর আমরা আল্লাহ্‌র সেবক, অথচ অল্লাহ্‌র ঘরে আমাদের ঠাঁই নাই। কাবা-গৃহে আমাদেরও ত দাবী আছে। উহা ত কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। আমরা কেন তবে ওখানে নামায পড়িতে পারিব না? মরি বাঁচি একবার ওখানে নামায পড়িতেই হইবে।" সাহাবীরাও এই কথার সায় দিলেন।

হযরত সাহাবাদিগের এই দৃঢ় মনোবল দেখিয়া উৎসাহিত হইলেন। তখনই মিছিল করা হইল। দুই কাতারে মুসলমানগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। ওমর ও হামজা দুই দলের পুরোভাগে স্থান লইলেন, হযরত উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইলেন। শোভাযাত্রা সাফা পর্বতের পাদদেশ দিয়া নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। মুহুর্মুহু : "আল্লাহু আকবর" ধ্বনিতে গিরি-পর্বত মুখরিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুসলমানদের বুকের বল দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

মিছিল ধীরে ধীরে কাবা মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইল। পথে কেহই বাধা দিতে সাহস করিল না। কোন্ যাদুমন্ত্রে কোরেশগণ আজ যেন হতবল হইয়া পড়িল।

একেই ত কোরেশগণ আল্লাহ্‌কে মানে না, কাবা-মন্দিরের দেব-দেবীদিগের বিরুদ্ধে প্রচার করিবার জন্য একেই ত তাঁহারা হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপর মহাখাপ্পা, তাহার উপর আবার সেই হযরত সেই শিষ্যবৃন্দের সহিত কাবা-মন্দিরের সেই দেবদেবীদিগের সম্মুখে সেই আল্লাহ্‌র উপাসনা করিতে অগ্রসর! তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিরস্ত্রবেশে। কত বড় দুঃসাহস এ! কিসের বলে কোন্ সাহসে এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়?

হযরত সকলকে লইয়া কাবা গৃহে আসিয়া দুই রাকাত নামায পড়িলেন। নামায শেষ করিয়া সকলে ধীরে ধীরে পূর্ববৎ মিছিল করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। কী চমৎকার সেই দৃশ্য! কাহারও মুখে কোন আস্ফালন নাই, বিরোধ বা দাঙ্গা সৃষ্টির মনোভাব নাই, সীমা লঙ্ঘনের প্রবৃত্তি নাই, প্রতিশোধ গ্রহণের দুরভিসন্ধি নাই, আছে শুধু সত্য প্রচারের আন্তরিক আগ্রহ, আছে শুধু আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার ন্যায্য দাবী। এইখানেই

www.pathagar.com

ত ইসলামের বিশেষত্ব। সে কোনদিন সীমা লঙ্ঘন করে না, আপন অধিকার স্বীকৃত হইলেই সে সন্তুষ্ট।

কোরেশগণ প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও ভিতরে ভিতরে অনেক কিছু করিল। তাহারা শীঘ্রই এক গোপন সভা ডাকিয়া স্থির করিল : মুহম্মদ, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন এবং শিষ্যবৃন্দকে সর্বপ্রকারে সমাজচ্যুত বা 'বয়কট' করিয়া রাখিতে হইবে; বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয়, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, চলা-ফেরা সমস্তই বন্ধ করিতে হইবে। ইহাই স্থির করিয়া তাহারা এক প্রতিজ্ঞাপত্র সই করিল এবং একটা পবিত্রতার ছাপ দিবার জন্য উহা কাবা-মন্দিরের দরজায় লটকাইয়া দিল। অতঃপর আট-ঘাট বাঁধিয়া তাঁহারা ভীষণভাবে 'বয়কট' শুরু করিল।

কোরেশদিগের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা এবং বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ আবুতালিব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবিলম্বে তিনি বনি-হাশিম ও বনি মুত্তালিবদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। স্থির হইল, মুহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া তাঁহারা 'শেব' নামক একটি গিরি সংকটে প্রস্থান করিবেন। স্থানটি পূর্ব হইতেই বনি-হাশিম গোত্রের অধিকারভুক্ত ছিল। শহর হইতে উহা কিছু দূরে অবস্থিত এবং বেশ সুরক্ষিতও ছিল। সেখানে সংঘবদ্ধভাবে থাকিতে পারিলে বিপদ অনেক কম হইবে এবং সতর্কতার সহিত বাহির হইতে খাদ্য সরবরাহ করা যাইবে, এইরূপ তাঁহারা মনে করিলেন।

কার্যত : ঠিক তাহাই করা হইল। হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে লইয়া বনি-হাশিম ও বনি-মুত্তালিবগণ সেই গিরি-দুর্গের মধ্যে আত্মনির্বাসিত হইলেন। ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই পিছনে পড়িয়া রহিল। এই সঙ্কীর্ণ গিরি-দুর্গের মধ্যে মুসলমানদিগকে একদিন নহে, দুইদিন নহে-দীর্ঘ দুই বৎসরকাল দারুণ মুসিবতের মধ্য দিয়া কাল কাটাইতে হইয়াছিল। এই সময় কোরেশগণ মুসলমানদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। বাহির হইতে তাহারা যাহাতে কোনরূপ আহারাদি না পায়, তাহার জন্য সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সময় সময় এইরূপ ঘটিয়াছে যে ক্ষুধার জ্বালায় সকলকে গাছের পাতা, শুষ্ক চর্ম ইত্যাদি খাইয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের করুণ ক্রন্দনে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে কিন্তু কোরেশদিগের পাষাণ হৃদয় এতটুকুও বিচলিত হয়নাই।

কোরেশগণ মনে করিয়াছিল, মুহম্মদ ও তাঁহার ধর্মের নাম নিশানা এইবার চিরতরে মুছিয়া যাইবে। একে ত নবদীক্ষিত মুসলমানদিগের সংখ্যা অতি অল্প, তাহার উপর তাহাদের অধিকাংশই আবিসিনিয়ায় নির্বাসিত। অবশিষ্ট যাহারা ছিল তাহারা এবং তাহাদের সমর্থকবৃন্দও এখন একটা সঙ্কীর্ণ গিরি-দুর্গে বন্দী। কাজেই এই সুযোগে তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া মারিয়া ফেলিতে পারিলেই ইসলামের উপদ্রব হইতে মক্কাভূমি এইরূপ মুক্ত হইবে। ইহা ভাবিয়াই তাহারা পূর্ণোদ্যমে মুসলিম-দলনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিকে ত এই শয়তানি লীলা, কিন্তু অপরদিকে মনুষ্যত্বের কী উজ্জ্বল চিত্র! হযরত মুহম্মদ ও তাঁহার অনুগামীদিগদের কী অপূর্ব ত্যাগ, সংযম ও সত্যনিষ্ঠা! মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও ভক্তবৃন্দ অটল, অথচ নির্বিকার! এত বড় ধর্মানুরাগ, এত বড় গুরুভক্তি, আল্লাহ্‌র উপর এত বড় অবিচলিত নির্ভর জগতের ইতিহাসে আর

www.pathagar.com

কোথায় আমরা দেখিতে পাই? মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক একটা আদর্শের জন্য কী কঠোর সংগ্রামই না করিয়া চলিয়াছে! এত যে দুঃখ, এত যে বিপদ, তবু কাহারও মুখে কথাটি নাই, ধৈর্যচ্যুতি নাই, গুরুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাই, পার্শ্ব পরিবর্তন নাই। জীবনমরণ পণ করিয়া ক্ষুদ্র একদল লোক কেবলমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বাহিরের কোন চিন্তাই তাহাদের মনে জাগে নাই; একমাত্র আল্লাহ্‌কেই তাহারা জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞানে অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতেছে। ঈমানের কী উজ্জ্বল চিত্র এইখানে!

ঠিক এই সঙ্কট মুহূর্তেই হযরতের নিকট আল্লাহ্‌র আশ্বাস বাণী নামিয়া আসিল :

"নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভীতি দ্বারা, ধনপ্রাণ ও শস্যহানি দ্বারা (সময়ে সময়ে) আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব! হে রসুল, তুমি সেই ধৈর্যশীলদিগকে সুসংবাদ দাও–যাহারা বিপদে আপতিত হইলে বলিয়া থাকে যে, আমরা আল্লাহ্‌র দান, তাঁহার দিকেই ত আমরা প্রত্যাবর্তন করিব। ইহারাই তাহারা—যাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অসীম করুণা বর্ষিত হয় এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত। (২ : ১৫৫–৫৬)

এই অমৃত পান করিয়াই ত মুসলমানরা অমর হইয়াছিল। ইসলামের বিশ্ব-বিজয় এত সহজ হয় নাই। তাহার পশ্চাতে ছিল একটা সাধনা, একটা বিপুল আত্মত্যাগ, একটা আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণা।

আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় দুর্দিনেও হযরত তাঁহার সত্যপ্রচার হইতে বিরত হন নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আরবে জিলহজ্ মাস পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। এই সময়ে কাবা-মন্দিরে হজ করিবার জন্য নানা দেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা সমবেত হইত। তখন আরবগণ নরহত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি পাপকার্য হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিত। অন্তরিত অবস্থায় যখন এই পবিত্র মাস উপস্থিত হইল, তখন হযরত এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং সমবেত যাত্রীদিগকে নানাস্থানে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট সত্যবাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। মনে হইল হযরতকে তাহারা খুন করে! কিন্তু উপায় নাই। পবিত্র মাস! মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিয়া তাহারা অন্য উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। হযরত যেখানেই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া হযরতের নামে নানারূপ কুৎসা প্রচার করিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল : এ একটা আস্ত পাগল। কেহ বলিতে লাগিল : এ একজন মায়াবী কবি। এর কথায় তোমরা কান দিও না। হযরত নীরবে সমস্তই সহ্য করিতে লাগিলেন।

দিন যায়। অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

ঠিক এমন সময় অদ্ভুত উপায়ে এই নিরীহ মযলুমদিগের উপরে আল্লাহ্‌র রহমৎ নামিয়া আসিল। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া মানুষ বেশী দিন টিকিতে পারে না। প্রতিক্রিয়া আপনা আপনি আরম্ভ হয়। কোরেশদিগের মধ্যে অনেকেই মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছিল–এতখানি নির্মমতা কিছুতেই তাহাদের শোভা পাইতেছে না। ধর্মমত পৃথক হইতে পারে, কিন্তু সকলেই ত মানুষ। সকল দ্বন্দ্বের অতীতে একটা নিভৃত স্থানে যে তাহাদের পরস্পরের জন্য একটা মিলন মঞ্চ আছে, একটা গোপন সূত্র আছে–প্রাণে প্রাণে একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা আছে, সে কথা আজ কাহারও

www.pathagar.com

কাহারও মনে জাগিল। ভিতরে ভিতরে দুই একজন হৃদয়বান ব্যক্তি ইতিপূর্বে এই নিষ্ঠুর কার্যের প্রতি বিরুদ্ধাভাব পোষণ করিতেছিলেন; এইবার প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদ শুরু করিয়া দিলেন। হাশিম ও মুত্তালিব বংশের সহিত অনেকের আত্মীয়তাও ছিল; তাঁহারাও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের জন্য গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

একদিন কাবা গৃহে ইহাই লইয়া কোরেশদিগের মধ্যে এক তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। জোহায়ের নামক এক ব্যক্তি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হে কোরেশগণ, তোমাদের এ কেমন বিচার? আমরা ভাল ভাল জিনিস খাইব, ভাল ভাল কাপড় পরিব, আর হাশিম বংশ না খাইতে পারিয়া মারা যাইবে? ইহা হইতে পারে না। আমরা এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য সমর্থন করিতে পারি না। আজই আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিব।"

জামআ, আবুলবাখতারী প্রমুখ কোরেশগণ জোহায়েরের এই কথা সমর্থন করিলেন। আবুযহল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল : "কখনই নহে। এ প্রতিজ্ঞাপত্র কিছুতেই নষ্ট করিতে দিব না"।

দুই দলে তুমুল বচসা আরম্ভ হইল।

ঠিক এই সময় একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিল। হযরতের পরামর্শক্রমে বৃদ্ধ আবু তালিব গিরি সঙ্কট হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ উক্ত সভায় উপস্থিত হইলেন এবং ঘোষণা করিলেন : "তোমাদের ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত নহে! বিশ্বাস না হয়, গিয়া দেখ, কীটে উহা কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এই কথা যদি সত্য না হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি মুহম্মদকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতে রাজী আছি। আর যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের উচিত আমাদের সঙ্গে এইরূপ শত্রুতা না করা।"

কোরেশগণ কৌতূহল অনুভব করিল। অনেকে বলিল : "ইহা যদি সত্য হয় তবে মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল তাহাও সত্য"।

মোতাএম নামক এক সাহসী ব্যক্তি তখন লাফ দিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রখানি ছিঁড়িয়া আনিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, একমাত্র আল্লাহ্‌র নামটি ছাড়া আর সমস্তই কীটদষ্ট হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

কোরেশগণ নিরুৎসাহ হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তৎক্ষণাৎ শেব দুর্গে গমনপূর্বক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিলেন।

দীর্ঘ দুই বৎসর পর হযরত ও তাঁহার অনুসঙ্গীবৃন্দ নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৭

সর্বহারা

হযরত যখন মুক্তিলাভ করিলেন, তখন তাঁহার নবুয়তের দশম বৎসর। মুক্তিলাভের পর কিছুদিন বেশ শান্তিতেই কাটিল! কোরেশগণ ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। কোন চেষ্টাই তাহাদের ফলবতী হইতেছে না, কোথা হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা না একটা বাধা আসিয়া তাহাদের সব আয়োজনকে পণ্ড করিয়া দিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহারা অনেকটা দমিয়া গেল। তবু উৎকট অভিমান ও বদ্ধমূল কুসংস্কারের মোহে কিছুতেই তাহারা নবাগত সত্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিল না।

হযরত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। ভাবিলেন এইবার বুঝি বিপদের মেঘ কাটিয়া গেল। কিন্তু হায়! একটা গভীরতর আঘাত এবং একটা কঠোরতর পরীক্ষা যে তখনও তাঁহার জন্য সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কি তিনি জানিতেন!

গিরি-গুহা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরেই আবুতালিব অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কারা জীবনে কঠোরতা তাঁহার সহ্য হয় নাই। হযরত আশঙ্কা করিলেন, বুঝি বা তাঁহার ইহজীবনের এই মূল্যবান অবলম্বনটুকু এইবার হারাইয়া যায়।

ঘটিলও তাহাই। আবু তালিব ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করিলেন। মৃত্যুকালে কোরেশ দলপতিগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। আবু তালিব গোষ্ঠীপতি ছিলেন, কাজেই কোরেশগণ তাঁহাকে সম্ভ্রম না করিয়া পারিত না। আবু তালিবের জীবন প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিয়া কোরেশগণ মুহম্মদকে বশে আনিবার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিল। আবুযহল প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিল : "আবুতালিব, আপনাকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করি, তাহা আপনি জানেন। মৃত্যুর পূর্বে আপনি মুহম্মদকে শেষবারের মত নিষেধ করিয়া যান, যেন সে আর আমাদের দেব-দেবীদিগের নিন্দা না করে।"

আবু তালিব মুহম্মদকে ডাকিয়া কোরেশদিগের প্রস্তাবের কথা তাঁহাকে শুনাইলেন। হযরত উত্তর দিলেন : "চাচাজান, সত্য চিরদিনই সত্য। মিথ্যার সহিত তাহার কোনদিনই আপোষ চলে না। কাজেই, যে-সত্য আমি লাভ করিয়াছি, তাহা প্রচার করিবই।" অতঃপর তিনি আবু তালিবকে সম্বোধন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন : "চাচাজান! এখনও সময় আছে। বলুন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্।"

কোরেশগণ দেখিল বেগতিক। তাহারা বাধা দিয়া আবুতালিবকে বলিতে লাগিল : "মৃত্যুর ভয়ে কি শেষকালে আপনি আপনার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিবেন?"

আবু তালিব ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন : "মুহম্মদ, আমি তোমার ধর্মকে গ্রহণ করিতাম, কিন্তু তাহা করিলে কোরেশগণ আমাকে কাপুরুষ বলিবে? আমি আমার পূর্বপুরুষদিগের ধর্মেই স্থির রহিলাম।"

কিন্তু পূর্বপুরুষদিগের ধর্ম কি? হযরত ইব্রাহিম, ইসমাইল-ইহারাই ত কোরেশদিগের পূর্বপুরুষ! তাঁহাদের ধর্ম ত ইসলাম! আবু তালিবের এই দ্ব্যর্থবোধক উক্তিতে হযরত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, অথচ একেবারে নিরাশও হইলেন না।

www.pathagar.com

ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন : "হে পিতৃব্য, আল্লাহ্‌তায়ালা নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্য বেহেশ্‌ত প্রার্থনা করিব।"

আবু তালিব শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন! মৃত্যুকালে তাঁহার ঠোঁট দুইটি ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মনে হইল, তিনি যেন চুপে চুপে কি বলিতেছেন।

'বায়হাকী' প্রমুখ কতিপয় প্রামাণ্য হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, আবুতালিব এই সময় মনে মনে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কলেমাই পাঠ করিতেছিলেন।

কিন্তু ' বোখারী ও 'মোসলেম' হাদিস গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, কাফির অবস্থাতেই আবু তালিবের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময় কোরআনের যে আয়াত[১] নাযিল হয়, তাহা হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আবুতালিব তৌহিদ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও আবুতালিবকে নানা কারণে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। অবিশ্বাসী হইয়াও তিনি সারাজীবন মুহম্মদের প্রতি যেরূপ স্নেহমমতা ও সহানুভূতি দেখাইয়া গিয়াছেন, আপদে-বিপদে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রবল, মহত্ত্ব, উদারতা ও পরম সহিষ্ণুতাই প্রকাশ পাইয়াছে। পক্ষান্তরে হযরতের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের সততাও ইহার মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। হযরত যদি কপট হইতেন, মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা যদি তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাইতেন, তাঁহার সততা ও সাধু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিত, তবে নিশ্চয়ই আবু তালিব সারাজীবন তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত থাকিতে পারিতেন না। আপন চরিত্র মাধুর্য ও অকৃত্রিমতার বলেই হযরত মুহম্মদ আবুতালিবের অন্তরে এতখানি স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

আবুতালিবের ছিল এক অদ্ভুত চরিত্র। সত্য ও সংস্কারের এমন দ্বন্দ্ব বড় একটা দেখা যায় না। প্রকাশ্যে তিনি কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ ইসলামের প্রতি কোনদিনও অশ্রদ্ধাও দেখান নাই। প্রাণ চাহে সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিতে, কিন্তু সমাজভীতি ও বদ্ধমূল কুসংস্কার আসিয়া বাধা দেয়। সত্যকে স্বীকার করিবার মত নির্ভীকতা ও সৎসাহসের অভাবই হইতেছে আবুতালিবের চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। অন্যথায় তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল বলিষ্ঠ ও উদার। হযরতের পয়গম্বর জীবনের সফলতার জন্য তাঁহার দান তুচ্ছ নহে। আবুতালিব না থাকিলে হযরতের জীবনধারা কোন পথে কেমন করিয়া প্রবাহিত হইত, ভাবিবার কথা। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইসলাম ও তাহার পয়গম্বরের জন্য এত করিয়াও প্রকাশ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। হায়! যাহার বংশ প্রদীপে দীন দুনিয়া আজ উজালা, তাঁহারই আপন অন্তরে এমন অন্ধকার রহিয়া গেল! এ যেন প্রদীপের নিচের অন্ধকার। দীপ শিখার জ্যোতিকে সে অস্বীকার করিল বটে, কিন্তু তাহারই নিচে বুক পাতিয়া দিয়া তাহার দীপ্তিকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিল।

আবু তালিবকে হারাইয়া হযরত অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জীবনের একটা প্রকাণ্ড অংশ যেন শূন্য হইয়া গেল।

---

১. নিশ্চয়ই তুমি যাহাকে ভালবাস, তাহাকে ইচ্ছা করিলেই সুপথে আনিতে পার না। কিন্তু আল্লাহ্‌ যাহাকে খুশি সুপথে আনিতে পারেন এবং তিনিই উত্তমরূপে জানেন, কাহারা সৎপথপ্রাপ্ত। (২৮ : ৫৬)

www.pathagar.com

কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। পিতৃব্যের শোক ভুলিতে না ভুলিতে বিবি খাদিজাও হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। হযরত বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবন সঙ্গিনীও এইবার তাঁকে ছাড়িয়া যাইতেছেন।

এক সুন্দর প্রভাতে বিবি খাদিজা চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। হযরত অন্তরে ভীষণ আঘাত পাইলেন। দুনিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নিয়ামৎ আজ তিনি হারাইলেন। অতীত জীবনের দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের সকল স্মৃতি আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বিবি খাদিজা যে তাঁহার জীবনে কত বড় একটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহার দান যে কত অপরিসীম ছিল, আজ তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন। নিঃসহায় অবস্থায় সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যখন তিনি রূঢ় বাস্তবতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, আত্মপ্রতিষ্ঠার যখন কোনই উপায় দেখিতেছিলেন না, তখন এই মহিয়সী নারীই তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া সামাজিক সম্ভ্রম ও পরিবারিক সুখশান্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং নিজের মনপ্রাণ ও ধনসম্পত্তি অকাতরে তাঁহার চরণে লুটাইয়া দিয়া স্বামীভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। শুধু কি তাহাই? হযরতের আধ্যাত্মিক বা পয়গম্বর জীবনের বিকাশের পথে তিনি সেবিকা ও সঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

হেরা গিরি গুহায় হযরত যখন কঠোর তপস্যায় মগ্ন থাকিতেন, তখন বিবি খাদিজাই তাঁহার তত্ত্ব লইতেন। হযরতের প্রচ্ছন্ন পয়গম্বর রূপটিকেই সর্বপ্রথম তিনি সত্যিকারভাবে চিনিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুত খাদিজা ছিলেন হযরতের মর্মমুকুর। হযরতের চিত্তে যখনই যে-ভাবের উদয় হইত, খাদিজার চিত্তেও তাহার ছায়া পড়িত। এই জন্যই হযরত যখন আল্লাহ্‌র প্রথম বাণী লাভ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহে ফিরিলেন, তখন খাদিজাই সর্বাগ্রে ইহার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সকলের আগে তিনিই হযরতের ধর্মে ঈমান আনিয়াছিলেন। চতুর্দিকে যখন নিরাশার ঘন অন্ধকার; অবিশ্বাস, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ-লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের বিষবাষ্পে মক্কার আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন, তখন এই নারীই মুহম্মদকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়া আদর্শ সহধর্মিণীর কার্য করিয়াছিলেন। তারপর সুখে দুঃখে আপদে-বিপদে কী বিশ্বস্তভাবেই না সারাজীবন তিনি ছায়ার মত স্বামীকে অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন! এমন আদর্শ সহধর্মিণী ও সহকর্মিণী না হইলে কাহারও জীবনই সার্থক ও সুন্দর হয় না। এই জন্যই ত হযরত খাদিজাকে এত শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহার সান্ত্বনা, প্রেরণা, বল ও ভরসা। দিনের শেষে ক্লান্ত বিহঙ্গ যেমন অলস পাখা মেলিয়া আপন নীড়ে ফিরিয়া আসে এবং নবজীবন লাভ করিয়া পরদিন প্রভাত বেলায় পুনরায় বহির্জগতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, হযরতও ঠিক তেমনি করিয়া প্রতিদিন বিবি খাদিজার নিকট হইতে জীবনের নবচেতনা লাভ করিতেন।

এহেন আদর্শ জীবন-সঙ্গিনী হযরতকে ছাড়িয়া আজ জান্নাতবাসিনী হইলেন। হযরত নীরবে এই বেদনার দান মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৮
তায়েফ গমন

আবুতালিব ও খাদিজার মৃত্যুতে কোরেশদিগের শয়তানি খেয়াল আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। তাহারা দেখিল, পথ এখন পরিষ্কার। এতদিন আবুতালিবের ভয়ে তাহারা বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই, এখন সেই বাধা দূর হইয়াছে মুহম্মদ এখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়, তাঁহাকে লইয়া যাহা খুশি করা যায়। ইহাই ভাবিয়া কোরেশগণ দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিল।

একদিন হযরত একটি স্থানে নামায পড়িবার জন্য নতজানু হইয়াছেন এমন সময় পিছন দিক হইতে ওকাবা নামক এক পাষণ্ড আসিয়া একখানি চাদর দিয়া হযরতের গলায় ফাঁস লাগাইয়া দিয়া পিছন দিক হইতে ধীরে ধীরে চাদরখানি মোচড়াইতে লাগিল। ফলে শীঘ্রই হযরতের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময় হযরতের শিষ্য আবুবকর উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কোনক্রমে রক্ষা করিলেন। কিন্তু আবুবকরকে ইহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইল প্রচুর। দুর্বৃত্তদের হস্তে তিনি ভীষণভাবে প্রহৃত হইলেন।

এরূপভাবে প্রতিদিন লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ চলিতে লাগিল। কখনও একদল লোক তাঁহার পিছনে পিছনে থাকিয়া নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালি দেয়, কখনও বা তাহারা হযরতের চলার পথে কাঁটা পুতিয়া রাখে, কখনও বা তাঁহার খাদ্যদ্রব্যে মলমূত্র মিশাইয়া দেয়, কখনও বা ঘৃণ্য আবর্জনাদি তাঁহার অঙ্গে নিক্ষেপ করে। এমনিভাবে তাহারা হযরতকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।

আফসোস্! দুনিয়ায় আজ এমন দরদী কেহ নাই- যে এই দুর্দিনে হযরতকে দুইটি সান্ত্বনার কথা শুনায়। পিতৃব্য নাই, স্ত্রী নাই, অসহায় কন্যারা পিতার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল; শিষ্যমণ্ডলীও আজ তাঁহারই মত লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত। কাহার মুখের দিকে কে তাকায়; কে কাহাকে সান্ত্বনা দেয়! কিন্তু কি আশ্চর্য! এ মুসিবতের দিনেও হযরত বিচলিত হইলেন না। আল্লাহ্‌র উপর তাঁহার নির্ভর আরও গভীর হইল। নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি অন্যান্য সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, হযরতের মক্কায় অবস্থান করা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। হযরত বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে গমন করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মক্কায় ইসলাম প্রচারের আর কোন সম্ভাবনাই আপাতত নাই।

কিন্তু যাইবেন কোথায়? এমন কোন্ স্থান আছে যেখানে তিনি সাদরে গৃহীত হইবেন? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তায়েফে গমন করিতে মনস্থ করিলেন।

মক্কা হইতে প্রায় ৭০ মাইল দূরে তায়েফ নগরী অবস্থিত। মক্কার পরেই ইহার স্থান। তায়েফবাসীদিগের সহিত কোরেশদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তায়েফবাসীরাও কোরেশদিগের ন্যায় মূর্তিপূজা করিত এবং কাবা মন্দিরই ছিল তাহাদের সর্বপ্রথম তীর্থক্ষেত্র। একই দেব-দেবীকে তাহারা পূজা করিত এবং একই রীতিনীতি ও কুসংস্কার মানিয়া চলিত।

www.pathagar.com

এহেন তায়েফ নগরেই হযরত চলিলেন আশ্রয় খুঁজিতে। সঙ্গে চলিলেন একমাত্র ভক্ত ও পালিত পুত্র জায়েদ।

দুর্গম গিরি কান্তার পার হইয়া হযরত পদব্রজে তায়েফে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়াই তিনি তায়েফবাসীদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিয়া সত্য প্রচারে সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার সে আহ্বানে সাড়া দিল না। তখন তিনি তায়েফের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বনু-সকীফ বংশই তখন ধনে মানে তায়েফের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। হযরত তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলেন। কিন্তু হায়! পাষাণের ন্যায় তাহারা অটল অচল রহিল। কেহ কেহ এমনও বলিতে লাগিল। "হু! আল্লাহ্ বুঝি খুঁজিয়া খুঁজিয়া আর লোক পাইল না, তোমাকেই পয়গম্বর করিল।" কেহ বলিল; "ভাল দেখেছ! আল্লাহর পয়গম্বর কখনও এমন করিয়া পায়ে হাটিয়া আসে?" কেহ বলিল; "ভাল দেখেছ; "ওহে মুহম্মদ, তোমার সঙ্গে কথা বলিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, তোমারও কোন লাভ নাই। তুমি যদি সত্যই আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হও, তবে তোমার কথার প্রতিবাদ করিলে বা বাধা দিলেই তুমি আমাদের অকল্যাণ ঘটাইবে আবার যদি ভণ্ড তপস্বী হও, তবে আমরাই ত তোমার পরম শত্রু হইব। কাজেই তুমি ফিরিয়া যাও।"

এমনইভাবে তিনি নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিলেন।

হযরত তবু নিরস্ত হইলেন না, তৌহিদের আবে কওসর জনে জনে বিলাইতে লাগিলেন-পথে পথে, ঘরে ঘরে আল্লাহ্‌র মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। দশ দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তায়েফবাসীদিগের বৈরীভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। অবশেষে তাহারা একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। হযরতকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা একদল লোক লেলাইয়া দিল। হযরত যে পথ দিয়া যান, সেই পথেই তাঁহার পিছনে পিছনে লোকগুলি বিদ্রূপ ও গালাগালি বর্ষণ করিয়া করিয়া চলে। শুধু তাহাই নহে, পাষণ্ডেরা হযরতের অঙ্গে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। প্রস্তারাঘাতে হযরতের দেহ জর্জরিত হইতে লাগিল। ইহাতেও মরদুদেরা নিবৃত্ত হইল না: তাহারা পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে বসিয়া গেল এবং হযরত সেই পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার চরণ-কমলে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিতে লাগিল। সমস্ত পথ এই জাহিল শয়তানদিগের ক্রুর হাসি ও অট্টরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

জায়েদ প্রাণপণ করিয়া হযরতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কতক্ষণ তিনি পারিবেন? শত শত লোকের বিরুদ্ধে দুইটি মাত্র লোক কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে? হযরত ক্রমশ : অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন; তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। জায়েদ ভীষণভাবে আহত হইয়া পড়িলেন কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি আপন কর্তব্য হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। হযরতকে কাঁধে তুলিয়া জায়েদ কোনক্রমে নগরের বাহিরে আসিলেন। নিকটেই একটি প্রাচীর বেষ্টিত আঙুর বাগ ছিল। জায়েদ সেইখানে গিয়া আশ্রয় লইলেন। নিজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি হযরতকে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরতের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন সর্বপ্রথমেই তাঁহার মনে পড়িল নামায পড়িবার কথা। তিনি অযু করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। জায়েদ

www.pathagar.com

অতিকষ্টে হযরতের ক্ষতবিক্ষত রুধিরাক্ত স্ফীত পদযুগল পাদুকা হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া জায়েদ কাঁদিতে লাগিলেন। হায়! যে চরণ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শরণ, সেই পবিত্র চরণের আজ এই দশা! .

হযরত নামায সমাধা করিয়া দুই হাত তুলিয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন। অত্যাচারী যালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করিবার জন্য অথবা তাহাদের ধ্বংস কামনা করিবার জন্য ইহাই বোধ হয় প্রকৃষ্ট সময়। কিন্তু বিশ্ব-প্রেমিক মহামানব কি বলিয়া প্রার্থনা করিলেন একবার শুনুন :

"হে আল্লাহ্! হে আমার প্রভু, তোমাকে ডাকি। অবিশ্বাসীরা আজ না বুঝিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তজ্জন্য দয়া করিয়া তুমি উহাদিগকে শাস্তি দিও না। উহাদিগকে ক্ষমা কর। অবিশ্বাসীরা আজ যে তোমার বাণীকে গ্রহণ করিতেছে না, তাহার জন্য উহাদের দোষ নাই; সে আমারই দুর্বলতা-আমারই অক্ষমতা; এই দুর্বলতার জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। হে রহমানুর রহিম, একমাত্র তুমিই দুর্বলের বল, তুমিই অগতির গতি তুমি ছাড়া আর কোন সাহায্য নাই, শরণ নাই। প্রভু হে আমার এই সাধনা কি ব্যর্থ হইবে? তুমি আমাকে জয়যুক্ত করিবে না? তুমি কি আমাকে এমন শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিবে-যাহারা চিরদিনই তোমা হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হউক। একমাত্র তোমার সন্তোষই আমার কাম্য। তুমি সন্তুষ্ট থাকিলে কোন লাঞ্ছনা, কোন গ্লানি কোন আপদ-বিপদ, কোন দুঃখ- বেদনাকেই আমি ভয় করি না। তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।"

কী আবেগ-ভরা আত্মনিবেদন। আল্লাহ্র প্রতি কী গভীর নির্ভর। মানুষের প্রতি কী প্রাণঢালা মমতা। সত্যের প্রতি কী অবিচলিত নিষ্ঠা। এমন না হইলে কি মহাপুরুষ হওয়া যায়।

ঠিক এই বিহ্বলতার মুহূর্তে হযরতের নিকট এই অহি নাযিল হইল :

"ধৈর্য ধর-চরম ধৈর্য। নিশ্চয়ই তাহারা (অবিশ্বাসীরা) দেখিতেছে-ইহা (বিজয়) সুদূরপরাহত, কিন্তু আমরা দেখিতেছি—ইহা নিকটবর্তী।" -(৭০ : ৫-৭)

গভীর আশ্বাসে হযরতের হৃদয় ভরিয়া গেল। বিজয়ের সুখস্বপ্নে সকল দুঃখ যাতনা তিনি ভুলিলেন। আল্লাহ্তায়ালাকে তিনি বারে বারে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২৯

আল-মিরাজ

জায়েদকে সঙ্গে লইয়া হযরত ফিরিয়া চলিলেন। কিন্তু আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন : কোথায় যাইবেন? মক্কায় স্থান নাই; তায়েফে স্থান নাই; কোথায় তিনি এবার আশ্রয় লইবেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি প্রিয় জন্মভূমির দিকেই অগ্রসর হইলেন।

ষাট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে আসিয়া হযরত গতিভঙ্গ করিলেন। যে মক্কা হইতে তাঁহার স্বদেশবাসী তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, সেখানে অনাহূতভাবে ফিরিয়া যাওয়া সমীচীন কি না ভাবিতে লাগিলেন।

হযরত প্রথমেই মক্কায় প্রবেশ করিলেন না। মক্কায় কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন কি না জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কেহই প্রথমত: হযরতের অনুরোধ রক্ষা করিতে রাযী হইল না। অবশেষে মুতাএম নামক এক হৃদয়বান ব্যক্তি হযরতকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইনি সেই মুতাএম-যিনি কোরেশদিগের প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন করিয়া হযরতকে গিরি সংকট হইতে মুক্ত করিয়া আনিবার সৎসাহস দেখাইয়াছিলেন। হযরতের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আপন পুত্রদিগকে এবং স্বগোত্রের অন্যান্য লোকজনকেও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সদলবলে কাবা গৃহে উপস্থিত হইয়া ঘোষণা করিলেন : "শোন কোরেশগণ, মুহম্মদকে আমি অভয় দিয়াছি; অতএব সাবধান, তাঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।"

মুতাএমের এই সৎসাহসকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মুতাএম কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; অথচ হযরতের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির অন্ত ছিল না। মানবতার সহজ আহ্বানেই তিনি এতটা করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এতটুকু ন্যায়নিষ্ঠা ও ঔদার্য থাকিলেই আর কোন বিরোধের আশঙ্কা থাকে না।

হযরত মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কোরেশগণ আপতত: কোন উচ্চবাচ্য করিল না।

মক্কায় ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পর হযরত 'সওদা' নাম্নী এক বর্ষীয়ান বিধবাকে বিবাহ করিলেন। সওদা ও তাঁহার স্বামী বহু পূর্বেই ইসলামে দীক্ষিত হন এবং আবিসিনিয়ায় হিযরত করেন। কিছুকাল পরে সওদার স্বামীর মৃত্যু হয়; তখন সওদা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়েন। নিরাশ্রয়া সওদাকে তাই হযরত পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। শুধু তাহাই নহে, হযরতের প্রিয় শিষ্য আবুবকরের কন্যা কুমারী আয়েশাকেও তিনি এই সময় বিবাহ করেন। আয়েশা তখন সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। আবুবকরের সাধ ছিল আল্লাহ্‌র রসূলের সহিত তিনি রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাই বিবাহের বয়স না হইলেও তিনি তদীয় কন্যা আয়েশাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য হযরতকে অনুরোধ করেন। হযরত আবুবকরের এ বাসনা পূর্ণ করেন। বিবাহের অনুষ্ঠান তখনই সম্পন্ন হয়। তিন বৎসর পর বিবি আয়েশা স্বামীর ঘর করিতে আসেন।

www.pathagar.com

কিন্তু এই সময়ের সর্বপ্রধান ঘটনা : হযরতের মি'রাজ বা নভোভ্রমণ। এমন অলৌকিক ঘটনা বিশ্বজগতে আর কখনো ঘটে নাই। আমরা নিম্নে 'মেশকাত শরীফ' হইতে মি'রাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি :

রজনী দ্বিপ্রহর। ঘন অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। নিস্তব্ধ নির্জন চারিধার। সেদিন পাখী ডাকে নাই। একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া আছে। হযরত কাবাগৃহের চত্বরে ঘুমাইয়া আছেন, এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে : "মুহম্মদ"–হযরতের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া দেখিলেন, ফেরেশ্‌তা জিব্রাইল শিয়রে দণ্ডায়মান! অদূরে 'বোরাক' নামক একটি অদ্ভুত জ্যোতির্মিয় বাহন অপেক্ষা করিতেছে। ডানা বিশিষ্ট অশ্বের মত তাহার রূপ, ক্ষিপ্র তাহার গতিবেগ।

জিব্রাইল প্রথমেই হযরতের হৃদয় পরীক্ষা করিলেন। পূর্বের ন্যায় এইবারও তিনি তাঁহার হৃদয়কে শক্তিশালী করিয়া দিলেন। তারপর হযরতকে সেই বোরাকে চড়িবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

হযরত বোরাকে আরোহণ করিলেন। মুহূর্তমধ্যে বোরাক হযরতকে লইয়া জেরুজালেমের শীর্ষদেশে আসিয়া উপনীত হইল। জিব্রাইলের ইঙ্গিতে হযরত

সেইখানে অবতরণ করিলেন। বোরাককে বাহিরে রাখিয়া তিনি জেরুজালেমের মসজিদে প্রবেশ করিলেন এবং পরম ভক্তিভরে দুই রাকাত নামায পড়িলেন। হযরত সোলায়মানের প্রতিষ্ঠিত এই পবিত্র জেরুজালেম মস্‌জিদ হযরত মূসা ও হযরত ঈসার স্মৃতি ইহার সহিত চিরবিজড়িত। ইহাকেই কিবলা করিয়া হযরত মুহম্মদ এতদিন নামায পড়িতেন। আজ সেই পবিত্র স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তিনি নিজেকে ধন্য মনে করিলেন।

এখান হইতে জিব্রাইল হযরত মুহম্মদকে সঙ্গে লইয়া ঊর্ধ্ব আকাশ পানে উধাও হইয়া চলিলেন মুহূর্ত মধ্যে তাঁহারা প্রথম আসমানের প্রবেশদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিতেই ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল : "কে তুমি?" জিব্রাইল উত্তর দিলেন "আমি জিব্রাইল!" পুনরায় প্রশ্ন হইল ঃ" তোমার সঙ্গে উনি কে? উনি কি আল্লাহ্‌র বাণীপ্রাপ্ত হইয়াছেন? জিব্রাইল উত্তর দিলেন : "ইনি আল্লাহ্‌র রসুল, মুহম্মদ।" তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলিয়া গেল। হযরত মুহম্মদ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। জিব্রাইল বলিলেন : 'ইনি আপনার আদি পিতা হযরত আদম। ইহাকে সালাম করুন।"

হযরত সসম্ভ্রমে সালাম জানাইলেন। তখন হযরত আদম হযরত মুহম্মদকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিলেন : "মুবারক হো। হে আমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব!"

অতঃপর হযরত মুহম্মদ জিব্রাইলসহ দ্বিতীয় আসমানে উপনীত হইলেন। তথায় হযরত ঈসাকে দেখিতে পাইলেন। যথারীতি সালাম সম্ভাষণের পর হযরত ঈসা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হে ন্যায়দর্শী ভ্রাতা, খুশ আমদিদ।'

এইরূপে তৃতীয়, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে প্রবেশ করিয়া হযরত মুহম্মদ যথাক্রমে হযরত ইউসুফ, হযরত ইদ্রিস, হযরত হারুণ, হযরত মুসা ও

www.pathagar.com

হযরত ইব্রাহিমকে দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেককেই তিনি সালাম জানাইলেন এবং প্রত্যেকেই পুলকিত চিত্তে হযরতকে অভিনন্দিত করিলেন।[১]

ইহার পর হযরত মুহম্মদ আরও ঊর্ধ্বে "সেদ্‌রাতুল্‌মন্‌তাহা" পর্যন্ত উপনীত হইলেন। এইখানে আসিয়া জিব্রাইল আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু নিরস্ত হইলেন না; কাহার যেন ইঙ্গিতে একাই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহাশূন্যের সীমা প্রাচীর পার হইয়া অসীম দিগন্তে এই বুঝি মানুষের প্রথম প্রবেশ! কী অসাধারণ এই নভোভ্রমণ! কত বড় দুঃসাহসিক এই অভিযান! নিঃসঙ্গ নির্জন পথ–সঙ্গিহীন যাত্রী। একটিমাত্র অদৃশ্য ইঙ্গিতে আল্লাহ্‌র রসূল চলিয়াছেন আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে। বোরাক তাঁহার বাহন! সূর্য রশ্মির চেয়েও ক্ষিপ্র তাঁহার গতিবেগ। কোন্ অসীমে কত–দূরে–কোথায় গিয়া সে থামবে কে জানে। অদ্ভুত রহস্য লোকের মধ্য দিয়া আজ তাঁহার প্রমাণ! সকল জ্ঞানচিন্তা আজ স্তব্ধ। শুধু জাগিয়া আছে পরম ধ্যান আর আল্লাহ্‌র প্রতি এক পরম নির্ভর।

'বায়তুল মামুর' পর্যন্ত গিয়া বোরাক গতিভঙ্গ করিল। এই 'বায়তুল মামুর' কিছুই নহে, মক্কার কাবা গৃহেরই সত্যরূপ (Noumenon) অর্থাৎ মক্কার কাবা 'বায়তুল মামুরের'ই বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে যেখানে কাবা গৃহ দণ্ডায়মান, ঠিক তাহারই ঊর্ধ্ব দেশে সপ্তম আসমানে 'বায়তুল মামুর' অবস্থিত। বাস্তব জগতের সহিত এইখানের কোনই সম্বন্ধ নাই; ইহা নিছক ধ্যান বা কল্পনার জগৎ (world of Ideas)। ফেরেশ্‌তোরা প্রতিনিয়ত এখানে আল্লাহ্‌র গুণগানে মশগুল থাকে। এক অপূর্ব জ্যোতিতে এ স্থান চিরস্নিগ্ধ–চিরমনোরম! এইখানে আসিয়া হযরত আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিলেন। একটা পর্দার আড়াল টানিয়া আল্লাহ্‌ তাঁহাকে আত্মরূপ দর্শন করাইলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক গোপন কথা হইল। সৃষ্টি লীলার যে রহস্য তখনও হযরতের অজানা ছিল, এইবার তাহা সম্যকরূপে তিনি উপলব্ধি করিলেন; স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে তিনি সত্য করিয়া চিনিলেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধান লইয়া মুহূর্তমধ্যে হযরত কাবা গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, জগৎ যেমন চলিতেছিল, ঠিক তেমনি চলিতেছে।

ইহাই হইল মিরাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। নবুয়তের দশম বৎসর অর্থাৎ হযরতের পঞ্চাশ বৎসর বয়ক্রমকালে রযব মাসের ২৭ তারিখের রাত্রে এই মহাঘটনা সংঘটিত হয়।

মি'রাজ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন পাকে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করিয়াছেন :

"তাহারই মহিমা–যিনি তাঁহার দাসকে (মুহম্মদকে) এক রজনীতে পবিত্র মস্‌জিদ (কাবা) হইতে দূরতম মসজিদ[২] পর্যন্ত পরিভ্রমণ করাইয়াছিলেন।" –(১৭ : ১)

---

১. বর্তমান নভোবিজ্ঞানের ভাষায় এই 'সেদ্‌রাতুলমন্‌তাহাকেই সম্ভবত : Space frontier বলা হয়।

২. 'দূরতম মস্‌জিদ' (মস্‌জিদে আক্‌সা) অর্থে প্রায় সমস্ত তফসীরকারই 'বায়তুল মুকাদ্দাস' বলিতেছেন। কিন্তু আমার মনে হয় 'দূরতম মসজিদ' অর্থে আল্লাহ্‌ বায়তুল মুকাদ্দাসকে উদ্দেশ্য করেন নাই। 'বায়তুল মুকাদ্দাস' সম্বন্ধে 'দূরতম' বিশেষণ কেন প্রযোজ্য হইবে, বুঝা কঠিন। 'বায়তুল মামুর'কে দূরতম বলিলেই অর্থের অধিকতর সুসংগঠিত হয়। এইখানে যখন হযরতের পরিভ্রমণের দূরত্ব নির্দেশ

www.pathagar.com

অন্যত্র বলিতেছেন :

"অস্তগামী তারকার শপথ

তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) ভুল করেন না,

অথবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না;

অথবা নিজের ইচ্ছাতেও তিনি কিছু বলেন না।

ইহা তাঁহার নিকট প্রকাশিত পাক কালাম ছাড়া কিছুই নহে।

অসীম ক্ষমতাশালী প্রভু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শক্তির অধিকারী (আল্লাহ্) কাজেই তিনি (মুহম্মদ) পূর্ণতা লাভ করিলেন।

এবং তিনি (মুহম্মদ) আকাশের সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছিলেন এবং তারপর (আল্লাহ্‌র) নিকটবর্তী হইলেন এবং (আল্লাহ্ সমীপে) নত হইলেন।

তিনি ছিলেন দুই ধনজ্যা পরিমাণ।

অথবা তার চেয়েও বেশী নিকটবর্তী।

এবং তিনি (আল্লাহ্) তাহার ভৃত্যের (মুহম্মদের) নিকট যাহা প্রকাশ করিবার ছিল, প্রকাশ করিলেন।

যাহা তিনি (মুহম্মদ) দেখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় ভুল করে নাই। তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তোমরা কি অবিশ্বাস করিবে? এবং নিশ্চয়ই তিনি দ্বিতীয়বার তাঁহাকে দূরতম 'সেদ্‌রাতুলমন্‌তাহা'র নিকটে দেখিয়াছেন-

যাহার নিকট (পুণ্যাত্মদিগের) বাসস্থানের উদ্যান রহিয়াছে।

যখন সেই সেদ্‌রা (আল্লাহ্‌র জ্যোতিতে) আচ্ছাদিত হইল,

তখন তাঁহার চক্ষু ভ্রান্ত বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না।

নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার প্রভুর অনেক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখিলেন।"

-(৫৩ : ১-১)

করা হইতেছে তখন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের উল্লেখই স্বাভাবিক। হযরত মক্কার কাবা গৃহে নিদ্রিত ছিলেন, সেখান হইতে তিনি 'বায়তুল মুকাদ্দাস' হইয়া সপ্তম আসমান অতিক্রম করিয়া 'বায়তুল মামুর' পর্যন্ত অগ্রসর হন। কাজেই 'দূরতম মসজিদ' অর্থে 'বায়তুল মামুর' হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ হইলে ইহার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য বুঝাও সহজ হয়। মক্কায় কাবা হইতেছে বস্তু জগতের, আর বায়তুল মামুর' হইতেছে ধ্যান জগতের। কাজেই কাবা হইতে 'বায়তুল মামুর' পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছিল বলিলে এই কথাই বুঝা যায় যে, বস্তুজগৎ হইতে হযরতকে ধ্যান জগতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩০

অন্ধকারের অন্তরালে

যে-রাত্রে মি'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইল, তাহার পরদিন প্রত্যূষে হযরত মস্‌জিদে গিয়া তাঁহার সাহাবাদিগের নিকট এই কথা প্রকাশ করিয়া দিলেন। ইহাতে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। অনেকে ইহা বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু যাহাদের ঈমান দুর্বল ছিল, তাঁহারা ইহা অসম্ভব ও অলীক বলিয়া মনে করিলেন। রসূলুল্লাহ্‌র সততা সম্বন্ধে অনেকের এইবার সন্দেহ জন্মিল। কয়েকজন সাহাবা আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন : আবুবকর, এইবার কি বলিতে চাও? মুহম্মদকে খুব ত বিশ্বাস কর। এখন তিনি যে বলিতেছেন, গতরাত্রে তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়া গতরাতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাও কি সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? ইহাও কি সম্ভব? আবুবকর বলিলেন : তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। হযরত এমন কথা বলিতে পারেন না। প্রতিবাদকারীরা বলিলেন : বিশ্বাস না হয়, আস, তিনি মস্‌জিদেই আছেন। তখন আবুবকর বলিলেন : যদি তিনি বলিয়া থাকেন, তবে সত্য বলিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যদি তিনি একটি দিনের তরেও কোন মিথ্যা না বলিয়া থাকেন বা ছলনা না করিয়া থাকেন, তবে আজ কেন তাহা করিবেন? কাজেই তিনি বলিয়া থাকিলে মিথ্যা বলেন নাই। জিব্রাইল আল্লাহর বাণী লইয়া ক্ষণিকের মধ্যে যদি বেহেশ্‌ত হইতে দুনিয়ায় নামিয়া আসিতে পারে, তবে আল্লাহ্‌র রসুল কেন সেরূপ দ্রুতগতিতে আকাশ ভ্রমণ করিতে পারিবেন না? আমি তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মস্‌জিদের দিকে চলিলেন। রসূলুল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ হইতে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : "লোকেরা যাহা বলিতেছে তাহা কি সত্য? আপনি কি এইরূপ কথা বলিয়াছেন?" হযরত বলিলেন : "হ্যাঁ আমি এই কথা বলিয়াছি।" তখন আবুবকর বলিলেন : "আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি সত্যই আল্লাহ্‌র রসূল।" "তুমি সিদ্দীক"-এই বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ আবুবকরকে সম্ভাষণ জানাইলেন। সেই হইতেই আবুবকর 'সিদ্দীক' (বিশ্বাসী) উপাধি লাভ করিলেন।

কিন্তু কোরেশগণ যখন এই কথা শুনিল, তখন তাহারা ইহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। সশরীরে বেহেশ্‌ত গমন বা আল্লাহ্‌র দিদার লাভ ত দূরের কথা, একরাতে বায়তুল-মুকাদ্দাস পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসাও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তাহারা মনে করিল। এ সম্বন্ধে কোরআনের যে আয়াত নাযিল হইল তাহাতেও তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল না সকলে বলিতে লাগিল : "মুহম্মদ, তুমি একটি আস্ত পাগল! একরাত্রে কেহ কখনও ৫০০ মাইল দূরবর্তী স্থান ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে? আচ্ছা, তুমি যদি জেরুজালেমেই গিয়াছ, তবে বল জেরুজালেমের মস্‌জিদটি কিরূপ?" কোরেশদিগের অনেকেই জেরুজালেমে গিয়াছিল, সেখানকার পবিত্র মস্‌জিদের কোথায় কি আছে না আছে সমস্তই তাহারা জানিত। হযরত মুহম্মদ যে জীবনে কখনও জেরুজালেমে যান নাই বা সে স্থান চোখেও দেখেন নাই, একথাও তাহারা অবগত ছিল। কাজেই তাহারা হযরতকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রশ্ন করিয়া বসিল। ভাবিল, এইবার মুহম্মদ নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তাহাও কি সম্ভব? হযরতের মানস চোখে জেরুজালেমের মস্‌জিদটি তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠিল; হুবহু তিনি তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া চলিলেন। যে যত রকমেই প্রশ্ন করিল, পুংখানুপুংখরূপে তিনি তাহার উত্তর দিতে লাগিলেন।

কোরেশগণ অবাক হইয়া গেল। কিন্তু হইলে কি হয়? পাষাণ ত সহজে গলিবার নহে! এত বড় প্রমাণ পাইয়াও কোরেশগণ হযরতকে আল্লাহ্‌র রসূল বলিয়া স্বীকার করিল না; বরং তাঁহার উপর আরও অধিক কুপিত হইয়া উঠিল। ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। প্রমাণের অভাবেই যে মানুষ সত্যকে গ্রহণ করে না, তাহা ত নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রমাণ পাইলে আরো জোরের সহিত জিদ করিয়া তাহারা সত্যকে অস্বীকার করে। সত্যকে বর্জন করা সহজ, কিন্তু সেই বর্জিত সত্যকে পুনর্গ্রহণ করা সহজ নহে। মানুষ যেখানে জ্ঞাতসারেই অন্ধ হয়, সেখানে তার নয়ন কোণে বাহির হইতে যতই আলোকপাত কর, সে দেখিবে না। কোরেশদিগের বেলায়ও ঠিক তাহাই হইল। যতই তাহারা হযরতের সত্যতার প্রমাণ পাইতে লাগিল, ততই তাহারা তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে লাগিল।

মি'রাজের পর হইতে হযরত প্রকৃতপক্ষে নজরবন্দী অবস্থায় বাস করিতে লাগিলেন। বাহিরে কোথাও প্রচার করা তাঁর পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। মক্কাবাসীদিগের নিকট নিতান্ত কৃপার পাত্র হইয়া তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বাৎসরিক হজ বা তীর্থ মেলার সময় উপস্থিত হইল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সময় মক্কাবাসীরা সকল প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ ও আত্মকলহ হইতে বিরত থাকিত। হযরত এই সুযোগে বাহিরে আসিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট সত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ হযরতের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিল না বটে, কিন্তু অন্য উপায়ে তাহারা হযরতের প্রচার প্রচেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। তিনি যেখানেই যে গোত্রের নিকট যাইতে লাগিলেন, সেইখানেই একদল লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল এবং মুহম্মদকে পাগল ভণ্ড ইত্যাদি বলিয়া পরিচয় দিয়া সকলকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে পরামর্শ দিল।

হযরত প্রতি গোত্রের নিকট হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। দিকে দিকে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল।

এই অন্ধকারের অন্তরালে নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে একটি স্থান হইতে সহসা একটা আশার আলো বিকীর্ণ হইয়া উঠিল।

মক্কার অনতিদূরে আল আকাবা নামক একটি উপত্যকা আছে। একদিন হযরত বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইলেন ছয়জন যাত্রী সেখানে বিশ্রাম করিতেছেন। হযরত পরিচয় লইয়া জানিলেন, তাঁহারা ইয়াস্রেব (মদিনা) হইতে আসিয়াছেন। হযরত তাঁহাদের নিকট নিজের ধর্মমত প্রচার করিলেন। হযরতের মুখনিঃসৃত অমিয়মাখা বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন : ইনিই কি তবে সেই পয়গম্বর–যাঁহার কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি?

এইখানে মদিনা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। মক্কা হইতে ২৭০ মাইল উত্তরে মদিনা নগরী অবস্থিত। মদিনায় শুধু যে আরবেরাই বাস করিত তাহা নহে। জেরুজালেম হইতে বিতাড়িত অনেক ইহুদীও এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনাবাসী আরবদিগের মধ্যে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল : আউস্ এবং খাজ্‌রাজ! উভয়

www.pathagar.com

দলের মধ্যে আদৌ কোন সদ্ভাব ছিল না। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। ইহুদীরা সুযোগমত কখনও বা এই দলে, কখনও বা অপর দলে যোগ দিত। এই কারণে মদিনাবাসীদের উপর ইহুদীবাসীদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল।

মক্কায় যে একজন পয়গম্বরের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তিনি যে কোরেশদিগের মধ্যে ভীষণ এক ধর্মবিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কথা মদিনাবাসী নানা সূত্রে অবগত ছিল। ইহুদীরাও এই কথা জানিত। হযরত তাই মদিনাবাসীদিগের একবারে অপরিচিত ছিলেন না।

যাহাই হউক, আকাবায় সমবেত ছয়জন যাত্রী হযরতের নিকট বয়েৎ লইয়া সেবারকার মত দেশে ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর হজের সময় তাহারা অধিক সংখ্যায় আসিবেন বলিয়া হযরতকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। এইরূপে ইসলামের জ্যোতি সকলের অলক্ষ্যে মদিনা নগরে প্রবেশ করিল।

হযরত নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার স্বপ্ন একটা ক্ষীণ আশার সূত্রে দুলিতে লাগিল।

নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আবার হজের সময় উপস্থিত হইল। হযরত সতৃষ্ণনয়নে মদিনাবাসীদিগের পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

মদিনা হইতে এইবার সত্য সত্য অধিকসংখ্যক লোক হজ করিতে আসিলেন। পূর্বোক্ত আকাবা উপত্যকায় তাঁহারা হযরতের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিলেন। আউস্ ও খাজ্‌রাজ গোত্রের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত তাহাদিগের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইলেন। নূতন আশায় তাঁহার মন দুলিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি সকলকে যথারীতি উপদেশ দান করিলেন। উপদেশ শুনিয়া মদিনাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তখন যাত্রীদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ দ্বাদশ ব্যক্তি হযরতের হাতে হাত রাখিয়া নিম্নলিখিতরূপে শপথ করিলেন :

১. আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদৎ করিব এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার শরীক করিব না।

২. ব্যভিচার করিব না।

৩. চুরি করিব না।

৪. আপন সন্তান সন্ততিকে হত্যা করিব না।

৫. কাহারও বিরুদ্ধে চোগলখোরী করিব না।

৬. প্রত্যেক সৎকার্যে আল্লাহ্‌র রসূলকে মানিয়া চলিব; ন্যায্য কাজে তাঁহার অবাধ্য হইবনা।

ইহাই 'আকাবার প্রথম বাইয়াৎ' নামে পরিচিত।

আকাবার এই 'বাইয়াৎ' রসূলুল্লাহর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। অন্ধকারের মধ্যেই ইহাই প্রথম আশার আলোকপাত। মুসলমানের বিজয় অভিযান এইখান হইতেই শুরু হইল। মক্কা বিজয়ের ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। এই মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিকদল সেদিন কী অসীম দুঃসাহস ও বলিষ্ঠ মনোবলেরই না পরিচয় দিয়াছিলেন। যে পথে কেউ চলে নাই সেই অজানা কঠিন পথে তাঁহারাই প্রথম পা বাড়াইলেন। ইসলামের বিশ্বজোড়া বিজয় গৌরবের মূলে রহিয়াছে প্রথম কয়েকজন শিষ্যের গভীর সত্যানুরাগ ও সত্যকে জয়যুক্ত করিবার কঠিন সংকল্প গ্রহণ।

www.pathagar.com

পাঠক, এই শপথ গ্রহণের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবেন। হযরত নবদীক্ষিতদিগের নিকট হইতে কোন স্বার্থমূলক শর্ত দাবী করেন নাই, 'প্রত্যেক সৎকার্যে আল্লাহ্‌র রসুলকে মানিয়া চলিব'—ইহাই মাত্র তাঁহার দাবী। কতখানি সততা, সাহস ও উদারতার পরিচয় ইহা। আপন প্রচারিত ধর্মমতকে অভ্রান্তরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, অথবা স্বীয় চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের নিষ্কলঙ্ক মাধুর্য দ্বারা শিষ্যের হৃদয়কে বশীভূত করিবার মত যোগ্যতা ও আত্মপ্রত্যয় না থাকিলে কোন ধর্মগুরু এমনভাবে কাহাকেও শিষ্যত্বে বরণ করিতে সাহস করিবে না। গুরুর কোন্ আদেশ মানা হইবে, কোন্‌টি হইবে না, সে বিচারভার শিষ্যের হস্তে। চিন্তা ও কার্যের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া কাহাকেও দীক্ষা দিতে যাওয়া গুরুর পক্ষে নিশ্চয়ই মারাত্মক! যে মুহূর্তে গুরুর কার্যে এবং বাক্যে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, যে মুহূর্তে শিষ্যের কাছে গুরুর কোন ভণ্ডামি ধরা পড়িবে, যে মুহূর্তে গুরু কোন অন্যায় বা জঘন্য আচরণ করিবে, অথবা যে মুহূর্তে গুরুর কোন কার্যে শিষ্যের প্রাণ সাড়া দিতে চাহিবে না, সেই মুহূর্তেই সে স্বাধীন, সেই মুহূর্তেই সে গুরুকে বর্জন করিতে পারিবে—ইহাই হইতেছে এই শপথের তাৎপর্য। ইহা একদিক দিয়া শিষ্যের বিচার-বুদ্ধির বন্ধন-মুক্তি সন্দেহ নাই; কিন্তু অন্যদিক দিয়া গুরুর দুর্জয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়েরও প্রকৃষ্ট পরিচয়। একদিক দিয়া ইহা বন্ধনের মুক্তি, কিন্তু অপরদিক দিয়া ইহাই মুক্তির বন্ধন। গুরু যদি শক্তিমান হয়, উদ্দেশ্য যদি সাধু হয়, তবে শিষ্য কেন তাহার বিধিনিষেধ মানিবে না? মানিতেই হইবে। আপন চরিত্র দিয়া, আদর্শ দিয়া, প্রভাব দিয়া গুরু শিষ্যকে তাহার বশে আনিবেই—এমনি অটল আত্মবিশ্বাস থাকিলে তবেই গুরু তাহার শিষ্যদিগকে অতখানি মুক্তবুদ্ধির অধিকার দিতে পারে—অন্যথায় নহে। হায়! আজ যদি আমাদের ধর্ম সমাজ বা রাষ্ট্র গুরুরা হযরতের এই আদর্শ গ্রহণ করিতেন! শিষ্যদিগকে এতখানি অধিকার দিলে গুরুরা নিশ্চয়ই আদর্শস্থানীয় না হইয়া পারিতেন না। তাঁহাদিগকেও ভিতরে ভিতরে আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইত, তাঁহাদিগকেও আত্মোন্নতির জন্য সাধনা করিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইহা দ্বারা গুরু শিষ্য উভয়েই উপকৃত হইতেন, দেশের কল্যাণ হইত।

বয়েৎ গ্রহণের পর সকলের প্রস্থান করিবার সময় উপস্থিত হইল। মদিনাবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধক্রমে হযরত তখন ভক্ত প্রবর মোসাএব বিন ওমায়েরকে তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। মোসাএব ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির পুত্র। চিরদিন তিনি বিলাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তিনি দীন দরিদ্র বেশে কাল কাটাইতেছিলেন। পবিত্র কোরআনে তাঁহার অগাধ অধিকার ছিল। হযরত তাঁহাকে পাঠাইলেন মদিনায়—ইসলামের আচার্য ও প্রচারকরূপে।

মোসাএব মদিনায় পৌঁছিয়া নবদীক্ষিত মুসলমান নরনারীদিগকে ধর্মকর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে বিভিন্ন গোত্রের অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এখানেও যে বাধার সৃষ্টি হইল না এমন নহে। মোসাএব মদিনায় আসিয়া আসাদ বিন জারারা নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কিরূপে ইসলাম প্রচার করা যায়, উভয়ে তাহা পরামর্শ করিতেন। প্রচার-কার্যে আসাদ মোসাএবকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। উভয়ের চেষ্টায় ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচার লাভ করিতে লাগিল, তখন আশ্‌হাল গোত্রের দলপতি সা'দ ইব্‌নে-মা'আজ এবং বনু জাফর গোত্রের দলপতি উসায়েব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মোসাএব এবং আসাদের জন্যই যে মদিনায় ধর্মবিপ্লব দেখা দিতেছে, ইহা তাঁহারা ভালভাবেই বুঝিতে পারিলেন। ইঁহাদিগকে দমন করিবার জন্য তাই উভয়ে তৎপর হইয়া উঠিলেন।

একদিন আসাদের গৃহে বিশিষ্ট মুসলমানদিগের একটি পরামর্শ সভা হইতেছিল। সংবাদ পাইয়া সা'দ উসায়েবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন : "বসিয়া বসিয়া কি করিতেছ? দেখিতেছ না মোসাএব ও আসাদ আমাদের কি সর্বনাশ করিতেছে? যাও, তুমি গিয়া ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা দিয়া আইস এবং বলিয়া আইস, আমাদের গোত্রের কাহারও উপর যেন তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করে। আমি নিজেই যাইতাম, কিন্তু পাজী আসাদটা আমারই খালাতো ভাই। অন্যথায় ওর মাথাটা আমি কাটিয়া আনিতাম।"

উসায়েব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আসাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মোসাএবকে দেখিতে পাইয়া তিনি কর্কশ ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিলেন : "শীঘ্র মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাও নতুবা ভাল হইবে না।"

মোসাএব তদুত্তরে ধীরে নম্রস্বরে বলিলেন "আসুন, বসুন। আমাদের বক্তব্য শুনুন, তারপর যদি কিছু অন্যায় দেখেন, বলিবেন।"

মোসাএবের এইরূপ ভদ্র ব্যবহারে উসায়েব একটু লজ্জিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। মোসাএব তখন ইসলামের মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং সুললিত সুরে মাঝে মাঝে কোরআনের আয়াত পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ উসায়েবের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল, ফলে তিনি সেখানেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন।

এদিকে সা'দ উসায়েবের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে উসায়েব ফিরিয়া আসিলে তাঁহার হাবভাব দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন : "কিহে, কতদূর কী করিয়া আসিলে?" উসায়েব নিজের ধর্ম পরিবর্তনের কথা আপাতত: প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন : "আপনার নির্দেশমত সমস্তই আমি উহাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু আপনার সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহারা কোন কিছুই করিতে রাজী নহে, কাজেই আপনার সেখানে একবার যাওয়া নিতান্ত দরকার।"

সা'দ মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই উত্তেজিত অবস্থাতেই তিনি আসাদের গৃহপানে ধাবিত হইলেন।

মোসাএব ও আসাদকে একত্রে দেখিতে পাইয়া সা'দও গালাগালি দিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহার বিনিময়ে মোসাএব পূর্ববৎ নম্র ধীরভাবে সা'দকে আহ্বান করিলেন এবং ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, ক্ষণকালের মধ্যে সা'দও মন্ত্রমুগ্ধবৎ বশীভূত হইয়া প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি আপন লোকদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন : "হে আশ্‌হাল গোত্রের লোকগণ, তোমরা আমাকে কী মনে কর, বল?"

সকলে সমস্বরে উত্তর দিল : "আপনি আমাদের গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমাদের নেতা।"

www.pathagar.com

"তবে শোন, আমি মুসলমান হইয়াছি; আমি আর এখন তোমাদের কেউ নই। যে পর্যন্ত না তোমরা মুসলমান হইতেছ, সে পর্যন্ত আমার সহিত তোমাদের কোন সংস্রব নাই।"

উসায়েব পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনিও সুযোগ বুঝিয়া ঘোষণা করিলেন যে, তিনিও মুসলমান হইয়াছেন। উভয় দলের সমস্ত লোক তখন বিনা বাক্যব্যয়ে আপন আপন নেতাদের অনুসরণ করিল। এইরূপে আশহাল ও জাফর গোত্রের লোকেরা মুসলমান হইয়া গেল।

মক্কায় হযরতের নিকট এই সমস্ত খবর পৌঁছিতে লাগিল। এই সফলতার সূচনায় মনে মনে তিনি সহস্রবার আল্লাহ্‌তায়ালাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আরও একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। আকাবা হইতে যে সব মদিনাবাসী বয়েৎ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তরুণ যুবক মা'জ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু তাহার পিতা (আমর) তখনও ছিলেন ঘোর পৌত্তলিক। মনাৎ ঠাকুরের সুন্দর একটি মূর্তি তিনি গৃহে রাখিয়াছিলেন। মা'জ তখন মহল্লার অন্যান্য তরুণ মুসলিম যুবকদের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন—কি করিয়া তাঁহার পিতাকে এই মূর্তিপূজা হইতে বিরত করা যায়। সকলে একটা যুক্তি স্থির করিলেন। একদিন রাত্রে গোপনে তাঁহারা সবাই মিলিয়া মূর্তিটিকে নর্দমায় ফেলিয়া রাখিয়া আসিলেন। পরদিন আমর মূর্তি না দেখিয়া মহাখাপ্পা হইয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিলেন এবং যাহারা এই কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে ধরিতে পারিলে সমুচিত শাস্তি দিবেন বলিয়া শাসাইলেন। অতঃপর বহু চেষ্টায় তিনি মূর্তিটির সন্ধান পাইলেন এবং নর্দমা হইতে তুলিয়া আনিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন। দুই-একদিন পরে আবার মূর্তি চুরি। আবার সেই নর্দমায় পুনঃপ্রাপ্তি। কয়েকদিন এইরূপ হইবার পর আমর একদিন রাত্রিবেলায় নিজের তরবারি দেবমূর্তির পায়ের তলায় রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "হে ঠাকুর, দুষ্কৃতকারীদিগকে তুমি শাস্তি দিও।" কিন্তু তাহার পরদিনও দেখা গেল, দেবমূর্তি উধাও এবং সেই একই স্থানে তিনি শায়িত। তখন আমরের চৈতন্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন : পাষাণ দেবতার কোনই শক্তি নাই। থাকিলে নিশ্চয় সে তরবারি তুলিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই উপলব্ধির ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩১

হিযরতের পূর্বাভাষ

দেখিতে দেখিতে আরও একটি বৎসর কাটিয়া গেল। পুনরায় হজের সময় আসিল।

এইবার মদিনা হইতে প্রায় ৫০০ যাত্রী হজ করিতে আসিলেন। সেই সঙ্গে ৭৩ জন মুসলিম পুরুষ ও দুই জন নারীও মক্কায় আসিয়া পৌঁছিলেন।[১] ইতিপূর্বে মক্কা হইতে হযরতের যে-কতিপয় শিষ্য মদিনায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, আগন্তুক দলের মধ্যে তাঁহাদেরও কেহ কেহ ছিলেন। হযরতের উপর যে কোরেশগণ অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে এবং মক্কায় তাঁহার জীবন যে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এইকথা মদিনাবাসী মুসলমানেরা অবগত ছিলেন। তাই তাঁহারা হযরতকে মদিনায় লইয়া যাইবার জন্য মক্কায় আসিলেন।

হযরত মদিনাবাসীদিগের আগমন-সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। স্থির হইল, সেই আকাবা পর্বতের নির্জন পাদদেশে তিনি গোপনে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

জিল্‌হজ্জ মাসের ১২ই তারিখে গভীর রাত্রে হযরত আকাবার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিলেন হযরতের অন্যতম পিতৃব্য আব্বাস। আবু তালিবের মৃত্যুর পর আব্বাসই ছিলেন হযরতের নিকটতম আত্মীয়। আবু তালিবের ন্যায় তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, অথচ হযরতের প্রতি তাঁহার স্নেহের অন্ত ছিল না। পাছে কোরেশগণ এই গোপন বৈঠকের কথা জানিতে পারিয়া হযরতের কোন অনিষ্ট সাধন করে, অথবা অন্য কোন আপদ-বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কাতেই আব্বাস হযরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন।

আকাবা উপত্যকায় উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হইল। মদিনাবাসীরা হযরতকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। তখন আব্বাস তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "আপনারা মুহম্মদকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, কিন্তু ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আগাগোড়া ভাবিয়া দেখুন। মুহম্মদকে লইতে গেলে আপনাদিগকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। মক্কাবাসীরা আপনাদের উপর ক্ষেপিয়া যাইবে এবং খুব সম্ভব আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। তখন যদি আপনারা বিপদ দেখিয়া পশ্চাৎপদ হন?"

আব্বাসের কথাগুলি কাহারও ভালো লাগিল না। সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন : 'রাসুলুল্লাহ্ নিজে কি বলেন, তাহা আমরা জানিতে চাই।"

তখন হযরত প্রথমে কোরআন পাঠ করিয়া সকলের অন্তর আল্লাহ্‌র দিকে রুজু করাইয়া দিলেন। তারপর ইসলামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বলিতে

---

১. এই দুইজন নারীর নাম নুসাইবা ও আস্‌মা। নুসাইবা বীর-রমণী ছিলেন। পরবর্তীকালে রসূলুল্লাহ্‌র সহিত তিনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাঁহার ছিল দুই পুত্র : হাবীব ও আবদুল্লাহ্। ইয়ামামার ভণ্ড নবী মুসাইলিমা ঘটনাক্রমে হাবীবকে বন্দী করে এবং তাঁহার ইসলাম প্রীতির জন্য তাঁহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলে। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুসলিম সেনাদল যখন মুসাইলমার বিরুদ্ধে ইয়ামামার অভিযান করেন, তখন নুসাইবাও তাহাদের সঙ্গে যান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মুসাইলিমা নিহত না হওয়া পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ করিতে থাকেন। যুদ্ধশেষে যখন তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার সঙ্গে তরবারি ও বর্শার বারোটি আঘাত দৃষ্ট হইয়াছিল। —(ইবনে-ইসহাক)

www.pathagar.com

লাগিলেন : "আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত। তবে একটি কথা। আমার সঙ্গে আমার শিষ্যদিগের কথাও তোমাদিগকে ভাবিতে হইবে। মক্কায় আমার যে সমস্ত শিষ্য আছে, তাহাদিগকে ফেলিয়া আমি একা যাইতে পারি না। তাহাদিগকে তোমাদের আশ্রয় দিতে হইবে, রক্ষা করিতে হইবে। তোমাদের ন্যায় তাহারাও যখন সত্যের সৈনিক, তখন তোমাদের সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য নাই। আমার নিজের জন্য আমি বেশী কিছু বলিতে চাহি না। আমি যখন তোমাদেরই একজন হইয়া যাইতেছি, তখন তোমরা নিজের পরিজনবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর, আমার প্রতিও সেইরূপ করিবে। স্বগোত্রের বা স্বজনগণের কেহ যদি বিপদে পড়ে, তখন তোমরা যেরূপ তাহাকে রক্ষা করিবার চিন্তা করিয়া থাক, আমাকেও ততটুকু করিবে-ইহার বেশী নহে। আমিও তোমাদের সহিত ঠিক তদ্রূপই ব্যবহার করিব। তোমাদের বন্ধুর আমি বন্ধু হইব, শত্রুর শত্রু হইব। সর্বোপরি যে আল্লাহ্‌র পাক-কালামকে তোমরা গ্রহণ করিবে, প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবে এবং সত্য প্রচারে যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবে-ইহাই আমার প্রস্তাব।"

তখন সকলে উল্লসিত হইয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন : "প্রস্তুত, আমরা প্রস্তুত। জীবনে-মরণে আমরা আপনার চিরসঙ্গী হইয়া রহিব; কোন বাধা, কোন বিপদকে আমরা মানিব না। আপনার জন্য-ইস্‌লামের জন্য সত্যের জন্য আল্লাহ্‌র জন্য আমরা আমাদের জান-মাল কুরবান করিব। মক্কায় আপনারা যে সকল শিষ্য আছেন, তাঁহাদিগকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। সকলকে ভাইয়ের মত ভালবাসিব। প্রয়োজন হইলে কোরেশদিগের সহিত আমরা যুদ্ধ করিব। হে রসূলুল্লাহ্, আমাদিগকে বাইয়াৎ করুন।"

হযরত তখন মদিনাবাসীগণকে বাইয়াৎ করিলেন। হযরতের হাতে হাত রাখিয়া সকলে দীক্ষা লইলেন। নীরব আকাশের তলে নির্জন বনানীর পাদদেশে অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের জন্য একদল লোক এইরূপে শপথ গ্রহণ করিল। কল্যাণ-বুদ্ধির এমন শুভ উন্মেষ খুবই বিরল।

ইহাই 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াৎ'। আধুনিক রাজনৈতিক পরিভাষায় ইহাকে একটি গোপন চুক্তি বা Pact বলা যাইতে পারে।

শপথ-গ্রহণ শেষ হইলে হযরত বলিলেন : "তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে দ্বাদশ ব্যক্তিকে প্রতিনিধি মনোনীত করিয়া দাও। হযরত ঈসার, দ্বাদশ শিষ্যের[২] ন্যায় তাহারা আমাকে কেন্দ্র করিয়া সত্য প্রচার করিবে।"

---

২. যিশুখ্রীষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের নাম : Simon (Peter), Andrew, James (Son of Zebedee), John, Philip, Bartholomew, Thomas, Mathew, James, (Son of Alphaeus), Labbaeus, Simon (The Canaanite) এবং Judas Iscariot. ইঁহারা যিশুর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কিন্তু ইঁহারাই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যিশুকে ইহুদীদের হস্তে ধরাইয়া দিল। Judas Iscriot মাত্র ত্রিশটি টাকার লোভে আপন ধর্ম গুরুকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করে। এই বিপদের দিনে অন্যান্য শিষ্যেরাও যিশুকে কোনরূপ সাহায্য না করিয়া পলাইয়া যান, ফলে যিশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু হযরত মুহম্মদের দ্বাদশ শিষ্য সম্বন্ধে (শুধু দ্বাদশ কেন, কোন শিষ্য সম্বন্ধেই) বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ আজ পর্যন্ত কেহ দিতে পারে নাই। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের প্রায় সকলেই আল্লাহ্, রসূল এবং ইসলামের জন্য শহীদ হইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

হযরতের আদেশক্রমে তখন আউস্ ও খাজ্রাজ গোত্র হইতে নিম্নলিখিত দ্বাদশ ব্যক্তি মনোনীত হইলেন : (১) আবু ঈমামা আসাদ বিন্ জোরারা, (২) সা'দ বিন্ রাবী, (৩) আবদুল্লাহ্ বিন্ রওয়াহা, (৪) রাফী বিন্ মালিক, (৫) বারা বিন্ মারুর, (৬) আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর, (৭) ওবাদা বিন্ সামিত, (৮) সা'দ বিন্ ওবাদা, (৯) মোনজার বিন্ আমর, (১০) উসায়েদ বিন্ হুজায়ের, (১১) সা'দ বিন্ খাইসামা, (১২) রিফা বিন্ আবুল মন্জির।

হযরত সকলকে উপদেশ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হইল।

সফলতার আসন্ন আনন্দে রসুলুল্লাহ্র নয়ন-যুগল অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

বাহিরের কর্ম-কোলাহলের অন্তরালে এত বড় একটা ঐতিহাসিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল। এই চুক্তির মূল্য বা গুরুত্ব যে কতখানি তাহা পাঠক একটু পরেই উপলব্ধি করিবেন।

অদ্ভুত আল্লাহ্র খেলা। হেলা-ফেলার ভিতর দিয়া কি কৌশলেই না আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় রসুলের জন্য একটা নিরাপদ গুপ্ত আশ্রয়স্থল রচনা করিয়া রাখিলেন। কোরেশগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিল না।

আকাবার এই দ্বিতীয় শপথ জগতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই দিন এইখানে পাপ-পুণ্যের এক জীবন-মরণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং জগতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে পুণ্যের জয় হইয়াছে। যদি এই দিন মদিনাবাসী মুসলমানেরা হযরতকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ না করিতেন, যদি তাঁহারা সত্যের জন্য এমন করিয়া যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত না হইতেন, তবে ইসলামের বিজয়-অভিযান কেমন করিয়া কোন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইত, বুঝা কঠিন। জগতের সমস্ত কল্যাণ ও মুক্তির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল, পাপ ও অনাচারের স্রোতে ধরণী ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল; পুণ্যভূমি মদিনা সেই চরম অভিশাপ হইতে নিশ্চয়ই সেদিন পৃথিবীকে রক্ষা করিয়াছে।

বস্তুত মদিনাবাসী মুসলমানদিগের 'আনসার' (মিত্র) নাম সত্যই সার্থক হইয়াছে। তাঁহারা শুধু হযরত মুহম্মদের মিত্র নহেন-পুণ্য, কল্যাণ ও মানবতারও মিত্র।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩২
শিষ্যদিগের প্রস্থান

কাফেলা মদিনায় ফিরিয়া গেল।

কোরেশগণ গুপ্তচরদিগের মুখে শুনিতে পাইল মদিনাবাসীদিগের সহিত মুহম্মদের একটি গোপন চুক্তি হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা মুহম্মদকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সংবাদে কোরেশগণ আবার উত্তেজিত হইয়া উঠল।

এইদিকে হযরত তাঁহার শিষ্যদিগকে আপন-আপন সুবিধামত গোপনে গোপনে মদিনায় প্রস্থান করিতে উপদেশ দিলেন। গৃহ-সুখ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ ও জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া সত্যের সেবকগণ অম্লান বদনে তাহা করিতে প্রস্তুত হইলেন। মুসলমানের স্বদেশ যে ভৌগোলিক নহে-আদর্শভিত্তিক, এই সত্যেরই সেদিন রেখাপাত করা হইল।

মুসলমানগণ মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে কোরেশদলপতিগণ প্রথমত বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল না। তাহারা মনে করিল, আপদ দূর হইয়া যায়, ভালই। শিষ্যগুলি দেশত্যাগ করিলে মক্কাভূমি অধিকতর নিরাপদ হইবে এবং মুহম্মদ সহায়হীন হইয়া পড়িবে; তখন তাঁহাকে দমন করা কষ্টকর হইবে না। ইহাই মনে করিয়া তাহারা মুসলমানদিগকে বাধা দিবার সেরূপ কোন ব্যাপক চেষ্টা করে নাই। কিন্তু শীঘ্রই তাহারা মত পরিবর্তন করিল। শিকারকে ছাড়িয়া দেওয়ার পূর্বে লোকে যেমন তাহার প্রতি অহেতুক নির্যাতন করিয়া আনন্দ পায়, কোরেশগণ সেই নিষ্ঠুর আনন্দের লোভে মাতিয়া উঠিল। ভাবিল, ধর্মদ্রোহীরা যখন চলিয়াই যাইতেছে, তখন যাহাকে যেরূপ পারা যায়, একটু শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দিলে ক্ষতি কি? ইহাই ভাবিয়া তাহারা মুসলিম দলনে প্রবৃত্ত হইল।

তখনকার নির্যাতন-কাহিনী শ্রবণ করিলে একদিকে যেমন মুসলমানদিগের দুঃখে হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের সত্যাগ্রহ, কষ্টসহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ও মহত্ত্ব দেখিয়া গৌরবে বুক ভরিয়া উঠে। আমরা নিম্নে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :

সোহায়েব রুমী নামক এক ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ মক্কায় বাস করিতেছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া তিনি প্রভূত ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। সোহায়েব মদিনা যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া কোরেশগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল : "তুমি আমাদের দেশে আসিয়া ব্যবসা করিয়া আমাদেরই অর্থে বড়লোক হইয়াছ। সেই অর্থ লইয়া এখন তুমি মদিনায় পালাইয়া যাইবে, তাহা হইবে না। যদি যাও, তবে তোমার সমস্ত অর্থ আমাদিগকে দিয়া যাইতে হইবে।"

কোরেশগণ ভাবিল, আজীবন পরিশ্রম করিয়া সোহায়েব যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিছুতেই সে রিক্ত হস্তে মদিনায় যাইতে রাযী হইবে না।

সোহায়েব উত্তর দিলেন : "বুঝিতে পারিয়াছি। এই অর্থের জন্যই তোমাদের আপত্তি?"

কোরেশগণ বলিল : "হ্যাঁ।"

www.pathagar.com

সোহায়েব তদুত্তরে বলিলেন : "বেশ। যদি আমি এই অর্থের দাবী না করি?"

কোরেশগণ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল : "তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই।"

"তথাস্তু", বলিয়াই সোহায়েব শূন্য হস্তে উটের পিঠে চাপিয়া বসিয়া উটকে যাইবার ইঙ্গিত করিলেন। উট ধীরে ধীরে মদিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাশিকৃত অর্থ ও আসবাবপত্র পিছনে পড়িয়া রহিল।

আবু-সাল্‌মা নামক এক ব্যক্তি স্ত্রী উম্মে-সাল্‌মাকে সঙ্গে লইয়া মদিনায় যাইতেছিলেন। উম্মে-সাল্‌মার কোলে ছিল একটি শিশু পুত্র। সংবাদ পাইয়া উভয় কূলের আত্মীয়-স্বজন আসিয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিল। উম্মে-সালমার পিতৃকুলের লোকেরা আবু-সাল্‌মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল : "নরাধম, তুই জাহান্নামে যাবি, যা; কিন্তু আমাদের বংশের একটি মেয়েকে তোর সঙ্গে যাইতে দিব কেন?" এই বলিয়া তাহারা উম্মে-সাল্‌মার হস্ত আকর্ষণ করিল। ঠিক সেই সময়ে আবু-সাল্‌মার স্ব-গোত্রের লোকেরাও বলিয়া উঠিল : "হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে, তুই দূর হ; কিন্তু আমাদের কুল-প্রদীপ এই শিশুটিকে আমরা ছাড়িব কেন?" এই বলিয়া উম্মে-সাল্‌মার বুক হইতে তাহারা শিশুটিকে ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হইল। তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই হৃদয়-বিদারক। স্বামীগতপ্রাণা উম্মে-সাল্‌মা একদিকে স্বামীর বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া ধরিয়াছেন, অপরদিকে প্রাণপ্রতিম পুত্রকে আঁকড়াইয়া আছেন, আর আবু-সাল্‌মা উভয়কে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পাষাণ-হৃদয় কোরেশগণ কিছুতেই বিচলিত হইল না। স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে এবং মাতার বক্ষ হইতে সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া বীভৎস আনন্দরোলের মধ্য দিয়া তাহারা স্ব-স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। আবু-সাল্‌মা একা নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একদিকে স্ত্রী-পুত্রের আকর্ষণ, অপর দিকে সত্যের আহ্বান; একদিকে মিথ্যার ঘন অন্ধকার, অপরদিকে সত্যের আলো। কোন্ দিকে যাইবেন? কোন্ পথ বরণ করিবেন।

মুহূর্ত মধ্যে আবু-সাল্‌মা নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া লাইলেন। 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি উটের পিঠে চড়িয়া মদিনার দিকে তাহার মুখ ফিরাইয়া দিলেন। উট মরুপথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই দিকে উম্মে-সাল্‌মার যে দশা হইল, তাহা বর্ণনাতীত। স্বামীপুত্রের বিয়োগ-বেদনায় তিনি একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন। যে স্থানে এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই স্থানে আসিয়া তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। নরাধমগণের অন্তরে তবু দয়ার উদ্রেক হইল না। তাহারা বলিল : "মুহম্মদের ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিব।" কিন্তু উম্মে-সাল্‌মা তাহাতে কিছুতেই রাযী হইলেন না।

প্রায় এক বৎসর এইভাবে কাটিয়া গেল। তখন উম্মে-সাল্‌মার এক নিকট-আত্মীয়ের মনে কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইল। তাহার অনুরোধক্রমে আবু-সাল্‌মার আত্মীয়গণও শিশুপুত্রটিকে তাহার সঙ্গে দিতে রাযী হইল। উম্মে-সাল্‌মা তখন কোনমতে একটি উট সংগ্রহ করিয়া শিশুপুত্রসহ নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই মদিনা যাত্রা করিলেন।

www.pathagar.com

কী অত্যুজ্জ্বল দৃশ্যই না ফুটিয়া উঠিল নিস্তব্ধ মরুর বুকে। একটি তরুণী তাহার শিশুপুত্র কোলে লইয়া উটের পিঠে চড়িয়া একাকী মরুভূমি পার হইয়া চলিয়াছে- সাথী নাই, পাথেয় নাই পথ জানা নাই। জন্মভূমির প্রেম, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা, অত্যাচারীর উৎপীড়ন ও বাধাদান-সব আজ ব্যর্থ। পথের দুঃখকষ্ট ও ভীষণতার কথাও আজ তুচ্ছ। উম্মে-সালমাকে কেহই আজ ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কোন্ যেন চেনা বাঁশির সুর শুনিয়া আজ তাহার মনের হরিণ অশান্ত আবেগে ছুটিয়া চলিল। ধ্রুব-জ্যোতির সন্ধান যে আজ পাইয়াছে, পথের অন্ধকারে তাহার আজ তাই ভয় নাই। শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেম সম্বল করিয়া সে আজ পথে বাহির হইল।

কিছু দূর অগ্রসর হইতেই ওসমান-বিন্-তালহা নামক এক আরব যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। ওসমান তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। একটি নারী ও তাহার শিশুপুত্র মরুপথে একাকী যাইতেছে দেখিয়া ওসমানের মনে কৌতূহল জাগিল। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তিনি সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি উম্মে-সাল্মাকে বলিলেন : "বহিন, আমি আপনার সঙ্গে যাইব।" উম্মে-সালমা আপত্তি করিলেন না। মানবতার সহজ ধর্মই একজন বিপন্না নারীর সাহায্যার্থ একজন পুরুষ ভাইয়ের মত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্তের সম্পর্ক উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবতার সম্পর্ক আজ বড় হইয়া দেখা দিল।

উভয়ে তখন মদিনার পথে অগ্রসর হইলেন। ওসমান উটের লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলেন। এক এক মঞ্জিলের পথ যান আর বিশ্রাম করেন। বিশ্রাম ও আহারাদির ব্যবস্থা ওসমানই করিয়া দেন। পথের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ হইতে ওসমান উম্মে-সাল্মাকে বাঁচাইয়া এমনি করিয়া মদিনা পৌছান। তারপর কোবা-পল্লীতে আসিয়া আবু-সাল্মাকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং উম্মে-সাল্মাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আবার তিনি মক্কায় ফিরিয়া আসেন।

কী সুন্দর এই চিত্রটি। বীরধর্মী নারীমর্যাদার কী অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! এমনি করিয়া শত বিপদের মধ্য দিয়া শত অত্যাচার সহ্য করিয়া ইসলামের অনুরক্ত ভক্তগণ মদিনায় গিয়া পৌছিলেন।

ওমর, হারিস প্রমুখ বিশিষ্ট শিষ্যগণও হযরতের আদেশে মদিনায় প্রস্থান করিলেন। হযরত নিজে মক্কায় রহিয়া গেলেন। সঙ্গে রহিলেন কেবলমাত্র আবুবকর ও আলি।

এইরূপে শিষ্যদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ না করা পর্যন্ত হযরত স্বস্থান পরিত্যাগ করিলেন না। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তিনি রহিলেন শত্রুপুরীতে। আদর্শ গুরুই বটে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ: ৩৩
হিযরত

দেখিতে দেখিতে তীর্থমাস শেষ হইয়া গেল।

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোরেশদিগের মনে এক নূতন চিন্তার উদয় হইল। তাহারা দেখিল, মক্কার মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হয় নাই। এই বেওকুফির ফলেই অপ্রত্যাশিতভাবে মুহম্মদের ধর্ম মদিনায় গিয়া দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল। ইহার উপর আবার মুহম্মদও তাহাদের সঙ্গে গিয়া যোগ দিতে উদ্যত। এইরূপ হইলে ত সবই মাটি। ইসলাম ত ধ্বংস হইল না; পক্ষান্তরে সে আরও অধিকতর শক্তিশালী হইবার সুযোগ পাইল; সঙ্গে সঙ্গে মদিনাবাসীরাও তাহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। কালে যে এই মদিনাবাসীরাও তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

ইহাই ভাবিয়া কোরেশ নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। অচিরে তাহারা পরামর্শ-সভা আহ্বান করিল। মুহম্মদকে এখন কি করা হইবে, ইহাই হইল সভার আলোচ্য বিষয়। কেহ কেহ বলিল : মুহম্মদ যদি তাঁহার শিষ্যবৃন্দের সহিত মক্কা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? মক্কাভূমি ত পবিত্র হইবে। কিন্তু অনেকে বাধা দিয়া বলিল : না, মুহম্মদ চলিয়া গেলে মদিনাবাসীরা এবং আরও অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিবে; তখন বিপদ ঘটিবে। আর একজন বলিল : তবে তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখ। ইহাও অনেকের মনঃপূত হইল না, কেননা বন্দী করিয়া রাখিলেও কোন না কোন সময় নিজেদের মধ্যেই আত্মকলহ বাঁধিয়া উঠিবে এবং তাহাতে উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে। শেব গিরিসঙ্কটে যখন মুহম্মদকে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, তখনকার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা তাহাদের মনে পড়িল। কাজেই কারারোধের কথা অগ্রাহ্য হইয়া গেল। তখন গম্ভীর স্বরে আবু যহল উঠিয়া প্রস্তাব করিল : "আমি বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলাম, মুহম্মদকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। তাহাকে হত্যা করিলেই ইসলামকে হত্যা করা হইবে; ইসলামের প্রাণশক্তির উৎস-মুখ তখন রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই পথ ছাড়া কিছুতেই আমাদের কল্যাণ নাই।" সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করিল। কিন্তু কে মুহম্মদকে হত্যা করিবে-তাহাই লইয়া পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইল। কোন বিশেষ গোত্রের কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি এই কার্যসাধন করিয়া আসে, তবে চিরদিন হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকেরা সেই ব্যক্তি বা গোত্রের উপর হিংসা ও বৈরীভাব পোষণ করিয়া চলিবে। কাজেই কেহ তাহাতে রাযী হইতে চাহিল না। তখন আবু যহল পুনরায় প্রস্তাব করিল; প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হউক এবং তাহারাই একযোগে মুহম্মদকে হত্যা করুক।

এই প্রস্তাব সকলেরই মনঃপূত হইল। প্রতিনিধি নির্বাচনও হইয়া গেল। স্থির হইল, গভীর রাত্রে সকলে গিয়া মুহম্মদের গৃহ ঘেরাও করিয়া রাখিবে, প্রত্যূষে মুহম্মদ যেই বাহিরে আসিবে, অমনি সকলে একযোগে তাহাকে হত্যা করিবে।

www.pathagar.com

রাত্রি আসিল। গৃহে গৃহে সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। আবু যহল প্রমুখ কোরেশ দুর্বৃত্তগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হযরতের গৃহ বেষ্টনী করিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

এদিকে হযরতের কিছুই জানিতে বাকী রহিল না। জিব্রাইলের মারফৎ কোরেশদিগের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া তিনিও প্রস্তুত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তরুণ যুবক আলিকে ডাকিয়া যথারীতি উপদেশ দিলেন, অতঃপর সকলের অলক্ষ্যে খিড়কি দরজা দিয়া কখন যে বাহির হইয়া গেলেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। আলি নির্বিকার চিত্তে একখানি চাদর মুড়ি দিয়া হযরতের শয্যায় শুইয়া রহিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। মুহম্মদ তবু গাত্রোত্থান করিতেছেন না কেন? কোরেশ দুর্বৃত্তগণ বিস্ময় মানিল। ক্রমেই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে সকলে জোর করিয়া গৃহে ঢুকিয়া হযরতের শয্যার চুতুর্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। প্রথমত তাহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থাতেই হযরতকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিল; কিন্তু আবু যহল দেখিল ঐরূপ কাপুরুষতার কোনই প্রয়োজন নাই। শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন একটু খেলাইয়া হত্যা করাই ত বেশী কৌতুকপ্রদ। ইহাই ভাবিয়া হযরতের উদ্দেশ্যে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে আবুযহল কল্পিত মুহম্মদের অঙ্গ হইতে চাদরখানি হেঁচ্‌কা টান দিয়া সরাইয়া ফেলিল। সুব্‌হানাল্লাহ্! এ কি! মুহম্মদ কোথায়? এ যে আলি! সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। সমস্ত ক্রোধ গিয়া পড়িল বেচারা আলির উপর। আবু যহলের ইচ্ছা হইল, আলিকে খুন করে। ক্রোধ সম্বরণ করিয়া সে বলিল : "বল্‌ দুরাচার মুহম্মদ কোথায়?"

বলদৃপ্ত কণ্ঠে আলি উত্তর দিলেন : "আমি তাহার কী জানি? তোমরা কি আমাকে তোমাদের চর নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলে যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? নিজেরাই খুঁজিয়া বাহির কর না?" বলিতে বলিতে আলি নির্ভীক চিত্তে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

আলিকে পীড়ন করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া ঘাতকদল মুহম্মদের সন্ধানে বাহির হইল। হযরত যে মদিনায় প্রস্থান করিবেন, একথা তৎপূর্ব হইতেই তাহাদের জানা ছিল। সেই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই তাহারা সন্ধানকার্য আরম্ভ করিল।

এদিকে রসূলুল্লাহ্ বাটির বাহির হইয়া সর্বপ্রথম আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব হইতেই মদিনা যাত্রা সম্বন্ধে তিনি আবুবকরের সহিত গোপন পরামর্শ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কি করিতে হইবে না হইবে সমস্তই স্থির করা ছিল। হযরত তাড়াতাড়ি আবুবকরকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। স্থির হইল, মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী সওর পর্বতের গুহায় গিয়া তাঁহারা আত্মগোপন করিবেন; তারপর সুযোগ ও সুবিধামত সেখান হইতে মদিনা রওয়ানা হইবেন। যাইবার সময় আবুবকর আপন পুত্র আবদুল্লাহ্ এবং কন্যা আস্‌মা ও আয়েশাকে বলিয়া গেলেন তাহারা যেন প্রতিদিন সন্ধ্যারাতে চুপি চুপি খাদ্য-দ্রব্য পাঠাইয়া দেয়।

তারার আলোকে পথ দেখিয়া উভয়ে অগ্রসর হইলেন। প্রভাতকালে সওর পর্বতে উপনীত হইলেন।

www.pathagar.com

এদিকে কোরেশগণ আলিকে ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ আবুবকরের গৃহদ্বারে আসিয়া ভীষণ বেগে করাঘাত করিতে লাগিল। তখন আস্‌মা ও আয়েশা গৃহে উপস্থিত ছিলেন। আস্‌মা যুবতী, আয়েশা কিশোরী। ব্যাপার বুঝিতে তাঁহাদের বিলম্ব হইল না। আস্‌মা আপন বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া নির্ভীক চিত্তে দুয়ার খুলিয়া দিলেন। খুলিতেই দেখিতে পাইলেন দুর্বৃত্ত আবুযহল মূর্তিমান শয়তানের মত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। ক্রোধকুঞ্চিত নেত্রে সে জিজ্ঞাসা করিল : "বল, তোর পিতা কোথায়?" আস্‌মা উত্তর দিলেন : "জানি না।" এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নরদানব আস্‌মার গণ্ডে ভীষণ এক চপেটাঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

'মুহম্মদ পলায়ন করিয়াছে'-কোরেশদিগের এই ঘোষণা-বাণী বনাগ্নির মত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহারা ইহাও ঘোষণা করিয়া দিল : মুহম্মদ বা আবুবকরকে জীবন্ত অথবা মৃত-যে কোন অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। এই ঘোষণা-বাণী কোরেশদিগের মধ্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। হযরতকে ধরিবার জন্য সর্বত্র বিপুল সাড়া পড়িয়া গেল।

এদিকে আবুবকর ও নূরনবী সওর গিরিগুহায় প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, কোরেশগণ তাঁহাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছেন। আবুবকর একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন; বলিলেন : "হযরত, এখন উপায়? আমরা মাত্র দুইজন, আর ওরা"- শুনিয়া হযরত শান্ত স্বরে বলিলেন : "ভুল করিতেছ আবুবকর! আমরা দুইজন নই; আরও একজন আমাদের সঙ্গে আছেন।" আবুবকর অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

সেই নিভৃত গুহার মধ্যে মাত্র দুইটি মানুষ। পলায়নের পথ নাই, মুক্তির আশা নাই, ঘাতকদল পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে—মৃত্যু একরূপ অবধারিত। কিন্তু সেখানেও হযরত সমুদ্রের মত গভীর—পর্বতের মত অটল—আকাশের মত নির্বিকার। প্রশান্ত চিত্তে তিনি এই ভয়ঙ্করের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত। তখনও তাঁহার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র করুণা নিশ্চয়ই নামিবে, নিশ্চয়ই তাঁহারা রক্ষা পাইবেন।

কার্যত হইলও তাহাই। কোরেশগণ এদিক-ওদিক অনুসন্ধান করিবার পর যখন গুহার মুখে আসিয়া পড়িল, তখন দেখিল গুহামুখে একটি মাকড়সা প্রকাণ্ড এক জাল বুনিয়া বসিয়া আছে। ইহা দেখিয়া সকলে আর গুহামধ্যে প্রবেশ করিল না; ভাবিল এই গুহায় নিশ্চয়ই কোন লোক প্রবেশ করে নাই, করিলে মাকড়সার জাল এমন অক্ষত অবস্থায় থাকিতে পারিত না। এই ভাবিয়া তাহারা অন্যত্র চলিয়া গেল।

আল্লাহ্‌র কী কুদরৎ! সর্বাপেক্ষা নাজুক ও দুর্বল যে উপকরণ, তাহাই যেন তিনি এমন দুর্ধর্ষ শত্রুদিগের সমুদয় অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অশনিসম্পাত দ্বারা নহে, ভয় দেখাইয়া নহে, প্লাবন, ভূমিকম্প বা অন্য কোন অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা নহে; সূক্ষ্ম একখানি কামড়সার জালের ঢালের আড়াল দিয়া আল্লাহ্‌ তাঁহার প্রিয় রসূলকে পাষণ্ডদিগের কবল হইতে রক্ষা করিলেন।

এই গুহার মধ্যে সেদিন হযরত মানুষের জন্য সত্যই এক চরম ভরসা রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্‌র করুণার উপর এমন ঐকান্তিক নির্ভরতার দৃষ্টান্ত আর কোথায় আমরা দেখিতে পাই? বিশ্বের মানুষ সেদিন বুঝিয়াছে আল্লাহ্‌র করুণা হইতে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া উচিত নহে। বিপদে ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে আল্লাহ্‌ যে মুহূর্ত-মধ্যে তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিতে পারেন, এই সত্যই সেদিন প্রতিপন্ন হইয়াছে। কুরআন তাই সত্যই ঘোষণা করিয়াছে :

www.pathagar.com

"লাতাক্‌নাতু মির রাহ্‌মাতিল্লাহ"
(আল্লাহ্‌র করুণা হইতে নিরাশ হইও না)

পক্ষান্তরে ভক্তপ্রবর আবুবকর কী উজ্জ্বল বেশেই না আমাদের সম্মুখে দেখা দিতেছেন! ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও গুরুভক্তির তিনি এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আবুবকর চিরদিনই হযরতকে ছায়ার ন্যায় অনুগমন করিয়াছেন এবং ধনজন সুখসম্পদ সমস্তই হযরতের জন্য—ইসলামের জন্য কুরবানী করিয়া দিয়াছেন। যে শয্যায় রসূলুল্লাহ্‌র মৃত্যু অবধারিত হইয়াছিল, সেই শয্যায় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দেহ পাতিয়া দিয়া আলি যেমন আত্মত্যাগের ও সৎসাহসের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, হযরতের নিরাপত্তার জন্য অসহায় স্ত্রী-পুত্র কন্যাদিগকে শত্রুমুখে ফেলিয়া আসিয়া আবুবকরও তেমনি ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। গুহামধ্যে অবস্থানকালেও আর একটি ঘটনাতে তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য প্রকাশ পাইল। হযরত ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, আবুবকর গুহামুখে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছেন। গুহার ভিতর ছিল কয়েকটি সাপের গর্ত। হযরতের অনিষ্ট-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি আপন শিরস্ত্রাণ ছিঁড়িয়া কয়েকটি গর্তের মুখ বন্ধ করিলেন। অবশিষ্ট একটি মুখের উপরে পা রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিবার পর পদনিম্নের গর্ত হইতে একটি সর্প তাঁহাকে দংশন করিল। আবুবকর ইহাতে না চীৎকার করিলেন, না গর্তমুখ হইতে আপন পদ সরাইয়া লইলেন। পাছে পরিশান্ত রসূলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে, এই চিন্তাতেই তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তবু ভক্তপ্রবরের মুখে কথাটি নাই! এমন সময় সহসা হযরতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল; ব্যাপারটি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। এইরূপে আবুবকরের জীবন রক্ষা হইল।

এইরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নিতান্তই বিরল।

আবুবকরের সহিত হযরত তিন দিন যাবৎ এই গুহার মধ্যে কাটাইলেন। চতুর্থ দিবসে উভয়ে গুহা হইতে বাহির হইলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনুল্‌ উরয্‌কিত এবং ভৃত্য আমের ইব্‌নে কুহয়রা আসিয়াও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মদিনা যাত্রার জন্য প্রয়োজন হইবে ভাবিয়া আবুবকর পূর্ব হইতেই দুইটি দ্রুতগামী উটের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দুইটি উটের একটিতে রসূলুল্লাহ্‌ চড়িলেন, অপরটিতে আবুবকর ও আমের চড়িলেন। আবদুল্লাহ্‌ তাঁহার নিজের উটটি লইলেন। চারিজন যাত্রীর এই ক্ষুদ্র কাফেলা তখন আল্লাহ্‌র নামে মদিনার পানে অগ্রসর হইল।

মদিনা যাত্রার এই আয়োজনকে যাঁহারা নীরবে নীরবে সফল ও সম্ভব করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখানে মনে পড়ে। হযরত আলি, হযরত আবুবকর, কুমারী আস্‌মা, আবদুল্লাহ্‌, আমর এবং তাঁহাদের উট-প্রত্যেকের ভূমিকাই গৌরবময়। আত্মত্যাগ, লক্ষ্য ও আদর্শের একমুখিতা, মনোবল, কর্মকৌশল এবং বিশ্বস্ততা-সবগুলি গুণের সমাবেশেই এত বড় একটা কঠিন কার্য সম্ভব হইয়াছিল। ঘুণাক্ষরে কোথাও যদি কাহারও কোন ত্রুটি ঘটিত, তবেই সব আয়োজন ব্যর্থ হইত; রসূলুল্লাহ্‌র মদিনা-যাত্রা হয়ত মোটেই সম্ভব হইত না। কি অদ্ভুত সুন্দর যোগাযোগ।

যাত্রা করিবার পূর্বে হযরত তাঁহার প্রিয় জন্মভূমির পানে একবার করুণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। নয়ন তাঁহার অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। গভীর মমতায় তিনি বলিতে লাগিলেন : "মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার

www.pathagar.com

সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না। বাধ্য হইয়া তাই তোমাকে ছাড়িয়া চলিলাম। বিদায়।”

লোহিত-সাগরের উপকূল ধরিয়া সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া সব লোক মদিনা যায় সেপথ তাঁহারা বর্জন করিলেন।

কিছুদূর যাইতে না যাইতে এক বিপদ ঘনাইয়া আসিল। সুরাকা নামক এক অশ্বারোহী কোরেশবীর হযরতের সন্ধান পাইয়া সদলবলে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সুরাকা যেই নিকটবর্তী হইয়াছে, অমনি তাঁহার অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় ধূলিগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। অশ্ব ভীষণ রবে চিৎকার করিতে লাগিল। সুরাকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন ইহাতে দমিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তীর নিক্ষেপ করিয়া সে তাঁহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিল। তীরে না-সূচক ইঙ্গিতই প্রকাশ পাইল। ইহাতে তাহার মনের আতঙ্ক আরও গভীর হইল। আল্লাহ্‌র রসুলকে হত্যা করিতে গেলে হয়ত আরও বিপদ ঘটিবে, এই আশঙ্কায় সে ভীত হইয়া পড়িল! তখন সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল : “হে মক্কার যাত্রীগণ, একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের শত্রু নই।” হযরত তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সুরাকা বিনীতভাবে হযরতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। হযরত হাসি মুখে তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং কয়েকটি সদুপদেশ দান করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। সুরাকা অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরিয়া গেল।

কাফেলা যখন মদিনার নিকটবর্তী হইল, তখন আর এক বিপদ আসিল। হযরতকে হত্যা করিতে পারিলে একশত উট পুরস্কার মিলিবে এই প্রলোভনে আসলাম-গোত্রের বারিদা নামক এক দলপতি ৭০ জন রণদুর্দম বেদুঈন বীর সঙ্গে লইয়া হযরতের পথ আগুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। হযরতকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল।

হযরত তখন সুললিত কণ্ঠে গম্ভীরভাবে কুরআন পাঠ আরম্ভ করিলেন। বারিদা ও তাহার সঙ্গীগণ হযরতের নিকটবর্তী হইতেই সেই অপূর্ব সুরলহরী তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহারা থমকিয়া দাঁড়াইল, আর অগ্রসর হইতে পারিল না। চরণ যেন ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, হস্ত যেন শিথিল হইয়া গেল। হযরত বারিদার মুখের দিকে তাকাইলেন। বারিদা সেই তীক্ষ্ণ জ্যোতির্দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিল না। ভিতর হইতে তাহার অন্তর যেন দ্রবীভূত হইয়া গেল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হযরতের নিকটে আসিয়া বিনীতভাবে সে বলিল : “হযরত, ক্ষমা করুন! না বুঝিয়া এই দুষ্কর্ম করিয়াছি।”

হযরত সন্তুষ্ট হইলেন। বারিদাকে তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সকলকে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। বারিদা অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, “হযরত, আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব। আমাদিগকেও আপনার চরণে স্থান দিন।” আমরাও কলেমা পড়িতেছি : “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রাসুলুল্লাহ্।”

তৎক্ষণাৎ ৭০ জন দস্যু মুসলমান হইয়া গেল। বারিদা মহা উৎসাহে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। আপন আপন শিরস্ত্রাণ ছিঁড়িয়া বর্শাফলকে জড়াইয়া তাহারা জয় পতাকা প্রস্তুত করিল। এক অপূর্ব মিছিল গড়িয়া উঠিল। ৭০টি আরবী অশ্ব বীর পদভরে দুলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল; ৭০ খানি নাঙ্গা তলোয়ার রৌদ্র-কিরণে ঝলসিয়া উঠিল;

www.pathagar.com

৭০ খানি বর্শা-ফলকে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িতে লাগিল; ৭০টি কম্প্রকণ্ঠে দিগঞ্চল মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল : "আল্লাহু-আকবর!"

কোন্ যাদুমন্ত্রে এমন হইল? একজন নহে, দুই জন নহে-৭০ জন রক্ত-মাতাল নর-শার্দুল মুহূর্ত মধ্যে কিরূপে বশীভূত হইয়া গেল। হযরতকে হত্যা করিতে আসিয়া নিজেদের ঘৃণিত পশু-জীবনকেই হত্যা করিয়া বসিল।

এমনি মধুর বেশে হযরত চলিলেন মদিনা পানে। সকল নিগ্রহ, সকল অত্যাচারের মধ্য দিয়া শত্রুদলের সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া হযরত ভাসিয়া উঠিলেন আজ এক অপূর্ব মহিমার বেশে!

এক আকাশের সূর্য আসিয়া আজ আরেক আকাশে উদিত হইল। উদয়গিরির শিখরে শিখরে এতদিন ছিল শুধু ঝঞ্ঝামেঘের তুমুল গর্জন আর সূর্যের পথরোধের নিষ্ফল প্রয়াস। কিন্তু সূর্যের তাতে কতটুকু ক্ষতি হইল? মেঘলোকের বহু ঊর্ধ্বপদ দিয়া গোপনে গোপনে সূর্য আরেক দিগন্তে আসিয়া কখন যে হাসিয়া দাঁড়াইল, ঝঞ্ঝা ও বজ্র-বাদল তাহা জানিতেও পারিল না। ফল হইল এই যে, উদয়-অচলকে সে খানিকটা দরিদ্র করিয়া আসিল।

রসূলুল্লাহ্ মদিনায় আসিয়া এই সত্যই জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন যে, নবীরা কোনদিন আপন দেশে সম্মানিত হন না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৪

আল–মদিনায়

রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ।[1] সোমবার। বেলা দ্বিপ্রহর! মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্ত দহনে মরুপ্রকৃতি খা–খা করিতেছে। এমন সময় মদিনা হইতে দুই মাইল দূরবর্তী কোবা–গিরির শীর্ষে দাঁড়াইয়া একজন ইহুদী দেখিতে পাইল : একটা ক্ষুদ্র কাফেলা মদিনা পানে অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপার বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "মদিনাবাসী মুসলমানগণ, প্রস্তুত হও, তোমাদের চিরবাঞ্ছিত মহানবী আসিতেছেন।"

হযরত মক্কা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, এই সংবাদ মদিনাবাসীরা জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, রসুলুল্লাহ্‌র শুভাগমন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমানেরা তাই প্রতিদিন প্রত্যূষে কোবাপ্রান্তরে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং সূর্যকিরণ অসহনীয় প্রখর না হওয়া পর্যন্ত তথায় অপেক্ষা করিতেন, তারপর বাধ্য হইয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতেন। সেদিন তাঁহারা এমনিভাবেই হযরতের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া সবেমাত্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, এমন সময় ইহুদীর এই আহ্বান তাঁহাদের নিকট গিয়া পৌঁছিল।

সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নগরবাসী মুসলমানেরা দলে দলে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনে আজ পুলক ও অফুরন্ত কৌতূহল। দীর্ঘদিনের ধ্যানের ছবি আজ বাস্তব হইয়া দেখা দিবে, আল্লাহ্‌র রসুলকে আজ তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পাইবেন, এ কি সহজ আনন্দ! উল্লাস ও উদ্দীপনায় সকলের হৃদয়ই আজ একেবারে ভরপুর।

হযরত ধীরে ধীরে কোবা–পল্লীতে উপনীত হইলেন। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল বেহেশ্‌তের একখানি স্বপ্ন মূর্তি ধরিয়া ধরার ধূলায় নামিয়া আসিতেছে।

কোবা একটি সুন্দর গিরি–উপত্যকা। ইহার চতুর্দিকে আঙুর–বেদানার–কমলালেবুর বাগান। কোথাও বা পুষ্পল কুঞ্জবিতান। স্থানটি অত্যন্ত মনোরম।

মদিনাবাসীদিগের ইহা একটি স্বাস্থ্যনিবাস। ইহারই মধ্য দিয়া মক্কা–মদিনার রাজপথ।

হযরত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ আসিয়া একটি বৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন। মুসলমানগণ দলে দলে আসিয়া হযরতকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মদিনাবাসীরা অনেকেই হযরতকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাই আবুবকরকে রসুলুল্লাহ্ মনে করিয়া অনেকে তাঁহাকেই তস্‌লিম জানাইতেছিলেন। আবুবকর ইহা বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে সকলের এই ভুল ভাঙিয়া দিলেন। সূর্য সরিয়া যাওয়ায় বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া রৌদ্রকিরণ আসিয়া হযরতের মুখে পড়িতেছিল; আবুবকর সেই সুযোগে আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হযরতকে ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন–কে গুরু আর কে শিষ্য।

---

১. খ্রীষ্টান পঞ্জিকা অনুসারে এ তারিখটি ছিল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর।

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর হযরত কোবা-পল্লীর বনি উবাইদ বংশের কুলসুমের[২] গৃহে আশ্রয় লইলেন।

ঠিক ইহার দুই -তিন দিন পরে মক্কা হইতে আলি আসিয়া হযরতের সহিত যোগ দিলেন। শত্রুদিগের দৃষ্টি এড়াইয়া অতি কষ্টে তিনি মদিনায় পৌঁছিলেন।

আলিকে কি অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ মক্কায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। কিন্তু আর একটি গূঢ় কারণও ছিল। মুহম্মদকে সকলে পয়গম্বর বলিয়া না মানুক, বিশ্বাসী (আল্-আমিন) বলিয়া মানিত। বহু লোকে বহু মূল্যবান দ্রব্য-সম্ভার তাই তাঁহার নিকট আমানত রাখিত। সেসব দ্রব্যাদি গচ্ছিতকারীদিগকে ফেরৎ দিবার জন্যই তিনি আলিকে রাখিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের কী অপূর্ব চরিত্র-মাধুর্য।

হযরত কোবা-পল্লীতে ১২ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মুক্ত ইসলামের ইহাই প্রথম মস্জিদ। পবিত্র কুরআনে এই মসজিদের উল্লেখ আছে। এই মসজিদ নির্মাণের সময় হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে নিজ হস্তে ইষ্টক ও মাল-মশলা বহন করিয়া শ্রমের যে মর্যাদা দেখাইয়াছিলেন-তাহা সত্যই অনুকরণীয়।

দ্বাদশ দিবসের শেষে হযরত মদিনা নগরে যাত্রা করিলেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। হযরতের মদিনা-যাত্রার সংবাদে সর্বত্র আবার একটা উন্মাদনার সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়া সমবেত হইলেন। মদিনা নগরে নূতন করিয়া অভ্যর্থনার আয়োজন চলিতে লাগিল।

আল্-কাসোয়া নামক উটের পৃষ্ঠে হযরত সওয়ার হইলেন। হযরতের পশ্চাতে বসিলেন আবুবকর। উট অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। ভক্তবৃন্দ তাঁহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে মিছিল করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবার গগনে গগনে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, নিশান উড়িল, "আল্লাহু-আকবর" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হযরত বনি-সালেম মহল্লায় আসিয়া উপনীত হইলেন। এইখানে তিনি ভক্তবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া জুমার নামায পড়িলেন। ইহাই ইসলামের প্রথম জুমার নামায।

নামায শেষ করিয়া হযরত পুনরায় যাত্রা করিলেন। যতই শহরের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন ততই দর্শকবৃন্দের ভিড় জমিতে লাগিল। মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা আজ রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই বুকে আজ নব কৌতূহল, মুখে আজ আনন্দোচ্ছ্বাস, চোখে আজ বেহেশ্তী রঙিন স্বপ্ন।

ধীরে ধীরে হযরত নগরে প্রবেশ করিলেন। অমনি শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল :

"শান্তির রাজা এস!
আল্লাহ্র রসুল এস।
বেহেশ্তের নিয়ামৎ এস!
আমরা তোমায় বরণ করি!"

---

২. অপর মতে তিনি সাদ বিন খাইসামার গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

www.pathagar.com

গৃহের আঙিনায় পুরমহিলারা অপেক্ষা করিতেছিলেন। হযরতকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারাও আজ আনন্দে এই কাসিদা গাহিয়া উঠিলেন :

"দেখ চেয়ে ওই চাঁদ উঠেছে
গগন কিনারায়
তার হাসির আভা ছড়িয়ে গেল
নিখিল দুনিয়ায়।"

বালক-বালিকারা দফ্ বাজাইয়া নাচিতে নাচিতে হযরতকে ঘিরিয়া ধরিল এবং সুললিত কণ্ঠে "ইয়া রসুলুল্লাহ্!" বলিয়া গান গাহিতে লাগিল। হযরতের সবচেয়ে ভাল লাগিল এই বালক-বালিকাদের নির্দোষ নৃত্য-সঙ্গীত। উটের পিঠ হইতে নূরনবী নামিয়া আসিলেন; সকলের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন : "তোমরা আমাকে ভালবাস?" একসঙ্গে উত্তর আসিল : "আলবৎ! আলবৎ!" হযরত তখন সকলের চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া হাসিমুখে বলিলেন : "আমিও তোমাদেরকে ভালবাসি।"

খুশিভরে বালক-বালিকারা জোরে জোরে দফ্ বাজাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সবার আগে বালক-বালিকাদের সঙ্গে হযরতের এইরূপ আত্মীয়তা জন্মিল। শিশুরা এককণা প্রীতি ও একটুকরা হাসি দিয়া বিশ্বনবীকে কিনিয়া লইল।

মদিনায় প্রবেশ করিয়া রসূলুল্লাহ্‌র মনে এক নূতন সমস্যার উদয় হইল। কোথায় কাহার গৃহে গিয়া তিনি উঠিবেন? নানা গোত্র, নানা দল। সকলেই হযরতকে আপন গৃহে স্থান দিতে লালায়িত। এইরূপ ক্ষেত্রে একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে আর দশজন অসন্তুষ্ট হয়। কাহার অনুরোধ তিনি রক্ষা করিবেন? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। স্থান নির্বাচনের ভার নিজের উপর না রাখিয়া তাঁহার উটের উপর ছাড়িয়া দিলেন। ঘোষণা করিলেন : উট যেখানে গিয়া স্বেচ্ছায় থামিয়া যাইবে, সেখানেই তিনি অবস্থান করিবেন। সকলেই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন; কাহারও আর কিছু বলিবার রহিল না। উৎসুক নয়নে সকলেই উটের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন।

উটের নাকাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। উট স্বাধীনভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে শহরের দক্ষিণভাগে বানু-নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় আসিয়া একটি প্রশস্ত স্থানে সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। নিকটেই ছিল আবু-আইউবের বাসগৃহ। হযরত তখন আবুবকরের সহিত উট হইতে নামিয়া আসিয়া সেই গৃহে পদার্পণ করিলেন। আবু-আইউব সসম্রমে সম্মানিত অতিথিদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আবু-আইউবের গৃহ ছিল দ্বিতলবিশিষ্ট; সপরিবারে উপরের তলায় বাস করিতেন। হযরতের জন্য তিনি সেই উপর-তলা ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন কিন্তু হযরত তাহাতে রাযী হইলেন না। অন্যান্য শিষ্যবৃন্দের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-আপ্যায়নের সুবিধার জন্য তিনি নিচের তলাই পছন্দ করিলেন।

উত্তেজনা ও কোলাহলের অবসান হইল। শান্ত নীরব আকাশের তলে সূর্য অস্ত গেল।

হযরতের মনে আজ নিশ্চয়ই ভাবান্তর উপস্থিত হইবার কথা। অতীত দিনের কত স্মৃতি, কত কথা আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সুদীর্ঘ তেরটি বৎসরের দুঃখের কাহিনী তাহা। সেই মক্কা, সেই কাবা, সেই হেরা, খাদিজা, সেই আবুতালিব, সেই

www.pathagar.com

শেব-গিরির বন্দীজীবন, সেই তায়েফ-নগরীর ভীষণ সঙ্কট-মূহূর্ত-সমস্তই আজ তাঁহার মনের আঙ্গিনায় ছায়া ফেলিল। এতদিন তিনি যেন ঈমানের একখানি স্বর্ণতরীতে কতিপয় যাত্রী লইয়া অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। যুলমাৎরাতের অন্ধকারে উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া ছিল সেই আলোকতরীর অভিযান। চারিপাশে হাঙ্গর-কুমীরের সন্ত্রাস, প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুর দাপটে মুহুর্মুহ : নৌকাডুবির আশঙ্কা, মেঘাচ্ছন্ন অকাশ-কোণ হইতে ভীমরবে অশনিসম্পাত-তাহারই মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল এই তরী। দাঁড়িরা টানিতেছিল দাঁড়, দুর্যোগ রাত্রির অবসান হইল। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া হযরত দেখা দিলেন বিজয়ী বীরের বেশে! আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া বারে বারে তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আজ হইতে মদিনা তাঁহার স্বদেশ হইল, মদিনাবাসীরা তাঁহার ভাই হইল। বিশ্বনবীর স্বদেশ কোথায়? তাঁহার স্বদেশ ভৌগোলিক নহে, তাঁহার স্বদেশ তামদ্দুনিক ও আদর্শভিত্তিক।

এখানে হিযরতের প্রয়োজনীয়তা লক্ষণীয়। আপন দেশে যাহার আশ্রয় মিলিল না, পরের দেশে তিনি সাদরে গৃহীত হইলেন। নৈকট্য ও অতি পরিচয়ের একটা অভিশাপ আছে। প্রতিভার স্বীকৃতি সেখানে সহজলভ্য নহে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, দলগত দ্বন্দ্ব, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার, রাজনৈতিক প্রভাব এবং আরও বহু কারণে কোন নূতন প্রতিভা তাহার আপন পরিধির মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। পরিবেশ পরিবর্তনের তাই প্রয়োজন হয়। এই জন্যই বহু পয়গম্বর বহু মনীষীকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। জগতের ইতিহাসে রসূলুল্লাহ্‌র হিযরতই সবচেয়ে বড় হিযরত। হিযরত যে কতখানি কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে, রসূলুল্লাহ্‌র জীবনই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। হিযরত শুধু হযরত মুহম্মদকেই রক্ষা করে নাই, বিপন্ন বিশ্বমানবতাকেও রক্ষা করিয়াছে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৫

প্রেমের বন্ধন

হযরতের প্রথম চিন্তা হইল : আল্-কাসোয়া যেখানে বসিয়া পড়িয়াছিল, সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা। তখনকার দিনে এই স্থানের কোনই গুরুত্ব ছিল না, নানা লতাগুল্ম ইহা ভর্তি ছিল। উট বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই স্থানটি ব্যবহৃত হইত। হযরত অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, দুইটি এতিম বালক এই স্থানটির মালিক। অনতিবিলম্বে তিনি বালক দুইটিকে ডাকাইলেন এবং উপযুক্ত মূল্য গ্রহণ করিয়া ঐ জমি তাদেরকে দান করিতে বলিলেন। বালকেরা কিছুতেই মূল্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল না। তাহারা বিনামূল্যেই হযরতকে এই জমি দান করিতে চাহিল। কিন্তু পরিণামে এই নজির দেখাইয়া সুবিধাবাদীরা আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে, এই আশঙ্কায় হযরত কিছুতেই বালকদিগের প্রস্তাবে রাযী হইলেন না। তখন অগত্যা তাহাদিগকে মূল্য গ্রহণ করিতেই হইল। জমির মূল্য দশ স্বর্ণমুদ্রা নির্ধারিত হইল। হযরতের আদেশক্রমে আবুবকর ঐ মূল্য বালকদ্বয়কে দান করিলেন।

অতঃপর তথায় একটি মসজিদ নির্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। মস্‌জিদ পার্শ্বেই রসূল-করিমের বাসভবনও নির্মিত হইবে, স্থির হইল। কয়েক দিনের মধ্যেই কার্য আরম্ভ হইয়া গেল। গাছ কাটিয়া মাটি ফেলিয়া স্থানটিকে ভরাট করা হইল। ইট ও মাল-মশলারও জোগাড় হইয়া গেল। হযরত নিজেও এই নির্মাণ-কার্যে অংশগ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সহিত তিনিও প্রতিদিন মজদুরের কার্য করিতে লাগিলেন। বিশ্ব-মুসলিমের মিলনকেন্দ্র এইরূপে স্থাপিত হইল।

নিজের এবং শিষ্যবৃন্দের নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া রসুলুল্লাহ্ এইবার আপন পরিবারবর্গের কথা চিন্তা করিলেন। মক্কায় তাঁহার স্ত্রী এবং দুই কন্যাকে তিনি শত্রুদের মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। আবুবকরের পরিবারবর্গও ঠিক একই অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। হযরত তাঁহাদিগকে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি আপন পালিত পুত্র জায়েদ এবং আবু রাফে নামক আর একটি মুক্ত ক্রীতদাসকে দুইটি উট ও পাঁচশত দিরহাম সঙ্গে দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

হযরতের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী বিবি সওদা এবং দুই কন্যা : ফাতেমা ও উম্মে-কুলসুম। ফাতিমা তখনও অবিবাহিত। উম্মে-কুলসুমের বিবাহ হইয়াছিল আবু লাহাবের বংশে। কিন্তু ধর্ম ও মতবৈষম্যের জন্য এ মিলন সুখের হয় নাই। এই কারণে উম্মে-কুলসুম স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পিতৃগৃহে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা জয়নাব মক্কায় তাঁহার স্বামী আবুল আসের সঙ্গেই বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা রোকাইয়া পূর্বেই তাঁহার স্বামী ওসমানের সঙ্গে মদিনায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

আবুবকরের পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী উম্মে রুমান এবং কন্যা আস্‌মা, আয়েশা ও অন্যান্য সকলে।

যথাসময়ে হযরত ও আবুবকরের পরিবারবর্গ মদিনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এইবার আর কোরেশগণ বিশেষ বাধা দান করে নাই।

www.pathagar.com

হযরত আপন পরিবারবর্গের এবং শিষ্যদিগের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিলেন। কাহারও কোনই অসুবিধা রহিল না। আনসার ও মোহাজেরদিগের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি, প্রেম ও মমতার বন্ধন সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

মদিনাবাসীরা ছিলেন কৃষিজীবী, কিন্তু মক্কাবাসীরা ব্যাবসায়জীবী। কাজেই, মদিনায় আসিয়া মক্কীয়গণ দারুণ অসুবিধায় পড়িলেন। কিন্তু আনসারদিগের কী সহৃদয়তা। নবাগত অতিথিদিগের সুখ-সুবিধার জন্য তাঁহারা যথাসর্বস্ব বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। পক্ষান্তরে মোহাজেরগণও অলস ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল। তাঁহারা দেখিলেন, শুধু কৃষি দ্বারা কোন জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি হইতে পারে না; বাণিজ্যই দেশের ধনাগমের প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই তাঁহারা জাতীয় জীবনের এই নূতন দিক্‌টা গড়িয়া তুলিতে প্রয়াস পাইলেন। ফলে মদিনা নগরে কৃষির পাশাপাশি বাণিজ্যও প্রসার লাভ করিতে লাগিল।

এই সময় আনসারগণ মোহাজেরদিগের প্রতি যে আদর্শ ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন, সত্যই তাহার তুলনা হয় না। জগতের ইতিহাসে মানুষ বুঝিবা আর কোনদিন মানুষকে এমন করিয়া ভালবাসে নাই। একেই ত মক্কাবাসীদিগের স্বতঃউৎসারিত প্রেম বিশ্বমানবতার এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আবার হযরতের মধ্যবর্তিতায় এই আদর্শ আরও মোহনীয় হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, আনসার ও মোহাজেরদিগের মধ্যে এত যে প্রেম, এত যে মিলন, তবু একটা জায়গায় এমন একটা শূন্যতা আছে যাহা সহজে দূর হইবার নহে। আনসারগণের সেবাযত্নের মধ্যে থাকে একটা সুজনতা, পাছে কোন ত্রুটি না ঘটে এমনই একটা সদাসতর্ক ভাব। আবার মোহাজেরদিগের সেবাগ্রহণের মধ্যে থাকে একটা সংকোচ ও কুণ্ঠা। গৃহস্বামী এবং অতিথি-উভয়ের পক্ষেই অনেক সময় উহা অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। হযরত এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান দূর করিতে চাহিলেন। তিনি একদিন আনসার ও মোহাজেরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "শোন মদিনাবাসী অনসারগণ! শোন মক্কাবাসী মোহাজেরগণ! ইসলামের আদর্শ : প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। কাজেই আমি চাই যে, তোমরা প্রত্যেকে জোড়ায় জোড়ায় ভাই বনিয়া যাও। প্রত্যেকে অপরের মধ্য হইতে একজন ভাই বাছিয়া লও।"

হযরতের আদেশ শ্রবণমাত্র আনসার-মোহাজেরদিগের মধ্যে একটা নূতন উম্মাদনার সঞ্চার হইল। সকলে নিজের নিজের পছন্দমত 'ভাই' বাছিয়া লইতে লাগিল। হযরত নিজেও এই নির্বাচনে সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও মানসিকতার প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। বাহিরে কেহই পড়িয়া থাকিল না, দুই-এ মিলিয়া এক হইয়া গেল। রক্তের সম্বন্ধকে অতিক্রম করিয়া এইরূপ ধর্ম ও মানবতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল।

এই নূতন সম্বন্ধ কতদূর গড়াইতে পারে, পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারেন কি? শুনিলে বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে, এই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া আনসারগণ নিজেদের জমাজমি, ধনদৌলত ও ঘর-বাড়ি-সমস্তই নূতন ভাইদিগকে বন্টন করিয়া দিলেন। মোহাজেরগণ কৃষিকর্ম জানিতেন না বলিয়া আনসারগণ নিজেরাই তাহাদের অংশের জমিজমা চাষ করিয়া ফসল উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। মোহাজেরগণও যাহা

www.pathagar.com

উপার্জন করিতে লাগিলেন, আনসারদিগকে তাহার ন্যায্য অংশ দিতে লাগিলেন। কাহারও মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার 'ধর্ম-ভাই'ও রীতিমত হিস্‌সা পাইতে লাগিলেন।

শুধু কি তাই! আনসারগণ কেবল যে আপন ধনসম্পত্তিই ধর্ম ভাইদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, তাহা নহে। যাঁহাদের দুইটি স্ত্রী ছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ একটিকে বর্জন করিয়া নূতন ভাইকে দিতে প্রস্তুত হইলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় : সা'দ ইবনে রাবীর কথা। আবদুর রহমান নামক জনৈক মোহাজেরকে তিনি ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সা'দের ছিল দুই স্ত্রী। সা'দ আবদুর রহমানকে এতই ভালবাসিতেন যে, একদিন তিনি বলিলেন : "প্রিয় ভ্রাতা, আমার দুই স্ত্রী; তুমি কোন্‌টিকে পছন্দ কর, বল? তাহাকেই আমি সানন্দচিত্তে তালাক দিয়া তোমার সাথে বিবাহ দিব।" যে কথা সেই কাজ। সা'দের একান্ত অনুরোধে আবদুর রহমান তাঁহার এক স্ত্রীকে বিবাহ করিলেন।

আনসার-মোহাজের সমস্যা যে মক্কা-মদিনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। মানব-গোষ্ঠীর এ এক চিরন্তর সমস্যা। যুগে যুগে প্রত্যেক জাতিই এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে এক দেশের অধিবাসী আর এক দেশের স্বজাতীয় ভাইদের শরণ লইতে বাধ্য হয়। আনসার-মোহাজের সমস্যা তখনই জাগিয়া উঠে। আনসারদিগের উচিত-মোহাজেরদিগের দুর্দিনে তাহাদিগকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা এবং মোহাজেরদিগের উচিত আনসারদিগের সুখ-দুঃখের সাথে নিজদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া এবং মোহাজেররূপে অধিক দিন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা না করা। নূতন দেশের নাগরিক অধিকার লাভ করিবার পর উভয়ের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে নূতন দেশের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। পুনর্বাসন সমস্যাও জটিল হয় না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৬
ইসলামিক রাষ্ট্র রচনা

মদিনার মস্‌জিদ নির্মিত হইয়া গেল। মস্‌জিদটির বিশেষ কিছুই আড়ম্বর ছিল না; আকারেও তখন ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ছিল। ইহার পরিমাপ ছিল : দৈর্ঘ্য ১০০ হাত, প্রস্থ ১০০ হাত! মাটি হইতে তিন হাত উঁচু করিয়া প্রস্তর দিয়া ইহার ভিত্তিমূল গঠিত হইয়াছিল; তারপর ইষ্টক দ্বারা ইহার দেওয়াল তোলা হইয়াছিল। চারি কোণে চারিটি মিনার ছিল, কিন্তু পাকা ছাদ ছিল না। খর্জুর বৃক্ষের খুঁটির উপরে তক্তা আঁটিয়া ইহার ছাদ নির্মিত হইয়াছিল। তখন ইহার কিবলা ছিল জেরুজালেমের দিকে।

এমনই নিরাভরণ ছিল এই মস্‌জিদুন্নবী। কিন্তু হইলে কী হয়, মধ্য যুগে এই ক্ষুদ্র মস্‌জিদটিই ছিল ইসলামের শক্তি নিকেতন (Power House) ! কত রাষ্ট্রদূত এইখানে গৃহীত হইয়াছে, কত সন্ধিপত্র এইখানে স্বাক্ষরিত হইয়াছে। কত বিজয় অভিযানের পরিকল্পনা এইখানে বসিয়া করা হইয়াছে। এখান হইতে যে-পরিকল্পনা গৃহীত হইত, যে আদেশ-নিষেধ প্রচারিত হইত, তাহাতেই জগতের বড় বড় সম্রাটের সিংহাসন টলিয়া যাইত। এখানে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি একসঙ্গে আলোচিত হইত। ইসলামে ধর্ম রাষ্ট্র ও সমাজ যে পরস্পর পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে অন্তর্বিজড়িত, মদিনার মস্‌জিদই ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিল্পের দিক দিয়াও এই মসজিদটি গুরুত্বপূর্ণ। সারাসিনিক স্থাপত্যকলার ইহাই ছিল আদিম আদর্শ। ইহার সুউন্নত মিনার তখনকার দিনে বাস্তবিকই এক নূতন শিল্পসৃষ্টি বলিয়া পরিগণিত হইত। পরবর্তীকালে এই আদর্শে মুসলিম-জাহানের সর্বত্র মসজিদ নির্মিত হইয়াছে। আগ্রার মতিমসজিদ ও তাজমহলে মূলত এই আদর্শের অনুকৃতি রহিয়াছে।

মস্‌জিদ নির্মিত হইলে হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দের সহিত নির্বিঘ্নে জামাত করিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ্‌র গুণগানে মদিনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হইতে লাগিল। এ দৃশ্য আরও মধুর হইয়া উঠিল সেইদিন—যেদিন আযান-প্রথা প্রবর্তিত হইল। মুসলমানদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে কিরূপ করিয়া মসজিদে সমবেত করা যায়, হযরত তাহা চিন্তা করিতেছিলেন। খ্রীষ্টানদিগের ঘন্টাধ্বনি, ইহুদীদের শৃংগ-নিনাদ, পারশিকদিগের অগ্নিপ্রজ্বলন-কোনটাই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। অনেক চিন্তার পর তিনি বিধান দিলেন আযানের। তৌহিদের মূলমন্ত্র প্রচার, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসীদিগকে আল্লাহ্‌র উপাসনায় যোগদান করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান-ইহাই হইল আযানের প্রাণবাণী।

এই শুভ আহ্বানের ভার পড়িল ভক্তপ্রবর বেলালের উপর। বেলাল হযরতের নিকট হইতে আযান-পদ্ধতি শিখিয়া লইলেন; তারপর এক সুন্দর প্রভাতে মস্‌জিদের মিনারে দাঁড়াইয়া উদাত্ত গম্ভীর স্বরে আযান ফুকাইলেন :

আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর।
আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।
আশ্‌হাদুআল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।
আশ্‌হাদুআল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

www.pathagar.com

আশ্‌হাদু আন্না মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ।
আশ্‌হাদু আন্না মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ।
হা-ইয়া আলাস্‌ সালাহ্‌।
হা-ইয়া আলাস্‌ সালাহ্‌।
হা-ইয়া আলাল ফালাহ্‌।
হা-ইয়া আলাল ফালাহ্‌।
আস্‌সালাতু খায়রুম্‌ মিনান্নৌম।
আস্‌সালাতু খায়রুম্‌ মিনান্নৌম।
আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর।
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।

(আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান! সাক্ষ্য দিতেছি : তিনি ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই। সাক্ষ্য দিতেছি : মুহম্মদ তাঁহার প্রেরিত রসূল। নামাযের জন্য আইস; শুভ কর্মে আইস! নিশ্চয়ই নিদ্রা হইতে নামায শ্রেয়ঃ! আল্লাহ্‌ মহান, আল্লাহ্‌ মহান, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই।)

লা-শরীক আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য উপযুক্ত আহ্বানই বটে। তন্দ্রাচ্ছন্ন মদিনাবাসীর কর্ণকুহরে যখন এই অপূর্ব জাগরণের বাণী প্রবেশ করিল, তখন তাঁহাদের মনঃপ্রাণ এক নবছন্দে ঝংকৃত হইয়া উঠিল। অন্ধকার হইতে আলোকের পথে—মৃত্যু হইতে জীবনের পথে সে কী প্রাণস্পর্শী আহ্বান। চুম্বক-শলাকার মত সেই অগ্নিবাণী মুহূর্ত-মধ্যে দিশিদিশি হইতে ভক্তবৃন্দকে একই লক্ষ্যে একই মিলন- কেন্দ্রে আনিয়া সম্মিলিত করিয়া দিল।

সেইদিন বেলালের কণ্ঠে পবিত্র আযানের অপূর্ব ধ্বনি-তরঙ্গ আকাশ পথে উত্থিত হইয়াছিল, আজও তাহার কম্পন থামিয়া যায় নাই। বিশ্বের মিনারে মিনারে সেই আযানের প্রতিধ্বনি আজও আমরা শুনিতে পাই।

ইহার কিছুদিন পরে মুসলিম উপাসনায় আর একটি বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। এতদিন জেরুজালেমের দিকেই কিবলা করিয়া নামায পড়া হইত; কিন্তু সহসা একদিন আল্লাহ্‌তায়ালা হযরতের নিকট এই আয়াত নাযিল করিলেন :

"নিশ্চয় আমি তোমাকে উর্ধ্বদিকে মুখ তুলিয়া প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছি। সেজন্য আমি তোমাকে এমন একটি কিবলার দিকে মুখ ফিরাইব-যাহাতে তুমি খুশি হইবে। অতএব তোমার মুখ পবিত্র মক্কার মস্‌জিদের দিকে ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, যখন প্রার্থনা করিবে, তাহারই দিকে মুখ ফিরাইবে।" (২ : ১৪৪)

সেই হইতে কাবা-শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া বিশ্বের সকল মুসলমান নামায পড়িয়া আসিতেছে। মুসলিমের ধ্যান-ধারণায়, কর্মে-চিন্তায়, ঐক্য-সাধনার ইহা এক অব্যর্থ প্রক্রিয়া। একই উদ্দেশ্যে একই দিকে মুখ করিয়া একই সময় একই পদ্ধতিতে বিশ্বের সমগ্র মুসলমান এক-আল্লাহ্‌র এবাদত করে। একে কেন্দ্র করিয়াই মুসলমানের সকল চিন্তা, সকল অনুভূতি পরিক্রমণ করে, হৃদয়ে-বাহিরে একেরই সুর নিশিদিন ধ্বনিত হয়। সকলে মিলিয়া তাহারা এক অখণ্ডরূপে এক। মুসলমানের স্বদেশ ও সমাজ তাই কোন ভৌগোলিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। নিখিল বিশ্বই তাহার স্বদেশ-নিখিল মুসলমানই তাহার ভাই। এই জন্যই ত প্রাণ খুলিয়া সে গাহিতে পারে :

www.pathagar.com

'চীন ও আরব্ হামারা
হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম ওয়াতান হ্যায়
সারা জাহা হামারা।'

এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা : হযরতের ইসলামিক রাষ্ট্র-রচনা। হযরত দেখিলেন, মদিনায় প্রধানত : তিন শ্রেণীর লোক বাস করে : (১) মদিনার আদিম পৌত্তলিক সম্প্রদায়, (২) বিদেশী ইহুদী সম্প্রদায়, (৩) নবদীক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায়। ইহাদের কাহারও সহিত কাহারও আদর্শের মিল ত ছিলই না, তাহার উপর আবার ছিল দলগত হিংসা-বিদ্বেষ। হযরত যখন মদিনায় শুভাগমন করেন, তখন ইহুদীরা ভাবিয়াছিল তাহাদের 'মসিহ্' আসিতেছেন। শিক্ষাদীক্ষা ও ধনবলে তাহারাই ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। কাজেই তাহাদের বিশ্বাস ছিল হযরতকে তাহারা তাহাদের দলে ভিড়াইয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ইসলামের ধ্যান-ধারণা ও রাসূলুল্লাহ্র আত্মরূপের সহিত যতই তাহারা পরিচিত হইতে লাগিল, ততই বুঝিতে পারিল- তাহাদের আশা সফল হইবার নহে। কাজেই হযরতের উপর হইতে তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমেই চলিয়া যাইতে লাগিল। পৌত্তলিক মদিনাবাসীরাও প্রথমে কোনই উচ্চবাচ্য করে নাই, কারণ তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্য হইতে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামকে এখন একটা স্বতন্ত্র শক্তিরূপে দেখিতে পাইয়া মনে মনে তাহারাও হযরতের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতে লাগিল।

দেশবাসীর মনোভাব বুঝিতে হযরতের কষ্ট হইল না। তিনি দেখিলেন, ধর্মমত যাহার যাহাই থাকুক না কেন, তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য না থাকিলে মদিনার কল্যাণ নাই। প্রত্যেক দেশে বৃহত্তর স্বার্থ ও মঙ্গল নির্ভর করে তাহার অধিবাসীবৃন্দের সংহতি ও একাত্মবোধের উপর। যে দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বাস, সে দেশে পরমতসহিষ্ণুতার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। "নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও"-ইহাই হইল নাগরিক জীবনের সর্বপ্রথম নীতি। মক্কায় অবস্থানকালে হযরত কোরেশদিগের নিকট হইতে এই মৌলিক অধিকারটুকুই চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই। মদিনায় আসিয়া সেইজন্যই তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিলেন। পৌত্তলিক এবং ইহুদীদিগের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত লালায়িত হইয়া উঠিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দকে ডাকিয়া একটি বৈঠক করিলেন এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির আবশ্যকতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। শুধু তাহাই নহে, একটি সনদ বা আন্তর্জাতিক সন্ধিপত্রও (International Magan charta) তিনি প্রস্তুত করিলেন। সেই সন্ধিপত্রে পরস্পরের দায়িত্ব ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইল। সকলেই সেই সন্ধিপত্র মানিয়া লইয়া স্বাক্ষর করিলেন। নিম্নে আমরা সেই সনদপত্রের প্রধান প্রধান শর্তগুলির উল্লেখ করিতেছি। পাঠক দেখিতে পাইবেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই সনদপত্রে ইসলামের মহাপয়গম্বর কী অপূর্ব ন্যায়নিষ্ঠা, উদারতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিক জীবনের কী মহান অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

সনদ

"বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির-রাহিম—

রসূল মুহাম্মদ বিশ্বাসীদিগকে এবং যাঁহারাই তাঁহার সহিত যোগ দিবে সকলকে এই সনদ দিতেছেন :

মদিনার ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলিম সকলেই এক দেশবাসী। সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান। ইহুদী নাসারা পৌত্তলিক এবং মুসলমান সকলেই নিজ ধর্ম পালন করিবে, কেহই কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। কেহই হযরত মুহম্মদের বিনানুমতিতে কাহারও সহিত যুদ্ধ করিবে না। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌ ও রসূলের মীমাংসার উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে। বাহিরের কোন শত্রুর সহিত কোন সম্প্রদায় গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না। মদিনা নগরীকে পবিত্র মনে করিবে এবং যাহাতে ইহা কোনরূপ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন শত্রু কখনও মদিনা আক্রমণ করে, তবে তিন সম্প্রদায় সমবেতভাবে তাহাকে বাধা দিবে। যুদ্ধকালে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের ব্যয়ভার নিজেরা বহন করিবে। নিজেদের মধ্যে কেহ বিদ্রোহী হইলে অথবা শত্রুর সহিত কোনরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে তাহার সমুচিত শাস্তি-বিধান করা হইবে—সে যদি আপন পুত্র হয়, তবু তাহাকে ক্ষমা করা হইবে না এই সনদ যে বা যাহারা ভঙ্গ করিবে, সে বা তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।"

ইহাই হইল সনদের সারমর্ম।

এই ঘটনার পর হইতে ইসলাম এক নূতন বেশে দেখা দিল। এতদিন ছিল কতিপয় বিধি-নিষেধ ও নীতিবাক্যের সমষ্টি মাত্র; রাষ্ট্র-রচনায় সমাজ-ব্যবস্থায়, নাগরিক জীবনে বা আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে সে কি বেশে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে তাহা বুঝা যায় নাই। অন্য কথায় তাহার রাজনৈতিক বা রাষ্ট্ররূপ ছিল এতদিন প্রচ্ছন্ন। মদিনায় আসিয়া রসূলুল্লাহ্‌ এইদিকে দৃষ্টি দিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ-বিধানের এইখানেই সূত্রপাত হইল।

বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্র মানবতা-বিকাশের এক নূতন সংস্থা। এতদিন বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন গোত্রের ভিত্তিতে মানব-সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কোন সদ্ভাব ছিল না। সমনাগরিকতা অচিন্তনীয় ছিল। হযরত মুহম্মদই এই অভাব সর্বপ্রথম অনুভব করিলেন। বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য তিনি তাই এমন এক রাষ্ট্র-রচনা করিতে উদ্যোগী হইলেন-যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি বজায় রাখিয়াও একই দেশে পাশাপাশি বাস করিতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষত্ব এইখানে। অনেকে ইহার ভুল ব্যাখ্যা করে; ভাবেন ইসলামী রাষ্ট্র ইসলামী শরীয়তের পূর্ণ রূপায়ণ-ক্ষেত্র। নামায-রোযা, হজ-জাকাত, বিবাহ-তালাক-ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত ইসলামী বিধানই এখানে কায়েম হইবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা নহে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা একই রাষ্ট্রে, কিরূপভাবে মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে, ইসলামী রাষ্ট্র হইবে তাহার দৃষ্টান্তস্থল। অন্য কথায় উদার মানবতা ও বিশ্ববোধই ইসলামী রাষ্ট্রের মূল প্রেরণা। যে-রাষ্ট্রে শুধুমাত্র ইসলাম-চর্চাই হয়, সে রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্র নহে। ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থায় শরীয়তের যে-কঠোরতা সম্ভব, ইসলামী রাষ্ট্রে বরং তাহা অনেক ক্ষেত্রে শিথিল।

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় : ইসলামী সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ; কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে মূর্তিপূজার উচ্ছেদ একরূপ অসম্ভব; কেননা সেইরূপ করিতে গেলে পৌত্তলিকদিগের ধর্মে আঘাত দেওয়া হয়।

এই ঘটনার চৌদ্দ শত বৎসর পরে আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি সেদিন মদিনায় মহামানবতার যে বীজ প্রোথিত হইয়াছিল, আজ তাহা মহীরুহে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আজকাল পৃথিবীর মানুষ একই কথা চিন্তা করিতেছে। লীগ অব নেশন্‌স (League of Nations), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (UNO) আটলান্টিক সনদ (Atlantic Charter), মানবাধিকারের ঘোষণা (Declaration of Human Rights)—এ সমস্তই বিশ্বনবীর চিন্তা, ধ্যান ও স্বপ্নের অমৃতময় ফল। আজ যে এক–পৃথিবীর (One World) স্বপ্ন আমাদের চোখে নামিয়াছে অথবা বিশ্ব–গভর্নমেন্ট (Global Government)-এর কথা আমরা চিন্তা করিতেছি, তাহার মূল উৎসও এই মদিনার ইসলামী রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র–চেতনায় হযরত মুহম্মদ তাই চতুর্দশ শতাব্দীর অগ্রগামী ছিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৭

মদিনার আকাশে কালো মেঘ

কিন্তু মহানবী মদিনায় আসিয়াই বা শান্তিতে থাকিতে পারিলেন কৈ? আপন মুক্তি ও নিরাপত্তাই তাঁহার বৃহত্তম বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। রসুলুল্লাহ, যে শিষ্যবৃন্দসহ নির্বিঘ্নে মদিনায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন এবং তিনি যে তথায় একটি রাষ্ট্রশক্তি গড়িয়া তুলিতেছেন, এই জ্ঞান কোরেশদিগের অন্তরে দারুণ ক্ষোভ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিল। এই শিশুরাষ্ট্র যদি ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়, তবে ইহাই যে একদিন মক্কাবাসীদিগের অশেষ অমঙ্গলের কারণ হইবে, ইহা তাহাদের বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহা ছাড়া একটা ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানিতে তাহাদের অন্তর ভরিয়া গেল। আনুপূর্বিক সকল কথা তাহাদের মনে পড়িল। মুহম্মদ এবং তাঁহার ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য কত চেষ্টাই না তাহারা করিয়াছে। মুহম্মদকে গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে, অত্যাচার করিয়াছে, সামাজিক বয়কট করিয়াছে, অবশেষে তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। শিষ্যদিগের উপরও কত না অমানুষিক অত্যাচার তাহারা করিয়াছে। তাহার পরে অনেকে আবিসিনিয়ায় হিযরত করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। তাহাদিগকে ধৃত করিতে অথবা দেশে ফিরাইয়া আনিতেও তাহারা কত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কোন চেষ্টাই তাহাদের সফল হয় নাই। অবশেষে সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া মুহম্মদ আজ বিজয়ীর বেশে মদিনায় গিয়া উপস্থিত। হিযরতের দিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে ধৃত করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই মুহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের উপর কোরেশদিগের ক্রোধ ও আক্রোশ যে এখন শতগুণ বর্ধিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

এই সঙ্গে মদিনাবাসী আনসারদিগের উপরেও কোরেশদিগের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহারা কেন মক্কায় আসিয়া গোপনে গোপনে মুহম্মদের সহিত চুক্তি করিয়া গেল? কোরেশদিগের পরাজয়ের কারণ ত প্রকৃতপক্ষে মদিনাবাসীরাই। তাহারা যদি মুহম্মদ ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নিজ দেশে লইয়া গিয়া আশ্রয় না দিত, তবে কি আজ মুহম্মদ এমনভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন? কখনই না।

কাজেই মদিনাবাসী মুসলমানদিগকেও জব্দ করিবার জন্য কোরেশগণ বদ্ধপরিকর হইল। ইহার জন্য সুযোগ জুটিতেও বিলম্ব হইল না। হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিবার উপকরণ তাহারা মদিনা নগরেই লাভ করিল প্রচুর। এই সময়ে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই নামক খাজ্‌রাজ বংশীয় জনৈক সম্ভ্রান্ত প্রতিপত্তিশালী পৌত্তলিক মদিনায় বাস করিত। মদিনাবাসীদের উপর তাহার প্রভাব ছিল যথেষ্ট। রসুলুল্লাহ্‌র মদিনায় আগমনের পূর্ব পর্যন্ত মদিনাবাসীরা আবদুল্লাহ্‌কে তাহাদের রাজা করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছিল। কিন্তু হযরতের শুভাগমনে সমস্তই ওলট পালট হইয়া গেল। মদিনা রিপাবলিকের তিনিই এখন প্রধান। মদিনাবাসীদের পূর্বমত তাই পরিবর্তিত হইয়া গেল। হযরতের অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আবদুল্লাহ্ বিন উবাইকে এখন নিষ্প্রভ দেখাইতে লাগিল। এইজন্য স্বভাবতই তাহার ক্রোধ গিয়া পড়িল নিরপরাধ হযরতের উপর। হযরতকে সে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতে লাগিল। বলাবাহুল্য, কোরেশগণ এই সুযোগের

www.pathagar.com

সদ্ব্যবহার করিতে ছাড়িল না। তাহারা গোপনে গোপনে পত্র লিখিয়া আবদুল্লাহ্‌কে হযরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আবদুল্লাহ্‌ও কোরেশদিগের এই দুরভিসন্ধিতে যোগ দিল।

এদিকে ইহুদীরাও সন্ধিশর্ত মানিল না। সর্বপ্রকার ধর্মস্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার দান করা সত্ত্বেও তাহাদের চিরবিশ্বাসঘাতক মন হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া ফিরিতে লাগিল। কোন পয়গম্বরকেই যখন তাহারা ছাড়ে নাই, হযরত মুহম্মদকেই বা কেন ছাড়িবে? তাহারা তলে তলে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়িয়া মদিনায় নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম রাষ্ট্রশক্তিও ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। আঘাতে আঘাতেই তাহার ঘুমন্ত ক্ষাত্রশক্তি জাগিয়া উঠিল। মদিনার মুসলমানগণ পরিষ্কার বুঝিতে পারিল, টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাদিগকে এখন যুদ্ধমনা হইতে হইবে।

হযরত তাই এইবার নবমূর্তিতে দেখা দিলেন। এতদিন তিনি বিধর্মীদিগের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, বাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এইবার তিনি এই নীতি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা হিযরত একটা সাময়িক প্রক্রিয়া মাত্র; উহা দ্বারা স্থায়ী জয়লাভ হয় না। বলিষ্ঠ জাগ্রত জীবনের উহা লক্ষণ নহে; বাঁচিয়া থাকিতে হইলে অত্যাচারী যালিমকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিতে হয় এবং যতদিন না তাহাতে জয়লাভ করা যায়, ততদিন সংগ্রাম চালাইতে হয়। ইহাই ভাবিয়া রসূলুল্লাহ এইবার শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

কিন্তু একটা দ্বিধা আসিয়া মহানবীর মনের চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যুদ্ধ মানে ত অস্ত্রাঘাত, খুনখারাবি, নরহত্যা, লুণ্ঠন এইসব। আল্লাহ্‌র রসূলের পক্ষে কি এই নিষ্ঠুরতা শোভা যায়? তিনি ত চাহেন প্রেম, শান্তি ও মিলন। সেই আদর্শের সঙ্গে যুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবতার সামঞ্জস্য কোথায়? রসূলুল্লাহ্‌র মনে এই জিজ্ঞাসা জাগে।

এই সময় কয়েকটি আয়াত নাযিল হওয়ায় হযরতের মনের দ্বন্দ্ব দূর হইয়া যায় :

"আল্লাহ্‌র পথে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমার সহিত যুদ্ধ করে। তবে সীমা লংঘন করিও না, কারণ আল্লাহ্‌ সীমা-লংঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।"

(২ : ১৯১)

"এবং তাহাদিগকে যেখানে পাও হত্যা কর এবং যেখান হইতে তাহারা তোমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে সেখান হইতে তুমিও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দাও। নিশ্চয় হত্যা অপেক্ষা অত্যাচার বেশী ভয়াবহ।" (২ : ১৯২)

"যুদ্ধ তোমাদের জন্য অবধারিত কর্তব্য করা হইল যদিও তোমরা ইহা কঠোর মনে করিতেছ। তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গল তোমরা হয়ত তাহাই পছন্দ করিতেছ না। আবার যাহা তোমাদের পক্ষে অমঙ্গলজনক হয়ত তোমরা তাহাই ভালবাসিতেছ। আল্লাহ্‌ই সব জানেন, তোমরা জানো না।" (২ : ২১৬)

নূরনবী এইবার ইসলামের মর্মবাণী খুঁজিয়া পাইলেন। বুঝিলেন ইসলাম নিষ্ক্রিয় প্রেম বা শান্তির ধর্ম নহে। এতদিন বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, অহিংসা, প্রেম, ক্ষমা ইত্যাদিই ছিল মানুষের পরম ধর্ম। সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, নরহত্যা, ইত্যাদি কর্মকে মহাপাপ বলিয়াই

www.pathagar.com

সকলে মনে করিত। কিন্তু নূরনবী আজ দিব্যদৃষ্টি দিয়া দেখিলেন : যালিমকে বাধা দেওয়া, দুশমনকে দমন করা, শত্রুপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র বা রসদপত্র লুট করিয়া নেওয়া, অথবা প্রয়োজন হইলে শত্রুর প্রাণবধ করিবার মধ্যেও অশেষ কল্যাণ নিহিত থাকিতে পারে। জীবনে প্রেম ক্ষমারও যেমন প্রয়োজন, যুদ্ধ বিগ্রহেরও ঠিক তেমনি প্রয়োজন। কোন প্রবৃত্তিই সৎ বা অসৎ নহে। ব্যবহারের উপরেই প্রত্যেক জিনিসের ভালমন্দ নির্ভর করে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে; চাই শুধু শুদ্ধিকরণ বা sublimation কামকে শুদ্ধ করিলে প্রেমে রূপান্তরিত হয়; বিশুদ্ধ ক্রোধ প্রেরণা রূপে ধর্মে উৎসাহ দিতে পারে; শুদ্ধিকৃত লোভ আগ্রহ বা আকর্ষণ রূপে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। সেইরূপ যুদ্ধ বা সংগ্রামেরও একটা বিশুদ্ধ রূপ আছে। তাহার নাম জিহাদ। সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের জন্য, আদর্শের জন্য, ধর্মের জন্য-এক কথায় আল্লাহ্‌র জন্য যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ পবিত্র। এই যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অতি মহৎ। লুণ্ঠন, নরহত্যা, রাজ্যজয় ইত্যাদি ইহার লক্ষ্য নহে—অসত্য, অন্যায় ও অত্যাচারকে জয় করিয়া সত্য প্রীতি, প্রেম ও শান্তি প্রতিষ্ঠাই হইল জিহাদের মূল লক্ষ্য।

ঠিক এ পরিস্থিতিই আজ রসুলুল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত। আজ তিনি জিহাদের জন্য উন্মুখ। জিহাদ আজ তাঁহার নিকট ফরজ। শান্তির জন্যই আজ যুদ্ধের প্রয়োজন। প্রেম ও ক্ষমার নীতি আজ ব্যর্থ। "এক গালে চড় মারিলে অপর গাল ফিরাইয়া দাও"-এই নীতিবাক্য আজ মহাপাপ। কেননা ইহার মধ্যে আছে দুষ্কৃতির প্রশ্রয় ও যালিমের সমর্থন। অতীতের সব কথা রসুলুল্লাহ্‌র আজ মনে পড়িল। কোরেশগণ দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহার উপর এবং তাহার শিষ্যদের উপর কী অমানুষিক অত্যাচারই না করিয়া আসিয়াছে। ঘরবাড়ি, টাকাকড়ি, আত্মীয় স্বজন এমন কি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সকলকে আসিতে হইয়াছে, তবু সেই পাষণ্ডদিগের অত্যাচারের বিরাম নাই কেন? কি অপরাধে তাঁহাদের এ দুর্গতি, এত উৎপীড়ন? একমাত্র অপরাধ তাঁহারা শান্তভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করিতে চাহিয়াছেন। কাহারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই, কাহারও উপর আক্রমণ করেন নাই-যুলুম করেন নাই, শুধু নিজ ধর্ম পালনের অধিকারটুকু চাহিয়াছেন। ইহাই কি এত অপরাধ? ইহারই জন্য এত যুলুম? দেশত্যাগ করাতেও নরপশুগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। মদিনা আক্রমণ করিয়া মুহম্মদ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দকে কিভাবে নির্মূল করিবে, এই ষড়যন্ত্রে এখন তাহারা লিপ্ত।

রসুলুল্লাহ্‌র মন তাই ধীরে ধীরে জিহাদের রঙে রাঙা হইয়া উঠিতে লাগিল। ইসলামের দৃপ্ত মূর্তি এইবার তাঁহার মানস-নয়নে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে মক্কা হইতে কোরেশগণ অতর্কিতে মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়া কয়েকবার লুটতরাজ করিয়া গেল।

কোরেশগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রসুলুল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে-জাহশ নামক জনৈক মোহাজিরের নেতৃত্বাধীনে একটি গোয়েন্দাদল গঠন করিয়া মক্কা সীমান্তে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে এই উপদেশ দেওয়া হইল যে, তাহারা সেখানে থাকিয়া কোরেশদিগের গতিবিধি ও সমরায়োজন সম্বন্ধে গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিবে। এই দলের লোকসংখ্যা ছিল আটজন। সন্ধানীদল মক্কার নিকটবর্তী নাখলা নামক স্থানে উপনীত হইলে তাহাদের সঙ্গে হঠাৎ একটি ক্ষুদ্র কোরেশ কাফেলার

www.pathagar.com

মোকাবেলা হইয়া গেল। তাহারা সংখ্যায় ছিল মাত্র চারিজন। কোরেশগণ অপ্রত্যশিতভাবে মদিনাবাসী মুসলমানদিগকে মক্কার এত নিকটবর্তী দেখিতে পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িল। সন্ধানীদলও হঠাৎ শত্রুর সম্মুখীন হওয়ায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। উভয় দলে তখন সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল। ফলে একজন কোরেশ নিহত ও দুইজন বন্দী হইল। চতুর্থ ব্যক্তি কোনমতে পালাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। -

আবদুল্লাহ ও তাহার সঙ্গীগণ পরিত্যক্ত মালপত্র ও বন্দীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। তখন ছিল পবিত্র রজব মাস। এই মাসে আরবে যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। আবদুল্লাহ্‌র কৃতকর্মে রসূলুল্লাহ্ তাই রুষ্ট হইলেন। বিধর্মীরাও রসূলুল্লাহ্‌কে নিন্দা করিবার একটা সুযোগ পাইল। কিন্তু এই সময়ে কোরআনের একটি আয়াত নাযিল হইয়া তাঁহার মনের সন্দেহ দূর করিয়া দিল :

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা জায়েজ কি না। বল পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা, আল্লাহ্‌র ভক্তদিগকে তাঁহার পথে চলিতে ও পবিত্র মস্‌জিদে যাইতে বাধা দেওয়া এবং (বিশ্বাসীদিগকে) সেখান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আল্লাহ্‌র চোখে অধিকতর অন্যায় এবং হত্যা অপেক্ষা অত্যাচার বেশী ভয়াবহ।" (২ : ২১৭)

এই আয়াতে আবদুল্লাহ্‌র কার্যের সমর্থন মিলিল। রসূলুল্লাহ্‌র মন শান্ত হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি তখন তিনি স্বেচ্ছাবাহিনীর মধ্যে যথারীতি বন্টন করিয়া দিলেন।

এইসব কাণ্ডের ফলে কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা আরও বাড়িয়া গেল। পূর্ণোদ্যমে তাহারা যোদ্ধা, হাতিয়ার, রসদপত্র, ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চারিদিক হইতে চাঁদা আসিতে লাগিল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং এক হাজার উট লইয়া আবু সুফিয়ান সিরিয়া যাত্রা করিল।

এইদিকে রসূলে করিমও মদিনায় গিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। মক্কাবাসীরা কোথায় কোন্ ষড়যন্ত্র করিতেছে, মদিনার ইহুদী ও নাসারাগণ কখন কিভাবে কোরেশদিগের সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করিতেছে, সমস্ত খবরই তিনি রাখিতেন। হযরতের চাচা আব্বাস মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করিলেও এতদিন যে তাহা প্রকাশ করেন নাই, তাহার গূঢ় কারণ ছিল গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার জন্যই তিনি মক্কাতে রহিয়া গিয়াছিলেন। কোরেশগণ মনে করিয়াছিল আব্বাস পূর্ববৎ পৌত্তলিক হইয়াই আছেন। কিন্তু তাহা নহে। ইহা নিছক গোয়েন্দাগিরি। বলা বাহুল্য, আব্বাস যে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকিয়া ইসলামের কত বড় খিদমৎ করিয়াছেন এবং দুর্দিনে ইসলামকে মুক্তির পথে যে কতখানি আগাইয়া দিয়াছেন, সে কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। আবু সুফিয়ান যে কখন কিভাবে কোন্ পথ দিয়া অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য সিরিয়া গমন করিয়াছে এবং কখন কোন পথ দিয়া ফিরিয়া আসিবে, সে সব কথা আব্বাসের মারফতই হযরত জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই অনুসারেই তিনি প্রস্তুত হইতেছিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৮
বদর—যুদ্ধ

যুদ্ধ আসন্ন দেখিয়া হযরত মদিনাবাসীদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্বে যে সনদপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার একটি শর্ত এই ছিল যে, বহিঃশত্রুর দ্বারা যদি মদিনা আক্রান্ত হয়, তবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মিলিয়া দেশরক্ষা করিবে। কিন্তু হযরত পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে সে মনোভাব আদৌ নাই। বরং তাহাদের ভাবে ভঙ্গিতে ও আচরণে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, কোরেশগণ মদিনা নগরী আক্রমণ করিয়া নব জাগ্রত মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করিয়া দিলেই তাহারা খুশি হয়। শুধু তাহাই নহে, তাহারা যে তলে তলে কোরেশদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, এই সংবাদও হযরতের অজানা রহিল না। হযরত ইহাতে দমিলেন না। বুঝিলেন মুসলমানদিগকে দুই সীমান্তেই যুদ্ধ করিতে হইবে। তবে উভয় শত্রুকে একযোগে ক্ষেপাইয়া দেওয়া বুদ্ধিমত্তার কাজ হইবে না। ইহাই ভাবিয়া তিনি সর্বপ্রথম কোরেশদিগকে দমন করিতেই বদ্ধপরিকর হইলেন।

এই উদ্দেশ্যে নবীজী আপন ভক্তবৃন্দকে এক পরামর্শ সভায় আহ্বান করিলেন। সমর পরিস্থিতির আলোচনা করিতে গিয়া তিনি বুঝাইয়া দিলেন, আবু সুফিয়ানকে অস্ত্রশস্ত্রসহ সিরিয়া হইতে নির্বিঘ্নে মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সুযোগ দিলে বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। তৎকালে মক্কা হইতে সিরিয়া যাইতে হইলে বদরের গিরিপথ দিয়া যাইতে হইত। বদর ছিল মক্কা মদিনা ও সিরিয়ার রাজপথের সন্ধিস্থল এবং মদিনার এলাকাধীন। কাজেই মদিনার বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মদিনার মধ্য দিয়াই শত্রুরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র রসদপত্র লইয়া দেশে ফিরিবে, অথচ মদিনাবাসী তাহাতে বাধা দিবে না, ইহার নাম নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানায় দস্তখৎ ছাড়া আর কিছু নহে। দুই দেশ যখন যুদ্ধাবস্থায় (state of the belligerency) আসিয়া যায়, তখন এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেওয়া কিছুতেই আর সম্ভব হয় না। কোন আন্তর্জাতিক নীতিই ইহা সমর্থন করে না। রসূলুল্লাহ্ তাই মনস্থ করিলেন সিরিয়া হইতে রণসম্ভারসহ ফিরিবার পথে বদর প্রান্তরে আবুসুফিয়ানকে বাধা দিয়া তাহার অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইবেন। তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, আঘাতের প্রতিঘাত করিয়া আত্মরক্ষা করা সব সময় নিরাপদ নহে। আক্রমণ অনেক সময় শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা।

এই ব্যাপারই পরামর্শ সভায় আলোচিত হইল। রসূলুল্লাহ্ সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। আবুবকর ও আলি রসূলুল্লাহ্র কথায় সায় দিয়া বলিলেন : কালবিলম্ব না করিয়া বদর প্রান্তরে অভিযান করা উচিত। আল্‌মিকদাদ নামক এক সাহাবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্র নির্দেশে আপনি যেখানে খুশি চলুন, আমরা আপনার সঙ্গে যাইব। হযরত মূসার শিষ্যদিগের ন্যায় আমরা এই কথা বলিব না, হে মূসা, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়া যুদ্ধ কর, আমরা এখানে বসিয়া থাকি। আমাদের কথা হইতেছে : আল্লাহ্র নামে আপনি যুদ্ধে চলুন, আমরাও আপনার সঙ্গে যুদ্ধে যাইব। এই কথায় রসূলুল্লাহ্ উৎসাহ বোধ করিলেন।

www.pathagar.com

অতঃপর আনসারদিগের প্রতি চাহিয়া তিনি তাহাদের মনোভাব জানিতে চাহিলেন। তখন আনসার–নেতা সাদবিন মা'জ উঠিয়া বলিতে লাগিলেন : "হে রসূলুল্লাহ্, আনসারদিগের সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন না। জীবনে মরণে সুখে দুঃখে ছায়ার ন্যায় আমরা আপনাকে অনুসরণ করিব। আপনি যেখানে যাইতে বলিবেন সেখানেই যাইব, যেখানে থামিতে বলিবেন সেখানেই থামিব। সাগরে ঝাঁপ দিতে বলিলে সাগরে ঝাঁপ দিব, ডুবিতে বলিলে ডুবিব, মারিতে বলিলে মারিব।'

শিষ্যদিগের এই মনোবল দেখিয়া হযরত যারপরনাই আশান্বিত হইলেন। অবিলম্বে অভিযানের জন্য তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু তবু শিষ্যদিগের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দিল। অনেকে বলিলেন, মদিনা নগরে যখন ইহুদী, নাসারা ও অন্যান্য গৃহশত্রু বিদ্যমান তখন সমস্ত মুসলমানের একযোগে নগর ত্যাগ করিয়া যাওয়া কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। হযরত দেখিলেন কথাটির মধ্যে সত্য আছে। তখন তিনি মুসলমানদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা মদিনায় থাকিবার পক্ষপাতি ছিলেন তাঁহাদিগকে মদিনাতেই রাখিয়া দিলেন আর যাহারা অভিযানে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন, তাঁহাদিগকে লইয়াই তিনি একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করিলেন। এইরূপ যিন্দাদিল দুঃসাহসিক মুসলিম বীরের সংখ্যা মিলিল মাত্র ৩১৩ জন; তাহাদেরও আবার অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত মামুলি ধরনের। অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র দুইজন। আর যানবাহনের জন্য পাওয়া গেল মাত্র ৭০টি উট।

এই ক্ষুদ্র বাহিনী লইয়াই হযরত আজ বাহির হইলেন সেনাপতির বেশে। আজ তাঁহার বীরমূর্তি। হাতে নাঙ্গা তলোয়ার। শিরে বাঁধা আমামা। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে তাঁহারা গৃহত্যাগ করিলেন। নিজেদের গতিবিধি গোপন রাখিবার জন্য উটের গলার ঘন্টাগুলি কাটিয়া দেওয়া হইল। মুষ্টিমেয় এই সত্যের সৈনিকদল নীরবে বদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইসলাম আজ সর্বপ্রথম দৃপ্ত তেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার প্রচ্ছন্ন রণমূর্তি আজ জগতে আত্মপ্রকাশ করিল। তুমি অন্যায় করিয়া আমার গালে চড় মারিলে, আর আমি তোমার দিকে অন্য গালটি ফিরাইয়া দিব, ইসলাম তাহা নহে। দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট ঝামেলা হইতে নিরাপদে থাকিবার জন্য সন্ন্যাসী সাজিয়া বনে যাইব, ইসলাম তাহাও নহে। ইসলাম জীবনের ধর্ম। আত্মবিলুপ্তি বা পশ্চাদপসরণ তাহার বাণী নহে। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা হিযরতও তাহার মূলনীতি নহে–কৌশলমাত্র। প্রয়োজন হইলে সাময়িকভাবে অত্যাচার সহ্য করিতে হয়, অথবা হিযরত করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে গিয়া উদ্দেশ্য সাধনের নূতন পথ খুঁজিতে হয়। হিযরতের অর্থ তাই পলায়ন বা আত্মগোপন নহে–সংগ্রামের ইহা এক কৌশলমাত্র। ইসলাম মূলত সংগ্রামের ধর্ম। সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হও—ইহাই তাহার বাণী। যালিমকে বাধা দাও, মযলুমকে রক্ষা কর, সত্য ও আদর্শের জন্য তরবারি ধর—প্রয়োজন হইলে মার—প্রয়োজন হইলে মর–ইহাই ইসলাম। ইসলামের তরবারি তাই নিরপরাধকে আঘাত করিবার জন্য নহে–আত্মরক্ষার জন্য, ন্যায় নীতি ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, অন্যায়ের যথাযোগ্য প্রতিকারের জন্য। জীবন বিমখুতা, কাপুরুষতা বা ভীরু হৃদয়ের মিনতি ইসলামে নাই।

www.pathagar.com

ইসলাম বলিষ্ঠ ধর্ম—স্বভাবের পটভূমিতে তাহার প্রতিষ্ঠা। স্বভাবে যাহা আছে, ইসলামেও তাহা আছে।

এই মহাসত্যকেই রসূলুল্লাহ্ আজ প্রথম রূপ দিলেন। এতদিন তাঁহার এক হাতে ছিল কোরআন, অপর হাত ছিল শূন্য। সেই শূন্য হাতে এবার তুলিয়া লইলেন তরবারি। এক হাতে কোরআন, অপর হাতে তলোয়ার—মানুষের এই মহিমময় মূর্তি দেখিয়া কোন্ অর্বাচীন ইহাকে নিন্দা করে? ইহার চেয়ে তাহার সুন্দর মূর্তি আর কি হইতে পারে? সত্যের সহিত শক্তির এই যে মিলন—ইহা কি ঘৃণার? ইহা কি নিন্দার? কিছুতেই নহে। শক্তি ছাড়া সত্য দাঁড়াইতে পারে না। পক্ষান্তরে শক্তি যদি সত্যাশ্রয়ী না হয়, তাহা হইলে মানুষের অশেষ দুর্গতি ও অকল্যাণ ঘটে। সত্যহীন শক্তি যুলুমে রূপান্তরিত হয়। জগতের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য সত্য ও শক্তির সমন্বয়ের তাই একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত হয়, সত্যও উন্নত শিরে তাহার পথ কাটিয়া চলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাই সত্য ও শক্তির যুগপৎ সাধনা। সত্যের আলো যদি আমাকে পথ দেখায়, সকল মিথ্যা সকল ভ্রান্তি সকল অসুন্দর হইতে সে যদি আমাকে বাঁচাইয়া চলে, সঙ্গে সঙ্গে আমার তরবারি যদি আমাকে দেয় সকল বাধা-বিঘ্নকে জয় করিবার বিপুল প্রেরণা; সকল ভীরুতা, দুর্বলতা দূর করিয়া সে যদি দেয় আমার অন্তরে অসীম সাহস ও মনোবল, তবে আমার ভয় কি? লক্ষ্যস্থলে আমি পৌছবই।

ইসলামের সহিত তরবারির এমনই সম্বন্ধ।

কোরআন ও তরবারি তাই আদৌ অসামঞ্জস্য নহে। দুই বিরুদ্ধশক্তির সমন্বয়ই ত ইসলাম।

বস্তুত ইসলাম মুসলমানকে দুইটি বস্তুই দান করিয়াছে : একটি কোরআন, অন্যটি তলোয়ার। সত্য ও শক্তি, দীন দুনিয়ার দুই চমৎকার প্রতীক এই কোরআন ও তলোয়ার।

ইহাই মুসলমানের সাচ্চা চেহারা—ইহাই তাহার সংক্ষিপ্ততম পরিচয়।

এই এক হাতে তলোয়ার—অপর হাতে কোরআনধারী নও মুসলিমকেই আজ আবার আমরা সারা প্রাণ দিয়া কামনা করি।

হযরত মুহম্মদকে আমরা দেখিলাম আজ এই আদর্শ মুসলিম বেশে। এইবেশেই বীর নবী চলিলেন যুদ্ধ অভিযানে।

রসূলুল্লাহ্ প্রথমত মক্কার পথ ধরিয়া চলিলেন, কিন্তু কিছুদূর গিয়া বদরের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

দুইদিন পথ প্রবাস করিবার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে হযরত সদলবলে বদর গিরি প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বদর গিরি উপত্যকার তিনদিকে ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়। পূর্বদিকের একটি পাহাড় হইতে একটি ঝর্ণাধারা নিম্নভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। অভিজ্ঞ সাহাবাদিগের পরামর্শে হযরত সেই ঝর্ণার হাসিমুখ অধিকার করিয়া ঘাঁটি গাড়িলেন। একটি টিলার উপর খর্জুর শাখা ও পত্রাদির দ্বারা হযরতের জন্য একটি ছাউনি প্রস্তুত করা হইল। সেই ছাউনির মধ্যে হযরত রাত্রি যাপন করিলেন। সাদ বিন মা'জ সারা রাত্রি সে ছাউনি পাহারা দিলেন।

www.pathagar.com

সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে সকলে আত্মগোপন করিয়া আবু সুফিয়ানের প্রতীক্ষায় রহিলেন। মাঝে মাঝে দুই একজন সাহাবী নিম্নে নামিয়া ছদ্মবেশে এদিক ওদিক গিয়া খোঁজ-খবর লইতে লাগিলেন।

কিন্তু আবু সুফিয়ানও কম ধুরন্ধর ছিল না। সিরিয়া হইতে ফিরিবার পথে বদরের সন্নিকটে আসিয়াই সে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। সে ছিল একজন পাক্কা গোয়েন্দা। বদর সীমান্তে পদার্পণ করিবার পূর্বেই তাহার সন্দেহ হইল হয়ত বা মদিনাবাসীরা বদরে আসিয়া এবার তাহাকে বাধা দিবে। এই আশঙ্কায় সে গোয়েন্দাগিরি শুরু করিল। একটি বাজারের সন্নিকটে দুইটি উটের পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া সে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া উটের খানিকটা শুষ্ক বিষ্ঠা দেখিতে পাইল। সেই বিষ্ঠা তুলিয়া ধৌত করিয়া সে দেখিল তাহার ভিতর যে খেজুরের আঁটি রহিয়াছে তাহা আকারে ছোট। বলা বাহুল্য, মদিনায় যে খেজুর হয় তাহার আঁটি মক্কার খেজুরের আঁটি অপেক্ষা অনেক ছোট; কাজেই আবু সুফিয়ানের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, এই অঞ্চলে মদিনার লোকেরা ঘোরাফেরা করিতেছে। এই ইঙ্গিত পাইয়াই আবুসুফিয়ান বদরের পথ ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাফেলাকে অন্য পথে পরিচালিত করিল। সঙ্গে সঙ্গে জমজম নামক জনৈক কোরেশদূতকে দ্রুতগামী এক উটে মক্কায় পাঠাইয়া দিল। দূত গিয়া আবু যহলকে এই জরুরী খবর দিল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে হামলা করিবার জন্য মুহম্মদ সসৈন্যে বদরে উপস্থিত। মক্কা হইতে যথেষ্ট সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র, ও রসদপত্র না পাঠাইলে আবু সুফিয়ানের আর রক্ষা নাই।

সংবাদ পাওয়া মাত্র আবু যহল ব্যস্তত্রস্তভাবে মক্কাবাসীকে আহ্বান করিয়া এই বিপদ সংবাদ জানাইল এবং তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসিবার জন্য সকলকে আহ্বান করিল। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী রণরঙ্গিণী হিন্দা স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সিংহীর ন্যায় গর্জিয়া উঠিয়া আপন পিতা ওৎবা, চাচা শায়বা, ভ্রাতা অলিদ ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগকে যুদ্ধ যাত্রার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে লাগিল। নাখলায় নিহত ও বন্দী কোরেশদিগের আত্মীয় স্বজনও উৎসাহের সঙ্গে সেনাদলে আসিয়া যোগ দিল। মদিনাবাসীদের দুঃসাহস ও স্পর্ধাকে দমন করিতেই হইবে, ইহা হইল তাহাদের দৃঢ় পণ। অনতিবিলম্বে প্রায় এক হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠিত হইয়া গেল। তন্মধ্যে ১০০ অশ্বারোহী, ৭০০ উষ্টারোহী ও অবশিষ্ট পদাতিক। এই সেনাবাহিনীর পরিচালক হইল সত্তর বৎসর বয়স্ক কোরেশ নেতা আবু যহল।

দ্বিগুণবেগে কোরেশবাহিনী বদর পানে অগ্রসর হইল। অর্ধপথ অতিক্রম করিবার পর আবু সুফিয়ানের দ্বিতীয় দূত আবু যহলের নিকট এই খবর লইয়া আসিল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মুহম্মদের লোক লস্করকে এড়াইয়া নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছে। এখন সে অন্য পথ দিয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে। কাজেই মক্কা হইতে আর সাহায্য পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

এই সংবাদে কোরেশ বীরদলে অনেকেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। অনেকে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিল। কিন্তু আবু যহল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অন্যরূপ যুক্তি দেখাইল। তাহারা বলিল, আমরা যখন এত কষ্ট করিয়া বদরের কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছি, তখন মদিনাবাসীদিগকে শায়েস্তা না করিয়া যাইব না। মুহম্মদের সঙ্গে কতই বা লোক লস্কর আছে? অস্ত্রশস্ত্রই বা তাহাদের এত কী? যুদ্ধই বা কয়জন জানে? কাজেই এ সুযোগ

www.pathagar.com

ছাড়া হইবে না। এখান হইতে ফিরিয়া গেলে সকলেই আমাদিগকে কাপুরুষ বলিবে। আমরা তাই কিছুতেই ফিরিব না। আমাদের সঙ্গে নর্তকী আছে, গায়ক গায়িকা আছে। আমরা বরং বদরে গিয়া আবু সুফিয়ানের নিরাপত্তা ও রণ চাতুর্যের জন্য আনন্দোৎসব করিব। আর মুহম্মদ ও তাহার লোক লস্করকে আমরা যে পরাজিত করিব, ইহা ত সুনিশ্চিত।

ইহা ভাবিয়া কোরেশগণ দ্বিগুণ উৎসাহে বদর পানে অগ্রসর হইল। গ্রীষ্মকাল। রমজান মাস। কোরেশগণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বদরে আসিয়া উপনীত হইল। পানির সন্ধানে কতিপয় সৈন্যকে সামনে অগ্রসর হইবার জন্য আবু যহল আদেশ দিল।

কয়েকজন লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝর্ণার ধারে আসিয়া যেই পানি খাইতে নামিয়াছে অমনি বীরবর হামজা গুপ্তস্থান হইতে তাঁহার দল লইয়া সেই লোকগুলিকে আক্রমণ করিলেন। হামজা নিজেই কোরেশদের সর্দারকে হত্যা করিলেন। কয়েকজন বন্দী হইল এবং একজন পলাইয়া গিয়া আবু যহলকে এই সংবাদ দিল। আবু যহল বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারা যে শত্রু সৈন্যের এত কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ভাবিতেই পারে নাই। কোরেশদলে তখন সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। দ্রিম্ দ্রিম্ রবে রণদামামা বাজিয়া উঠিল।

মুসলিমদের মনের অবস্থা তখন যে কিরূপ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই অনুমান করা যায়। অকস্মাৎ এমন পটপরিবর্তন ঘটিবে, কে জানিত? রসুলুল্লাহ্ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা আসিয়াছিলেন আবুসুফিয়ানের নিরস্ত্র কাফেলাকে আক্রমণ করিতে। কিন্তু সে কাফেলা কোথায় মিলাইয়া গেল, তদস্থলে ভাসিয়া উঠিল সশস্ত্র এক কোরেশবাহিনী। এর জন্য ঠিক রসুলুল্লাহ্ প্রস্তুত হইয়া আসেন নাই। এখন বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে এই কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইল। কোরেশবাহিনীর মুকাবেলা করা ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল? শত্রু ত এখন ঘাড়ের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। রসুলুল্লাহ্ নেতৃস্থানীয় সাহাবীদিগের সহিত পুনরায় পরামর্শ করিলেন। তিনি দেখিলেন ভক্তবৃন্দ পূর্বের প্রতিজ্ঞায় অটল রহিয়াছেন। আল্লাহ্র জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য প্রত্যেকেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত। রসুলুল্লাহ্ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

শুক্রবার প্রভাত হইতে না হইতেই বেলালের কণ্ঠে ফজরের আযান ধ্বনিত হইল। মুসলমানেরা কাতারবন্দী হইয়া রসুলে করিমের এমামতিতে নামায পড়িলেন। নামাযান্তে হযরত যুদ্ধের জন্য সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন যেখানে যাহাকে মোতায়েন করা দরকার, করিলেন। যাহাকে যে উপদেশ দিবার, দিলেন। মুসলিম সৈন্য প্রান্তরভূমি সম্মুখে রাখিয়া একটি অনুচ্চ পর্বত গাত্রে স্থান নিলেন। পানির ঝর্ণাটি তাঁহাদের অধিকারে রহিল।

কোরেশ সৈন্য প্রান্তরে ব্যূহ রচনা করিল। বিচিত্র বর্ণের পোশাক ও বর্মে সুসজ্জিত হইয়া তাহারা কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া গেল।

যুদ্ধ আসন্ন জানিয়া রসুলুল্লাহ্ আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় গিয়া তিনি আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এই সংকট মুহূর্তে জীবনের চরম এবং পরম বন্ধুর স্মরণ লইলেন। প্রাণের সকল আবেগ মিশাইয়া মুনাজাত করিলেন : "হে আমার প্রভু, আমার সহিত তুমি যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা পূর্ণ কর। প্রভু হে–এই মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিকদলটিকে তুমি কি বাঁচাইয়া রাখিবে না? ইহারা যদি আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়,

www.pathagar.com

তবে দুনিয়ায় তোমার নামের মহিমা প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে।" বলিতে বলিতে হযরত একেবারে ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া পড়িলেন। তাহা দেখিয়া আবুবকর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, হযরত যথেষ্ট হইয়াছে। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই আপনার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন :

"ন্যায়বানদিগকে সুসংবাদ দাও। নিশ্চয়ই তোমার প্রভু বিশ্বাসীদিগের নিকট হইতে শত্রুদিগকে দূরে রাখিবেন, কারণ আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদিগকে ভালবাসেন না।" (২২ : ৩৮)

হযরত উৎফুল্ল হইয়া বাহিরে আসিলেন। আবুবকরকে ডাকিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন এবং আল্লাহ্র সেই প্রতিশ্রুতির বাণী জোরে ঘোষণা করিতে লাগিলেন :

"শীঘ্রই শত্রুদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলায়ন করিবে। আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি এই নিয়তি। শত্রুদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত মারাত্মক ও ভয়াবহ হইবে।"[১] (৫৪ : ৪৫ ৪৬)

ওদিকে আবু যহল মুসলমানদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিবার জন্য ওমায়ের নামক জনৈক অশ্বারোহীকে আদেশ দিল। ওমায়ের দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া মুসলমানদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিল : মুসলমানেরা সংখ্যায় তিন শতের বেশী হইবে না।

শুনিয়া আবুযহল নিশ্চিত বিজয়গর্বে একেবারে অধীন হইয়া উঠিল। কালবিলম্ব না করিয়া সে যুদ্ধা রম্ভের আদেশ দিল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশ শিবির হইতে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। তখনকার রীতি অনুসারে প্রথমে যুগ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোরেশদিগের মধ্য হইতে ওৎবা, তাহার ভ্রাতা শায়্বা এবং পুত্র অলিদ বাহির হইয়া আসিয়া আস্ফালন করিতে করিতে বলিতে লাগিল : "ওরে কাপুরুষ মুসলমানগণ, কার এমন বুকের পাটা; আয় ত দেখি। যুদ্ধ কারে বলে একবার দেখে যা এখানে।"

এই আহ্বান শুনিয়া আনসারদিগের মধ্য হইতে তিনজন বীর লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু মহানুভব রসূলুল্লাহ্ তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, প্রথমেই যদি আনসারগণ যুদ্ধে নামে এবং যদি তাহাদের কেহ নিহত হয়, তবে লোকে বলিবে মোহাজেরদিগকে নিরাপদে রাখিয়া হযরত আনসারদিগের দ্বারাই যুদ্ধ চালাইতেছেন। এই ভাবিয়া তিনি আপন পরমাত্মীয় হামজা, ওবায়দা ও আলিকে আহ্বান করিলেন। আদেশক্রমে তৎক্ষণাৎ বীরত্রয় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। ওৎবার সহিত হামজার, শায়্বার সহিত ওবায়দার এবং অলিদের সহিত আলির যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত মধ্যে বীরকেশরী আলির এক আঘাতেই অলিদের শির ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তদ্দৃষ্টে ওৎবা অধিকতর ক্ষিপ্ত হইয়া বিপুল বলে হামজাকে আক্রমণ করিল; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই হামজা তাহাকে জাহান্নামে পাঠাইয়া দিলেন। পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্ক ওবায়দাও শায়্বাকে নিহত করিলেন বটে কিন্তু শায়্বার তরবারির আঘাতে তিনিও গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই শাহাদৎ লাভ করিলেন।

ওৎবাকে এত শীঘ্র নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কোন ফল হইবে না ভাবিয়া তাহারা সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের আক্রমণ

১. ইহা রসূলুল্লাহ্র নিকট আল্লাহ্র ওয়াদা। এই আয়াত দুইটি মক্কায় নাযিল হইয়াছে।

www.pathagar.com

করিল। এদিকে মুসলমানেরাও বিজয়ের প্রথম সূচনায় অধিকতর অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রু-নিপাতে অগ্রসর হইলেন।

তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অস্ত্রের ঝনঝনায় ও সৈনিকদের রণহুঙ্কারে বদর প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ চলিতেছে। দূর হইতে হযরত এই যুদ্ধের ভীষণতা লক্ষ্য করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; পুনরায় শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন : "হে আমার প্রভু, আমার সহিত তুমি যে ওয়াদা করিয়াছিলে তাহা তুমি পূর্ণ কর।"[২]

মুসলিম বীরদল তখন বিপুল বেগে যুদ্ধ করিতেছেন। দুর্বার গতিতে তাহারা ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুদিগকে নাস্তনাবুদ করিয়া চলিয়াছেন। এক একজন বীর চার পাঁচজন শত্রুকে নিপাত করিয়া তবে শহীদ হইতেছেন।

এই সময়ে মো'আজ ও আবদুল্লাহ্ নামক দুইজন মুসলিম তরুণ আপন ত্যাগ ও অসামান্য বীরত্ব দ্বারা এই যুদ্ধকে আশু পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া দিলেন। আবু যহলকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহারা জীবন পণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। আবুযহল তখন ব্যূহ বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। যুবকদ্বয় বিদ্যুৎগতিতে সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া অতর্কিতে আবুযহলকে আক্রমণ করিলেন। মো'আজের এক আঘাতে আবুযহলের একটি পদ ছিন্ন হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া সে ভূতলশায়ী হইল। পিতার এই মারাত্মক বিপদ দেখিয়া ইকরামা ছুটিয়া আসিয়া মো'আজকে আঘাত করিল; সেই আঘাতে মো'আজের একটি বাহু ছিন্ন হইয়া ঝুলিতে লাগিল। মো'আজ দেখিলেন তাঁহার আপন বাহুই তাঁহার শত্রু হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি দোদুল্যমান বাহুটিকে পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমনভাবে ঝটকা টান দিলেন, যে, বাহুটি ছিন্ন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন মো'আজ স্বচ্ছন্দচিত্তে অপর হস্ত দ্বারা তরবারি চালনা করিতে লাগিলেন। মো'আজের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আবদুল্লাহ্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবু যহল তখনও জীবিত ছিল। আবদুল্লাহ্র এক আঘাতে তাহার ছিন্নমস্তক লুটাইয়া পড়িল।

আবু যহলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কোরেশ সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুসলিমগণ সাফল্যের সূচনায় দ্বিগুণ উৎসাহিত হইয়া কোরেশীদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অনেককে নিহত করিলেন, অনেককে বন্দী করিলেন। মুসলিমগণ ইচ্ছা করিলে এই সুযোগে আরও বহু শত্রুকে নিহত করিতে পারিতেন, কিন্তু প্রেম ও করুণায় মূর্ত ছবি মুহম্মদ। বাহিরে কঠোর হইলেও অন্তর তাঁহার হতভাগ্য মানুষের বেদনায় কাঁদিয়া ফিরিতেছিল। তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ দিলেন : উহাদিগকে মারিও না। বেচারাদের অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

আল্লাহ্র এ কী খেলা। রসূলুল্লাহ্ কী করিতেই বা আসিলেন আর কীই বা করিলেন। আসিয়াছিলেন বদর সীমান্তে টহল এবং বিশেষ করিয়া সিরিয়া হইতে

---

২. মক্কায় অবস্থান কালে রসূলুল্লাহ্ কোরেশদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ্র নিকট হইতে যে ওয়াদা লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

www.pathagar.com

প্রত্যাগমনরত আবু সুফিয়ানের কাফেলাকে আক্রমণ করিতে, সেই হিসাবে জনের স্বেচ্ছাবাহিনীই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আবু সু সমুদয় অস্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম লইয়া নির্বিঘ্নে মক্কায় গিয়া পৌঁছিল, আর অন্য পথ দিয়া ইসলামের মারাত্মক শত্রুগুলি মদিনায় রসুলুল্লাহ্‌র আয়ত্তের মধ্যে আসিয়া হাজির হইল। আবু সুফিয়ানের দল আবু যহলের দলের সহিত মিশিতেই পারিল না। আল্লাহ্ যেন সুকৌশলে দুই দলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। পঞ্চাশ হাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র তাই বিফলে গেল। দুই দল একযোগে আসিলে বদর যুদ্ধের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপে লিখিত হইত।[৩]

বদর-যুদ্ধে কোরেশদের নিহত সংখ্যা ছিল ৭০, বন্দী সংখ্যাও ছিল ৭০। মুসলমানদিগের নিহত-সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪। যে কয়জন কোরেশ নেতা আঁ-হযরতের প্রধান শত্রুরূপে এতকাল তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইল। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রও মুসলমানদিগের হস্তগত হইল।

কোরেশদিগের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে বদর-প্রান্তর পুনরায় শান্ত হইল। সত্যের বিজয়ে এবং মিথ্যার পরাজয়ে সারা প্রকৃতি যেন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বদর যুদ্ধ ইতিহাসে এক যুগপ্রবর্তক ঘটনা। যে সমস্ত মুসলিম বীর বদরে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারা আরও অনেক বড় বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, অনেক দেশও তাঁহাদের দ্বারা বিজিত হইয়াছিল; কিন্তু সেসব জয় গৌরবকে কোন মূল্য না দিয়া বদর যুদ্ধে জড়িত থাকাকেই তাঁহারা অধিকতর সৌভাগ্য ও গৌরব বলিয়া মনে করিতেন। ইরাকের শাসনকর্তা, কুফা নগরীর স্থাপয়িতা, পারস্য বিজয়ী মহাবীর সা'দ অশীতিবর্ষ বয়সে মরণশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলিয়াছিলেন : "বদর যুদ্ধে পরিহিত বর্ম আমাকে পরাইয়া দাও, এই বেশে মরিব বলিয়া আমি উহা এতদিন সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছি।" বাস্তবিকই বদর যুদ্ধের গুরুত্ব এবং গৌরব মিথ্যা নহে। মক্কা বিজয়ের ইহাই প্রথম পদক্ষেপ। ইসলামের ইতিহাস এখান হইতে মোড় ফিরিয়াছে এতদিন সে ছিল নিরীহ; এখন সে হইল নির্ভীক। এতদিন সে ছিল শান্ত ও সংযত; এখন সে হইল দুর্বার, প্রাণমাতাল ও গতিশীল। আল্লাহ্‌তায়ালা এইজন্য বদর বিজয়ের দিনকে 'মুক্তির দিন' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সত্যই ইহা মুক্তির দিন। বিধর্মীরা ইসলামকে অন্ধকারের বেড়াজালে শৃংখলিত করিবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ইসলাম সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া এইদিন বিজয়ীর বেশে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

---

৩. এ দুই দলের সঙ্গে কুরআন-শরীফে আল্লাহ্ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: "এবং যখন আল্লাহ্ দুইটি দলের একটিকে তোমার হাতে দিবেন বলিয়া তোমার সঙ্গে ওয়াদা করিলেন এবং তুমি চাহিয়াছিলে যে নিরস্ত্র দলটিই তোমার হউক কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। তিনি চাহিয়াছিলেন তাঁহার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়া সত্যকে জয়যুক্ত করিবেন এবং অবিশ্বাসীদিগের মূলোচ্ছেদ করিবেন।"

www.pathagar.com

বস্তুত বদর যুদ্ধের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছিল। হযরত যদি এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিতেন তবে কোরেশগণ ত মদিনা আক্রমণ করিতই, অধিকন্তু নগরের পৌত্তলিক, ইহুদী, নাসারা ও মুনাফিকগণও তাহাদের সহিত যোগ দিত। এইরূপ বহু বিপদের সম্ভাবনা হইতেই ইসলাম সেদিন মুক্তি পাইয়াছে।

পক্ষান্তরে বদর বিজয়ে মুসলমানগণ এক নূতন জীবনের সন্ধান পাইল। তাহাদের মধ্যে যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে, সংখ্যাগুরু শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াও যে তাহারা জয়ী হইতে পারে, তাহারা যে দুর্বার, দুর্দমনীয়, বিপদে যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল তাহাদের সহায়, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। অন্তরে অন্তরে তাহারা বুঝিতে পারিল ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম আর হযরত মুহম্মদ সত্যসত্যই আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল। হযরত এতদিন যে দাবী করিয়া আসিতেছিলেন এবং যে আশার বাণী শুনাইতেছিলন, বদর যুদ্ধে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হল। এক নূতন মনোবল ও সামরিক বিজয়ে মুসলমানদিগের অন্তর ভরিয়া গেল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩৯

বদর–যুদ্ধের পরে

বিজয়লব্ধ রণসম্ভার ও বন্দীদিগকে লইয়া সত্যের সৈনিকদল মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। আবার গগন পবন প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল : "আল্লাহু আকবর।"

উসায়েল নামক স্থানে আসিয়া বীরদল রাত্রিপ্রবাস করিলেন। কিন্তু মদিনাবাসী মুসলমানদিগের উৎকণ্ঠার কথা ভাবিয়া হযরত সেখান হইতে জায়েদ এবং কবি আবদুল্লাহ্‌কে বিজয়বার্তা ঘোষণা করিবার জন্য সত্বর মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। আল আকিক উপত্যকা পর্যন্ত দূতদ্বয় এক সঙ্গেই আসিলেন; তারপর ঘোষণা করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া দুইজন পথ দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। আবদুল্লাহ্ কোবা এবং পার্বত্য মদিনার দিকে চলিয়া গেলেন। জায়েদ সোজা নগরের দিকে অগ্রসর হইলেন। হযরতের প্রিয় উট 'আল কাসোয়ার' উপরে জায়েদ উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু ইহাতে এক বিপরীত ফল ফলিল। ইহুদী ও পৌত্তলিকগণ যখন দেখিল হযরতের উট লইয়া জায়েদ ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ভাবিল মুহম্মদের দফা রফা হইয়াছে, নতুবা তাঁহার উট এরূপভাবে ফিরিয়া আসিবে কেন? কিন্তু জায়েদ যখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া উঠিলেন : "হে মদিনাবাসীগণ আনন্দ কর। কোরেশদল সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছে; আবুযহল ও অন্যান্য কোরেশ নেতা নিহত হইয়াছে; হযরত শীঘ্রই সেনাদলের সঙ্গে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহারা "হায়! হায়!" করিয়া উঠিল। মনে হইল সমস্ত আকাশ ভাঙিয়া তাহাদের মাথায় পড়িয়াছে।

পক্ষান্তরে মুসলমানগণ এই বিজয়বার্তা শ্রবণে আনন্দে আত্মহারা, হইয়া উঠিলেন। যুবক ও বৃদ্ধেরা মুহর্মুহ তকবীরধ্বনি করিতে লাগিলেন, বালক বালিকারা দফ্ বাজাইয়া গান গাহিতে লাগিল; সমস্ত মুসলিম মদিনা হযরতকে অভিনন্দিত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

পরদিন হযরত মদিনায় পৌঁছিলেন। আবালবৃদ্ধবনিতার মুবারকবাদ ও আনন্দ কলরবে মদিনা তখন উচ্চকিত–শিহরিত–হিল্লোলিত–পুলকিত।

যুদ্ধলব্ধ যাবতীয় সম্পদ পথিমধ্যে সাফ্‌রা নামক স্থানে সকলের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। ভাগ বাটোয়ারা লইয়া একটু বিভ্রাট ঘটিল। যাঁহারা নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া অন্য কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে সমান অংশ দেওয়া হইবে কিনা ইহাই লইয়া একটা মতবিরোধ দেখা দিল। কিন্তু অচিরেই সব গণ্ডগোল মিটিয়া গেল। হযরত এ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নির্দেশ লাভ করিলেন। তদনুসারে এক-পঞ্চমাংশ 'আল্লাহ্‌র এবং রসুলের' জন্য রাখিয়া বাকী সমস্তই সৈন্যদিগের মধ্যে সমান ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য, এই নীতিই ন্যায়ানুমোদিত। কোন যুদ্ধ অভিযান একটি বিরাট যন্ত্র বিশেষ। ইহার ছোট বড় প্রত্যেকটি অংশই (part) তুল্যরূপে মূল্যবান। একটা সূক্ষ্ম তারের অভাবে গোটা যন্ত্রটিই বিকল হইতে পারে। একটা সেনাবাহিনীর বেলায়ও একথা সত্য। যাহারা বসিয়া সুড়ঙ্গ পাহারা দেয় তাহারাও যুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

আবুযহলের ব্যবহৃত বিখ্যাত 'জুল্‌ফিকার' তরবারিখানিও যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসম্ভারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত নিজে সেখানি গ্রহণ করিলেন।

হযরত মদিনায় পৌঁছিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার প্রিয় দুহিতা রোকাইয়া আর এই দুনিয়ায় নাই। রোকাইয়ার পীড়া গুরুতর জানিয়াই তাঁহার স্বামী ওসমান গনি বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। হযরত জানিতেন, রোকাইয়ার পীড়া মারাত্মক; কিন্তু বৃহত্তর কতর্ব্যের আহ্বান যখন আসে, মানুষ তখন ব্যক্তিগত কর্তব্য ও সুখ সুবিধার দিকে তাকাইতে পারে কৈ? হযরতকে তাই বাধ্য হইয়াই মৃত্যুকাতর কন্যার মায়া পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল।

যথাসময়ে বন্দীগণ মদিনায় আসিয়া উপনীত হইল। এই সব বন্দীদিগের প্রতি হযরত যে আদর্শ ব্যবহার দেখাইলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা মেলা ভার। হযরতের আদেশে মদিনায় আনসার এবং মোহাজেরগণ সাধ্যানুসারে বন্দীদিগকে নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন গৃহে স্থান দিলেন এবং আত্মীয় কুটুম্বের মতই তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে এই বন্দীদিগের একজন প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন; "মদিনাবাসীদিগের শিরে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হউক। তাহারা আমাদিগকে উটে চড়িতে দিয়া নিজেরা পায়ে হাঁটিয়া গিয়াছে, নিজেরা শুষ্ক খেজুর খাইয়া আমাদিগকে রুটি খাইতে দিয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এই মহানুভবতা বিফলে গেল না। বন্দীদিগের অনেকেই হযরত এবং তাঁহার শিষ্যদিগের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল এবং এইরূপে অন্তরে বাহিরে মুক্ত হইল। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিল না, তাহাদের প্রতিও কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করা হইল না। মুক্তিলাভ না করা পর্যন্ত তাহারা একইভাবে আদৃত হইতে লাগিল। পরাজয়ের কলঙ্ক ও গ্লানি ভুলিয়া বন্দীদিগের মুক্তির জন্য মদীনায় দূত পাঠাইতে কোরেশদিগের অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া বন্দীগণ সমানভাবে মুসলমানদিগের সেবাযত্ন পাইতে লাগিল।

বন্দীদিগের মুক্তিদান ব্যাপারেও হযরত কম সহৃদয়তা দেখান নাই। বন্দীদিগের সাধ্যানুসারে তিনি মুক্তিপণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহাদের প্রত্যেককে ২০০০ হাজার হইতে ৬০০০ দিরহাম দিতে হইয়াছিল; কিন্তু দরিদ্র লোকদিগের জন্য মাত্র ৪০০ দিরহাম পণ ধার্য করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা নিতান্তই অক্ষম ছিল, হযরত তাহাদিগকে বিনাপণেই মুক্তিদান করিয়াছিলেন। আবার বন্দীদিগের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত ছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেককে মদিনার দশটি বালক বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিতে বলা হইয়াছিল এবং উহাই তাহাদের মুক্তিপণরূপে গণ্য করা হইয়াছিল। শিক্ষার প্রতি হযরতের এই অনুরাগ সত্যই প্রশংসার্হ। অবশ্য সকলের প্রতিই যে নির্বিচারে সমান ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা নহে। বন্দীদিগের মধ্যে দুইজন পাষণ্ডকে তাহাদের দুষ্কৃতির জন্য কিছুতেই ক্ষমা করা সম্ভব হয় নাই। তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুসারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে হযরতের পারিবারিক জীবনের প্রধান ঘটনা– আলির সহিত ফাতিমার বিবাহ। বদর–যুদ্ধে বীরবর আলিই সর্বাপেক্ষা অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে তাই যেন তিনি তাঁহার সেই কৃতিত্বের পুরস্কার লাভ

www.pathagar.com

করিলেন। হযরতের প্রিয় দুলালীকে লাভ করা কি মানব জীবনের একটা চরম পুরস্কার নহে। আর আলি ছাড়া এই দুর্লভ রত্ন লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারই বা ছিল? যোগ্য পাত্রে যোগ্য পুরস্কারই অর্পিত হইয়াছিল। হযরত নিজে খুৎবা পড়িয়া আলি ও ফাতেমাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। বিশ্বের দুই শ্রেষ্ঠ সম্পদ–সত্য, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের মূর্তিমান আদর্শ হযরত হাসান হোসেন ইঁহাদেরই সন্তান।

বদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত ইহুদীদিগের ক্রিয়াকলাপ ও গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি দিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ইহুদীরা মক্কায় কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। উভয়ের মধ্যে বহু গোপন পত্রবিনিময় হইত। খাজরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ্ কোরেশদিগের সহায়তায় হযরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে, এইরূপ ছিল তাহাদের ষড়যন্ত্র এবং সেজন্য তাহারা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। কিন্তু বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায় ইহুদীরা একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িল।

হযরতের সহিত ইহুদীদিগের বিরোধের প্রধান কারণ ছিল উভয়ের আদর্শগত পার্থক্য। ইহুদীরা ছিল সুদখোর, হযরত ছিলেন সুদের ঘোর বিরোধী; ইহুদীরা ছিল পরস্বাপহরণকারী, নির্মম ও শোষণপ্রয়াসী; হযরত ছিলেন মানুষের দরদী এবং দুর্গতদিগের সাহায্যকারী; ইহুদীরা ছিল মানুষে মানুষে ভেদবুদ্ধিদাতা, হযরত ছিলেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার উদ্‌গাদা। এহেন মুহম্মদকে তাহারা সহ্য করিবে কিরূপে? ইহুদীরা তাই ভাবিল : মুহম্মদের জন্যই যখন তাহাদের সমস্ত স্বার্থ ও সুবিধা হাত হইতে চলিয়া যাইতে বসিয়াছে, তখন তাহাদের পথ হইতে এই কন্টকটিকে সরাইয়া ফেলিতে হইবে।

বদর যুদ্ধে মুসলমানদিগের অপ্রত্যাশিত বিজয়ে ইহুদীরা নিজেদের পরিণাম চিন্তা করিয়া আরও বিচলিত হইয়া উঠিল। হযরতকে উচ্ছেদ করিতে না পারিলে যে তাহাদের সমূহ অকল্যাণ ঘনাইয়া আসিবে, একথা তাহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিল।

ইহুদীদিগের মধ্যে কা'ব নামক একজন কবি ছিল। বদর যুদ্ধে কোরেশদিগের শোচনীয় পরাজয়ের কথা শুনিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ইহুদীদিগের মধ্য হইতে একদল প্রতিনিধিকে সঙ্গে লইয়া সে মক্কায় গমন করিল এবং বীরত্বব্যঞ্জক নানা কবিতা ও গাথা রচনা করিয়া বদরের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। ইহুদীরা যে কোরেশদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে প্রস্তুত, এই গোপন বাণীও সে তাহাদিগকে দিল। ইহাতে কোরেশ প্রতিনিধিগণের মনে আবার নব উৎসাহের সৃষ্টি হইল; উপযুক্ত পরামর্শ দিয়া তাহারা প্রতিনিধিদিগকে বিদায় দিল।

কা'ব মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হযরতকে দাওয়াৎ দিতে গেল। উদ্দেশ্য নিজ গৃহে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবে। সুখের বিষয়, হযরত এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই জানিয়া ফেলিলেন; কাজেই কা'বের উদ্দেশ্য সফল হইল না। অভিমান ক্ষুব্ধ শয়তান কবি তখন প্রকাশ্যে হযরতের নামে নানাবিধ ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করিয়া মদিনাবাসীদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, অন্যভাবেও ইহুদীরা হযরতকে জ্বালাতন করিতে ছাড়িল না। মুসলমানগণ পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে "আস্‌সালামু আলাইকুম" বলিয়া সালাম জানায়; ইহার অর্থ 'আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।" ইহুদীরা ইহার অনুকরণে হযরতকে "আসসামু আলাইকা" অর্থাৎ

www.pathagar.com

"তুমি ধ্বংস হও" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, হযরতের বাটির বাহির হওয়াই দায় হইয়া উঠিল।

বিভিন্ন মুসলিম গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টির জন্যও ইহুদীরা প্রয়াস পাইল। বদর যুদ্ধে কে কেমন বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, এই অহেতুক আলোচনার ভিতর দিয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগের মধ্যে তাহারা হিংসা বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি আনিয়া দিতে লাগিল। বস্তুত ইহুদীরা হযরতের উচ্ছেদ সাধনের জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিল না।

শুধু যে ইহুদীরাই কোরেশদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য মক্কায় গিয়াছিল, তাহাই নহে; কোরেশগণও ইহুদীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য মদিনায় আসিয়াছিল। স্বয়ং আবু সুফিয়ানের দ্বারাই এই কার্য সাধিত হইয়াছিল। দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে লইয়া সে একদিন মদিনা যাত্রা করে। তারপর মদিনার উপকণ্ঠে একটি গুপ্তস্থানে সৈন্যদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া রাত্রির অন্ধকারে নগরে প্রবেশ করে এবং ইহুদী দলপতিদিগের সহিত সলাপরামর্শ করিয়া প্রভাত হইতে না হইতেই আবার সৈন্যদের সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ফিরিয়া যাইবার কালে দুইজন মদিনাবাসী কৃষককে মাঠে কাজ করিতে দেখিয়া তাহারা তাহাদিগকে হত্যা করে এবং তাহাদের ফল শস্যাদি পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যায়। এই সংবাদ মদিনায় পৌঁছিলে হযরত একদল মুসলিম সেনাকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতবেগে কোরেশদিগকে অনুসরণ করেন, কিন্তু তাহাদের নাগাল ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসেন।

কোরেশদিগের সহিত মদিনার ইহুদী ও নাসারা যে তলে তলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে, গুপ্তচরদিগের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ তাহা ভালভাবেই অবগত ছিলেন। কূটনীতির খাতিরে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে তিনি এতদিন কিছুই বলেন নাই। এইবার তাহাদের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিল।

একটি ব্যাপারে মুসলিমদিগের ধৈর্যের বাঁধ টুটিল। ইহুদীদিগের মধ্যে বনি কাইনোকা গোত্রই ছিল তখনকার দিনে ধনে-মানে ও প্রতিপত্তিতে মদিনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বদর-যুদ্ধের পূর্ব হইতেই ইহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের দুর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রয়োজন হইলেই ইহাদের মধ্য হইতে শত শত যোদ্ধা যুদ্ধে নামিতে পারিত। ইহারা প্রধানত স্বর্ণকার ছিল। একদিন একটি পর্দানশিন মুসলিম যুবতী আবশ্যক বোধে ইহাদের একটি অলংকারের দোকানে গিয়াছিলেন। ইহুদীরা ইহাকেই একটা সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া মহিলাটিকে নানা প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে উত্যক্ত হইয়া তিনি অন্য আর একটি স্বর্ণকারের দোকানে গিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না। মহিলাটি বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত গোপনে গোপনে পিছন দিক হইতে তাঁহার ওড়নার এক কোণ খুঁটির সহিত বাঁধিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে মহিলাটি যেই গাত্রোত্থান করিতে গিয়াছেন, অমনি তাঁহার অঙ্গাবরণখানি খসিয়া পড়িল এবং তিনি লোকচক্ষে উন্মুক্ত হইয়া পড়িলেন। দুর্বৃত্তদিগের কুৎসিত হাসি-তামাসায় তখন স্থানটি সরগরম হইয়া উঠিল। মহিলাটি লজ্জায় ও ক্রোধে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কে আছ মুসলিম বীর। বিপন্না নারীকে রক্ষা কর।" জনৈক মুসলমান পথিকের কর্ণে এই আহ্বান প্রবেশ মাত্র তিনি উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়া আসিয়া মহিলাটিকে রক্ষা করিলেন এবং পাষণ্ডদিগের একজনকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। ফলে

www.pathagar.com

ইহুদীরাও সংঘবদ্ধভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মুসলিম বীর প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই নিহত হইলেন।

এই সংবাদ যখন মুসলমানদিগের কর্ণে পৌঁছিল, তখন তাঁহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু হযরত তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া নিজেই বনি কাইনোকা সম্প্রাদয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন : "হে ইহুদীগণ, তোমরা যে জঘন্য কুকর্ম করিয়াছ, তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিতে আমরা প্রস্তুত। আমার উপদেশ এই : তোমরা বশ্যতা স্বীকার কর, নতুবা কোরেশদিগের দশাই তোমাদের ঘটিবে।"

কিন্তু ইহুদীরা হযরতের এই উপদেশ মানিল না; নানারূপ টিট্‌কারি দিয়া তাঁহাকে আরও শাসাইতে লাগিল। বলিল : "বদরের সামান্য একটা যুদ্ধে জিতিয়া তোমাদের খুব গর্ব হইয়াছে, না? আমাদের সহিত যদি যুদ্ধ লাগে, তবে দেখাইয়া দিব যুদ্ধ কাহাকে বলে?" হযরত তখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং বাধ্য হইয়া ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার জন্য মুসলমানদিগকে আদেশ দিলেন।

ইহুদীরা ফেরেববাজিতে পাকা হইলেও ভিতরে ভিতরে খুব ভীরু ছিল। মুসলমানদিগের সমরায়োজনের সংবাদ শুনিয়া তাহারা সকলে দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল। মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন। ইহুদীদিগের বিশ্বাস ছিল, কোরেশগণ শীঘ্রই মদিনা আক্রমণ করিবে, কাজেই অল্প কয়েকদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের মুক্তির দিন আসিবে। আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই প্রমুখ খাজরাজদিগের নিকট হইতেও সাহায্য আসিবে বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘ দুই সপ্তাহের মধ্যে যখন বাহির হইতে কোন সাহায্য আসিল না, তখন তাহারা হযরতের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এই প্রস্তাব করিল : "দয়া করিয়া আমাদিগকে নিহত বা বন্দী করিবেন না। বনি-নাজিরদিগের ন্যায় আমরাও মদিনা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি। আমাদিগকে সেই অনুমতি দিন।"

এই বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদিগের প্রতি কী করা উচিত ছিল? ইহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিলে কি রাষ্ট্রনীতি অনুসারে মুসলমানদিগের পক্ষে কোনরূপ অন্যায় করা হইত? নিশ্চয়ই না। অন্তত ইহাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে দাসদাসীরূপে ব্যবহার করা, অথবা সম্পদ, ঘরবাড়ি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া সকলকে বন্দী করিয়া রাখা তখনকার দিনে কোন মতেই অসঙ্গত হইত না। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর মানব মুহম্মদ তাহা করিলেন না। ইহুদীদিগের প্রার্থনানুযায়ী তিনি তাহাদিগকে মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। এজন্য তাহারা তিনদিন সময় চাহিয়াছিল, তাহাও তিনি মঞ্জুর করিলেন। শুধু তাই নয়, ইহাদিগের যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য তিনি একজন সুদক্ষ সাহাবীকেও নিযুক্ত করিলেন।

ইহুদীরা সিরিয়া অঞ্চলে চলিয়া গেল।

অবশ্য ইহুদীদিগের নগর পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার ফলে মুসলমানগণ তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন। তবে ইহার পরিমাণ খুব বেশী নহে। ভূসম্পত্তির দিকে ইহুদীদিগের বিশেষ লোভ ছিল না, নগদ টাকা ও স্বর্ণই ছিল তাহাদের প্রধান সম্পদ। ইহুদীরা যথাসাধ্য তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। তবে দুর্গাভ্যন্তরে

www.pathagar.com

তাহারা যুদ্ধবিগ্রহের জন্য যেসব অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা লইয়া যাইতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানগণ সেগুলি লাভ করিয়া নিশ্চয়ই উপকৃত হইয়াছিলেন। কূটনীতির দিক দিয়া এই অবরোধের যথেষ্ট মূল্য ছিল, সন্দেহ নাই।

দুষ্ট কবি কা'ব কিন্তু তখনও শান্ত হয় নাই। সিরিয়া হইতে সে গোপনে গোপনে মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েকজন গোত্রপতিকে নিজেদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মুসলিম প্রহরীদিগের হস্তে সে অবশেষে ধরা পড়িয়া গেল। হযরত এবার আর তাহাকে ক্ষমা করিলেন না। এই স্বদেশদ্রোহী ভণ্ড নীচমনা, ষড়যন্ত্রীকে তিনি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

বনি-কাইনোকাদিগকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া খুবই সময়োচিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা হযরত রাজনৈতিক দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা মদিনায় থাকিলে পরবর্তী ওহদ-যুদ্ধের সময় মুসলমানদিগের সমূহ বিপদ ঘটিত। ইহারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কোরেশদিগের ষড়যন্ত্রের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল

এই সমস্ত ঘটনা হিযরীর দ্বিতীয় বর্ষে সংঘটিত হয়। 'ঈদুল-ফিতর' এবং ঈদুল-আজ্‌হার' উৎসব পর্বও এই বৎসরে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪০

ওহদ–যুদ্ধ

পরাজিত কোরেশবাহিনী মক্কায় ফিরিয়া গেল। বদরের শোচনীয় পরাজয় এবং কোরেশ–নেতাদের অধিকাংশের মৃত্যু–সংবাদ সারাটি দেশ জুড়িয়া শোকের ছায়া ফেলিল। ঘরে–ঘরে কান্নার রোল উঠিল। মক্কার অন্যতম কোরেশনেতা আবু লাহাব এই দুঃসংবাদ শ্রবণে শয্যাগ্রহণ করিল; আর উঠিল না; সাতদিন পরে সে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের পরিচালনার ভার পড়িল আবু সুফিয়ানের উপর। বদর–যুদ্ধে সে যোগদান করে নাই, মক্কাতেই রহিয়া গিয়াছিল। কোরেশদিগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ে সে মনে মনে বেদনা অনুভব করিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিল না; কি করিয়া এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যায় ভাবিতে লাগিল। নগরবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল : "ভ্রাতৃগণ, কাঁদিও না; অশ্রুপাতে আমাদের প্রতিহিংসার আগুন নিবাইয়া দিও না। মনকে দৃঢ় কর, নূতন আশায় নূতন উদ্যমে বুক বাঁধ। এই কলঙ্ক–কালিমা মুছিয়া ফেলিতেই হইবে। শুধু হা–হুতাশ করিলে চলিবে না। ইহাতে আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে। শত্রুরা ভাবিবে, আমরা হতাশ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, প্রতিজ্ঞা কর : শত্রুকে পরাজিত করিতেই হইবে। আমার সম্বন্ধে বলিতেছি : যতদিন না এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে পারি, ততদিন পর্যন্ত আমি কোন সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিব না, অথবা আমার স্ত্রীকে স্পর্শ করিব না।"

আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাও কোরেশদিগের স্তিমিত হিংসানলকে জাগাইয়া তুলিতে কম চেষ্টা করে নাই। তাহার পিতা ওৎবার মৃত্যুতে সে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়াছিল; পিতৃহন্তা হামজার রক্ত পানের জন্য সেও দারুণ পণ করিয়া বসিল।

আবু যহলের পুত্র ইকরামা এবং আরও দুই–একজন রক্ত–মাতাল যুবক বীর আবু সুফিয়ানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ওদিকে মদিনা হইতে ইহুদীরা আসিয়াও কোরেশদিগকে নব উৎসাহ দান করিয়া গেল।

এই সমস্ত কারণে কোরেশদিগের রণস্পৃহা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; নববলে বলীয়ান হইয়া তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

পূর্বে বলা হইয়াছে বদর–যুদ্ধের প্রাক্কালে কোরেশগণ রণসম্ভার ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্য হইতে ৫০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা চাঁদা তুলিয়াছিল। সেই অস্ত্রশস্ত্র নির্বিঘ্নে মক্কায় পৌঁছিয়াছিল। তাহাই দিয়া আবু সুফিয়ান পুনরায় ৩০০০ হাজার সৈন্যের আর এক নূতন বাহিনী রচনা করিল। তন্মধ্যে ৭০০ বর্মধারী, ২০০ অশ্বারোহী, অবশিষ্ট উষ্ট্রারোহী ও পদাতিক। তায়েফ হইতে ১০০ জন সৈন্য আসিয়াও এই সেনাদলে যোগ দিল। এই বিপুল বাহিনী লইয়া আবু সুফিয়ান মদিনা পানে অগ্রসর হইল।

অপূর্ব এই অভিযান। পুরোভাগের কোরেশদিগের জয়পতাকা উড়িতেছে, তৎপশ্চাতে তাহাদের দেবতা 'হোবল' ঠাকুরের বিরাট মূর্তি শোভা পাইতেছে, তৎপশ্চাতে হিন্দা ও অন্যান্য রণরঙ্গিনীরা উষ্ট্র পৃষ্ঠে চড়িয়া ভেরী নাকাড়ার তালে তালে অগ্নিক্ষরা রণগীতি গাহিয়া চলিয়াছে, তৎপশ্চাতে বীরকেশরী খালেদের নেতৃত্বে

www.pathagar.com

দুইশত অশ্বরোহী বীরপদভরে অগ্রসর হইতেছে। সর্বশেষে রসদবাহী উষ্ট্রারোহী সেনাদল চলিতেছে। দেখিলে সত্যই মনে ত্রাস জন্মে। মনে হয়, একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি হাওয়া নানাভাবে শক্তি সঞ্চয় করিয়া আল্লাহ্‌র সত্যশিখাকে নির্বাপিত করিবার জন্য বিপুল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

হযরতের অন্যতম চাচা আব্বাস তখনও মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করিলেও চিরদিন হযরতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কোরেশদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি গোপন লিপিসহ জনৈক বিশ্বস্ত দূতকে মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন।

হযরত যখন এই কোরেশ–বাহিনীর যুদ্ধযাত্রার কথা জানিতে পারিলেন তখন তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না। সেই চিরবিশ্বাসের বাণীই তাঁহার মুখে ধ্বনিত হইল : "আমাদের পক্ষে এক আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।"

পঞ্চম হিযরী। শওয়াল মাসের ১৪ তারিখ শুক্রবার জু'মার নামায বাদ হযরত সমবেত মুসলিমদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন। আবদুল্লাহ্‌–বিন–উবাই প্রমুখ পৌত্তলিক খাজরাজ প্রধানদিগকেও ডাকা হইল। নগর রক্ষার উপায় সম্বন্ধে সকলে পরামর্শ করিলেন। হযরত বলিলেন : "এবার আমাদের নগর ছাড়িয়া দূরে যাইয়া যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না; ইহাতে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। কাজেই আমার মত : এবার নগর–প্রাচীরের মধ্যে থাকিয়াই যুদ্ধ চালাইব। তোমাদের মত কি?"

বয়োজ্যেষ্ঠ মোহাজের ও আনসারগণ সকলেই হযরতের মত গ্রহণ করিলেন। আবদুল্লাহ্‌–বিন–উবাইও ইহাতে সম্মতি দিল। তখন স্থিরীকৃত হইল : কোরেশদিগকে নগরের বাহিরে গিয়া বাধাদান করা হইবে না, যদি তাহারা মদিনা আক্রমণ করে, তবে প্রাচীরের উপর হইতে এবং দুর্গ হইতে তীর ও লোষ্ট্রবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়া হইবে।

কিন্তু এই প্রস্তাব তরুণদলের মনঃপূত হইল না। তাহারা বলিল : "আমরা কেন অলস ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নগর মধ্যে বসিয়া থাকিব? এরূপ করিলে শত্রুরা আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবে। তাহা ছাড়া আমাদের এই দুর্বলতা দেখিলে শত্রুদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে, তাহারা মদিনা আক্রমণ করিবেই। এই সুযোগ কেন তাহাদিগকে দিতে যাই? কাজেই আমাদের মতে নগর হইতে বাহির হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন।"

বলা বাহুল্য, অনেকেই তরুণদিগের এই মত সমর্থন করিলেন। বদর–যুদ্ধের জয়লাভের পর নিশ্চয়ই যোদ্ধাগণ একটু বে–পরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন।

সংখ্যাধিক্যের ফলে তরুণদিগের মতই বলবৎ হইল দেখিয়া হযরত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের প্রস্তাবই গ্রহণ করিলেন। নগর হইতে বাহির হইয়া শত্রুর অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্তই তিনি ঘোষণা করিলেন।

আসরের নামায বাদ মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের আদেশক্রমে সজ্জিত হইয়া মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে সমবেত হইলেন। হযরত তখন আবুবকর ও ওমরকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। অপূর্ব সেই রণমূর্তি! অঙ্গে দৃঢ় বর্ম, হস্তে ঢাল, কটিবন্ধে 'জুলফিকার', শিরে

www.pathagar.com

বাঁধা আমামা। রসূলুল্লাহ্‌র আজ এমনই বীরবেশ। তিনি আজ সেনাপতি। তিনি আজ যুদ্ধনায়ক। ধর্মের আদর্শের সঙ্গে তিনি আজ কর্মের আদর্শকে আনিয়া একাসনে মিলাইয়া দিলেন। মুসলমানের জীবন-দর্শনের ইহাই ত গূঢ় রহস্য। ধর্মজীবনের সহিত তাহার কর্মজীবনের বিরোধ কোথায়? ধর্ম ও কর্মকে—দীন ও দুনিয়াকে সে এমনইভাবে মিলাইয়া লয়। ধর্মহীন কর্ম তাহার লক্ষ্য নহে, কর্মহীন ধর্মও তাহার আদর্শ নহে। ভোগের মধ্যে বসিয়া সে ত্যাগের সাধনা করে; বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া মহানন্দময় মুক্তির সংগ্রাম করিতে সে ভালবাসে।

হযরতের এই বীরমূর্তি দেখিয়া সকলেই শিহরিয়া উঠিলেন। তরুণ দলের অনেকেই বলিতে লাগিলেন "হযরত, আমরা যদি ভুল করিয়া থাকি, তবে মাফ করুন; আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি।" হযরত বলিলেন; "তা হয় না। যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছি তাহার রদবদল করিতে পারি না। সেনাপতির কর্তব্য তাহা নহে। সকলে প্রস্তুত হও; বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যাত্রা কর। ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলে তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

ইহাই বলিয়া তিনি তিনটি বর্শা চাহিয়া লইয়া তিনটি নিশান প্রস্তুত করিলেন। একটিকে দিলেন অধ্যাপক মুসায়েবের হস্তে। অন্য দুইটিকে দিলেন আউস ও খাজরাজ গোত্রের দুই দলপতির হস্তে। তারপর সৈন্যদিগকে লাইনবন্দী করিয়া কুচকাওয়াজ করিবার জন্য হুকুম দিলেন। হযরত নিজে একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। মোট ১০০০ সৈন্যের এই বাহিনী। তন্মধ্যে ২ জন মাত্র অশ্বারোহী, ৭০ জন বর্মধারী, ৪০ জন তীরন্দাজ, বাকী সমস্তই নগ্নদেহ পদাতিক। তাহাদের কাহারও হাতে বর্শা, কাহারও হাতে ঢাল তলোয়ার।

কিন্তু পথিমধ্যে এই এক হাজারের মধ্য হইতেও তিনশত খসিয়া পড়িল। আবদুল্লাহ্‌-বিন-উবাই ৩০০ সৈন্য লইয়া হযরতের নগরাভ্যন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করিবারই সে পক্ষপাতী ছিল। তাহার কথা রক্ষিত হইল না বলিয়া এখন সে অসন্তোষ প্রকাশ করিল। কতকগুলি তরলমতি যুবকের কথায় হযরত নগর ত্যাগ করিলেন, এই অজুহাতে সে তাহার দলবলসহ সরিয়া পড়িল। বাকী রহিল মাত্র ৭০০ সৈন্য। ইহাদের সকলেই মুসলিম।

আবদুল্লাহ্‌র দলত্যাগে হযরত বিচলিত হইলেন না। এই মুনাফিক পৌত্তলিকের প্রকৃত স্বরূপ যে এইখানেই ধরা পড়িল, ইহাতে বরং তিনি খুশিই হইলেন। যুদ্ধকালে এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মুসলমানদিগের ভাগ্যে কী দুর্গতিই না ঘটিত। ইহাই ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। ৭০০ মুসলিম বীরকে সঙ্গে লইয়াই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে একটি চমৎকার ঘটনা ঘটিল। মুসলিম সৈন্যদিগকে কুচকাওয়াজ করিয়া যাইতে দেখিয়া কতিপয় কিশোর-তরুণও যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেনাদলের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অনেক দূর আসিল। হযরত তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিলেন। কিন্তু তাহারা অবুঝ! যুদ্ধে না যাইয়া কিছুতেই তাহারা ছাড়িবে না। অগত্যা তখন হযরত তাহাদিগের দেহের মাপ লইতে হুকুম দিলেন। উদ্দেশ্য, মাপে ছোট হইলে সেই অজুহাতে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া সহজ হইবে। মাপ লইবার সময় রাফে নামক একটি বালক পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির

www.pathagar.com

উপর ভর দিয়া যথাসম্ভব উঁচু হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য সকলে বলিতে লাগিল : "রাফে বেশ তীর ছুঁড়িতে উস্তাদ!" এই সুপারিশ করিবার ফলে তাহাকে যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল। তখন সামারা নামক অন্য একটি বালক ক্ষুব্ধ হইয়া বলিতে লাগিল : "রাফেকে যদি লওয়া হয়, তবে আমাকে লওয়া হইবে না কেন? আমি কুশ্‌তি লড়িয়া অনায়াসে রাফেকে হারাইয়া দিতে পারি!" হযরত হাসিয়া বলিলেন : 'বেশ, কুশ্‌তি লড়ত!' এই কথা বলা মাত্র সামারা তাল ঠুকিয়া রাফের সহিত কুশ্‌তি লড়িতে প্রবৃত্ত হইল। ইচ্ছাকৃতভাবেই এই শক্তি পরীক্ষায় রাফে পরাজয় বরণ করিল; তখন হযরত সন্তুষ্ট চিত্তে সামারাকেও যুদ্ধে যাইবার অনুমতি দিলেন।

শনিবার প্রভাতে হযরত ওহদ পর্বতের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। পথিমধ্যে 'শেখায়েন' নামক স্থানে তাঁহারা রাত্রিযাপন করিলেন।

মদিনা হইতে তিন মাইল দূরে ওহদ পর্বত। সেই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে গিয়া হযরত একটি সুবিধাজনক উন্নত স্থান দেখিয়া ঘাঁটি গাড়িলেন। সম্মুখে রহিল উন্মুক্ত ময়দান, পিছনে পাহাড়।

ওদিকে আবু সুফিয়ানও তাহার বিরাট বাহিনী লইয়া ওহদ প্রান্তরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমানদিগের আগমনে তাহাদের মধ্যে উত্তেজনার সাড়া পড়িয়া গেল। বীভৎস আনন্দ-রোলে তাহারা আকাশ ফাটাইতে লাগিল।

বেলালের কণ্ঠে ফযরের আযান ধ্বনি হইল। মুসলমানগণ হযরতের সহিত নামায পড়িয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

বদর-যুদ্ধে হযরত সৈন্য-চালনা করেন নাই, এবার তিনি নিজেই এ কার্যে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদিগের বাম পার্শ্বে পর্বতগাত্রে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। দূরদর্শী হযরত দেখিলেন, এই স্থানটি ভালরূপে রক্ষা না করিলে শত্রুরা এই পথ দিয়া পশ্চাৎদিক হইতে আসিয়া আক্রমণ করিতে পারে। এইজন্য তিনি একদল তীরন্দাজকে এই সুড়ঙ্গ পথ রক্ষার জন্য নিয়োজিত করিলেন। তাহাদিগকে কড়া হুকুম দিলেন : "সাবধান, এই সুড়ঙ্গ সর্বদা রক্ষা করিবে। যদি দেখ যে, আমরা শত্রুসেনাকে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছি, অথবা তাহাদের পরিত্যক্ত রণসম্ভার লুট করিয়া লইতেছি, তবু তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সহিত যোগ দিও না। অতঃপর তিনি অন্যান্য সৈন্যদলকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

প্রথমেই কোরেশদিগের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ বীর তাল্‌হা অগ্রসর হইয়া ব্যঙ্গস্বরে মুসলমানদিগকে আহ্বান করিল। বীরকেশরী আলি তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া এক আঘাতেই তালহার দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া তাল্‌হার ভ্রাতা ওসমান ক্ষিপ্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল। বীরবর হামজা আসিয়া তাহাকেও জাহান্নামে পাঠাইলেন। মুহূর্ত মধ্যে দুইজন বীরের শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া কোরেশগণ আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইল না, তাহারা সমবেতভাবে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মক্কার রণরঙ্গিণীরা দফ্ বাজাইয়া গাহিয়া উঠিল :

প্রভাতী তারার দুলালী আমরা, পুষ্পপেলব মুখ,
গুলাবী রঙিন সিরীন্ শারাবে ভরা আমাদের বুক।

www.pathagar.com

কালো কুন্তলে কস্তুরী মাখা, কণ্ঠে মুক্তমালা
খঞ্জনসম নৃত্যচরণা নয়নে বহ্নি-জ্বালা।
ওগো বীরদল, হও আগুয়ান, রাখ স্বদেশের মান,
বিজয়ীর বেশে, ফিরে এস, দিব মিলন-মালিকা দান।
কাপুরুষ সম পালাইয়া যদি আস আমাদের মাঝে,
ধিক্কার দিব, চিরদিন তরে, মুখ ফিরাইব লাজে।"

আরব তরুণীদিগের রূপ-শারাবের রঙিন স্বপ্ন কোরেশদিগের অন্তরতলে আগুন জ্বালিল। ভীম-ভৈরবে তাহারা নগণ্য মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

কিন্তু মুসলিম বীরদল তাহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না। প্রচণ্ড বেগে তাঁহারাও শত্রুসেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এই সময় রসুলুল্লাহ্‌র একটি কার্যে মুসলিম বীরদিগের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। একখানি তরবারি তুলিয়া সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন : "কে এই তরবারির মর্যাদা রক্ষা করিবে!-এস।" তরবারির গাত্রে এই বীরবাক্য খোদিত ছিল :

"পলায়ন-সে যে ঘৃণ্য ভীরুতা, অগ্রসরেই মান,
পালাবি কোথায়? তক্‌দীর হ'তে নাহিক পরিত্রাণ।"

কতিপয় তরুণ বীর তরবারিখানি গ্রহণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু হযরত সেখানি অন্য কাহাকেও না দিয়া বীরবর আবু-দোজানার হস্তে সমর্পণ করিলেন। গৌরবে আবু-দোজানার অন্তর ভরিয়া গেল; বীরবিক্রমে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ধাবিত হইলেন। হামজা, আলি, আবু-দোজানা, জিয়াদ, জুবায়ের প্রমুখ বীরগণ যেন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। বহু কোরেশ সৈন্য ইঁহাদের হস্তে প্রাণ হারাইল। ইঁহাদের অমানুষিক শৌর্যবীর্য ও রণচাতুর্যে কোরেশদিগের প্রাণে ত্রাসের সঞ্চার হইল। তাঁহারা যেদিকে যাইতে লাগিলেন, সেইদিকেই কোরেশদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল কোরেশবীর খালিদ তাহার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া দুইবার পূর্বোক্ত সুড়ঙ্গ পথ ভেদ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুদক্ষ মুসলিম ধানুকীরা দুইবারই তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। অবশেষে মুসলমানদিগের বীরবিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কোরেশগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। ওহদ-ক্ষেত্রে যেন বদরের পুনরাভিনয় হইল। কোরেশগণ পালাইতেছে দেখিয়া মুসলমানগণ তাহাদিগকে তাড়া করিয়া লইয়া চলিলেন এবং তাহাদের পরিত্যক্ত রসদপত্র লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। এই আশাতীত সাফল্য লক্ষ্য করিয়া সুড়ঙ্গ পথে নিয়োজিত ধানুকীরা আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। হযরতের আদেশ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের প্রায় সকলেই শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ৫০ জনের মধ্যে মাত্র ১২ জন হযরতের আদেশমত সুড়ঙ্গ পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন, অবশিষ্ট সকলেই লুণ্ঠনকার্যে যোগ দিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন।

সুচতুর খালিদ দূর হইতে মুসলমানদিগের এই মারাত্মক ভ্রম লক্ষ্য করিল। মুহূর্ত মধ্যে সে তাহার অশ্বারোহী সেনাদলকে ঘুরাইয়া আনিয়া সেই অরক্ষিত গিরিবর্ত্মে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুষ্টিমেয় মুসলিম তীরন্দাজকে অনায়াসে সে পরাজিত ও নিহত করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিল। "ও লো ওজ্জা!" "ও লো হোবল!" বলিয়া কোরেশগণ বিকট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সেই জয়ধ্বনি শুনিয়া পলায়নপর অন্যান্য কোরেশ সৈন্যও ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভূলুণ্ঠিত কোরেশ পতাকা আবার তুলিয়া ধরিল। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

www.pathagar.com

মুসলমানদিগের তখন কী ভীষণ অবস্থা। একে ত শৃঙ্খলহীন, তাহাতে আবার উভয় দিক হইতে আক্রান্ত। বীরদল দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। যিনি যেখানে ছিলেন, সেখানে থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাও কি হয়! বহু বীর নিরুপায় হইয়া প্রাণ হারাইলেন। অধ্যাপক মুসায়েব ও বীরবর হামজা এইবার শহীদ হইলেন।

হযরত দূর হইতে এই বিপদ লক্ষ্য করিয়া মুসলমানদিগকে পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান কাহারও কর্ণে পৌঁছিল, কাহারও পৌঁছিল না। অনেকে পর্বতোপরি উঠিয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে হযরতের জীবন বিপন্ন দেখিয়া একদল বিশ্বস্ত ভক্ত দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। কোরেশগণ তাহা লক্ষ্য করিয়া সেইদিকেই তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিল। চারিদিক হইতে তীর, তরবারি, বর্শা এবং লোষ্ট্র বর্ষিত হইতে লাগিল। মুষ্টিমেয় মুসলিম বীর সকল ভুলিয়া প্রাণপণে হযরতকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই ঘন দুর্যোগে-এই কঠিন সঙ্কটমুহূর্তে ভক্তবৃন্দ কী অনুপম আত্মত্যাগই না দেখাইলেন। নিজেদের দেহকে ঢাল করিয়া তাঁহারা হযরতের জীবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু সাহাবা মরিয়া অমর হইলেন।

কিন্তু এত করিয়াও হযরতকে তাঁহারা অক্ষত রাখিতে পারিলেন না।

শত্রুর আঘাতে ও লোষ্ট্রনিক্ষেপে হযরতের দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। একস্থানে কাটিয়া লহু ঝরিতে লাগিল। সম্মুখের চারিটি দাঁত ভাঙিয়া গেল। এইখানেই শেষ নহে। হামজার হত্যাকারী দুরাত্মা ইবনে-কামিয়া ছুটিয়া আসিয়া হযরতের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ভীম বেগে তরবারির আঘাত করিল। তাল্‌হা-বিন্-ওবাইদুল্লাহ্ সে আঘাত আপন হস্ত দ্বারা রোধ করিলেন। ফলে তাঁহার অঙ্গুলিগুলি কাটিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়িয়া গেল। হযরতের শিরস্ত্রাণেও সে আঘাত লাগিল। শিরস্ত্রাণ কটিয়া গিয়া তদ্‌সংলগ্ন দুইটি লৌহকড়া হযরতের কপালে গভীরভাবে ঢুকিয়া গেল। হযরত হতচেতন হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। সেই পতন দেখিয়া উৎসাহের আতিশয্যে "মুহম্মদ নিহত হইয়াছে" বলিয়া ইবনে-কামিয়া উল্লাস-ধ্বনি করিতে করিতে কোরেশদলে ফিরিয়া গেল।

"মুহম্মদ নিহত হইয়াছে" এই সংবাদ যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে দিকে এক বিচিত্র প্রভাব সৃষ্টি করিল। মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে অনেকে নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। আবার অনেকে মনে করিতে লাগিলেন : "আল্লাহ্‌র রসূলই যদি কাফিরদিগের হস্তে প্রাণ হারাইলেন, তবে আর আমাদের এ-জীবন রাখিয়া লাভ কী? যে-সত্য যে-আদর্শের জন্য তিনি শহীদ হইলেন, সেই সত্য ও সেই আদর্শের জন্য আমরাও তাঁহার অনুগমন করিব।" এই বলিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত তাঁহারা শত্রুনিপাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাহাবাদিগের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহারা এ সংবাদে আদৌ বিচলিত হইলেন না। বলিলেন, "ইহাতে আর আশ্চর্যের কী আছে? হযরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত রসূল বৈ ত নন। তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য সমস্ত নবী-রসূলেরও ত মৃত্যু হইয়াছে। সত্যের যে আলো তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমরা এখন পথ চলিব।" ইহাই বলিয়া তাঁহারা সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে এই মিথ্যা ঘোষণায় চমৎকার একটি সুফলও ফলিল। হযরতের মৃত্যু-সংবাদই হযরতের জীবন রক্ষার উপায়স্বরূপ হইল। কোরেশগণ যে-মুহূর্তে এই সংবাদ শুনিল, সেই মুহূর্ত হইতেই তাহাদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা কমিয়া গেল। মুহম্মদই ত তাহাদের সকল অনিষ্টের মূল। তাহার জীবনই ত তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। সে-ই যখন নিহত, তখন আর যুদ্ধ কিসের? শত্রুতা কিসের? ইহাই ভাবিয়া তাহারা ক্ষান্ত

www.pathagar.com

হইয়া হৃষ্টচিত্তে আপন শিবিরপানে ফিরিয়া চলিল। এইরূপে নিজের মৃত্যু-সংবাদই ঢাল হইয়া রসুলুল্লাহ্‌র জীবনকে শত্রুর কবল হইতে আড়াল করিয়া রাখিল।

এদিকে হযরত ক্ষণকাল পরে চৈতন্যলাভ করিলেন। তাল্‌হা নিজে ভীষণভাবে আহত হইলেও রসুলুল্লাহ্‌কে ধরিয়া তুলিলেন। অন্যান্য সাহাবারাও হযরতের সেবায় ছুটিয়া আসিলেন। সকলে মিলিয়া হযরতকে শোয়াইয়া দিয়া তাঁহার মস্তক হইতে প্রোথিত কড়াদ্বয় টানিয়া বাহির করিলেন। দ্রুতবেগে রুধির-ধারা বহিতে লাগিল। সেই পবিত্র রক্তে হযরতের মুখখানি ধোয়াইয়া দেওয়া হইল। এই অবস্থায় তিনি কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন : "হায়!; যাহারা তাহাদের কল্যাণকামী পয়গম্বরকে এমন করিয়া আঘাত হানিতে পারে, তাহারা কী করিয়া জগতে উন্নতি করিবে? হে আমার প্রভু, আমার জাতিকে ক্ষমা কর! তাহারা অজ্ঞ, তাহারা ভ্রান্ত!"

কী বিরাট মহানুভবতা! নিজের জীবনের প্রতি লক্ষ্য নাই, আপন সেনাদলের দুর্দশার কথা মনে নাই; শত্রুর প্রতি অভিশাপ নাই, প্রতিহিংসার সকল আঘাত, সকল বেদনা, সকল গ্লানি ভুলিয়া গিয়া মহামানব অজ্ঞ মানুষের দুষ্কৃতির জন্য চিন্তাকুল। পাছে আল্লাহ্‌র কোন অভিশাপ এই মহাপাতকীদের শিরে নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি ব্যাকুল। এমন না হইলে কি 'রহমতুল্লিল আলামিন' হওয়া যায়।

কোরেশ দলপতিগণ এইবার হযরতের মৃতদেহ সন্ধান করিতে ব্যস্ত হইল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা মুসলমান দলের লাশ পরীক্ষা করিতে লাগিল। এই সময়ে কোরেশগণ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। বহু মুসলিম শহীদের পবিত্র দেহকে তাহারা নানাভাবে বিকৃত করিয়া নিজেদের পৈশাচিক হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। বীরবর হামজার মৃতদেহ পাইয়া আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিকট হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। পিশাচিনী হামজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া গলার মালা করিল, তারপর বুকের উপরে বসিয়া হৃৎপিণ্ডটি টানিয়া বাহির করিয়া চিবাইতে লাগিল।

হযরতের মৃতদেহের কোন সন্ধান না পাইয়া কোরেশ নেতৃবৃন্দ তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিল। অবশেষে আবু সুফিয়ান পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া 'মুহম্মদ আছ? আবুবকর আছ? ওমর আছ?' বলিয়া বারে বারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। মুসলমানগণ পর্বতের উপর হইতে সে ডাক শুনিতে পাইলেন বটে, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। তখন আবু সুফিয়ান অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল : "সবগুলি নিপাত হইয়াছে।" ওমর এই কথা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "ওরে হতভাগা, তুই মিথ্যা কথা বলিতেছিস। তোকে শাস্তি দিবার জন্য ইহাদের সকলকেই আল্লাহ্‌ বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন।" কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর আবুসুফিয়ান বলিতে লাগিল : "আচ্ছা থাকো; আগামী বৎসর বদর-প্রান্তরে আবার তোমাদের সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে।" ওমর বলিলেন : "বেশ তাহাই হইবে; আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত আছি।"

শাসাইতে শাসাইতে আবু সুফিয়ান সদলবলে মক্কার দিকে ফিরিয়া চলিল। শত্রুগণ দৃষ্টিসীমার বাহিরে গেলে হযরত অনুচরবৃন্দের সহিত নিম্নে অবতরণ করিলেন। মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণ এই সময় সঠিকভাবে নিরূপিত হইল। দেখা গেল : ৭০ জন বীর শহীদ হইয়াছেন। কোরেশদিগের সংখ্যা ২৩।[১]

১. ইবনে ইসহাকের মতে মুসলিম নিহতের সংখ্যা ৬৫ এবং কোরেশ নিহতের সংখ্যা ২২।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪১
জয় না পরাজয়

ওহদ যুদ্ধে কাহারা জয়ী হইল? কোরেশ, না মুসলমান?

বাহ্যদৃষ্টিতে ত মনে হয় মুসলমানদেরই পরাজয় ঘটিয়াছে।

কিন্তু সত্যই কি তাই?

না। আমাদের মতে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে নাই। তাহাদের কোন ক্ষতিও হয় নাই।

একথা বুঝিতে হইলে আর একটি কথা আগে বুঝা দরকার। আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি, হযরতের জীবনে যতগুলি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটির মূলেই আছে আল্লাহ্‌র একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত–একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের প্রেরণা। কোনও ঘটনাই বিফলে যায় নাই–প্রত্যেকটি একটা চরম লক্ষ্যের দিকে হযরতকে আগাইয়া দিয়াছে। কাজেই, কোন ঘটনাকে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় আমাদের নাই। সেই চরম লক্ষ্য এবং পরিণতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াই প্রতিটি ঘটনার ফলাফল আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, হযরতের সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া সত্যের সহিত মিথ্যার–আলোকের সহিত অন্ধকারের একটা ধারাবাহিক সংগ্রাম চলিয়াছে। এর পশ্চাতে রহিয়াছে একটা বিরাট পরিকল্পনা—একটা বিরাট আদর্শের প্রেরণা। এ সংগ্রামের শেষ পরিণতি কোথায় কিরূপ করিয়া হইল, সত্য জিতিল কি মিথ্যা জিতিল, হযরতের জীবন-সাধনা সার্থক হইল কি বিফলে গেল—ইহাই হইবে আমাদের সকল বিচারের মাপকাঠি। মাঝখান হইতে কোন একটা ঘটনাকে তুলিয়া লইয়া বিচার করিতে গেলে হযরতের সত্য রূপ পাঠকের চোখে ধরা পড়িবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, বদর-যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম নূতন পথে চলিয়াছে। এ-পথ সংঘর্ষের পথ–অগ্রগতির পথ–আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। এ-পথের এক প্রান্তে বদর, অপর প্রান্তে বায়তুল্লাহ্‌-কাবা! সেই শেষ মঞ্জিলে না-পৌঁছা পর্যন্ত বা আল্লাহ্‌র বাণীকে সুপ্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত হযরত কিছুতেই শান্ত হন নাই। কাজেই, আমরা হযরতের জীবনের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহকেই একটা অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিতে চাই। একটা মহাযুদ্ধের মধ্যে ছোটখাটো পরাজয় বা ভাগ্যবিপর্যয় থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কিছু যায় আসে না। সমগ্রের ফলাফল দেখিয়াই তাহার চূড়ান্ত ফল নিরূপিত হয়। হযরতের জীবন-সংগ্রামকেও সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে হইবে।

অতএব, ওহদ-যুদ্ধের ফলাফল ওরূপভাবে বিচার করিলে চলিবে না। ওহদ-যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য কতদূর সফল হইয়াছে তাহাই আমাদিগকে সর্বপ্রথম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস : কোরেশদিগকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করিবার জন্য আল্লাহ্‌ মুসলমানদিগকে ওহদ-প্রান্তরে টানিয়া আনেন নাই। মুসলিম বীরবৃন্দের শৌর্যবীর্য পরীক্ষারও এখানে কোন প্রয়োজন ছিল না; সে পরীক্ষা বদর-যুদ্ধেই হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন করিয়া দেওয়াই ছিল

www.pathagar.com

এ-যুদ্ধের প্রধান লক্ষ্য। শত্রুজয় অপেক্ষা তাহারা আত্মজয় করিতে পারে কি কিনা, বিপদের দিনে ধৈর্য ধরিয়া আপন কর্তব্য পালন করিতে সক্ষম কিনা, জয়ের সঙ্গে পরাজয়কেও তাহারা সঠিকভাবে গ্রহণ করিতে জানে কি-না-সত্যের জন্য তাহারা মরণ-বরণ করিতে প্রস্তুত কি-না— ইহারই পরীক্ষা ছিল এ যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানগণ নিজেদের আত্মরূপ দেখিতে পাইয়াছে। কোথায় তাহাদের গলদ আছে, কোথায় তাহাদের দুর্বলতা আছে, এই যুদ্ধে পাওয়া গিয়াছে তাহারই সন্ধান। বদর-বিজয়ের পর হইতে মুসলিম গাজীগণের অনেকে নিশ্চয়ই খানিকটা বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ক্রটিবিচ্যুতি ছিল- যাহার সংশোধনের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। পাঠক জানেন, বদর ও ওহদ-যুদ্ধের গাজীগণই পরবর্তীকালে ইসলামের বিশ্ব-বিজয় অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। সিরিয়া, পারস্য, স্পেন প্রভৃতি দেশসমূহ ইহাদের হস্তেই বিজিত হইয়াছিল। ভবিষ্যতের সেই বীরবাহিনী ওহদের ময়দানে অগ্নিস্নান করিয়াই শুদ্ধ বুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিলেন। এই দুঃখদহন না ঘটিলে এই নৈতিক পাঠ তাঁহারা আর কোথা হইতে গ্রহণ করিতেন?

বস্তুত ওহদ-যুদ্ধ মুসলমানদিগের পক্ষে বিফলে যায় নাই। মুসলমানদিগের নবীন জাতীয় জীবন-গঠনের যথেষ্ট উপকরণ ছিল এইখানে। অনেক কিছু নৈতিক শিক্ষা তাঁহারা এই যুদ্ধে লাভ করিয়াছিলেন। আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি :

১। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, তরুণদল হযরত ও অন্যান্য সাহাবাদিগের অভিমতকে অগ্রাহ্য করিয়া মদিনার বাহিরে আসিয়া যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যুদ্ধজয় অপেক্ষা লুণ্ঠনের লোভই ছিল অনেকের মধ্যে প্রবল। হযরতের কড়া হুকুম সত্ত্বেও তীরন্দাজদিগের স্থানত্যাগই তাহার প্রমাণ। এই দুইটি কার্যই তারুণ্যের উগ্র উচ্ছ্বাসের কুফল। নেতার আদেশ ও অভিমতের প্রতি এহেন অশ্রদ্ধা যে ভয়ঙ্কর দোষের, ওহদ-যুদ্ধ হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ হইতে তাঁহারা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে কোন যুদ্ধে আর তাঁহাদের এরূপ ভুল হয় নাই কাজেই, অমঙ্গলের মধ্য দিয়া মুসলমানদিগের মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

২। যুদ্ধ-জয়ের আগের দিন অপেক্ষা পরের দিন অত্যন্ত কঠিন। যুদ্ধজয়ের পরে সেনাপতি ও সৈনিকদিগকে তাই অধিকতর সতর্ক থাকিতে হয়। উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকতার মুহূর্তে অনেক সময় শত্রু সৈন্যদল যুদ্ধকালে গোপনে থাকে, জয়ের পরে তাহারা যুদ্ধে নামে। এই গুপ্ত শত্রুকে শেষ না করা পর্যন্ত কোন জয়ই সুনিশ্চিত নহে। ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানেরা এ-সত্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

৩। নেতার আদেশ- নিষেধ পালন করিলে যে কি সুফল ফলিতে পারে, এবং লঙ্ঘন করিলে যে কি অমঙ্গল নামিয়া আসে, মুসলমানগণ যুগপৎভাবে তাহা এইখানে দেখিতে পাইয়াছেন। বিজয় ত তাহাদের হাতের মুঠার মধ্যেই আসিয়াছিল, কিন্তু নিজেদের দুষ্কৃতির ফলেই সে তাঁহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।[১]

---

১ . এখানে রসূলুল্লাহ্ যে কত বড় রণকুশলী ও দূরদর্শী সেনাপতি ছিলেন তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া যে বিপদ আসিতে পারে, আগেই তিনি তাহা অনুমান করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

৪। বদর-যুদ্ধের মুসলমানগণ বিজয়ীর ভূমিকায় দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন বিজয়লাভ কোন মানুষের বা কোন জাতির ভাগ্যেই ঘটে না। জীবনে জয়-পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া জাতিগঠন সম্পূর্ণ হয়। কাজেই দুঃখ-দুর্দিন দেখিয়া ভয় করিলে চলে না। এহেন দুঃসময়ে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হয়, কেমন করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে হয়, এ-শিক্ষা গঠনোন্মুখ মুসলমান জাতি সর্বপ্রথম ওহদ-ক্ষেত্রেই লাভ করিয়াছিলেন। চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্য কী চমৎকারভাবেই না অগণিত ও সুসজ্জিত শত্রুসেনার সকল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই অগ্নি-পরীক্ষার ফলে শুধু যে মুসলিম গাজীগণ নিজেরাই উপকৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। পরাজয় বা ভাগ্যবিপর্যয়ের দিনের পরবর্তীকালে মুসলমান জাতি কেমনভাবে আত্মস্থ হইবে, কেমন করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনকে পুনর্গঠিত করিবে- সে আদর্শও আমরা পাই এইখানে। সব যুদ্ধেই হযরত যদি জয়ী হইতেন, তবে সঙ্কটদিনের আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম?

৫। হযরত নিজেও দুর্যোগের মধ্যে নেতৃত্বের এক অতুলনীয় আদর্শ দেখাইতে পারিয়াছিলেন। সঙ্কট-মুহূর্তে তিনি একটুও বিচলিত হন নাই। সমগ্র জীবনের মধ্যে এই ওহুদ-যুদ্ধেই বোধ হয় তিনি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। শত্রুর শাণিত তরবারি ত তাঁহার মস্তকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, শিরস্ত্রাণ কাটিয়া গিয়া দুইটি লৌহ কড়াও তাঁহার কপালে ঢুকিয়া গিয়াছিল। তাল্‌হা আপন হস্ত দ্বারা সে আঘাতকে বাধা না দিলে তখনই হয়ত হযরতের জীবন-লীলার অবসান হইত। এমনভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও হযরত আপন কর্তব্য পালন করিতে ভুলেন নাই। বিক্ষিপ্ত মুসলিম সৈন্যদিগকে তিনিই পুনরায় একত্র করিতেছিলেন এবং সেনাদলের নৈতিক বল (morale) তিনিই রক্ষা করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কিরূপ ধৈর্য ও তিতিক্ষার প্রয়োজন, হযরত সেদিন তাহা মুসলমানদিগকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

শুধু তাহাই নহে। জীবন-স্বপ্নকে সফল করিতে হইলে—আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে হইলে—মুসলমানকে যে মৃত্যুর দুয়ার পর্যন্তও পৌছিতে হয়, ইঞ্চি-পরিমাণ ব্যবধানে দাঁড়াইয়াও যে জীবনকে মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিতে হয়, এই বাণীই হযরত সেদিন আমাদিগকে দিয়াছেন। জীবন-সংগ্রামে যখনই মন আমাদের নিরাশার আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিবে, তখনই মনে পড়িবে আমাদের ওহদ ময়দানে হযরতের এই অতুলনীয় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার কথা—সত্য ও আদর্শের জন্য এই জীবন-মরণ সংগ্রামের কথা-আল্লাহ্‌র উপর তাঁহার এই অবিচলিত বিশ্বাস ও ঈমানের কথা। হযরত না হারিলে কেমন করিয়া আমরা এই সম্পদ লাভ করিতাম?

৬। আক্রমণকারীর ভূমিকা হইতে যখন মুসলমানগণ অকস্মাৎ আক্রান্তের ভূমিকায় নামিলেন তখন তাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ও লক্ষ্য হইল আত্মরক্ষা করা। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা শীঘ্রই তাঁহাদিগকে ভুলিতে হইল। পরীক্ষা আরও কঠোর ও সূক্ষ্মতর হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা দেখিলেন শুধু আত্মরক্ষা করিলেই চলিবে না, তাঁহাদের প্রাণপ্রতিম রসুলকেও বাঁচাইতে হইবে। ইহার জন্য চাই আত্মবিসর্জন। কাজেই তাঁহাদিগকে যুগপৎভাবে আত্মরক্ষাও করিতে হইল, আবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মত্যাগও

www.pathagar.com

করিতে হইল। এ-বড় কঠোর পরীক্ষা। কিন্তু এতবড় পরীক্ষাতেও মুসলমানগণ বিভ্রান্ত হন নাই। সকলে না হউক, অন্তত একদল মুসলমান এ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিতই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা পলায়ন করেন নাই বা ভীত হন নাই; নিজের প্রাণ না বাঁচাইয়া তাঁহারা হযরতের প্রাণ-রক্ষা করিয়াছেন। কাজেই বলা যাইতে পারে, মুসলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষা এইখানে একেবারে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

৭। হযরতের যদি মৃত্যুই ঘটে, তবে মুসলমানগণ কোন্ আলোকে ইহা গ্রহণ করিবে—তাঁহার নির্দেশিত পথেই চলিবে, অথবা উদভ্রান্ত হইয়া সে-পথ পরিত্যাগ করিবে—মুসলমানদিগকে এ পরীক্ষাও এখানে দিতে হইয়াছে। হযরতের মৃত্যু-সংবাদ যখন প্রচারিত হইল, তখন যাঁহারা দুর্বলচিত্ত, তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই পলায়ন করিলেন। কিন্তু যাঁহারা আদর্শ মুসলমান, তাঁহারা একটুও বিচলিত হইলেন না। হযরতের প্রদত্ত বাণী, আদর্শ ও আলোকেই তাঁহারা আকড়াইয়া ধরিয়া আপন কর্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

বস্তুত ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের নিরাশ হইবার কোনই কারণ ছিল না। এইখানে তাঁহারা অনেক ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছিলেন ওহদ-যুদ্ধে যাত্রা করিবার সময় তাঁহারা যেরূপ মুসলমান ছিলেন, ফিরিবার সময় তদপেক্ষা সুন্দর ও উন্নত মুসলমান হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

এ ত গেল যুদ্ধের ভিতরকার দিক। বাহিরের দিকটাও দেখা যাক। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে, কোরেশগণ এ-যুদ্ধে প্রকৃত জয়লাভ করে নাই।

৩০০০ সুসজ্জিত কোরেশ সৈন্যের মুকাবেলায় মাত্র ৭০০ মুসলিম সৈন্য যুদ্ধ করিয়াছে। তাহার মধ্যেও আবার মাত্র ২ জন অশ্বারোহী আর ৭০ জন বর্মধারী অস্ত্রশস্ত্র নিতান্ত মামুলি ধরনের। অনুপাত ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় ১ জন মুসলমানকে প্রায় ৫ জন কোরেশের বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আমরা দেখিতে পাই কোরেশগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্টিতে পারে নাই, রণে ভঙ্গ দিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই বিজয়ের লক্ষণ নহে।

মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময়ই বা কোরেশগণ কী বাহাদুরি দেখাইল? মুসলমানদিগের নির্বুদ্ধিতার ফলে ৭০ জন বীর অকারণে প্রাণ হারাইলেন বটে, কিন্তু কোরেশদের কোন্ উদ্দেশ্য ইহাতে সিদ্ধ হইল? না তাহারা হযরতকে বধ করিতে পারিল, না আবুবকর, ওমর, আলি বা অন্য কোন মুসলিম বীরকে বন্দী করিতে সক্ষম হইল, না ভক্তগণের উপর হইতে হযরতের অসাধারণ প্রভাবকে তাহারা ক্ষুণ্ন করিতে পারিল। ওহদ-যুদ্ধের পূর্বেও হযরত যেমন শক্তিমান ছিলেন, পরেও তিনি ঠিক তেমনি শক্তিমান রহিলেন; বরং মনোবল তাঁহার আরও বাড়িয়া গেল।

মুসলমানগণ যদি পরাজিতই হইবে, তবে কোরেশগণ মদিনা আক্রমণ করিল না কেন? মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই ত তাহারা এই বিরাট অভিযান আনিয়াছিল। ওহদ-যুদ্ধে এইরূপ আশাতীত সাফল্য লাভের পরেও তাহারা তবে মক্কায় ফিরিয়া গেল কেন?

কোরেশগণ সত্যই যে মুসলমানদিগের উপর বিজয় লাভ করিতে পারে নাই, কোরেশ-নেতা আবু সফিয়ান তাহা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল, নতুবা যুদ্ধশেষে ওহদ-

www.pathagar.com

পর্বতের পাদদেশে দাঁড়াইয়া সে কেন ওমরকে এই কথা বলিয়া শাসাইবে : "আচ্ছা, আগামী বৎসর পুনরায় বদরে তোমাদের সঙ্গে বুঝাপড়া হইবে।"

ঐতিহাসিকগণ কোরেশদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ২৩ জন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও আমাদের বিশ্বাস হয় না। এক হামজার হস্তেই ত ৩১ জন কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বীরবর আলি একাই ৮ জন কোরেশ সৈন্যকে নিহত করেন। সাদ্-বিন্-রাবী, নয্‌র-বিন্-আউস্ প্রমুখ বীরগণের হস্তেও বহু কোরেশ নিহত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বীরকেশরী আবু-দোজানা-যিনি হযরত-প্রদত্ত অসিহস্তে অনিরুদ্ধ গতিতে শত্রুনিপাত করিতেছিলেন-তাঁহার হস্তেই বা কত না শত্রু নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। দূর হইতে আবু-দোজানার অসাধারণ বীরত্ব ও শত্রুনিপাতের ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া স্বয়ং হযরত বলিয়াছিলেন : যদি জিহাদ না হইয়া অন্য কোন ব্যাপার হইত তবে আল্লাহ্‌তায়ালা আবু-দোজনার এইরূপ ভীষণ নরহত্যা দেখিয়া নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইতেন।

যুদ্ধের প্রথমার্ধে ৩০০০ কোরেশ সৈন্য যখন পালাইতে আরম্ভ করিল তখন নিশ্চয় মাত্র ২৩ জন কোরেশ, (তখনকার হিসাবমতে তাহারও কম) নিহত হইতে দেখিয়াই তাহারা রণে ভঙ্গ দেয় নাই। তাহাদের হতাহতের সংখ্যা নিশ্চয়ই এমন ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার দরুন তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়াই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত যুদ্ধের শেষাংশে যে সমস্ত মুসলিম বীর নিহত হইয়াছিলেন তাঁহারাও যে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই মরণ-বরণ করিয়াছিলেন, এমনও নহে অনেক শত্রুকে হতাহত করিবার পরই তাঁহারা শহীদ হইয়াছিলেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায়, এই যুদ্ধে অলিদ, আবু উমায়া, তাল্‌হা, হিশাম, উবায়া-বিন্-খালাফ, আবদুল্লাহ্-বিন্-হামিদ, আবু সৈয়দ বিন্-আবু-তাল্‌হা, মাসাফী, জালাস প্রমুখ ১৭ জন নেতৃস্থানীয় কোরেশবীর নিহত হইয়াছিল। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে সাধারণ সৈন্য যে কত মরিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

বদর-যুদ্ধে মুসলমান ও কোরেশদিগের সংখ্যার অনুপাত ছিল ১ : ৪। ওহদ-যুদ্ধের অনুপাতও তদ্রূপই ছিল। কিন্তু বদরে নিহতের অনুপাত ছিল ১৪ : ৭০ অর্থাৎ ১ : ৫। বদরের সেইসব যোদ্ধাই ওহদে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই ৭০ জন মুসলিম বীর শহীদ হইয়া থাকিলে হিসাবমতে ইহার ৫ গুণ কোরেশ সৈন্য নিহত হইবার কথা। সে ক্ষেত্রে কম্‌সেকম ইহার দ্বিগুণ যে নিহত হইয়াছিল এই অনুমান অনায়াসেই করা যায়।

কিন্তু তবু বলিতেই হইবে, ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের পরাজয়ই ঘটিয়াছিল। একথা স্বীকার করায় কোন অগৌরব নাই। এই পরাজয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকৃত। অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি এই বিধান করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের অনুমান নহে। নিম্নে আমরা পবিত্র কোরআন হইতে ওহদ-যুদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় আয়াত পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি; তাহা হইতেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে সূরা "আল-ইমরান"-এ আল্লাহ্‌তায়ালা অনেক কিছু বলিয়াছেন। সেখান হইতে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করিতেছি। সেইসব আয়াত হইতেই ওহদ-যুদ্ধের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও জয়-পরাজয় সম্বন্ধে পাঠক একটা সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন

www.pathagar.com

ওহদ-যুদ্ধের প্রারম্ভে মুসলমানদিগের মধ্যে যে সত্যই মতানৈক্য ঘটিয়াছিল এবং অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই যে যুদ্ধে আসিয়াছিল, আল্লাহ্ তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :

"এবং যখন তুমি প্রত্যূষে আপন পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলে এবং যুদ্ধের জন্য মুসলমানদিগকে সজ্জিত করিলে—এবং আল্লাহ্ শ্রোতা এবং জ্ঞাতা—তখন তোমাদের মধ্য হইতেই দুইটি দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল যে, তাহারা কাপুরুষতা দেখাইবেই। এবং আল্লাহ্ উভয়েরই অভিভাবক এবং আল্লাহ্র উপরই বিশ্বাসীগণ বিশ্বাস স্থাপন করিবে।" (৩ : ১২০-১২১)

ধৈর্য ধরিয়া থাকিলে এবং যথাযথ কর্তব্য পালন করিলে যে আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে সাহায্য করিবেন, সে কথা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন :

"যদি তোমরা ধৈর্য ধরিয়া থাক এবং (স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে) সজাগ থাক, এবং তাহারা (শত্রুগণ) যদি হঠাৎ তোমাদের উপর আসিয়া আপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রভু পাঁচ হাজার ধ্বংসকারী ফেরেশ্‌তা পাঠাইয়া তোমাদের সাহায্য করিবেন।" (৩ : ১২৪)

করুণাময় আল্লাহ্ কোরেশদিগকে যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে চাহেন নাই, শুধু দলপতিদিগকে ধ্বংস করিয়া অন্যান্য সকলকে সুপথে আনাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন :

"যাহাতে তিনি (আল্লাহ্) অবিশ্বাসীদিগের মধ্য হইতে একটি দলকে (দলপতিদিগকে) নিপাত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহারা নিজেদের অভীষ্ট সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।" (৬ : ১২৬)

বলা বাহুল্য, বদর এবং ওহদ-যুদ্ধে ঠিক আল্লাহ্র এই উদ্দেশ্যই সাধিত হইয়াছে। যে সমস্ত কোরেশ নেতা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছিল এবং হযরতের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে যাহারা প্রধান পাণ্ডা ছিল, তাহাদের প্রায় সকলেই বদর ও ওহদ-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। বাকী ছিল আবু সুফিয়ান, জুবায়েব-বিন্-মু'তাএম, হাকিম-বিন্ হিজাম-ইহারা তিন জন পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। মুসলমানগণ যে প্রথমত কোরেশদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন তাহাও আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতেছেন :

"কি আশ্চর্য যখন তোমাদের উপর মুসিবৎ আসিল—এবং তোমরাও বিধর্মীদিগকে দুইবার অনুরূপ মুসিবতে ফেলিয়াছিলে-তখন তোমরা বলিতে লাগিলে : কোথা হইতে এই মুসিবৎ আসিল? বল (হে মুহম্মদ) ইহা তোমাদের হইতেই আসিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (৩ : ১৬৫)

কোরেশদিগকে পরাজিত করিবার পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও যে মুসলমানগণ তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই; বরং উল্টো তাহাদের হাতে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে হয়ত মুসলমানগণের মনে খানিকটা লোভের সঞ্চার হইয়া থাকিবে। কিন্তু এখানেও দুঃখ করিবার কিছু নাই। ন্যায়বিচারক আল্লাহ্ পরিষ্কারভাবে মুসলমানদিগকে বলিয়া দিতেছেন :

"যদি আঘাত খাইয়া তোমরা দুঃখ পাইয়া থাক, তবে মনে রাখিও তোমরাও বিধর্মীদিগকে অনুরূপ আঘাত দিয়াছ। এবং আমরা পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে এই

www.pathagar.com

(ভাগ্য-বিপর্যয়ের) দিনগুলি আনিয়া থাকি যাহাতে আল্লাহ্ জানিতে পারেন কাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী; এবং আল্লাহ্ অন্যায়কারীদিগকে ভালবাসেন না; এবং যাহাতে তিনি বিশ্বাসীদিগকে খাঁটি করিয়া লইতে পারেন এবং অবিশ্বাসীদিগকে মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন।" (৩ : ১৩৯-৪০)

মুসলমানদিগের ঈমান পরীক্ষা করাও যে যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাও স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন :

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে-যতক্ষণ না আল্লাহ্ (তোমাদের মধ্য হইতে) সেই সব লোককে চিনিয়া লন যাহারা কঠোর কর্তব্যপরায়ণ এবং ধৈর্যশীল? (৩ : ১৪১)

"এবং নিশ্চয়ই তোমরা মৃত্যুকে না দেখিয়াই মুখে মৃত্যুকামনা করিয়াছিলে; তাই তোমরা যখন মৃত্যুকে দেখিলে, তখন তাকাইয়া রহিলে।" (৩ : ১৪২)

হযরতের নিহত হইবার সংবাদে মুসলমানদিগের অনেকের মধ্যেও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে কি সুন্দর শিক্ষাই না দিতেছেন :

"এবং মুহম্মদ একজন প্রেরিত পুরুষ বৈ ত নহেন; তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও মারাও গিয়াছেন। অতএব তিনি যদি মারাই যান বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে?" (৩ : ১৪৩)

মুসলমানদিগের মধ্যে যে সকলেই নিষ্কাম খোদা-প্রেমের তাড়নায় ওহদ-যুদ্ধে আসে নাই এবং অনেকের মনেই যে 'দুনিয়ার পুরস্কার' লাভের চিন্তাই প্রবল হইয়া জাগিয়াছিল, আল্লাহ্ সে গোপন কথাও প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন :

"এবং যে কেহ এই দুনিয়ার পুরস্কার চায়, তাহাকে আমরা তাহাই দেই এবং যে-কেহ পরকালের পুরস্কার চায়, তাহাকেও আমরা তাহাই দেই। আমরা কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত : করিব।" (৩ : ১৪৪)

উপরে যে সমস্ত আয়াত উদ্ধৃত করা হইল, তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেছেন, ওহদ-যুদ্ধের অনেকগুলি উদ্দেশ্য ছিল এবং সেইসব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আল্লাহ্ মুসলমানদিগের এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটাইয়াছিলেন।

বস্তুত ওহদ-যুদ্ধ সত্যই মুসলমানদিগের এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা। এই যুদ্ধে মুসলমানদিগের কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং এক বিরাট নৈতিক সম্পদ তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। পরাজয়ের মধ্যেও যে ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিহিত থাকে ওহদ-যুদ্ধে আমরা তাহাই দেখিলাম।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪২

ওহুদ–যুদ্ধের শেষে

হযরতের নিহত হইবার সংবাদ যখন মদিনায় পৌছিল, তখন সর্বত্র একটা শোকের মাতম উঠিল। গৃহ ছাড়িয়া সকলে ওহদের দিকে ছুটিয়া চলিল। মুসলিম নারীরা পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইলেন। উম্মে-আয়মান নাম্নী জনৈকা মহিলা একজন মুসলিম সৈন্যকে নগরাভিমুখে আসিতে দেখিয়া ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন : "কাপুরুষ! তোমাদের রসুল মারা গিয়াছেন আর তোমরা গৃহে ফিরিতেছ? দাও তোমার অস্ত্র, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছি।"

বনি দিনার গোত্রের একটি মহিলা উন্মাদিনীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিতেছিলেন। কতিপয় মুসলমানের সাক্ষাৎ পাইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন : "খবর কি?"

"কি আর বলি, তোমার ভ্রাতা শহীদ হইয়াছেন।"

"সোব্হানাল্লাহ্! তাঁহার কল্যাণ হউক। তারপর?"

"তোমার স্বামী শহীদ হইয়াছেন।"

"ইন্না লিল্লাহে......! তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক।"

"তোমার পিতাও শহীদ হইয়াছেন।"

"স্নেহময় পিতাও? ....তারপর.....হযরতের খবর কি? ভাই বল না?"

"হযরত জীবিত আছেন।"

"জীবিত আছেন? কই, কোথায় তিনি? আমাকে একবার দেখাও।"

অগত্যা তাঁহাকে হযরতের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। হযরতকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : "আল্-হামদু-লিল্লাহ্! হে রসুলুল্লাহ্, তোমাকে পাইলে আর সকলকেই হারাইতে পারি।"

হযরতের স্নেহময়ী কন্যা বিবি ফাতিমাও পিতার মৃত্যুসংবাদে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। হযরতের ক্ষতস্থান হইতে শোণিতপাত হইতেছে দেখিয়া তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি এক টুকরা চাটাই পুড়াইয়া সেই ভস্ম ক্ষতস্থানে প্রদান করিলেন। ইহাতেই রক্ত বন্ধ হইয়া গেল।

অন্যান্য মহিলারাও আহত মুসলিম সৈনিকদিগকে যথাসাধ্য সেবা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

একটু সুস্থ হইলে হযরত শহীদদিগের লাশ দাফন-কাফন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। খুনরঞ্জিন লেবাস্ পরিয়া বীরদল শেষের শয়ন গ্রহণ করিলেন। দুই তিনজন শহীদকে একত্রে এক একটি কবরে স্থাপন করা হইল।

সন্ধ্যার পূর্বেই হযরত সকলকে লইয়া মদিনায় পৌছিলেন।

মদিনার প্রতি ঘরে কান্নার রোল উঠিল। আল্লাহ্র অভয়-বাণী শুনাইয়া হযরত সকলকে শান্ত করিলেন।

দূরদর্শী হযরত মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে একটি বিষয় ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেছিলেন। মদিনা-নগরী তখন অরক্ষিত। যদি কোরেশগণ ফিরিয়া আসিয়া মদিনা

www.pathagar.com

আক্রমণ করে, তখন কি হইবে? ইহাই ছিল তাহার চিন্তার কারণ। হযরত এজন্য সা'দ নামক জনৈক সাহাবীকে কোরেশদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য চর নিযুক্ত করিয়া আসিলেন।

কোরেশগণ যখন আল্-আকিক উপত্যকায় পৌছিল, তখন তাহাদের মাথায় এক নূতন খেয়াল চাপিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল : আমরা কি করিতেই বা আসিলাম, আর কি করিয়াই বা চলিলাম। আসিলাম মদিনা আক্রমণ করিতে, কিন্তু তাহা হইল কৈ? এমন সুযোগ কেউ ছাড়ে? মদিনা ত এখন অরক্ষিত! কেন তবে আমরা ফিরিয়া যাইতেছি?

কিন্তু অনেকে আবার এ কথায় সায় দিল না। তাহারা বলিল : "মদিনা আক্রমণ করিতে গেলে বিপদ আছে। দেখ নাই মুসমানদিগের শৌর্যবীর্য? সঙ্কীর্ণ স্থানে একবার পাইলে তাহারা আমাদিগকে একদম শেষ করিবে। কাজেই যাহা পাইয়াছ তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে ঘরে ফিরিয়া চল।"

কিন্তু এই প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হইল না। মদিনা আক্রমণ করিবার দিকেই অধিকাংশ লোকের ঝোঁক দেখা গেল। কোরেশবাহিনী পুনরায় মাদিনার পানে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

হযরত মদিনায় বসিয়া রাত্রে এই সংবাদ জানিতে পারিলেন। ওমর ও আবুবকরের সহিত তিনি পরামর্শ করিলেন। কোরেশদিগের অগ্রগতিকে বাধা দিতেই হইবে, ইহাই হইল তাঁহাদের মত।

কোনরূপে রাত্র কাটিয়া গেল। প্রভাত হইতেই বেলালের কণ্ঠে ফযরের আযান ধ্বনিয়া উঠিল। মুসলিম বীরবৃন্দ হযরতের সহিত নামায পড়িলেন। অমনি ঘোষণা করিলেন : "এখনই সকলে প্রস্তুত হও, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। অন্য কাহাকেও আমি চাই না; গতকল্য যে সমস্ত বীর ওহদে যুদ্ধ করিয়াছ, কেবল তাহারাই সজ্জিত হইয়া আইস।"

ঘরে ঘরে তখনও কান্নার রোল থামিয়া যায় নাই। বীরবৃন্দের অনেকেই তখন অল্পবিস্তর আহত এবং সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত; ইহারই মধ্যে আসিল আবার এক নূতন আহ্বান!

কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই আহত ও পরিশ্রান্ত বীরদলই হযরতের আদেশে মুহূর্ত মধ্যে রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিলেন। কত বড় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই মহাপুরুষের! কী অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর তাঁহার উপর তাঁহার ভক্তবৃন্দের! কী অপূর্ব মনোবল ও নিয়মানুবর্তিতা। এই মুসলিম বীরবৃন্দের! ওহদে অগ্নি পরীক্ষার পর সত্যের সৈনিকদল যেন ঈমানের তেজে ও দেহের শক্তিতে অধিকতর প্রাণবন্ত হইয়া উঠিলেন।

হযরত তাঁহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া অনতিবিলম্বে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে আবু সুফিয়ান মাবাদ নামক জনৈক মদিনাবাসী পথিকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, হযরত পুনরায় এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়া কোরেশদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে সে খুব দমিয়া গেল; মদিনা আক্রমণের সাধ তাহার মিটিয়া গেল। ভীতচিত্তে সে তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল।

www.pathagar.com

হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া মদিনার আট মাইল দূরবর্তী 'হামরাউল্ আসাদ' নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু শত্রুদিগের কোন সন্ধানই তিনি পাইলেন না। অগত্যা কয়েকদিন সেখানে শিবির স্থাপন করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। প্রতি রাত্রে পর্বতোপরি অসংখ্য স্থানে এমনভাবে বড় বড় আগুন জ্বালান হইতে লাগিল—যাহাতে দূর হইতে দেখিলে স্বতঃই মনে হয় বহু লোক সেখানে জমায়েত হইয়াছে। এইরূপ কয়েক রাত্রি অতিবাহিত করিবার পর তিনি সদলবলে মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

রণকৌশলের দিক দিয়া হযরতের এই কার্য নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে কোরেশগণ ভাবিল, মুসলমানদিগকে পরাজিত করা সহজ নহে। ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ভাবিল, ওহদ যুদ্ধে মুসলমানেরা একটুও কাবু হয় নাই। মুসলমানেরাও ভিতরে ভিতরে নব বল ও নবপ্রেরণা লাভ করিলেন। হযরতের উপর তাঁহাদের যে অবিচলিত বিশ্বাস ও ভরসা আছে এবং তিনিই যে তাঁহাদের অবিসম্বাদিত নেতা, অমুসলমানগণ তাহা এইবার পরিষ্কার বুঝিতে পারিল।

www.pathagar.com

পারিচ্ছেদ : ৪৩

চতুর্থ ও পঞ্চম হিযরীর কয়েকটি ঘটনা

ওহদ-যুদ্ধের পর দুই মাস বেশ শান্তিতেই কাটিল।

কিন্তু চতুর্থ হিযরীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আবার বিপদ দেখা দিল। নানাসূত্রে হযরত জানিতে পারিলেন, মরুভূমির মধ্যস্থিত বনু-আসাদ্ নামক একটি শক্তিশালী গোত্র অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অনতিবিলম্বে হযরত আবু সালমার নেতৃত্বে ১৫০ জন মুসলিম সৈন্যের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীকে তাহাদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন মুসলমানগণ গোপন পথ ধরিয়া এত ক্ষিপ্রগতিতে গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌছিলেন যে, শত্রুগণ প্রস্তুত হইবার অবসর পাইল না। ফলে তাহারা পরাজিত হইল। মুসলমানগণ প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পরের মাসে হযরত কোরেশদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে আসেম-বিন-সাবেত নামক জনৈক সাহাবীর অধীনে দশ জন মুসলিম গুপ্তচরকে মক্কার দিকে প্রেরণ করিলেন। এই দলটি যখন রাযী নামক স্থানে উপনীত হইল, হোযায়েল বংশের দুই শত লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মুসলমানদিগকে বন্দী করিয়া কোরেশদের নিকট বিক্রয় করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ মিলিবে, ইহাই ছিল তাহাদিগের এই আক্রমণের একমাত্র প্রেরণা। মুসলমানগণ বেগতিক দেখিয়া নিকটস্থ একটি পর্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। হোযায়েলগণ দেখিল, মুসলমানেরা প্রাণ থাকিতে আত্মসমর্পণ করিবে না, তাই অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া তাহাদিগকে নামিয়া আসিতে বলিল। কিন্তু দলপতি আসেম বলিলেন : "তোমাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকের কথায় আমরা বিশ্বাস করি না।" পাষণ্ডগণ মুসলমানদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন মুসলিম বীরগণ তরবারি হস্তে দ্রুতবেগে নিম্নে অবতরণ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহাদের আটজন বীর প্রাণ হারাইলেন। বাকী দুইজন-জায়েদ[১] ও খোবায়ের আহত অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন।

নরপশুগণ বন্দীদ্বয়কে লইয়া মক্কায় পৌছিল। বদর-যুদ্ধে নিহত দুইজন কোরেশ যোদ্ধার পুত্রগণ আনন্দের সহিত জায়েদ ও খোবায়েরকে কিনিয়া লইল। তারপর বেচারাদিগের উপর শুরু হইল অমানুষিক অত্যাচার।

মনের সুখে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পর দুর্বৃত্তগণ তাঁহাদেরকে বধ্যভূমিতে লইয়া চলিল। অগণিত কৌতূহলী কোরেশ নরনারী ও বালক-বালিকা চলিল তাহাদের পিছনে পিছনে সেই চমকপ্রদ দৃশ্য দেখিবার জন্য। বধ্যভূমিতে উপনীত হইবার পর কোরেশ নেতাগণ বলিতে লাগিল : "যদি ইসলাম পরিত্যাগ করিতে পার তবে এখনও তোমাদের প্রাণরক্ষা হয়।" মুসলিম বীরদ্বয় ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, বলিলেন : "কিছুতেই না। সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়েও না।" দুর্বৃত্তগণ তখন জায়েদকে বলিল : "দেখ জায়েদ, এই ফাঁসিকাষ্ঠে যদি এখন মুহম্মদকে ঝুলাইয়া

---

১. এই জায়েদ হযরতের পালিত পুত্র জায়েদ নহেন।

www.pathagar.com

দেওয়া হয় এবং তদ্বিনিময়ে তুমি মুক্তিলাভ কর, তবে কি তাহা পছন্দ কর না?" জায়েদ বজ্রকণ্ঠে উত্তর দিলেন। : "সাবধান! মুখ সামাল করিয়া কথা বলিস। আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার প্রিয় নবীর গায়ে একটি কন্টক বিদ্ধ হইতে দিতেও আমি রাযী নই।" তখন কোরেশ নরপিচাশগণ তরবারি হস্তে তাঁহাদিগের প্রতি অগ্রসর হইল। মুসলিম বীরদ্বয় নির্ভীক নির্বিকার মুখে তাঁহাদের ভয়ভীতি বা গ্লানিমার চিহ্নমাত্র নাই। এক অপূর্ব বেহেশ্তী নূরে সে মুখ আজ অধিকতর উজ্জ্বল। বারে বারে আঘাত করিয়া পাষণ্ডগণ তাঁহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল। আল্লাহ্র নাম করিতে করিতে বীরদ্বয় হাসিমুখে শহীদ হইলেন।

এই মাসেই আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিল আবু-বেরা নামক জনৈক বৃদ্ধ নেজ্দ্বাসী দুইটি অশ্ব এবং দুইটি উট উপঢৌকনসহ হযরতের নিকট আসিয়া বলিল : "আপনি যদি কতিপয় উপযুক্ত লোককে আমাদের ওখানে পাঠাইয়া দেন, তবে আমাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে।" হযরত বলিলেন : "নেজ্দ্বাসীদের উপর বিশ্বাস কী? নেজ্দের বনি-আমির গোত্র ত কোরেশদিগেরই বন্ধু"। তদুত্তরে আবু বেরা বলিল : 'হযরত, সেখানে ত আমরাই নেতৃস্থানীয়। আমরা যাহা বলি তাহাই হইবে। কাজেই আমি মুসলমানদিগের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" হযরত বেরার কথা বিশ্বাস করিয়া ৭০ জন বিশিষ্ট মুসলিম উলেমাকে আবু-বেরার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। বনি-আমির গোত্রের প্রতি হযরত একখানি পত্রও সেই সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইলেন। বীরমউনা নামক স্থানে উপনীত হইলে মুসলমানগণ সেই পত্রসহ জনৈক মুসলিম দূতকে বনি-আমিরদিগের নেতা আমির ইব্নে- তোফায়েলের নিকট প্রেরণ করিলেন। আমির পত্রখানি না পড়িয়াই নিকটস্থ জনৈক অনুচরকে ইঙ্গিত করিল, তদনুসারে সেই মুহূর্তে মুসলিম দূতকে হত্যা করা হইল; শুধু তাহাই নহে, আমির তাহার দলবলসহ তৎক্ষণাৎ বীরমাউনার দিকে ধাবিত হইল এবং মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার আদেশ দিল। আবু-বেরা নিজের শপথের কথা বলিয়া বনি-আমিরদিগের নিরস্ত করিতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু সে প্রয়াস কার্যকরী হইল না। বনি-সালেম নামক আর একটি গোত্র ইব্নে- তোফায়েলকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের সহায়তায় তোফায়েল নিরীহ মুসলিম জ্ঞান তাপসদিগকে হত্যা করিয়া নিজেদের পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিল।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বড়ই চিত্তাকর্ষক। ওমাইয়া নামক জনৈক মুসলিম বীরমউনার এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মদিনায় ফিরিবার কালে পথিমধ্যে বনি-আমির বংশের দুইজন লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ওমাইয়া সেই দুইজন লোককে নিদ্রিতাবস্থায় হত্যা করেন। লোক দুইটি হযরতের নিকট হইতে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশে ফিরিতেছিল। কিন্তু ওমাইয়া তাহা জানিতেন না। ওমাইয়া মদিনায় ফিরিয়া গিয়া হযরতকে সকল কথা বলিলেন। বীরমউনার শোচনীয় হত্যাকণ্ডের সংবাদ শুনিয়া যদিও তিনি নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন, তবু ওমাইয়া কর্তৃক দুইজন নিরীহ বনি-আমিরের হত্যার ব্যাপারকে কিছুতেই তিনি সমর্থন করিতে পারিলেন না। এদিকে যে আমির ইব্নে -তোফায়েল নিতান্ত অমানুষিকভাবে ৭০ জন নিরপরাধ মুসলমানকে হত্যা করিল সেই পাষণ্ডই আরবদিগের চিরাচরিত আন্তর্জাতিক নীতিপদ্ধতি খেলাফ হইবার দোহাই দিয়া মৃত ব্যক্তিদিগের জন্য হযরতের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া বসিল। হযরত এই দাবী

www.pathagar.com

স্বীকার করিয়া লইলেন। দুইজন বনি-আমির প্রাণহানির জন্য রক্তপণ বাবদ উপযুক্ত অর্থ ও তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী তিনি বনি-আমির নেতাকে পাঠাইয়া দিলেন।

বীরমাউনার হত্যাকাণ্ড শুধু যে বনি-আমিরদিগের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল তাহা নহে; বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরাও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল হযরত ইহা জানিতে পারিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা গোত্রের ইহুদীরা হযরতের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না বা কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিবে না। বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীদিগের নিকট হইতেও হযরত সেইরূপ একটি সন্ধির দাবী করিলেন। বনি-নাজিরগণ তখন শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হযরতকে বলিয়া পাঠাইল : "সন্ধিপত্রের আর কী প্রয়োজন? ধর্ম লইয়াই যখন আমাদের মধ্যে গণ্ডগোল তখন এক কাজ করুন; আমরা আমাদের মধ্য হইতে তিন জন ইহুদী পণ্ডিতকে মনোনীত করিয়া রাখিতেছি, আপনিও আপনার মনোনীত আর-দুইজন মুসলমান পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া সেখানে চলিয়া আসুন। ইসলামের সত্যতা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলেই আমরা মুসলমান হইয়া যাইব।" হযরত প্রথমে ইতস্তত করিলেন, কিন্তু সত্যপ্রচারক নবী পরে তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ধার্য দিনে দুইজন সাহাবীকে লইয়া গন্তব্য স্থানের দিকে তিনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সেখানে পৌছিতেই ইহুদীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিলেন। ইহুদীরা হযরতকে হত্যা করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। হযরত তাহা উপযুক্ত সময়ে জানিতে পারায় ইহুদীদিগের সেই হীন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। হযরত মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া জনৈক দূতের মারফৎ বনি-নাজিরদিগের অনতিবিলম্বে মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইবার চরমপত্র প্রদান করিলেন। ইহুদীরা ইহাতে দমিয়া গেল। দেশত্যাগ করিবে বলিয়াই তাহারা প্রথমে মনস্থ করিল। কিন্তু আবদুল্লাহ্-বিন্-উবাই ও নেজ্দের বনি-আমির প্রমুখ বিভিন্ন মরুগোত্রের সাহায্য পাইবার ভরসায় তাহারা বাঁকিয়া বসিল। হযরতকে তাহারা বলিয়া পাঠাইল : "আমরা তোমার আদেশ মানি না, তুমি যাহা পার কর।" এই বলিয়া তাহারা নিজেদের দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইল।

অবিলম্বে হযরত একদল মুসলিম সৈন্যকে বনি-নাজিরদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বীরবর আলি ইহার অধিনায়ক হইলেন। মুসলিমগণ বনি-নাজিরদিগের দুর্গ অবরোধ করিলেন। কয়েকদিন একভাবে কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহুদীদিগের স্বপ্ন সফল হইল না। আব্দুল্লাহ্-বিন-উবাই অথবা বনি-আমিরগণ কেহই কোন সাহায্য পাঠাইল না। তিন সপ্তাহ এরূপভাবে কাটিয়া যাবার পর ইহুদীরা প্রমাদ গণিল। তাহাদের রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিল। তখন তাহারা হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া প্রস্তাব করিল : "দয়া করিয়া আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন না; আমরা দেশত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

এহেন দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদিগকে হাতের মুঠার ভিতরে পাইয়াও হযরত কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন না। তিনি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। শুধু এই শর্তটি জুড়িয়া দিলেন : নগর ত্যাগের সময় তাহারা কোন অস্ত্রপাতি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেনা।

www.pathagar.com

ঠিক তাহাই হইল। বনি-নাজিরগণ তাহাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া মদিনা ছাড়িয়া চলিল। যাইবার সময় ধন-দৌলত, মণি-মাণিক্য ও আসবাবপত্র যাহা ছিল—সমস্তই সঙ্গে লইয়া গেল; এমন কি দরজা-জানালাগুলি পর্যন্ত উটের পিঠে চাপাইয়া দিল। মুসলমানগণ ইহাতে কোন আপত্তিও করিলেন না, বাধাও দিলেন না।

ইহুদীরা সিরিয়ার দিকে চলিয়া গেল।

বনি-নাজিরদিগকে বিতাড়িত করিবার ফলে মুসলমানদিগের অনেক সুবিধা হইল। ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সরাইয়া দেওয়ায় কোরেশদিগের অসুবিধা ঘটিল। যে-শক্তি ভিতরে ভিতরে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িল। সাধারণের চক্ষে মুসলমানদিগের প্রতিপত্তিও অনেক বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদিগের পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেদের অধিকারে আসায় তাঁহারা বেশ লাভবান হইলেন। সমর- কৌশলের দিক দিয়া এই বহিঃষ্করণ খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

পঞ্চম হিযরীর দুই-একটি ঘটনাও ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঠক জানেন : মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপে সমগ্র আরবদেশ আকণ্ঠ ডুবিয়া ছিল। হযরত ধীরে ধীরে তাঁহার শিষ্যবৃন্দের নৈতিক জীবনকে ক্লেশমুক্ত করিতেছিলেন। হযরত দেখিলেন, কোন মাদকদ্রব্যের অভ্যাস একদিনে দূর হওয়া অসম্ভব। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও তাহাই বলে। কোন আফিমখোরকে বা মদখোরকে যদি হঠাৎ বলা যায়, তুমি আজ হইতে নেশা করা বন্ধ কর, তবে তাহার স্বাস্থ্যের উপর একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। এই মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া হযরত প্রথমত: শিষ্যদিগকে বলিয়া দিলেন : তোমরা মদ্যপান করিও না; উহা শয়তানের কাজ। ইহাই বলিয়া তিনি তাহাদের বিবেক ও প্রবৃত্তির মধ্যে একটা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। কিছুকাল পরে তিনি আদেশ করিলেন : "মদ যাহারা পরিত্যাগ করিয়াছ ভাল, যাহারা করিতে পার নাই, তাহারা এইটুকু যেন কর যে, নেশার ঘোরে যেন নামায না পড়।" শরাব-খোরেরা এইবার একটু মুশকিলেই পড়িল। ভোর হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত প্রত্যেককে পাঁচবার করিয়া নামায পড়িতেই হয়; তাহার মধ্যে মদ্যপান করিবার অবসর কোথায়? নেশা কাটিতে না কাটিতেই নামাযের ওয়াক্ত আসিয়া পড়ে। কাজেই সারাদিনমান তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই পবিত্র থাকিতে হয়। এইরূপে প্রবৃত্তির তাড়নাকে অনেকখানি সংযত ও সংহত করিয়া আনিবার পর হযরত একদিন আল্লাহ্‌র এই কঠোর বাণী সকলকে শুনাইয়া দিলেন : "মদ্যপান হারাম।" এইবার সকলে এই পাপকে সহজেই বর্জন করিতে পারিল। সেই হইতে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য মুসলমানদিগের নিকট হারাম হইয়া গেল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৪

আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক–দান

এই সময় ব্যক্তিগত জীবনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। জায়েদের স্ত্রী জয়নবকে তিনি বিবাহ করেন। জয়নব ছিলেন তাঁহারই ফুফাত বোন। হযরত ইচ্ছা করিয়াই জয়নবকে জায়েদের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয় নাই। জয়নবের মনে উচ্চবংশের গর্ব ও অভিমান ছিল; কাজেই ক্রীতদাস স্বামীর সংসর্গ কোনদিনই তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত পয়গম্বরের সহধর্মিণী হইবার জন্য পূর্ব হইতেই তাঁহার মনে দুর্দমনীয় সাধ জাগিয়াছিল। জায়েদ এই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া জয়নবকে তালাক দেন। জয়নব তখন তাঁহার অভিপ্রায় হযরতকে জানান। জয়নবের সাধ পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং জায়েদও হযরতকে অনুরোধ করেন। হযরত প্রথমত রাজী হন নাই। আপন পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা জায়েজ কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন না। কাজেই তিনি আল্লাহ্‌র আদেশের অপেক্ষা করিতে থাকেন। তখন কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয় :

"তুমি যে–স্ত্রীকে তোমার মায়ের মত বলিয়া বর্জন কর আল্লাহ্ তাহাকে সত্যই তোমার মা করেন নাই, অথবা যাহাকে তুমি আপন পুত্র বলিয়া ঘোষণা কর, তাহাকেও তোমার প্রকৃত পুত্র করেন নাই : এ–সমস্ত তোমার মুখের কথা মাত্র। পালিত পুত্রগণ তাহাদের আপন পিতার নামে পরিচিত হউক–ইহাই আল্লাহ্‌র কাছে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত।"

হযরত তখন জয়নবকে নিঃসঙ্কোচে বিবাহ করিলেন। মৌখিক সম্বন্ধকে অস্বীকার করিয়া মুসলমানেরা যে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, এই আদর্শ প্রদর্শনই এই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য।[১]

জননী আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক–দানও এই হিযরীর অন্যতম প্রধান ঘটনা। মক্কার নিকটবর্তী বনি–মুস্তালিক গোত্র মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া হযরত তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। হযরত যখন নিজে কোন অভিযানে যোগদান করিতেন তখন কোন না কোন স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এই অভিযানকালে তিনি বিবি আয়েশাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। চতুর্থ হিযরীতে পর্দা–প্রথার প্রবর্তন হওয়ায় বিবিগণ আর পূর্বের ন্যায় লোকচক্ষুর সম্মুখে বাহির হইতেন না। একটি স্বতন্ত্র উটে বস্ত্রাচ্ছাদিত সওয়ারীতে বিবি আয়েশা স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র শিবিরের ব্যবস্থা ছিল।

মুস্তালিকদিগকে দমন করিয়া হযরত সদলবলে মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। এক মন্‌জিল পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সকলে রাত্রিপ্রবাস করিতেছিলেন। শেষরাত্রে সকলে যখন পুনরায় যাত্রা শুরু করিবেন, এমন সময় বিবি আয়েশা স্বভাবের তাকিদে আপন সওয়ারী হইতে অবতরণপূর্বক একটু আড়ালে যাইতে বাধ্য হন। প্রয়োজন শেষে ফিরিয়া আসিয়া যখন নিজ সওয়ারীতে যাইবেন, তখন দেখেন যে তাঁহার গলার হার

---

১ . এই সম্বন্ধে কোরআনের 'আল আহজাব' সূরার ৩৭ আয়াত দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছেন। তাড়াতাড়ি হার খুঁজিয়া আনিবার জন্য পুনরায় তিনি পূর্বস্থানে ফিরিয়া যান। এদিকে বিবি আয়েশা ফিরিয়া আসিয়াছেন ভাবিয়া পর্দাবৃত সওয়ারীখানি উটের পিঠে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বিবি আয়েশা ক্ষীণকায়া ছিলেন, সওয়ারী বাহকগণ তাই বুঝিতে পারে নাই যে তিনি উহার ভিতরে আছেন কি না। সওয়ারী বাঁধা হইয়া গেলে সকলে পুনরায় যাত্রা শুরু করিলেন।

এদিকে বিবি আয়েশা আসিয়া দেখেন কাফেলা চলিয়া গিয়াছে। চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নিজকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তিনি সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এ- ভুল শীঘ্রই ধরা পড়িবে এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য হযরত একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন। উদ্বেগের মধ্য দিয়া রাত্রি প্রভাত হইল, এমন সময় সাফওয়ান নামক জনৈক সাহাবী সেইখানে উপস্থিত হইলেন। অভিযাত্রীগণ ভুলক্রমে কোন কিছু ফেলিয়া আসিলে তাহা কুড়াইয়া আনিবার জন্যই এইরূপ এক-একজন সমঝদার লোককে সবার পিছনে আসিবার নিয়ম ছিল। সাফওয়ান বিবি আয়েশাকে পূর্ব হইতেই চিনিতেন। হযরতের স্ত্রীকে এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। হযরতের অসাক্ষাতে তাঁহার বিবির সহিত কথোপকথন করাও তিনি বেয়াদবী মনে করিলেন, অথচ তাঁহাকে এরূপভাবে এখানে ফেলিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাঁহার উটের উপর বিবি আয়েশাকে সওয়ার হইতে বলিলেন। আয়েশা পর্দাবৃত অবস্থায় তাহাই করিলেন। তখন সাফওয়ান উটের লাগাম ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়া তিনি কাফেলার সহিত মিলিত হইলেন। বিবি আয়েশাকে এইরূপভাবে উটে চড়িয়া আসিতে দেখিয়া সকলে অবাক হইলেন। হযরত নিজেও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তখন সাফওয়ান সব কথা খুলিয়া বলিলে সকলে শান্ত হইলেন।

ব্যাপারটা সেখানেই মিটিয়া যাইবার কথা কিন্তু তাহা হইল না। হযরতের শত্রুগণ এবং মুনাফিক প্রকৃতির দুই-একজন মুসলমান ইহাই লইয়া কানাঘুষা আরম্ভ করিল। বিবি আয়েশার চরিত্রের উপর তাহারা কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। অবশেষে হযরতের কর্ণেও ইহা পৌঁছিল। তিনিও বিচলিত না হইয়া পারিলেন না। বিবি আয়েশার চরিত্রের স্বচ্ছতা ও নিষ্কলঙ্কতা সম্বন্ধে হযরতের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি জনমতকে উপেক্ষা করিতে পারেন না। নিন্দুকের মুখকে কে বন্ধ করিয়া রাখিবে? আরব-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। কুৎসার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া সে যুগে সহজ ছিল না। অপরের স্ত্রী হইলেও একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি কি করিতে পারেন? তিনি যদি নির্বিচারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তবে লোকে বলিবে : নিজের স্ত্রী কি-না, তাই হযরত খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এই শ্রেণীর অভিজ্ঞতা তাঁহার জীবনে এই প্রথম। কত মানুষের পারিবারিক জীবন যে এই সব কারণে তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠে, কত সোনার সংসার যে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়, হযরত ইহা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিলেন। আয়েশার চরিত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াও তিনি মানসিক দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলেন না।

বাহিরে যে কুৎসিত কানাকানি চলিতেছে, হযরত সে কথা বিবি আয়েশাকে জানিতে দিলেন না। পাছে তাঁহার কোমল অন্তরে আঘাত লাগে, এজন্য তিনি তাঁহাকে

www.pathagar.com

কোনরূপ প্রশ্ন পর্যন্ত করিলেন না। শুদ্ধচারিণী পূতচরিত্রা নারীর পক্ষে স্বামীর বিন্দুমাত্র সন্দেহও অসহনীয়। হযরত তাই বিবি আয়েশার সূক্ষ্ম অনুভূতিতে কোনরূপ আঘাত দিয়া তাঁহার সম্ভ্রম ও মর্যাদার হানি করিলেন না।

কিন্তু হযরতের মনের দ্বন্দ্ব বুদ্ধিমতী আয়েশার নিকট চাপা রহিল না; হযরত যে পূর্বের ন্যায় তাঁহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহেন না, হাসেন না, সব সময়ে বিমর্ষভাবে থাকেন, একটা অন্তর্বিপ্লব যে তাঁহার মধ্যে চলিতেছে, এ সত্য আয়েশা ধরিয়া ফেলিলেন। হযরতের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন কেন দেখা দিল, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই সময়ে একদিন রাত্রিকালে বিবি আয়েশা প্রয়োজনবশত বরিরা নাম্নী একজন সহচরীর সহিত বাহিরে যান। যাইতে যাইতে আপন ওড়না পায়ে জড়াইয়া গিয়া বরিরা পড়িয়া যান। তখন তিনি ক্রুদ্ধস্বরে আপন পুত্র মিস্‌তাহ্‌-বিন্‌-উসামাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন : "মিস্‌তাহ্‌ নিপাত যাউক!" বিবি আয়েশা বিস্মিত হইয়া বলিলেন : "আপন পুত্র সম্বন্ধে কেন এত অভিশাপ দিতেছ?" বরিরা বলিলেন : "তুমি জান না, এই শয়তানটা তোমার নামে কি ভীষণ কুৎসা রটনা করিয়াছে।" বিবি আয়েশা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বরিরা তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। বজ্রাহতের ন্যায় আয়েশা মুষড়িয়া পড়িলেন। হযরতের ভাবান্তরের কারণ এইখানে মিলিল।

আয়েশা পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র তিনি কেবলই কাঁদেন, কেবলই ভাবেন। একে ত তিনি নিরপরাধিনী, তাহাতে আবার পয়গম্বরের সহধর্মিণী। এই নিদারুণ আঘাত কেমন করিয়া তিনি সহ্য করিবেন?

বিবি আয়েশা ভাবিলেন : বাহিরের লোকে যাহা বলুক, স্বয়ং হযরতও কি এ কথা বিশ্বাস করিলেন? তিনিও কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করেন? নিশ্চয়ই করেন, নতুবা তিনি প্রাণ খুলিয়া আমার সহিত কথা বলেন না কেন? হাসেন না কেন? তাঁহার ব্যবহারে সে অকপট আন্তরিকতা দেখি না কেন? যদি তাই হয়, তবে আমার জীবনে ধিক!

এই ধরনের শত দুশ্চিন্তা আসিয়া আয়েশার মনে ভিড় জমাইল। হযরতের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

কুৎসা-রটনাকারীদিগের মধ্যে হাস্‌সান-বিন্‌-সাবেত, মিস্‌তাহ্‌-বিন্‌-উসামা এবং হামনা-বিন্‌তে-জহশ-এই তিনজনই অগ্রণী ছিলেন। হাস্‌সান ছিলেন কবি, মিস্‌তাহ্‌ ছিলেন 'বদরী'[২] এবং হাম্‌না ছিলেন হযরতের স্ত্রী জয়নবের ভাগিনী। হযরতের পত্নীদিগের মধ্যে রূপলাবণ্যে বিবি আয়েশার পরেই ছিল জয়নবের স্থান। জয়নবের ভগিনী হাম্‌না তাই এ সুযোগে আয়েশাকে স্থানচ্যুত করিয়া আপন বহিনকে গৌরবান্বিত করিবার মতলব করিয়াছিলেন। একদিন জয়নবকে তিনি বলিলেন : "এই সুযোগ কেন ছাড়িতেছ? তুমিও আয়েশার নামে হযরতের কাছে খানিকটা কুৎসা গাও না?" কিন্তু জয়নবের অন্তঃকরণ ছিল উচ্চ ও মহৎ। তিনি বলিলেন, "আয়েশাও আমার

---

২. যে সমস্ত যোদ্ধা বদর-যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'বদরী' বলা হইত। তখনকার দিনে ইহা গৌরবজনক পদবী বলিয়া পরিগণিত হইত।

www.pathagar.com

বোন, সে-ও ত নারী। না জানিয়া শুনিয়া কেন তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কদান করিব? আদর্শ সপত্নীর যোগ্য কথাই বটে!

বিবি আয়েশা পিত্রালয়ে গমন করায় অবস্থা আরও খারাপ হইল : লোকের মনে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল।

এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে হযরত প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশ আশা করিতেছিলেন। কিন্তু কোন 'অহি' এ পর্যন্ত নাযিল হইল না। একদিকে আল্লাহ্‌র এই নীরবতা, অপরদিকে গীবৎকারীদিগের অবাধ কুৎসা রটনা-ইহার মধ্যে পড়িয়া হযরত সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। কি করিবেন তিনি? শত্রুগণ বাহির হইতে কলঙ্কের শর হানিয়া আপন প্রিয়তমা স্ত্রীর অন্তর বিদ্ধ করিবে, অথচ স্বামী হইয়া তিনি তাহার কোনই প্রতিকার করিবেন না, দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে এই দৃশ্য দেখিবেন, এই ভীরুতাও ত তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মস্‌জিদে গিয়া মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া সমবেত সাহাবাদিগকে বলিলেন : "আমি বুঝিতে পারি না। আমার বংশের উপর অযথা কালিমা লেপন করিয়া লোকেরা কি সুখ পায়। তোমরা সাফওয়ানকে ভালরূপেই চেন, আমি তাহাকে অতি সচ্চরিত্র বলিয়াই জানি ভাল ছাড়া তাহার মধ্যে কোন কিছু মন্দ দেখি নাই, তবে কেন এই অন্যায় কুৎসা রটনা?"

হযরতের এই কথায় আউস- গোত্রের নেতা উসায়েদ অতিমাত্রায় সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন : "হযরত, অনুমতি দিন, যাহারা এই জঘন্য মিথ্যা প্রচার করিতেছে, তাহাদিগকে গর্দান মারি।" কুৎসাকারীদের অধিকাংশই ছিল খাজরাজ-বংশীয়; কাজেই উসায়েদের এই আস্ফালন ও ভীতি-প্রদর্শন খাজরাজদিগের মনঃপূত হইল না। তাহারাও ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তখন ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে, মনে হইতে লাগিল, আউস ও খাজরাজ বংশের পূর্বশত্রুতা বুঝিবা আবার গজাইয়া উঠে। হযরত অতি কষ্টে এই বিবাদ মিটাইয়া দিলেন।

অতঃপর তিনি আবুবকরের গৃহে উপস্থিত হইয়া আলি, ওসমান ও ওমরের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিলেন।

হযরত বলিলেন : "তোমরা এ-সম্বন্ধে কি মনে কর?"

ওমর বলিলেন : "হযরত, এ-অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক।"

হযরত তখন ওসমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন : " তোমার মত কি?"

ওসমান বলিলেন : "আমারও ঐ একই মত।"

হযরত অতঃপর আলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "আলি, তুমি কি বল?"

আলি বলিলেন : "নিশ্চয়ই ইহা মিথ্যা কথা।"

এইরূপে সকলেই এই অপবাদ সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তবে আলি হযরতকে অধিকতর নিশ্চিত হইবার জন্য আয়েশার দাসীকেও আয়েশা সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পরামর্শ দিলেন। তৎক্ষণাৎ আয়েশার দাসীকে ডাকা হইল। দাসী বলিল : "বিবি আয়েশার চরিত্রে আমি কোনদিন কোন দোষত্রুটি দেখি নাই। একদিন মাত্র একটি দোষ তিনি করিয়াছিলেন যে, ময়দার খামির করিয়া আমি তাঁহাকে রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিলাম; কিন্তু আয়েশা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই সুযোগে কয়েকটি বকরী আসিয়া তাহা খাইয়া গিয়াছিল।"

www.pathagar.com

হযরত অবশেষে বিবি আয়েশার প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। আয়েশা কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছিলেন। আয়েশার জননী কন্যার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শুধুই তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন : "মা, কাঁদিও না; আল্লাহ্‌র উপর সবর দিয়া থাকো, নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন।" কিন্তু আয়েশার ব্যথিত হৃদয় কিছুতেই শান্ত হইত না: কুসুমের অন্তরে কীট প্রবেশ করিলে যেমন সে শুকাইয়া যায়, বিবি আয়েশাও দিন দিন তেমনি করিয়া দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন।

হযরত আয়েশার কামরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন : "আয়েশা লোকে তোমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। যদি এই ব্যাপারে তুমি কোনরূপে দোষী থাকো, আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করিবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।" বিবি আয়েশা হযরতের এই কথায় অন্তরে আরও আঘাত পাইলেন। এ-কথার অন্তরালে যে একটা সন্দেহের কালো ছায়া লুকাইয়া আছে, বিবি আয়েশার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি দেখিলেন, স্বামীর মনেও সন্দেহ জাগিয়াছে। তাই তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে এবং বেদনায় তাঁহার মুখে কোন কথা সরিল না। মাতাপিতাকে ডাকিয়া তিনি অতি কষ্টে বলিলেন : "আপনারা উত্তর দিন না?" কিন্তু আবুবকর এবং তাঁহার স্ত্রীও বিষণ্ন মুখে নীরব হইয়া রহিলেন। কী-ই বা বলিবেন তাঁহারা? তখন বাধ্য হইয়া বিবি আয়েশা বলিলেন : "ইয়া-রসুলুল্লাহ্‌ আমি ভাল করিয়া কোরআন শরীফ পড়ি নাই। আমি ছেলেমানুষ, আমার জ্ঞান এখনও পরিপক্ক নহে, তবু আমি আপনার কথার তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝিতে পারিতেছি। আল্লাহ্‌র কসম, এই ব্যাপারে আমি আল্লাহ্‌র নিকট অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা চাহিব না, কারণ আমি জানি আমি নির্দোষ। দোষ করিয়া দোষ অস্বীকার করা যেমন অন্যায়, দোষ না করিয়া দোষ স্বীকার করা ঠিক তেমনই অন্যায়। ইহাতে আমি মিথ্যাচারিণী হইব, কারণ আল্লাহ্‌ জানিতেছেন, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। পক্ষান্তরে এরূপভাবে ক্ষমা চাহিলে লোকের নিকট আমার মর্যাদা বাড়িবে না। সকলে মনে করিবে দোষ সত্যই করিয়াছিলাম, পরে ক্ষমা চাহিয়া রেহাই পাইয়াছি। আবার যদি বলি যে, আমি মোটেই দোষ করি নাই, তাহাও কেহ বিশ্বাস করিবে না। কাজেই আমি এখন সম্পূর্ণ নিরুপায় ও নিঃসহায়। আমি কিছুই বলিতে চাহি না; ইউসুফের পিতা[৩] বিপদে পড়িয়া যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি শুধু সেই কথাই আজ বলি-আমি ধৈর্য ধরিয়া থাকিব, একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার ভরসা।"

কথাগুলি যেন অন্তরের কোন্‌ অতল গহন হইতে গৈরিক নিঃস্রাবের মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কী তার তেজ, কী তার প্রচণ্ড গতি, কী তার অপরূপ ভঙ্গিমা! এই বলদৃপ্ত উত্তর শুনিয়া হযরত মুগ্ধ হইলেন। ইহার পর তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। এই সময় অহি নাযিল হইবার সমস্ত লক্ষণ হযরতের মধ্যে প্রকাশ পাইল। তাড়াতাড়ি তিনি শুইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছদিত করিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। মুহূর্ত মধ্যে আয়েশার ভাগ্যে আল্লাহ্‌র কোন্‌ বিধান নামিয়া আসে কে জানে! একটা সঙ্গিন মুহূর্তের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা আবেগ-কম্পিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিবি আয়েশা তখনও নির্বিকার। তাঁহার মনে কোন ভয় নাই-সন্দেহ নাই;

---

৩. হযরত ইয়াকুবের নাম তাড়াতাড়িতে মনে না পড়ায় এইরূপ বলিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ কোনরূপেই যে তাঁহাকে অপদস্থ করিবেন না, এই স্থির বিশ্বাসে তিনি একেবারে নির্ভীক ও অটল।

ক্ষণকাল পরে হযরত আত্মস্থ হইয়া উঠিলেন : "আয়েশা, তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ্ তোমাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।"

আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী তখন আনন্দে অধীর হইয়া আয়েশাকে বলিলেন, "আয়েশা, যাও যাও। হযরতের নিকট শুকরিয়া আদায় কর।"

বিবি আয়েশা অধিকতর দৃপ্তকণ্ঠে অভিমানিনীর মত বলিয়া উঠিলেন : "কিছুতেই না। হযরত আমাকে কি সাহায্য করিয়াছেন যে, আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইব? তিনি ত কুৎসাকারীদের দলেই আছেন। তাহাদের কথাই ত তিনি বিশ্বাস করিয়াছেন; আমার সপক্ষে ত কিছু করেন নাই। আমার এই চরম বিপদে যদি কেহ সাহায্য করিয়া থাকেন, তবে সে একমাত্র আল্লাহ্—রহমানুর রাহিম আল্লাহ্। আমি তাঁহারই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব—হযরতের নিকট নহে।"

হযরত এ-কথায় মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ লোকদিগের নিকট উপনীত হইয়া আল্লাহর এই বাণী ঘোষণা করিলেন :

"যাহারা সম্ভ্রান্ত ঘরের স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে কুৎসা রটনা করে এবং চারিটি প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে না পারে, তাহাদিগকে আশিটি দোররা মারিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে না, কারণ তাহারা সীমালঙ্ঘনকারী।"

(২৪ : ৪)

"নিশ্চয়ই যাহারা (বিবি আয়েশার) এই মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছে, তাহারা তোমারই দলভুক্ত লোক। ইহাকে তুমি অশুভ বলিয়া মনে করিও না, পরন্তু ইহার মধ্যে তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। অপবাদকারীদের প্রত্যেকে তাহাদের কার্যের জন্য যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিবে, যে সর্বাপেক্ষা এই কার্যে আগ্রহশীল, তাহাকে গুরুতর শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে।" (২৪ : ১১)

কোরআনের এই বিধান অনুযায়ী হাস্‌সান এবং মিস্‌তাহ্‌কে ৮০টি দোররা মারা হইল। এমন কি জয়নবের ভগিনী (হযরতের শালিকা) হাম্‌নাকেও রেহাই দেওয়া হইলনা।

বিবি আয়েশার সহিত সুচরিত্র সাফওয়ানও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিলেন। আয়েশার নিষ্কৃতির পর তিনিও দোষমুক্ত হইলেন। কিন্তু কুৎসাকারীদিগের উপর হইতে তাঁহার আক্রোশ দূর হইল না। কবি হাস্‌সানকে তিনি ত গুরুতররূপে আহত করিয়াই ছাড়িলেন। এদিকে আবুবকরও কসম খাইয়া বসিলেন : মিস্‌তাহ্‌কে তিনি আর কোনরূপে সাহায্য করিবেন না। মিস্‌তাহ্ আবুবকরেরই আশ্রিত ও প্রতিপাল্য ছিলেন।

কিন্তু এ-সম্বন্ধে এমন কয়েকটি আয়াত নাযিল হইল, যাহা দ্বারা বুঝা যায় ব্যাপারটি আগাগোড়াই একটা উদ্দেশ্যমূলক আদর্শ-সৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নহে। আমরা নিম্নে এই আয়াতগুলি উদ্ধৃত করিলাম :

"হে বিশ্বাসী পুরুষ এবং বিশ্বাসী নারীগণ, তোমরা যখন এই কুৎসাকাহিনী শুনিলে, তখন আপনার জনদিগের কথা মনে করিয়া কেন বলিলে না যে, ইহা সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা?"

www.pathagar.com

"এবং যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না থাকিত এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁহার করুণাই না প্রকাশ পাইত, তবে তোমরা (বিবি আয়েশার সম্বন্ধে) যে সব (কুৎসিত) আলোচনায় যোগ দিয়াছিলে, তাহার জন্য নিশ্চয়ই তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইত।"

"তোমরা এমন বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিলে যাহার সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জানিতে না; তোমাদের কাছে বিষয়টি খুব হালকা মনে হইয়াছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে উহা গুরুতর ছিল।"

"এবং যখন তোমরা উহা শুনিলে তখন কেন বলিলে না যে, এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা আমাদের সাজে না, সমস্ত গৌরব আল্লাহ্‌র, নিশ্চয়ই ইহা একটি মস্ত বড় অপবাদ?"

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তবে ভবিষ্যতে যেন এরূপ কার্য আর না কর।" (২৪ : ১২-১৭)

আবুবকর সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিলেন :

"এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহারা যেন তাহাদের আশ্রিতজনকে, দরিদ্রদিগকে এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে পালাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা না করে; তাহাদের উচিত সকলকে ক্ষমা করা এবং (প্রতিজ্ঞা হইতে) ফিরিয়া দাঁড়ান; আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন, ইহাই কি পছন্দ কর না? আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (২৪ : ২২)

আয়াতগুলি নাযিল হইবার পর হযরত সকলকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাঁহাদের সহিত সম্প্রীতি স্থাপন করিলেন। আবুবকরও তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া পুনরায় এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন, ততদিন কোন অবস্থাতেই মিস্‌তাহ্‌কে সাহায্য করিতে ভুলিবেন না।

এই ঘটনাটি সম্বন্ধে পাঠকের কিরূপ মনে হয়? আল্লাহ্‌র প্রিয় নবী কেন এই নিগ্রহ ভোগ করিলেন? হযরত ও তাঁহার পরিবারবর্গ (আহলে বায়েত) চির-পবিত্র। সর্বপ্রকার কলুষতা হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত। এরূপ হওয়া সত্ত্বেও সতীসাধ্বী আয়েশার নসিবে কেন এই লাঞ্ছনা ঘটিল? বিবি আয়েশা কেনই বা এরূপভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, হযরত কেনই বা তাহা জানিতে পারিলেন না? জিব্রাইল ফেরেশ্‌তাও ত তাঁহাকে এই মারাত্মক ভুলের কথা জানাইয়া দিতে পারিতেন। তারপর মাসাধিককাল এই ঘটনাটি লইয়া মদিনায় বেশ একটা শোরগোল চলিল, অথচ আল্লাহ্ একদম নীরব হইয়া রহিলেন, কোন অহি নাযিল করিলেন না। ইহারই বা হেতু কি? আবার, যদিও আয়াত নাযিল হইল, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : "মুহম্মদ, ইহাকে অশুভ বলিয়া মনে করিও না। ইহার মধ্যে তোমার জন্য প্রচুর কল্যাণ নিহিত আছে।" ইহারই বা তাৎপর্য কি?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস : লীলাময় আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতেই সমস্ত কিছু সংঘটিত হইয়াছে। হযরত যখন আমাদের সর্ব অবস্থার আদর্শ, তখন তাঁহার জীবনে নব নব সমস্যা-সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। নূতন নূতন অবস্থায় ফেলিয়া আল্লাহ্ তাঁহার রসূলকে দিয়া নূতন নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আলোচ্য ঘটনাটি সেই শ্রেণীর। ইহা পূর্ব পরিকল্পিত এবং উদ্দেশ্যমূলক। সেই উদ্দেশ্যটি কি? তাহা এই :

www.pathagar.com

দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার উপরেই পারিবারিক সুখ ও সামাজিক শৃঙ্খল নির্ভর করে। প্রত্যেক মানুষ চায়-তাহার পারিবারিক জীবন যৌনকলঙ্ক হইতে মুক্ত থাকুক। কিন্তু ঘটনাচক্রে এমন হয় যে, কলঙ্কের হাত হইতে অনেক সময় রেহাই পাওয়া যায় না। দোষ করিলে ত কলঙ্ক রটেই, অনেক সময় সন্দেহ করিয়াও লোকে নানা কথা বলে। তখন নারীর দুর্ভোগই হয় পুরুষের চেয়ে বেশী। পুরুষ দোষ করিলেও সহজে দণ্ডনীয় হয় না; কিন্তু নারীর যদি একবার পদস্খলন হয়; অথবা যদি কোনরূপে তাহার চরিত্রে একবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়, তবে আর রক্ষা নাই। সমাজের সমস্ত নৈতিক নিষ্ঠা ও ন্যায়বোধ তখনই জাগিয়া উঠে, ফলে নারীকে করিতে হয় ভীষণ শাস্তি ভোগ। গৃহে বা সমাজে তখন আর তাহার মর্যাদা থাকে না। প্রতি পরিবারে, প্রতি সমাজে এই অপ্রীতিকর ঘটনা কোন- না কোন সময় ঘটেই। এইরূপ গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে পড়িলে মানুষকে কি করা উচিত? এই সমস্যার সমাধানই হইতেছে এই ঘটনার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আনুপূর্বিক সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিলে মনে হয় আল্লাহ্ ইচ্ছা করিয়াই এই ঘটনা সংঘটিত করিয়াছিলেন এবং ধীরে ধীরে ইহাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছিলেন। সতীসাধ্বী স্ত্রীর নামে কুৎসা রটিলে স্বামীর প্রাণে কিরূপ দাবানল জ্বলিয়া উঠে, কিরূপ তিনি মানসিক অশান্তি ভোগ করেন, হযরত তাহা আপন প্রাণে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নিরপরাধিনী নারীর অন্তরে এইরূপ মিথ্যা অপবাদ কিরূপ শেল বিদ্ধ করে, কিরূপভাবে তিনি কাতর হইয়া পড়েন, তাহার নিদর্শন পাই আমরা জননী আয়েশার মধ্যে। সাধারণ সমাজ এসব ঘটনাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করে এবং কিরূপ করিয়া তাহাদের মনে খেলা করে, তাহারও দৃষ্টান্ত পাই মদিনাবাসীদিগের আচরণে। সমাজমনের সত্যই একখানি সুন্দর আলেখ্য এ।

পূর্বেই বলিয়াছি বিশ্বনবী আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ-প্রদর্শক। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে আমরা তাঁহার নিকট হইতে আলো পাইতে পারি। এ ব্যাপারেও তিনি আমাদের সম্মুখে চিরন্তন আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন।

মহাত্মা রামচন্দ্র লোকাপবাদের ভয়ে অথবা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিরপরাধিনী সতীসাধ্বী সীতাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় পড়িয়া হযরত মুহম্মদ তাহা করেন নাই। কলঙ্ক ভয়ে তিনি বিচলিত হন নাই। নিজের স্বার্থের চিন্তা না করিয়া নিঃসহায়া নারীর স্বার্থের কথাই তিনি বেশী করিয়া চিন্তা করিয়াছেন। ধৈর্যের সহিত ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আয়েশা সম্পূর্ণ নিরপরাধ তখন সমস্ত লোকভয় উপেক্ষা করিয়া তিনি আয়েশার সহিত মিলিত হইলেন। নারীর প্রতি কতখানি সম্ভ্রম ও সমবেদনার পরিচয় এ! অসীম মনোবলসম্পন্ন সত্যাশ্রয়ী আদর্শ পুরুষ না হইলে কেহ এরূপ করিতে পারে না।

এই ঘটনার পর হইতে বহু অকল্যাণের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আমরা আমাদের মা বোনকে সম্ভ্রম করিতে শিখিয়াছি, মর্যাদা দিতে শিখিয়াছি, অমূলক সন্দেহের বশবর্তী হইয়া বিনা বিচারে আমরা তাঁহাদিগকে আর লাঞ্ছিত করিতেছি না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির ভয়ে আমরা পূর্বের ন্যায় অবলীলাক্রমে কোন নারী-চরিত্রের উপর কুৎসা-কালিমাও প্রক্ষেপ করিতেছি না। এইজন্য আল্লাহ্ তাঁহার প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছেন : "মুহম্মদ, এই ঘটনাকে তুমি অশুভ বলিয়া মনে করিও না, ইহার

www.pathagar.com

মধ্যে তোমার জন্য বিশেষ কল্যাণ নিহিত আছে।" এ কল্যাণ যে কোথায় এবং কিরূপভাবে ঘটিতেছে, পাঠক তাহা নিশ্চয়ই এখন বুঝিতে পারিতেছেন।

এই সঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় : বিবি আয়েশার চরিত্রবল। পুণ্যময়ী সতীসাধ্বী নারীর তিনি একটি জ্বলন্ত আদর্শ। পরিত্যক্ত অবস্থায় বিপদে পড়িয়া তিনি সাফওয়ানের উটে চড়িয়া আসিতে কোনই দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিপদের দিনে নারীর এরূপ সৎসাহস ও মনোবলের নিতান্ত প্রয়োজন। তারপর মদিনায় আসিয়া যখন তিনি লোকমুখে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কথা জানিতে পারিলেন, তখনও তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না; অথবা আত্মহত্যা করিবার দুর্বলতাও দেখাইলেন না। দারুণ অভিমানে তিনি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। অবশেষে হযরত যখন তাঁহাকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন তখন যে নির্ভীক তেজস্বিতার পরিচয় তিনি দিলেন তাহার তুলনা নাই। পরীক্ষা যত কঠোর হইতে লাগিল ততই তিনি তাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিলেন। হযরতের উপদেশমত তিনি যদি সত্যই আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন, তবে এই কথাই স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রমাণিত হইত যে, বিবি আয়েশার নিশ্চয়ই কিছু না-কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল; তাই তওবা করিয়া তিনি রেহাই পাইয়াছেন। লোকে বলুক-না-বলুক হযরত তাহামনে করুন বা না করুন, আপন বিবেকের কাছে এবং সমাজের কাছে তিনি নিশ্চয়ই ছোট হইয়া যাইতেন। তাই এতটুকু সূক্ষ্ম দাগও আয়েশার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন : "আমি এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাহিতে রাজি নই।" কতখানি নৈতিক বল থাকিলে এরূপ উত্তর দেয়া যায়, পাঠক তাহা চিন্তা করুন। একে ত লোকচক্ষুর সম্মুখে কলঙ্কভাগিনী, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় একে ত শীর্ণকায়া, স্বামীর সহিত পুনর্মিলনে একে ত তিনি উৎকণ্ঠিতা, সর্বোপরি নিজের নিষ্কলঙ্কতা প্রমাণ করিবার জন্য একে ত তিনি উদ্বিগ্না, তাহার উপর আবার স্বামীর এই অনুরোধ। সে স্বামীও অন্যা কেহ নহেন-পয়গম্বর। আর সে অনুরোধ অন্য কিছু নহে-আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অনুরোধ। কিন্তু হইলে কি হয়। এই সূক্ষ্ম স্থানের মধ্যেও যে তাঁহার চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত রহিয়াছে। সারা পথ তরী বাহিয়া শেষকালে কি ঘাটে আসিয়া তাঁহার ভরাডুবি হইবে? কিছুতেই না। বিবি আয়েশা ক্ষমা চাহিলেন না। আপন মর্যাদা ষোল আনা আদায় না করিয়া তিনি ছাড়িলেন না। মলিনতার একটা সূক্ষ্ম বিন্দুও তাঁহার চোখ এড়াইয়া গেল না। এই কঠোরতম পরীক্ষার ফলাফল দেখিবার পর আল্লাহ্ আর নীরব থাকিতে পারেন কি? অমনি আয়াত নাযিল করিয়া তিনি সব সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন।

তারপর ? তারপর আসিল ধন্যবাদের পালা। আবুবকর ও তাঁহার স্ত্রী বলিলেন : "আয়েশা, যাও হযরতকে ধন্যবাদ দাও, তাঁহাকে আলিঙ্গন কর।" কিন্তু আয়েশার চরিত্রের জ্যোতিঃ তখনও জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। অভিমানের সুরে তিনি বলিলেন : 'হযরতকে কেন ধন্যবাদ দিব? তিনি আমার কি উপকার করিয়াছেন ? কোন্ সাহায্য করিয়াছেন? তিনি বরং কুৎসাকারীদিগের দলে আছেন। একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, কাজেই সকল ধন্যবাদ আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।"

এ আদর্শের তুলনা নাই। পুরুষ এবং নারীর চিরন্তন একটি দ্বন্দ্ব ও সমস্যার উজ্জ্বল চিত্র এ।

ধন্য হযরত মুহম্মদ, ধন্য বিবি আয়েশা—বিশ্বমানুষের কল্যাণের জন্য যাঁহারা এতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৫

খন্দক–যুদ্ধ

ওহদ–যুদ্ধের শেষে আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল : পর বৎসর বদর–প্রান্তরে আবার তাহারা মুসলমানদিগের সহিত শক্তি–পরীক্ষা করিবে। কিন্তু ঐ আস্ফালন কার্যে পরিণত হইল না। আবু সুফিয়ান দেখিল ওরূপভাবে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। ধর্ম ও আদর্শের জন্য যাহারা দেশ ত্যাগ করিতে পারে, স্ত্রী–পুত্র বর্জন করিতে পারে, পিতা হইয়া পুত্রের গলায় ছোরা চালায়, পুত্র হইয়া পিতাকে হত্যা করে, তাহারা যে যুদ্ধক্ষেত্রে কত ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়, সে প্রমাণ বদরে ও ওহদে তাহারা লাভ করিয়াছে। কাজেই এখন কোন নূতন প্রচেষ্টা করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও শক্তিশালী অভিযানের প্রয়োজন। এই কথা ভাবিয়া আবু সুফিয়ান সমগ্র আরবময় একটা বিদ্রোহ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইল।

কিন্তু এত আস্ফালনের পর বদরে না গেলেও ত আবু সুফিয়ানের মুখ থাকে না। আরব–চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই : যাহা বলিবে, তাহা করিবেই; না করিলে তাহা নিছক কাপুরুষতা বলিয়া গণ্য হইবে। নির্দিষ্ট সময়ে যদি মুসলমানগণ বদরে আসিয়া পৌঁছে, আর কোরেশদিগকে না দেখিতে পায়, তবে সকলে বলিবে : আবু সুফিয়ান ভয় পাইয়া আসে নাই। কাজেই মুসলমানগণ যাহাতে এবার আর বদরে না আসে, সেই চেষ্টা করাই আবু সুফিয়ান কর্তব্য বলিয়া মনে করিল। নঈম নামক জনৈক নিরপেক্ষ লোককে হাত করিয়া সে তাহাকে মদিনায় পাঠাইয়া দিল। নঈম মদিনায় গিয়া প্রকাশ করিল : "আবু সুফিয়ান এবার আরও বিপুল ও বিরাটভাবে রণসজ্জা করিয়া বদরে অগ্রসর হইতেছে; সুতরাং তোমরা এবার আর বদরে যাইও না।" এই সংবাদে হযরত মোটেই বিচলিত হইলেন না। যথাসময়ে তিনি ১৫০০ মুসলিম গাজীকে সঙ্গে লইয়া বদরে উপনীত হইলেন। আট দিন পর্যন্ত তিনি তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কোরেশদিগের কোনই সাড়াশব্দ পাইলেন না। তখন বাধ্য হইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। লোকে দেখিল, মুসলমানগণ একটুও দমে নাই, বরং তাহাদের শক্তি ও সাহস আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

ইহার পর প্রায় একটি বৎসর একরূপ নির্বিঘ্নেই কাটিয়া গেল। আবু সুফিয়ান ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিল। কিন্তু কোরেশদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে বাকী রহিল না। একটা ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও আয়োজন যে চলিতেছে, হযরত তাহা বুঝিতে পারিলেন। সেজন্য তিনিও প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ভিতরে শত্রু, বাহিরে শত্রু, যে–কোন মুহূর্তে যে কোন বিপদ ঘটিতে পারে; কাজেই তিনি একটা স্থায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন। তিন হাজার মুসলিম বীর এই সেনাদলে যোগ দিলেন।

এক বৎসর ধরিয়া আবু সুফিয়ান আরবের সর্বত্র সৈন্যসংগ্রহ ও বিদ্রোহ সৃষ্টির ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিয়া সফলকাম হইল। মরুভূমির মধ্যে যে সমস্ত স্বাধীন বেদুঈন জাতি বাস করিত, তাহারা কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল। তাহা ছাড়া ইহুদীরাও এবার প্রকাশ্যে ও সমবেতভাবে কোরেশদিগকে সাহায্য করিতে লাগিল। নির্বাসিত বনি–নাজির গোত্রের হয়াই প্রমুখ ইহুদীরাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিল। মক্কায়

www.pathagar.com

গিয়া কোরেশদিগকে তাহারা উৎসাহিত করিতে লাগিল এবং অন্যান্য স্থানেও প্রচারকার্য দ্বারা তাহারা সকলকে সংঘবদ্ধ করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্বে বনি-কোরাইজা গোত্রের ইহুদীদিগের সহিত হযরত একটি সন্ধি করিয়াছিলেন। বনি-নাজিরগণের চক্রান্তে তাহারাও সে-সন্ধি ভঙ্গ করিয়া গোপনে গোপনে কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল। এইরূপে কোরেশ, ইহুদী, বেদুঈন ও অন্যান্য পৌত্তলিক গোত্র একসঙ্গে মিলিয়া এবার মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল।

যথাসময়ে মদিনায় এই সংবাদ পৌঁছিল। হযরত বিশিষ্ট সাহাবাদিগকে লইয়া পরামর্শ করিলেন। সিদ্ধান্ত করা হইল : এবার কিছুতেই মদিনার বাহিরে যাওয়া হইবে না। শুধু তাহাই নহে, এক সম্পূর্ণ নূতন যুদ্ধপদ্ধতিরও পরিকল্পনা তিনি করিলেন। সাল্‌মান ফারসী নামক জনৈক পারস্যবাসী মুসলমান নগরের চারিপাশে গভীর পরিখা খনন করিবার পরামর্শ দিলেন। এই পরিকল্পনা হযরতের খুবই পছন্দ হইল। তিনি পরিখা খনন করিতে প্রস্তুত হইলেন। যুদ্ধের এইরূপ প্রক্রিয়া আরববাসীরা কোনদিন শোনেও নাই দেখেও নাই। সকলে বিস্ময় মানিল।

অনতিবিলম্বে মুসলমানগণ এই পুর-পরিখা খনন-কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মদিনার পশ্চাদ্দিকে আল্‌ওয়া পর্বত অবস্থিত; কাজেই সেদিকটা একরূপ সুরক্ষিত ছিল। অন্য তিন দিকেরও সর্বত্র পরিখা খননের প্রয়োজন বোধ হয় নাই; দুর্গ ও প্রাচীর দ্বারা কোন কোন স্থান পূর্ব সুরক্ষিত ছিল। যে-সমস্ত স্থান উন্মুক্ত ছিল, সেই সমস্ত স্থানেই খনন-কার্য আরম্ভ করিলেন এবং সেই সমস্ত মাটি ফেলিয়া খাদের ভিতরকার পার্শ্ব উঁচু করিয়া বাঁধিয়া তুলিতে লাগিলেন। সেই সুউচ্চ প্রাচীরের উপর বড় বড় প্রস্তর-খণ্ড রাখিয়া দেওয়া হইল; উদ্দেশ্য : সময়কালে সেগুলিকে শত্রুদের মাথায় নিক্ষেপ করা চলিবে। এক সপ্তাহের অক্লান্ত চেষ্টায় এই বিরাট কার্য সম্পন্ন হইল। প্রায় দশ হাত গভীর, দশ হাত প্রস্থ এবং ছয় হাজার হাত দীর্ঘ পরিখা প্রস্তুত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, হযরত নিজেও এই পরিখা খনন-কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দুই লাইন কবিতা রচনা করিয়া একটা বিশিষ্ট ছন্দে এবং সুরে তাহা গান করতেন এবং সাহাবারা তাহারই তালে তালে অপূর্ব উন্মাদনায় মাটি কাটিয়া যাইতেন। কবিতার চরণ দুইটি এই :

"লা খাইরা ইল্লাল খাইরান্ আখিরা : ।
আল্লাহুমা আর্‌হামান্ আন্‌সারা-
ও মুহাযিরা : ।

অর্থাৎ

আখিরের শুভ ছাড়া শুভ নাহি আর।
আন্‌সার-মুহাযিরের আল্লাহ্ মদদ্‌গার।।

অপূর্ব এই দৃশ্য! দীন্ ও দুনিয়ার বাদশাহ্ কুলি-মজুর সাজিয়া ধূলিধূসরিত দেহে দেশরক্ষায় আত্মনিয়োজিত। এক মহান প্রেরণায় আজ সবাই উদ্বুদ্ধ। এই স্বদেশ-এই পাকভূমি তাঁহাদের রক্ষা করিতেই হইবে। এই স্বদেশের সঙ্গে তাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নসাধ বিজড়িত। এর প্রতি ধূলিকণা নূরে নূরে উদ্ভাসিত। ইহাকে কি বিধর্মীদের হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়? কখনই না।

www.pathagar.com

মদিনার মুসলিম নরনারী প্রস্তুত। যেমন করিয়া হউক-মদিনাকে রক্ষা করিতেই হইবে-এই তাহাদের দৃঢ় সংকল্প।

দ্রুতগতিতে সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়া গেল। মহিলা ও শিশুদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ একটি দুর্গে সরাইয়া দেওয়া হইল। পরিখার পার্শ্ববর্তী বাসিন্দাদিগকেও স্থানান্তরিত করা হইল। উপযুক্ত রসদপত্রের ব্যবস্থা পূর্বেই করা হইয়াছিল।

বনি-কোরাইজাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিতে পারিয়া হযরত আউস এবং খাজ্‌রাজ বংশের দুইজন প্রবীণ ব্যক্তিকে তাহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "এ কী শুনিতেছি? তোমরা নাকি সন্ধি ভাঙিয়া কোরেশদিগের সঙ্গে যোগ দিয়াছ? ইহুদীরা উদ্ধতস্বরে উত্তর দিল : "দিয়াছি তাই কী? তোমাদের কোন কথা আমরা শুনিতে চাই না। কে তোমাদের মুহম্মদ? কে তোমাদের রসুল? মানি না আমরা তাহাকে। যাও।"

ইহুদীদিগের এই জঘন্য আচরণে হযরত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন হইলেন। ইহারা যে সময়কালে মুসলমানদিগকে এমন বিপদে ফেলিবে তাহা তিনি ভাবিতেই পারেন নাই। মদিনার উপকণ্ঠে যে-দিকটায় তাহাদের বাস, সেই দিকটাই অপেক্ষাকৃত অরক্ষিত ছিল। কাজেই তিনি আশঙ্কা করিলেন, যুদ্ধকালে এই দিক দিয়া বিপদ আসিতে পারে। প্রকৃত ব্যাপারও ছিল তাই। কোরেশগণ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, মুসলমানগণ যখন তাহাদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিবে, তখন ইহুদীরা তাহাদের মহল্লা হইতে বাহির হইয়া মুসলমানদিগের ঘরবাড়ি আক্রমণ করিবে। হযরত কালবিলম্ব না করিয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেন। তিন হাজার সৈন্যের মধ্য হইতে পাঁচ শতকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন এবং দুইজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে তাহাদিগকে স্থাপন করিয়া ইহুদী-পল্লীর চতুর্দিকে টহল দিবার আদেশ দিলেন। মুসলমানগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া দিবারাত্র ইহুদী মহল্লার চারিপাশে কুচকাওয়াজ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এবং মুহর্মুহ তকবীর-ধ্বনিতে গগন-পবন প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইহুদীরা খুব ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা আর নিজেদের মহল্লা ছাড়িয়া বাহির হইতে সাহস করিল না। এদিকে হযরত আড়াই হাজার সৈন্য লইয়া পরিখা-বেষ্টিত মুক্ত প্রান্তরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবু সুফিয়ান মহাআড়ম্বরে মদিনার পানে অগ্রসর হইতে লাগিল। দশ হাজার সৈন্যের বিরাট অভিযান সে! অগণিত অশ্ব, অগণিত উট, অগণিত লোক-লস্কর ও রসদ-সম্ভার। এই বিপুল অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মাত্র আড়াই হাজার মুসলিম! জীবন-মরণ সমস্যার আজ তাঁহারা সম্মুখীন। তাঁহাদের নসীবে কী আছে, কে জানে? কিন্তু তবু মুখে কোন ভয়ভীতির চিহ্নমাত্র নাই। সকলের মুখে সেই একই নির্ভরতার বাণী : আল্লাহ্‌ই আমাদের যথেষ্ট।

আবু সুফিয়ান প্রথমত ওহদ-প্রান্তরে আসিয়া ডেরা ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল মুসলমানগণ পূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দিবে। কিন্তু যখন সে দেখিল, মুসলিম সৈন্যের নাম-নিশানাও সেখানে নাই, তখন অধিকতর উৎসাহিত হইয়া মদিনা অবরোধের জন্য সে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু মদিনার উপকণ্ঠে আসিয়াই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কী! পরিখা! এমন ব্যাপার তাহারা কখনও কল্পনা করে নাই। কী করিয়া এই পরিখা পার হওয়া যায়? পরিখা-প্রাচীরের উপরে তীরন্দাজ

www.pathagar.com

সৈন্য দণ্ডায়মান; অগণিত প্রস্তরখণ্ড সেখানে সুবিন্যস্ত। কোররেশগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানেই তাঁবু ফেলিল। বসিয়া বসিয়াই তাহারা দিন গুজরান করিতে লাগিল। কী যে করিবে, ভাবিয়াই পাইল না।

প্রথমত তাহারা কয়েকদিন দূর হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া দেখিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। তখন নিরূপায় হইয়া তাহারা সমবেত আক্রমণ দ্বারা পরিখা-প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিতে মনস্থ করিল। বহু চেষ্টা করিবার পর তাহারা একটি দুর্বল স্থান দেখিয়া সেইখানে ক্ষিপ্রভাবে আক্রমণ করিল। আবু যহলের পুত্র ইকরামা তাহার অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া এই স্থানের অবরোধ ভেদ করিয়া একটা পথ প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। সেই পথ দিয়া আমর নামক জনৈক কোরেশীবীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া মুসলমানদিগকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিল। মহাবীর আলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া আমরের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুহূর্ত মধ্যেই 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে গগন-পবন কাঁপাইয়া তুলিয়া আলি বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলে বুঝিতে পারিল, আমর নিহত হইয়াছে।

ইহার পর নওফেল নামক আর একজন কোরেশবীরও আলির হস্তে নিহত হইল। কোরেশগণ ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। সেদিনকার মত যুদ্ধ এইখানেই শেষ হইল।

রাত্রি আসিল। মুসলমানগণ সারারাত্রি জাগিয়া পরিখা পাহারা দিতে লাগিলেন।

পরদিন ভোরবেলা কোরেশগণ সমুদয় সৈন্য লইয়া পরিখা আক্রমণ করিল। খালিদ ও ইকরামা তাহাদের অশ্বারোহীদল লইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল। কখনও বা একযোগে, কখনও বা দলে দলে কোরেশগণ আক্রমণ চালাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না পরিখা-প্রাচীর কিছুতেই তাঁহারা ভেদ করিতে পারিল না। এইরূপে দ্বিতীয় দিনের চেষ্টাও তাহাদের ব্যর্থ হইল।

এদিকে বনি-কোরাইজাগণও কোরেশদিগের নিরাশ করিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে তাহারা মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। তখন আবু সুফিয়ান তাহাদের নিকট লোক পাঠাইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ইহুদীরা বলিল ঃ "আজ আমাদের sabbath বা উপাসনার দিন, কাজেই আমরা কোন মতেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।" এই বিশ্বাসঘাতকতার দরুন কোরেশগণ ইহুদীদিগের উপর মহাখাপ্পা হইয়া পড়িল।

শীতের রাত। উন্মুক্ত প্রান্তর। রসদপত্রও ফুরাইয়া আসিয়াছে। প্রতিদিন দশ হাজার লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম কথা নহে। আবু সুফিয়ান ভাবিয়াছিল, দুই-একদিনের মধ্যেই তাহারা মদিনা জয় করিয়া আসিবে; কিন্তু দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবু কিছুই হইল না। তখন সকলে মহাদুর্ভাবনায় পড়িল। অবরোধ তুলিয়া তাহারা ফিরিয়া যাইবার মতলব করিল।

কিন্তু ফিরিতে চাহিলেই ফিরা যায় না। দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধের পর সন্ধ্যাবেলা কোরেশগণ যখন শিবিরে আশ্রয় লইল, তখন আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে ভীষণ মরুঝটিকা উত্থিত হইয়া কোরেশদিগের সমুদয় ছাউনি উড়াইয়া লইয়া গেল। মুষলধারে বৃষ্টিপাতও আরম্ভ হইল। শিবিরের আগুন নিভিয়া গেল। রসদপত্র ও অন্যান্য উপকরণও ভাঙিয়া-চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। কোরেশদিগের দুর্গতির সীমা রহিল না। আল্লাহ্‌র গজব যেন তাহাদের উপর মূর্তি ধরিয়া

www.pathagar.com

নামিয়া আসিল। ভীত-ত্রস্ত ও দিশাহারা হইয়া কোরেশগণ সেই রাত্রেই মদিনা পরিত্যাগ করিয়া তাড়াতাড়ি মক্কার পথ ধরিল।

পরদিন ভোরবেলা দেখা গেল, ময়দান একদম সাফ। কোরেশদিগের নামগন্ধও নাই, আছে শুধু তাহাদের সকরুণ স্মৃতি, ছিন্ন শিবির, ভগ্ন আসবাবপত্র এবং নির্বাপিত অগ্নিকুণ্ডের সিক্ত ভগ্নস্তূপ।

একটি রজনীর এপারে-ওপারে কত পার্থক্য-কত পরিবর্তন। কাল যেখানে জাহান্নামের আগুন জ্বলিতেছিল, আজ সেখানে বেহেশ্‌তের স্নিগ্ধ বারিধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। কাল যেখানে মিথ্যা ও ভয়ঙ্করের অভিনয় চলিতেছিল, আজ সেখানে সত্য ও সুন্দরের মাহফিল বসিয়াছে। এই অচিন্ত্য পটপরিবর্তন কে করিল? কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে এমন হইল? কার কুদরৎ এ। মুসলমানগণ ভাবেন আর ক্রমেই আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। কৃতজ্ঞতায় তাঁহাদের অন্তর ভরিয়া যায়।

কোরেশদিগের পরিত্যক্ত আসবাবপত্র লুণ্ঠন করিবার জন্য এইবার আর কোন মুসলমানই পরিখা হইতে বাহির হইলেন না। ওহুদের মারাত্মক ভুলের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে গাঁথা ছিল। শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়া তাই এইবার আর তাঁহাদের একটুও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিল না।

কোরেশগণ সত্যই ফিরিয়া যাইতেছে কিনা, অথবা ইহা তাহাদের রণকৌশল মাত্র, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হযরত একজন গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, কোরেশগণ সত্যই মক্কায় ফিরিয়া যাইতেছে।

হযরত যখন নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন, তখন সকলকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। পথপ্রান্তর আবার বিজয়-নিনাদে মুখরিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু হযরত বসিয়া থাকিলেন না। বনি- কোরাইজাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা তিনি ভুলেন নাই। তাহারা যে গোপনে গোপনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, এ কথাও তিনি জানিতে পারিলেন। এহেন মুনাফিকদের দ্বারা দুনিয়ায় কী মহা অনর্থই না ঘটিতে পারে! ইহারা কথা দিয়া কথা রাখে না, সন্ধি করিয়া সন্ধি মানে না! সমাজের আবেষ্টনীর মধ্যে ইহারা সর্পের মত বাস করে; কখন কাহাকে দংশন করে, কে জানে! ইহারা সমাজের শত্রু। ইহারা ক্ষমার অযোগ্য।

যুদ্ধের দারুণ ক্লান্তি তখনও মুসলমানদিগের দেহমনে লাগিয়া আছে, এমন সময় পুনরায় হযরতের আহ্বান আসিল : "প্রস্তুত হও বনি কোরাইজাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইবে।"

আবার বীর দল পরিত্যক্ত অস্ত্র তুলিয়া লইলেন, আবার তাঁহাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হইল। বিশাল পতাকা উড়াইয়া 'শেরে খোদা' আলি চলিলেন অগ্রে অগ্রে; তাঁহারই পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন তিন হাজার গাজী—মুখে তাঁহাদের তৌহিদের কলেমা, হাতে তাহাদের নাঙ্গা তলোয়ার।

মুসলমানগণ বনি-কোরাইজাদিগের দুর্গ ও বসতি অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। ইহুদীরা কখনও স্বপ্নে ভাবিতে পারে নাই, এত শীঘ্র তাহাদের দুয়ারে এই বিপদ ঘনাইয়া আসিবে। নিরুপায় হইয়া তাহারা দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল।

www.pathagar.com

কিন্তু এইরূপভাবে কয়দিন চলে? ইহুদীদিগের আর কষ্টের অবধি রহিল না। প্রায় দুই সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকিবার পর তাহারা হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইল। দূত মারফৎ তাহারা হযরতের নিকট বলিয়া পাঠাইল : হযরত যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করেন, তবে বনি-কাইনোকা ও বনি -নাজিরদিগের ন্যায় তাহারাও দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু হযরত এবার এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে অত সহজে ক্ষমা করিতে চাহিলেন না। পূর্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বুঝিয়াছিলেন, অপরাধীকে সব সময় ক্ষমা করাও এক নৈতিক অপরাধ। ন্যায়নীতি এবং বৃহত্তর মানব-কল্যাণের জন্য দুর্বৃত্তদের সমুচিত দণ্ডবিধানেরও প্রয়োজন আছে। বনি-কাইনোকা ও বনি-নাজিরদিগকে রক্ষা করিয়া তিনি যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছেন; তাই এইবার তিনি ইহুদীদিগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। সকলকে বন্দী করিবার জন্য তিনি হুকুম দিলেন।

ইহুদীদিগের মনে খুব ভয় হইল। তাহারা বুঝিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে। তখন নিতান্ত নিরাশ হইয়া তাহারা আউস-গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের শরণাপন্ন হইল। ইসলাম গ্রহণ করিবার পূর্বে এই আউস-গোত্রের সহিত ইহুদীদিগের খুব মাখামাখি ও বাধ্যবাধকতা ছিল। ইহুদীরা মনে করিল, আউসগণ নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি এখন একটু সহানুভূতি দেখাইবে। তাই তাহারা প্রস্তাব করিল : আউস-গোত্রের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উপর তাহাদের বিচারভার ন্যস্ত করা হইক; তিনি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, ইহুদীরা তাহাই মানিয়া লইবে।

হযরতও তাহাতে রাজি হইলেন।

তখন ইহুদীদিগের ইচ্ছানুসারে আউস-গোত্রের খ্যাতনামা প্রধান পুরুষ সা'দ-বিন্' মা'জ এই বিচারের জন্য মনোনীত হইলেন।

কিন্তু সা'দের তখন শোচনীয় অবস্থা। খন্দক-যুদ্ধে মুসলমানগণ যদি কিছু হারাইয়া থাকেন, তবে এই উজ্জ্বল রত্নটিকে হারাইয়াছেন। যুদ্ধকালে তিনি শোচনীয়ভাবে আহত হওয়ায় শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে মদিনার মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এইখানে হযরত যুদ্ধে আহত মুসলমান বীরদিগের চিকিৎসার ও সেবাযত্নের জন্য পূর্ব হইতেই একটি হাসপাতাল খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এইখানে সা'দ শয্যাশায়ী ছিলেন। হযরত বাধ্য হইয়া সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সা'দকে অতিকষ্টে একটি খাটিয়ায় বহন করিয়া লইয়া আসা হইল। তখন হযরত বলিলেন : ইহুদীরা তোমাকে বিচারক নিযুক্ত করিয়াছে। তুমি যে দণ্ডবিধান করিবে, তাহাই তাহারা মানিয়া লইবে। আমিও তাহা মানিতে রাজী আছি।"

সা'দ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আসিবার কালে সারা পথ আউস গোত্রের অন্যান্য মুসলমানগণও ইহুদীদিগের উপর সদয় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট সুপারিশ করিয়াছিলেন। ইহুদীদিগের সহিত আউস গোত্রের সৌহার্দ্যের পূর্বস্মৃতিও তাঁহার মনে জাগিতেছিল। কিন্তু হইলে কী হয়! সেই খাতিরে ত তিনি পক্ষাপাতিত্ব করিতে পারেন না। মরণ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া কেমন করিয়া তিনি ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিবেন? করিলে তাঁহাকেও যে জবাবদিহি করিতে হইবে। অপক্ষপাত বিচার তাঁহাকে করিতেই হইবে, তাহাতে যে যাহা বলে বলুক। ইহাই ভাবিয়া সা'দ তাঁহার মনকে দৃঢ় করিলেন।

www.pathagar.com

তখনকার দৃশ্য বাস্তবিকই বড় করুণ! বন্দী ইহুদীগণ একপার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে, অন্যপার্শ্বে হযরত ও তাঁহার সাহাবাগণ দাঁড়াইয়া আছেন। আশা-নিরাশার আলো-আধাঁরে ইহুদীদিগের ভাগ্য দোল খাইয়া ফিরিতেছে। স্তব্ধ প্রকৃতি এই অভিশপ্তদিগের শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য যেন নীরবে অপেক্ষা করিতেছে।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সা'দ ঘোষণা করিলেন : "ইহুদীদিগের ধর্মগ্রন্থ তওরাতে লেখা আছে : কোন দলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সন্ধির জন্য আহ্বান কর, যদি তাহারা সে আহ্বানে কর্ণপাত করে এবং সন্ধি করিতে রাজী হয়, তবে তাহাদিগকে করদ মিত্ররূপে গ্রহণ কর; যদি তাহারা না শুনে, তবে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, যুদ্ধে তাহারা পরাজিত হইলে তাহাদের পুরুষদিগকে হত্যা কর, স্ত্রীপুত্র ও বালক-বালিকাদিগকে দাস-দাসীরূপে ব্যবহার কর, এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লও। [১] সেই শাস্ত্রবিধান অনুসারেই আমি এই রায় দিতেছি যে মুসলমানদিগের সহিত সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার দরুন সমুদয় ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইবে, স্ত্রীলোক এবং বালক-বালিকাগণ দাস-দাসীরূপে পরিগণিত হইবে এবং ইহুদীদিগের সমস্ত সম্পত্তি মুসলিম সৈন্যদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।"

রায় শুনিয়া ইহুদীরা নিরাশ হইয়া পড়িল; মুখে তাহাদের কথা সরিল না। ম্লানমুখে তাহারা এই দণ্ডাদেশ গ্রহণ করিল। মৃত্যুর কালো ছায়া হতভাগ্যদিগের চোখেমুখে ঘনাইয়া আসিল। নিজেদের ধর্মশাস্ত্রেই যখন এই ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন তাহারা ইহাকে অন্যায়ও বলিতে পারিল না। তাহাদের ভাগ্যে যে এই বিড়ম্বনা ঘটিবে কে জানিত!

সা'দের এই বিচার কোনক্রমেই অসঙ্গত হয় নাই। এইরূপ অপরাধে চিরদিন গুরুদণ্ডই হইয়া থাকে। আধুনিক যুগেও রাষ্ট্রবৈরী ষড়যন্ত্রকারীদিগের ইহা অপেক্ষা লঘুদণ্ড হয় না। সোভিয়েট রাশিয়াই তাহার প্রমাণ। অনেক ক্ষেত্রে বিনাবিচারেই শত্রুদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইয়া থাকে বা আটক রাখা হইয়া থাকে। তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই অনেক স্থানে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হয়। এইক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, হযরত নিজে ইহুদীদিগের বিচার করেন নাই; ইহুদীদিগের মনোনীত ব্যক্তির হস্তেই

---

১. তাওরাত গ্রন্থে এইরূপ লেখা আছে :

"When thou comest night unto a city of fight against it, then preclaim peace unto it.

And it shall be, if it make thee answer of peace and open unto thee than it shall be that all the people that is found therein shall be tributaries unto thee and they shall serve thee.

And if it will make no peace with thee, but will make war against thee then thou shalt besiege it.

And when the Lord thy God hath delivered it unto thine hands, thou shalt smite every male there of with the edge of the sword.

But the women and the little ones and the cattle all that is in the city, even all the spoil there of shalt thou take unto thyself, and thou shalt eat the spoil of thine enemies which the Lord thy God hath given thee."

(Deut : 20 : 10—11)

www.pathagar.com

তাহাদের বিচারভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এতখানি অধিকার নিশ্চয়ই কোন অপরাধীকে কোথাও দেওয়া হয় না–এই উন্নত ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগেও না। সা'দ যদি ইহুদীদিগকে সম্পূর্ণ মুক্তিও দিতেন, তবু হযরত তাহাই নির্বিবাদে মানিয়া লইতে বাধ্য ছিলেন। কাজেই, সেই সম্বন্ধে ইহুদীদিগের পক্ষ হইতে কোন কিছুই আর বলিবার নাই।

রায় অনুসারে ইহুদী পুরুষদিগের প্রাণদণ্ড হইল। নারী ও পুত্রকন্যারা যুদ্ধলব্ধ দাস-দাসীরূপে পরিগণিত হইল। সমস্ত সম্পত্তি সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু হইলে কি হয়! বিচার ন্যায্য হইল বটে, কিন্তু ইহার কঠোরতা হযরতের প্রাণকে স্পর্শ করিল। দেশের আইনে যাহাই বলুক, স্বাধীন মানুষকে কেমন করিয়া তিনি দাস-দাসীতে পরিণত করিবেন? হাজার হইলেও ইহুদীরাও ত মানুষ। মানুষের পাপ ও দুষ্কৃতিকে হযরত ঘৃণা করিতে পারেন কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করেন না। অথচ ঘটনাচক্রে আজ তাহাই প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। হযরত কিছুতেই ইহা বরদাশ্‌ত্‌ করিতে পারিলেন না। মানবতার এই গুরু লাঞ্ছনায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দিনীদিগের মধ্য হইতে 'রায়হানা' নাম্নী জনৈকা ইহুদী ললনাকে বিবাহ করিয়া নিজের পরিবারভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে সমগ্র ইহুদী সমাজ লাঞ্ছনা ও অমর্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ক্রীতদাসীকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়া তিনি মানব-প্রেমের এক নব আদর্শ সৃষ্টি করিলেন। সমগ্র ইহুদী সমাজ বুঝিল : রাজনৈতিক কারণে ইহুদী বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড হইলেও, হযরত জাতিগতভাবে ইহুদীদিগকে ঘৃণা করেন না। ক্রীতদাসীরাও হযরতের এই কার্যে বিস্ময় মানিল। মুক্ত নারীদিগের ন্যায় তাহাদেরও যে পয়গম্বর-গৃহিণী হইবার অধিকার আছে, এই কথা তাহারা এই প্রথম উপলব্ধি করিল। কোন যুদ্ধ-বন্দিনী ক্রীতদাসীকে এতখানি মর্যাদা ইহার পূর্বে আর কেহ দিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৬

ষষ্ঠ হিযরীর কয়েকটি ঘটনা

ইহুদীদিগের বিচারকার্য শেষ হইবার পর সা'দকে ধরাধরি করিয়া গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাপিত হইয়া আসিয়াছিল। এই ঘটনার কয়েক দিন পরেই তিনি জান্নাতলোকে প্রস্থান করিলেন।

খন্দক-যুদ্ধের ফলাফল কী দাঁড়াইল? আসুন পাঠক, এই সুযোগে তাহা একবার দেখিয়া লই। এই যুদ্ধকেই ইসলামের চূড়ান্ত যুদ্ধ বলা যাইতে পারে। এই যুদ্ধে কোরেশগণ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ পাইল যে, ইসলামের গতি দুর্নিবার। তিন তিনবার তাহারা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। তিন তিনবারই বিফলমনোরথ হইয়াছে। বদরে তাহারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে: ওহদে তাহারা জয়লাভের পূর্ণ সুযোগ পাইয়াও মুসলমানদিকে পরাজিত করিতে পারে নাই; খন্দকে তাহারা আরবের সমস্ত শক্তি লইয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। শুধু কোরেশই বা বলি কেন? কোরেশ, ইহুদী, পৌত্তলিক ও বেদুঈন—সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিই বুঝিতে পারিয়াছে : মুহম্মদ অজেয়। খন্দক-যুদ্ধের পর তাই তাহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল, একটা হীনতা ও পরাজয়ের মনোভাব এইবার সকলকেই পাইয়া বসিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের বুকে নব বল ও নবপ্রেরণার সঞ্চার হইল। নির্ভীক উন্নত শিরে বিশ্বের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইলেন। কোন বাধাই যে তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না, সকল শত্রুই যে তাঁহাদের পদানত হইবে, ইসলাম যে সর্বত্র জয়যুক্ত হইবে—এই কথা এই যুদ্ধের পর হইতে তাঁহারা সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করিলেন। হযরতের মহিমা এবং মর্যাদাও পূর্বাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইল। একটা অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তুরূপে তিনি সকলের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

খন্দক-যুদ্ধের অবসানের পর ষষ্ঠ হিযরী আসিল। কয়েকটি ছোটখাটো অভিযান ছাড়া এই হিযরীতে উল্লেখযোগ্য আর কোন যুদ্ধ বিগ্রহই ঘটে নাই। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে রাযী-প্রান্তরে ১০ জন মুসলিম সাহাবা হোজায়েল বংশের দুই শত লোক দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইয়া শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন। সেই দুরাচারদিগের এইবার শায়েস্তা করিবার জন্য হযরত প্রস্তুত হইলেন। অনতিবিলম্বে তিনি ২০০ মুসলিম বীরকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাসভূমির দিকে যাত্রা করিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ পূর্ব হইতেই এই অভিযানের গন্ধ পাইয়া তাহাদের যথাসর্বস্ব লইয়া পার্বত্য অঞ্চলে পালাইয়া গিয়াছিল। কাজেই মুসলমানগণ ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে।

বিবি খাদিজার এক ভাগিনেয় ছিলেন, নাম তাঁহার আবুল আ'স। সম্ভ্রান্ত ও ধনী গৃহেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। খাদিজা আস'কে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। খাদিজার ইচ্ছা অনুসারেই হযরত আপন কন্যা জয়নবকে আ'সের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিবাহ হযরতের নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। রাসুলুল্লাহ্র নবুয়ত প্রাপ্তির পর বিবি খাদিজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্রকন্যারাও ইসলাম গ্রহণ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। কিন্তু আ'স ইসলাম গ্রহণ করিলেন না। অন্যান্য কোরেশদিগের ন্যায় তিনি পৌত্তলিকই রহিয়া গেলেন। কন্যা মুসলমান, জামাতা পৌত্তলিক। মহাসমস্যার সৃষ্টি হইল। হযরত ও বিবি খাদিজার মন ইহাতে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইলেও তাঁহারা কিন্তু কোনদিনই ইসলাম গ্রহণের জন্য জামাতার উপর পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না। অথবা জয়নবকে আ'সের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া আনিতেও চাহিলেন না। কোরেশগণ কিন্তু এই সুযোগে বেয়াড়া ব্যবহার আরম্ভ করিল। হযরতকে অধিকতর বিপন্ন করিবার জন্য তাহারা জয়নবকে তালাক দিয়া অন্য একটি কোরেশ কুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য আস'কে যথেষ্ট প্ররোচিত করিতে লাগিল। কিন্তু আ'স সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; মুসলিম স্ত্রী লইয়াই তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। জয়নবও অদ্ভুত মনোবল দেখাইলেন। হযরত যখন আপন পরিবারবর্গকে মদিনায় স্থানান্তরিত করিলেন, তখন জয়নব মদিনায় না গিয়া স্বামীর গৃহেই রহিয়া গেলেন। ঠিক এই অবস্থায় বদর-যুদ্ধে কোরেশদিগের সপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়া আ'স মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হন। বন্দীগণ মদিনায় আনীত হইলে অন্যান্য কোরেশ-বন্দীর ন্যায় তাঁহারও মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। তখন বিবি জয়নব মক্কা হইতে স্বামীর মুক্তিপণ বাবদ কিছু অর্থ ও একটি মূল্যবান স্বর্ণহার পাঠাইয়া দেন। এই হার বিবি খাদিজা জয়নবের বিবাহের সময় তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। হযরত সেই হার দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সাহাবাদিগকে বলিলেন : তোমাদের যদি অমত না থাকে, তবে আস'কে বিনাপণে মুক্তি দাও এবং হারও তাহাকে ফিরাইয়া দাও। সকল সাহাবাই ইহাতে সম্মত হইলেন। শুধু একটি শর্ত এই দেওয়া হইল যে, আ'স ফিরিয়া গিয়া জয়নবকে একবার মদিনায় পাঠাইয়া দিবেন। আ'স তাহাতেই রাযী হইলেন।

মক্কায় ফিরিয়া গিয়া আ'স তাঁহার ভ্রাতা কেনানার তত্ত্বাবধানে জয়নবকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবার আয়োজন করিলেন। কিন্তু একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই কতিপয় কোরেশ দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবু যহলের পুত্র ইকরামা ছিল ইহাদের দলপতি। জয়নব যে উটের পৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন, ইকরামা বর্শা দ্বারা সেই উটটিকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। জয়নব পড়িয়া গিয়া দারুণ আঘাত পাইলেন। ঠিক এই সময়ে আবু সুফিয়ান তথায় উপস্থিত হইয়া কেনানাকে বলিতে লাগিল : "দেখ কেনানা এইভাবে জয়নবকে মদিনায় পৌঁছিয়া দেওয়া তোমাদের খুবই অন্যায়। প্রকাশ্যভাবে যদি মুহম্মদের কন্যাকে আমরা যাইতে দিই তবে সকলে ভাবিবে আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। গোপনে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। "যাও, এখনকার মত মক্কায় ফিরিয়া যাও, তারপর অন্য ব্যবস্থা করিও।"

কেনানা তাহাই করিল। আ'সও ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেন। জয়নবকে পাঠান স্থগিত রাখা হইল। ইহার পরে জায়েদ আসিয়া জয়নবকে মদিনায় লইয়া গেলেন।

তিন বৎসর পর সেই আ'স সিরিয়া হইতে বাণিজ্য-কাফেলাসহ মক্কায় ফিরিবার পথে পুনরায় বন্দী অবস্থায় মদিনায় নীত হইলেন। এইবার আ'স গোপনে গোপনে স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জয়নবের মধ্যবর্তিতায় হযরত আ'সকে এবারও মুক্তি দিলেন। তাঁহার সমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্যও ফিরাইয়া দেওয়া হইল। আ'সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও মুক্তি পাইল। হযরতের এই সদয় ব্যবহার এবং ইহার অন্তরালে জয়নবের একনিষ্ঠ প্রেম বিফলে গেল না। আ'সের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইতে আরম্ভ করিল।

www.pathagar.com

মনে মনে তিনি তখনই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিলেন না। একটা কাপুরুষতার অনুভূতি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল এইদিকে হযরত বা জয়নবের দিক হইতে ইসলাম গ্রহণের জন্য আ'সের প্রতি কোন অনুরোধও আসিল না। আপন মর্যাদায় উভয় পক্ষই যেন অটল। আ'স তাই কিছুতেই মদিনার বুকে দাঁড়াইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সেইরূপ করিলে মক্কাবাসীরা তাঁহাকে কাপুরুষ মনে করিবে। তাই তিনি মক্কায় ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া প্রকাশ্যে ইসলামের মূল কালেমা ঘোষণা করিলেন। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই মদিনায় ফিরিয়া জয়নবের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। অকৃত্রিম ভালবাসা দিয়া এইরূপে স্ত্রী তাঁহার আপন স্বামীকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসিলেন।

দুঃখের বিষয়, জয়নব বেশীদিন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে পারেন নাই। উট হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন তাহাই তাঁহার কাল হইল। এক বৎসর পরেই তিনি ইন্তেকাল করিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৭
হোদায়বিয়ার সন্ধি

দীর্ঘ ছয় বৎসর হইল, মক্কার মুসলমানগণ স্বদেশ ছাড়িয়া মদিনায় আসিয়া বাস করিতেছেন। এই ছয় বৎসরের মধ্যে তাহারা একবারও স্বদেশের মুখ দেখিতে পান নাই, প্রিয় তীর্থ ভূমি কাবার সন্দর্শনও ঘটিয়া উঠে নাই। মদিনাবাসী মুসলমানেরাও কাবায় হজ করিবার জন্য কম লালায়িত ছিলেন না। আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের জন্য ইসলামের জন্য মুসলমানগণ যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়াছেন, অকাতরে নিজেদের জান ও মাল কুরবান করিয়া দিতেছেন, অথচ আল্লাহ্‌র ঘরের প্রতি এখনও তাঁহারা দৃষ্টি দিবার অবসর পান নাই। খন্দক-যুদ্ধের পর হইতে মুসলমানদিগের মনে সেই চিন্তা জাগিল। একদিন তাঁহারা হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হযরত, আমরা কি আর কাবা-শরীফে হজ করিতে পাইব না?"

এই কথাগুলির অন্তরালে মুসলমানদিগের অন্তরে যে গভীর বেদনা লুকাইয়া ছিল হযরত তাহা উপলব্ধি করিলেন। তাঁহার নিজেরও ত এই সম্বন্ধে উৎসাহ কম ছিল না। তাই তিনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন : "বিচলিত হইও না; আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।"

জিলকদ্ মাস আসিল আরবের পবিত্র মাসগুলির মধ্যে ইহা অন্যতম। এই পবিত্র মাসগুলিতে আরবরা কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ করিত না। মক্কার চতুঃসীমার মধ্যে এই সময় রক্তপাত একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। যে-কোন গোত্রের যে-কোন ধর্মের লোক আসিয়াই হজের সময় হজ করিয়া যাইতে পারিত। এই সুযোগে হযরত শিষ্যবৃন্দসহ মক্কায় হজ করিয়া আসিবার ইচ্ছা করিলেন। সকলকে ডাকিয়া বলিলেন : "এইবার হজ করিতে যাইতে হইবে; যাহারা যাইতে চাও, প্রস্তুত হও।" এই বলিয়া তিনি হজ-যাত্রার দিন স্থির করিয়া দিলেন

নির্দিষ্ট দিনে শিষ্যগণ প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। হযরত নিজেও গোসল করিয়া হজের পোশাক পরিধান করিলেন।

যথাসময়ে সকলে যাত্রা করিলেন। আল্-কাসোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া হযরত আগে আগে চলিলেন; পশ্চাতে ১৫০০ ভক্ত সাহাবী শান্তভাবে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। "লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! আমি হাযির, প্রভু হে, আমি হাযির!" বলিতে বলিতে সকলে সেই পরম প্রভুর গৃহপানে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কুরবানির জন্য ৭০টি উট সঙ্গে লওয়া হইল। যাত্রীদল নিরস্ত্র, শুধু পথের আপদ-বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু অস্ত্রবলের প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই তাঁহারা সঙ্গে লইলেন। মনে তাঁহাদের কোন দুরভিসন্ধি নাই, হিংসা-বিদ্বেষের কলুষতা, লাভক্ষতির চিন্তা নাই। হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের পুণ্যস্মৃতি আজ তাঁহাদের মনে জাগিয়াছে। ভিতরে-বাহিরে আজ শুধু ত্যাগের মন্ত্রই ধ্বনিত হইতেছে, কুরবানির সুরই রণিত হইতেছে। বীরত্বের গৌরব, শৌর্য-বীর্যের অভিমান, ভোগ-বিলাসের লালসা আজ মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে; জাগিয়া আছে আজ নিষ্কাম আল্লাহ্-প্রেম আর পরকালের চিন্তা। এই ত্যাগী ভক্তদলই দুইদিন আগে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সিংহবিক্রমে

www.pathagar.com

শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং আপন শৌর্য-বীর্য দ্বারা সমগ্র আরবে একটা ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিলেন, কে তাহা এখন বিশ্বাস করিবে? আজ তাঁহারা সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। দনিয়াদারীর পঙ্কিলতা হইতে আজ তাঁহারা মুক্ত।

হযরতের হজ-যাত্রার সংবাদ যথা সময়ে মক্কায় পৌঁছিল। এই সময় কাহারও মনে দ্বেষ-হিংসা জাগিবার কথা নহে। কিন্তু কোরেশদিগের অন্তর এতই কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মুসলমানদিগের এই তীর্থযাত্রাকেও তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিল। মুহম্মদকে কিছুতেই মক্কায় আসিতে দেওয়া হইবে না-ইহাই হইল তাহাদের দৃঢ় পণ। অনতিবিলম্বে কোরেশগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদিনার পথে অগ্রসর হইল পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাহাদের সহিত যোগ দিল। খালিদ ও ইকরামার অধীনে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য অগ্রেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

দুই মঞ্জিলের পথ অতিক্রম করিয়া হযরত ওসফান্ নামক স্থানে পৌঁছিতেই সংবাদ পাইলেন, কোরেশগণ যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে হযরত ভিন্ন পথ ধরিলেন এবং শত্রুসেনার চোখ এড়াইয়া মক্কার উপকণ্ঠে হোদায়বিয়া নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন। কোরেশ সৈন্য যখন এই কথা জানিতে পারিল, তখন তাহারা নগর রক্ষার জন্য দ্রুতগতিতে পিছাইয়া আসিল। তাহারা ভাবিল মুহম্মদ বুঝি বা এতক্ষণ মক্কা আক্রমণ করিয়াই বসিল।

মক্কার "খোজা" সম্প্রদায় পৌত্তলিক হইলে চিরদিনই হযরতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। হযরতের আগমন সংবাদে এই খোজা-গোত্রের দলপতি বোদায়েল স্বগোত্রের কতিপয় প্রতিনিধিসহ হোদায়বিয়ায় আসিয়া হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

হযরতকে তিনি বলিলেন : "কোরেশগণ আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে; কিছুতেই তাহারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না এ অবস্থায় কি করিবেন?"

বোদায়েলের কথা শুনিয়া হযরত বিশেষ মর্মাহত হইলেন। বলিলেন, 'তুমি গিয়া কোরেশদিগকে বল, আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই, হজ করিতে আসিয়াছি। কেন তবে তাহারা অকারণে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে? এই পবিত্র মাসে ত কেহ কাহারও সহিত যুদ্ধ করে না। আমরা যুদ্ধ চাই না, চাই শান্তি। কোরেশগণ অন্তত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আমার সহিত সন্ধি করুক; সেই সময়ের মধ্যে আমার ধর্ম যদি জয়লাভ করে ত ভালই, অন্যথায় তখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে, করিবে।"

বোদায়েল মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। হযরতের মনে কোনরূপ দুরভিসন্ধি নাই, তিনি যে কেবলমাত্র হজ করিবার উদ্দেশ্যেই আসিয়াছেন এবং তিনি যে কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে চান না, চান শুধু শান্তি, একথা তিনি তাহাদিগকে বলিলেন। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। বোদায়েলের কথা কোরেশগণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। তখন 'ওরওয়া' নামক জনৈক তায়েফবাসী মোড়লি করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল : 'আচ্ছা, আমি গিয়া একবার মুহম্মদকে পরীক্ষা করিয়া আসিতেছি।" কেহই বাধা দিল না, ওরওয়া হোদায়বিয়া যাত্রা করিল।

হযরতের নিকট পৌঁছিয়া ওরওয়া ধৃষ্টতার সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিল। ইহাতে সাহাবাগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে সাবধান করিয়া দিলেন।

www.pathagar.com

হযরত ওরওয়াকেও একই কথা বলিলেন এবং একথাও তিনি বলিয়া দিলেন, কোরেশগণ যদি খামাখা যুদ্ধ করিতে চায়ই, তবে তিনিও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

ওরওয়াও ফিরিয়া গিয়া কোরেশদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতে বলিল। মুহম্মদ যে সত্যসত্যই হজ করিতে আসিয়াছেন, সেই তাহা স্বীকার করিল। মুহম্মদের উপর তাঁহার ভক্তবৃন্দের যে অবিচলিত নির্ভর ও শ্রদ্ধা সে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা উল্লেখ করিতেও সে ভুলিল না। কিন্তু কোরেশগণ অনমনীয়। কিছুতেই তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না। শিকার যখন একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন কি এই সুযোগ কেহ ছাড়ে?

ইহার পর 'বেদওয়া' গোত্রের দলপতি হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। মুসলমানগণ যে কুরবানির জন্য বহু উট সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, ইহা দেখিয়া সেও বুঝিতে পারিল, হযরতের মনে সত্যই কোন মতলব নাই।

এইরূপে নানা গোত্রের লোক আসিয়া হযরতের সহিত যতই মুলাকাৎ করিতে লাগিল, ততই তাহাদের মনের বিকার কাটিয়া যাইতে লাগিল। হযরতের শান্তমধুর চরিত্র এবং অকৃত্রিম শান্তির বাণী সকলেরই উপর প্রভাব বিস্তার করিল।

হযরত যে সত্য সত্যই শান্তির প্রয়াসী, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি নিজেও উদ্যোগী হইলেন। খেরাশ নামক জনৈক সাহাবীকে তিনি দূতরূপে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আন্তরিকতার নিদর্শনস্বরূপ আপন উট আল্‌-কাসোয়ার উপর তাঁহাকে সওয়ার করিয়া দিলেন। কিন্তু খেরাশ মক্কায় পৌঁছিতেই কোরেশগণ তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার মতলব করিল এবং হযরতের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার নিরীহ উটটিকে খুঁতা করিয়া দিল। কোরেশদিগের এই অবৈধ আচরণে অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; খেরাশকে তাহারা কিছুতেই হত্যা করিতে দিল না। খেরাশ নির্বিঘ্নে হযরতের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

হযরত ইহাতেও দমিলেন না। এইবার তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ সাহাবী ওসমানকে পাঠাইলেন। ওসমান মক্কায় পৌঁছিয়া আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কোরেশ নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দলপতিগণ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিল না, পক্ষান্তরে ওসমানকে আটক করিয়া ফেলিল। ওসমানের প্রত্যাবর্তনে যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, মুসলমানদিগের মধ্যে ততই উদ্বেগ ও আশঙ্কা বাড়িয়া চলিল। ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসিল ওসমান কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

এই নিদারুণ সংবাদে মুসলমানগণ যারপরনাই মর্মাহত হইয়া পড়িলেন তাঁহারা বলিলেন : "এ ত ওসমানের হত্যা নয়–সত্যের সহিত মিথ্যার সেই চিরন্তন বিরোধেরই এ একটা আংশিক প্রকাশমাত্র।" কেন তবে তাঁহারা এই আঘাতকে নীরবে সহ্য করিবেন? কেন তবে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইবেন? কিছুতেই না। তখন একটি বাবলা গাছের তলে দাঁড়াইয়া হযরতের হাতে হাত রখিয়া ১৫০০ ভক্ত মুসলিম আল্লাহ্‌র নামে প্রতিজ্ঞা করিলেন : "ইসলামের জন্য আমরা প্রত্যেকে জীবন দিতে প্রস্তুত।"

শত্রুর দেশে আসিয়া নিঃসহায় নিরস্ত্র একদল লোক সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য আজ এমন করিয়া আত্মদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ইহাই ত কুরবানি! ইহাই ত হজ!

লাব্বায়েক-এর অর্থই ত এই! "প্রভু হে, আমি হাযির! কথা শুধু মুখে বলিলে ত হয় না, কাজেও দেখাইতে হয়। মুসলমানগণ এই চরম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুরবানির জন্য তাঁহারা যে-সব উট সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া রহিল, প্রভু তাহা গ্রহণ করিলেন না! দ্বেষ-হিংসা-কাম-ক্রোধ প্রভৃতি যে সমস্ত পশু তাহাদের মনের আঙিনায় ভিড় জমাইয়াছিল, তাহাদিগকে জবাই করা হইল, তাহাতেও প্রভুর মন উঠিল না! বাকী ছিল নিজেদের প্রাণ। আজ তাহাও তাঁহারা অকাতরে দান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। হযরত ইব্রাহিমের মতই এক মহাকুরবানি এখানে সংঘটিত হইয়া গেল।

দারুণ উত্তেজনার মধ্যে সকলে আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় ওসমান ফিরিয়া আসিলেন।

ওসমান মক্কায় গিয়া শান্তির প্রস্তাব করিলে আবু সুফিয়ান বলিয়াছিল : "তুমি যদি কাবা-মন্দিরে একা হজ করিতে চাও, আমরা তাহাতে রাজি আছি। কিন্তু মুহম্মদ বা অন্য কাহাকেও কাবা-ঘরে কিছুতেই ঢুকিতে দিব না।" বলা বাহুল্য, ওসমান এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহাই হইয়াছিল তাঁহার আটকের কারণ। সৌভাগ্যক্রমে ওসমানকে আটক করায় অন্যান্য গোত্রের লোকরা কোরেশদিগের উপর দারুণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহাদের কেহ কেহ এতদূর পর্যন্ত বলিল : "ওসমানকে যদি না ছাড়ো এবং মুহম্মদকে যদি হজ করিতে না দাও, তবে আমরা আমাদের দলবল লইয়া তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব।" এইসব কারণে কোরেশগণ দমিয়া গিয়া ওসমানকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। অন্যথায় কী মহা অনর্থপাতই না ঘটিত।

অনেক পরামর্শের পর কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজি হইয়া সোহায়েল নামক জনৈক দূতকে হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। সোহায়েল আসিয়া প্রস্তাব করিল : "কোরেশগণ সন্ধি করিতে রাজি আছে, তবে এবারকার মতো মুহম্মদকে দলবলসহ এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে; ইহাই প্রধান শর্ত।"

হযরত একথা শুনিয়া বলিলেন : "সোহায়েল, শান্তির নামে কোরেশগণ আজ যাহা চাহিবে, তাহাই আমি দিব। তোমাদের শর্তেই আমি সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছি।"

মুসলমানগণকে এবার যে হজ না করিয়াই ফিরিয়া যাইতে হইবে, একথায় সাহাবাদের অনেকেরই মন উঠিল না। এরূপ হীনতাজনক শর্তে সন্ধি করিতে হযরতকে তাহারা নিষেধ করিলেন। কিন্তু হযরত বলিলেন :

"তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না; এ আমাদের পরাজয় নহে, ইহার মধ্য দিয়াই আমরা মহাবিজয় লাভ করিব।"

একটি কথায় সমস্ত বিরোধ শান্ত হইল। সাহাবাগণ আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না, হযরতের কথাই তাঁহারা মানিয়া লইলেন।

নেতার প্রতি কী সুগভীর নির্ভর। মতামত প্রকাশেরও পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, আবার নেতৃ-আদেশ শিরোধার্য করিবার মত মনোবলও আছে। এমন না হইলে কি জাতিগঠন হয়। নেতৃত্ব করিব, আবার প্রয়োজন হইলে নেতৃ আদেশ মানিয়াও চলিব, ইহাই জীবন্ত জাতির লক্ষণ।

তখন নিম্নলিখিত শর্তে সন্ধি করা সাব্যস্ত হইল :

১. মুসলমানগণ এবারকার মত হজ না করিয়াই মদিনায় ফিরিয়া যাইবে।

www.pathagar.com

২. আগামী বৎসর তাহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবে, কিন্তু সে তিন দিন কোরেশগণ নগর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইবে।

৩. আত্মরক্ষার জন্য পথিকদের যেটুকু প্রয়োজন, মুসলমানগণ মাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্রই সঙ্গে আনিবে, কিন্তু তাহাও খাপের মধ্যে বন্ধ করিয়া আনিতে হইবে।

৪. মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান আছে, মুহম্মদ তাহাদিগকে মদিনায় লইয়া যাইতে পারিবেননা।

৫. মদিনার কোন লোক কোরেশদিগের মধ্যে ফিরিয়া আসিলে কোরেশগণ তাহাকে মুহম্মদের নিকট ফিরাইয়া দিবে না; কিন্তু মক্কার কোন লোক যদি মদিনায় গিয়া আশ্রয় লয়, তবে তাহাকে কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিতে হইবে

৬. আরবদের যে-কোন গোত্র কোরেশদিগের সহিত অথবা মুহম্মদের সহিত স্বাধীনভাবে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

৭. দশ বৎসরের জন্য কোরেশ ও মুসলমানদিগের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ স্থগিত থাকিবে।

হযরতের আদেশে আলি এই সন্ধিপত্র লিখিতে বসিলেন। 'বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম"-(করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি) এই কথা যেই লেখা হইয়াছে, অমনি সোহায়েল বলিয়া উঠিল : "থামো থামো। এ কথা লিখিতে পারিবে না আল্লাহ্‌কে জানি বটে কিন্তু তাহার ঐ করুণাময় বিশেষণটি আমরা মানি না শুধু লিখ : "আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি।" হযরত তাহাতেই রাযী হইলেন।

তারপর যেই লেখা হইল : "আল্লাহ্‌র রসুল মুহম্মদ এবং কোরেশদিগের মধ্যে এই সন্ধি" অমনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সোহায়েল পুনরায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল : "থামো থামো। মুহম্মদ যে আল্লাহ্‌র রসুল, একথা যদি আমরা মানিবই, তবে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ কিসের জন্যে? ও -কথা লিখিতে পারিবে না। 'আল্লাহ্‌র রসুল মুহম্মদ'-ইহা কাটিয়া দিয়া শুধু লিখ : "আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহম্মদ।" হযরত হাসিয়া বলিলেন : "বেশ তাহাই হইবে। আমি যে আবদুল্লাহ্‌র পুত্র একথাও ত মিথ্যা নহে" ইহাই বলিয়া হযরত 'রসুলুল্লাহ্‌' শব্দটি কাটিয়া দিয়া 'মুহম্মদ-বিন-আবদুল্লাহ্‌' কথাগুলি লিখিবার জন্য আলিকে বলিলেন কিন্তু আলি বলিলেন : "হযরত, মাফ করিবেন, রসুলুল্লাহ্‌ শব্দ আমি কিছুতেই কাটিতে পারিব না।" তখন হযরত বলিলেন : "আচ্ছা আমাকে দেখাইয়া দাও, আমিই কাটিয়া দিতেছি।" আলি দেখাইয়া দিলে হযরত নিজে কলম ধরিয়া উহা কাটিয়া দিলেন। মহাপুরুষের মহত্ত্ব দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিলেন

সন্ধিপত্র লেখা শেষ হইলে উভয় পক্ষ তাহাতে স্বাক্ষর করিলেন

ঠিক এই সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল। মক্কা হইতে সোহায়েলের পুত্র আবু-জন্দল শৃঙ্খল-বেষ্টিত অবস্থায় হযরতের নিকট আসিয়া উপনীত হইলেন। ইসলাম গ্রহণ করিবার অপরাধে আবু-জন্দলের উপর দীর্ঘদিন ধরিয়া অত্যাচার চলিতেছিল; ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য কোরেশগণ তাঁহার উপর খুবই চাপ দিতেছিল, কিন্তু আবু-জন্দল কিছুতেই রাযী হন নাই। এই জন্যই সোহায়েল এবং তাহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি পালাইয়া হযরতের শরণাপন্ন হইলেন। আবু-জন্দলকে দেখিয়াই সোহায়েল বলিয়া উঠিল : "মুহম্মদ!

www.pathagar.com

এইবার তোমার আন্তরিকতার পরীক্ষা উপস্থিত। সন্ধির শর্তানুসারে তুমি এখন আবু-জন্দলকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।"

হযরত বলিলেন : 'নিশ্চয়ই আমার কর্তব্য আমি পালন করিব।' এই বলিয়া তিনি আবু-জন্দলকে বুঝাইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। আবু-জন্দল নিজ দেহের ক্ষতগুলিকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন : "হযরত, দেখুন আমার অবস্থা! এর উপর যদি আবার আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের হাতে পড়ি, তবে এবার আর আমাকে আস্ত রাখিবে না। দোহাই আপনার, আমাকে আর ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি প্রাণে মারা যাইব।"

হযরত বলিলেন : "বৎস, ধৈর্য ধরিয়া থাক, শীঘ্রই তোমার উপর আল্লাহ্‌র রহমত নামিয়া আসিবে। এইমাত্র যে সন্ধি করা হইয়াছে, তোমার জন্য কিছুতেই আমি তাহার খেলাফ করিতে পারি না।"

আবু-জন্দল তখন বাধ্য হইয়া কোরেশদিগের নিকট ফিরিয়া গেলেন হযরত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া মদিনায় ফিরিয়া চলিলেন। যাইবার পূর্বে হোদায়বিয়াতেই তাঁহারা হজের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। উটগুলিকে সেইখানেই আল্লাহ্‌র নামে কুরবানি দেওয়া হইল।

মদিনায় পৌঁছিবার পর 'ওৎবা' আর একজন নবদীক্ষিত মুসলমান যুবক কোরেশদিগের কবল হইতে পালাইয়া আসিয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মক্কা হইতে দুইজন কোরেশ-দূতও মদিনায় আসিয়া হাযির। ওৎবা ইসলামের নামে হযরতের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; দূতদ্বয় সন্ধির নামে ওৎবাকে ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইল। হযরত বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ওৎবাকে ফিরিয়া যাইতে বলার অর্থ যে পুনরায় তাহাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা, একথা তিনি ভাল করিয়াই জানেন। আবার ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দিতেও পারেন না সন্ধির শর্তানুসারে তাই তিনি অম্লানবদনে তাহাকে কোরেশ দূতদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু ওৎবা পথিমধ্যে রক্ষীদ্বয়ের একজনকে নিহত করিয়া, অপরজনকে ভাগাইয়া দিয়া পুনরায় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন : "হযরত, আপনার সন্ধির খাতিরে আমি কেন সত্যের আলোক হইতে গোমরাহীর অন্ধকারে ফিরিয়া যাইব? মাফ করিবেন, আমার প্রাণ কিছুতেই ইহাতে সায় দেয় না। এবার আপনাকে কেহই কিছু বলিতেও পারিবে না, কারণ আপনি সন্ধিশর্ত ত পালন করিয়াছেন। এখনও কি আমি মদিনায় থাকিতে পাইব না?"

হযরত ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া বলিলেন : "না। তোমার এ-আচরণও আমি সমর্থন করিতে পারিলাম না।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে পুনরায় কোরশদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন। ওৎবা তখন বেগতিক দেখিয়া মদিনা হইতে পলায়ন করিয়া সমুদ্রতীরে 'ঈস' নামক একটি নিভৃত নিরপেক্ষ স্থানে আশ্রয় লইলেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া মক্কার অন্যান্য উৎপীড়িত মুসলমানও পালাইয়া গিয়া ওৎবার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দিনে দিনে তথায় বেশ একটি ছোটখাটো মুসলিম উপনিবেশ গড়িয়া উঠিল। সংখ্যায় যখন পলাতকদল বাড়িয়া গেল, তখন তাহারা কোরেশদিগের সিরিয়াগামী বাণিজ্য-কাফেলাকেও আক্রমণ করিতে লাগিল। কোরেশগণ ইহাতে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন নিজেরাই হযরতকে

www.pathagar.com

অনেক ধরাধরি করিয়া সন্ধির ৫নং শর্তটি বাতিল করাইয়া আনিল। প্রকৃতির কী চমৎকার প্রতিশোধ।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কোরআনে 'ফতুহামমুবীন' অর্থাৎ মহাবিজয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, সত্যসত্যই তাই। এই সন্ধির ফলেই শত্রুদিগের মনে দোলা লাগিল। ভিতর হইতে তাহাদের মধ্যে মস্ত বড় একটা ফাটল ধরিয়া গেল। দীর্ঘদিনের জমাটবাঁধা পাষাণস্তূপ এইদিন হইতে বিগলিত হইতে আরম্ভ করিল। মুহম্মদকে প্রত্যাখ্যান করিবার মধ্য দিয়াই অলক্ষ্যে তাহারা এই প্রথম তাঁহাকে একজন অপরাজেয় শক্তিরূপে স্বীকার করিয়া লইল। সমগ্র আরবে হযরত মুহম্মদ যে এখন একজন, এ উপলব্ধি এইবার তাহাদের প্রথম জন্মিল। বলা বাহুল্য কোরেশদের পরাজয়ের ইহাই নিশ্চিত পূর্বাভাষ। এরপর শুধুই সময়ের প্রশ্ন। হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে কোরেশদিগের স্বাক্ষর প্রকৃতপক্ষে তাহাদের আত্মসমর্পণেরই স্বাক্ষর।

হযরতের অনুপম চরিত্র-মাধুর্যের প্রতি এইবার কোরেশদিগের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইল। তাহারা দেখিল, হযরতকে যে-রঙে এতদিন তাহারা চিত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তিনি তাহা নহেন। তিনি যে কোরেশদিগের, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলা যে তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির মতলবও যে তাঁহার নাই, একথা তাহারা এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। শত্রু নহেন, এমন হীনতাজনক শর্তেও যিনি সন্ধি করিতে পারেন, তিনি যে সত্য সত্যই শান্তিপ্রয়াসী-এ কথা তাহারা বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিল না। হযরতের আন্তরিকতা ও মহানুভবতা কোরেশদিগের হৃদয়কে সত্যই এবার স্পর্শ করিল। শত্রুদিগের দুর্ভেদ্য তিমির-প্রাচীর ভেদ করিয়া হযরত যেন প্রভাত-সূর্যের ন্যায় এই প্রথম তাহাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ লাভ করিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৮

দিকে দিকে গেল আহ্বান

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত আশ্বস্ত হইলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহাকে 'মহাবিজয়' আখ্যা দেওয়ায় এ আশ্বস্তি আরও গভীর হইল। হযরত বুঝিলেন তাঁহার সাধনার সিদ্ধি নিকটবর্তী, বুঝিলেন তিনি আর এখন তুচ্ছ নহেন, ক্ষুদ্র নহেন : মদিনার নহেন, মক্কার নহেন; তিনি এখন সকলের—তিনি এখন বিশ্বের। সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া শত বাধাবিঘ্নকে জয় করিয়া নদী যখন মহাসাগরের নিকটবর্তী হয়, তখন যেমন বিজয়ের গৌরব ও সার্থকতার আনন্দে তাহার বুক ভরিয়া উঠে, সীমাহীন বিশালতার স্বপ্ন যেমন তাহার নয়ন ছাইয়া আসে, হযরতেরও ঠিক তাহাই হইল। মোহনার মুখে আসিয়া তাঁহার সাধনার স্রোতোধারা শুনিতে পাইল মহাসাগরের কলকল্লোল, অনুভব করিল বিরাটের আকর্ষণ, বুঝিতে পারিল সাফল্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। এখন আর তাঁহার মনে কোন সংশয়-দ্বিধা নাই; আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব নাই; আছে শুধু সময়ের প্রশ্ন—আছে শুধু সেই শুভ মিলন-মুহূর্তের ব্যগ্র প্রতীক্ষা।

হযরতের মনোবল দৃঢ় হইল। ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত জানিয়া তিনি তাঁহার বাণী দিকে দিকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বিশ্ববাসীর জন্য বিশ্বনবী যে-সত্যের সওগাত বহন করিয়া আনিলেন, তাহা কি চিরদিন সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে? এই অমৃতকে জনে জনে পরিবেশন করিতে পারিলে তবেই ত ইহার সার্থকতা। ইহাই ভাবিয়া তিনি বিশ্বের দিকে দিকে তাঁহার সাদর আহ্বান-লিপি পাঠাইতে মনস্থ করিলেন।

তখনকার দিনে জগতের ইতিহাসে যে কয়টি রাজশক্তি বিদ্যমান ছিল, তাহাদের মধ্যে এশিয়ায় চীন ও পারস্য, ইউরোপে রোম-সাম্রাজ্য (The Holy Roman Empire) এবং আফ্রিকায় হাবসী সাম্রাজ্যই ছিল প্রধান। হযরত প্রথমেই রোমক সম্রাটকে আহ্বান করিলেন।

এইখানে রোম ও পারস্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুটা জানা দরকার। বহুদিন হইতেই রোম-সাম্রাজ্যে ও পারস্য-সাম্রাজ্যে ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। রোমকগণ পশ্চিম এশিয়ার এক বিস্তীর্ণ অংশ জয় করিয়া রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় এবং ইহার নামকরণ করে 'বাইজান্টাইন, বা প্রাচ্য রোম-সাম্রাজ্য (Eastern Roman Empire)। হযরত মুহম্মদের সময় এই বাইজান্টাইনের শাসনকর্তা ছিলেন হিরাক্লিয়াস। ইনি কনষ্টান্টিনোপলে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিতেন। ইহাকে 'কাইসার'ও বলা হইত।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে পারস্য-সম্রাট খসরু রোমদিগকে পরাজিত করিয়া মিসর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির উদ্ধার সাধন করেন। কিন্তু বেশী দিন সেগুলিকে স্ব বশে রাখিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই হিরাক্লিয়াস পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া হৃতরাজ্যগুলি পুনরাধিকার করিয়া লন। ঠিক এই সময়ে হযরত মুহম্মদ হোদায়বিয়ার কোরেশদিগের সহিত সন্ধি করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

www.pathagar.com

হিরাক্লিয়াস মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া প্যালেস্টাইন পুনরাধিকার করিতে পারেন তবে পায়ে হাঁটিয়া জেরুজালেম তীর্থ করিতে আসিবেন। তদনুসারে তিনি মহা আড়ম্বরে জেরুজালেমে আসিতেছিলেন। এমন সময় অপরিচ্ছন্ন সীলমোহরযুক্ত আরবী-ভাষায়-লিখিত একখানি পত্র তাঁহার হস্তে আসিয়া পৌঁছিল। দেহিয়া কল্‌ব নামক জনৈক আরবীয় দূত পত্রখানি প্রথমত বসরার খ্রীষ্টান শাসনকর্তা হারিসের নিকট প্রদান করেন। হারিস জনৈক কর্মচারী সঙ্গে দিয়া আরবীয় দূতকে জেরুজালেমে হিরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়া দেন। পত্রখানিতে এই কথা লেখা ছিল :

"বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির-রহিম-

আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রসুল মুহম্মদের পক্ষ হইতে রোমের প্রধান পুরুষ হিরাক্লিয়াস সমীপে-

সত্যের অনুসরণকারীদিগের প্রতি সালাম। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছি! ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার কল্যাণ হইবে। ইসলাম গ্রহণ করিলে আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করিবেন। কিন্তু যদি আপনি ইহাতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে আপনার প্রজাসাধারণের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"

(কোরআনের আয়াত)

"বল হে গ্রন্থধারিগণ। এস, আমরা ও তোমরা একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি : আমরা কেহই আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহাকেও পূজা করিব না এবং আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও অংশীদার করিব না অথবা নিজেদের মধ্য হইতে কাহাকেও আল্লাহ্‌র আসনে বসাইব না। কিন্তু যদি তাহারা একথা না মানে তবে বলিয়া দাও যে, আমরা মুসলমান; তোমরা এ কথার সাক্ষী থাকিও।" (৩ : ৬৩)

(মোহর) : মুহম্মদ-রসুল-আল্লাহ্

প্রবল প্রতাপান্বিত রোমের কাইসারের নিকট একজন নিরক্ষর মরুবাসীর পত্র! আর সে-পত্রের পুরোভাগে মর্যাদার ভঙ্গিতে প্রথমেই তাঁহার নিজের নাম লেখা। হিরাক্লিয়াস বিস্ময় মানিলেন। সভাসদগণ পরামর্শ দিলেন : "এই অজ্ঞাতনামা ভণ্ড কপটাচারীর উদ্ধত স্পর্ধা নিতান্তই অমার্জনীয়। ইহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হউক।" কিন্তু হিরাক্লিয়াস সে কথা কানে তুলিলেন না। একজন 'ভাববাদী' যে আসিবেন বাইবেল হইতে তাহা তিনি জানিতেন।তাই তিনি মুহম্মদ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন। মন্ত্রী, পুরোহিত ও অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে লইয়া তিনি একটি পরামর্শ সভা ডাকিলেন। আরবীয় দূতকেও সে সভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেরুজালেমের প্রবাসী আরবদিগকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে ইসলাম-বৈরী আবু সুফিয়ানও বাণিজ্য উপলক্ষে জেরুজালেমে অবস্থান করিতেছিল। সম্রাটের আদেশক্রমে সেও রাজসভায় উপস্থিত হইল।

দোভাষীর সাহায্যে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। সম্রাট আরবীয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "মুহম্মদের সর্বাপেক্ষা নিকট-আত্মীয় তোমাদের মধ্যে কেহ আছে?"

আবু সুফিয়ান উত্তর দিল : "আমি আছি। মুহম্মদ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।"

তখন সম্রাট আবু সুফিয়ানকে নিকটে ডাকিয়া অন্যান্য আরবদিগকে বলিতে লাগিলেন : "এই ব্যক্তিকে আমি কতকগুলি প্রশ্ন করিব। সে যদি মিথ্যা উত্তর দেয়, তবে তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিও।"

www.pathagar.com

আবু সুফিয়ান মহাসঙ্কটে পড়িল। ভাবিয়াছিল প্রাণ ভরিয়া সে হযরতের কুৎসা গাহিবে, কিন্তু তাহা হইল কৈ? মিথ্যা কথা বলিলেই ত সকলে তাহার প্রতিবাদ করিবে, ফলে এই রাজদরবারে তাহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। এ কি গ্রহের ফের! বাধ্য হইয়াই যে আজ তাহাকে হযরত সম্বন্ধে সত্য কথা বলিতে হয়। আবু সুফিয়ান এই চিন্তায় একেবারে জর্জরিত হইয়া পড়িল।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন : যে ব্যক্তি নবী বলিয়া দাবী করিতেছেন, তাঁহার বংশ কিরূপ?

আব-সু : বংশ সম্ভ্রান্ত।

সম্রাট : তাঁহার পূর্ব-পুরুষগণের মধ্যে কেহ কোনদিন রাজা ছিলেন কি?

আবু-সু: না।

সম্রাট : কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁহার শিষ্য হইতেছে?

আবু-সু : দরিদ্র শ্রেণীর লোকই বেশী করিয়া তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিতেছে।

সম্রাট : তাঁহার শিষ্যসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, না কমিতেছে?

আবু-সু : বাড়িতেছে।

সম্রাট : এই ব্যক্তি কোনদিন মিথ্যা কথা বলিয়াছে কি?

আবু-সু : না, জীবনে কোনদিন তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই

সম্রাট : কোনদিন তিনি কোন প্রতিজ্ঞা বা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন কি?

আবু-সু : না, আজ পর্যন্ত ত দেখি নাই।

সম্রাট : তাঁহার সহিত তোমাদের কোন যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে কি?

আবু-সু: হইয়াছে।

সম্রাট : কে জিতিয়াছে?

আবু-সু : কোনটায় তিনি জিতিয়াছেন, কোনটায় আমরাও জিতিয়াছি।

সম্রাট : লোকটি কি শিক্ষা দিতেছেন?

আবু-সু : তিনি বলেন : এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই উপাস্য নাই, দেবদেবী মিথ্যা। আরও বলেন : নামায পড়, সত্য কথা বল, সুপথে চল, সচ্চরিত্র হও, পরস্পর মারামারি করিও না, মিলিয়া মিশিয়া থাকো-ইত্যাদি।

সম্রাট তখন আরবীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "দেখ এই ব্যক্তি যে সত্যসত্যই নবী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তোমাদের কথা হইতে জানিলাম তিনি সদ্বংশজাত। নবীরা চিরদিনই সদ্বংশজাত হন। তোমরা বলিয়াছ : তাঁহার পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কোনদিন রাজা ছিলেন না। ইহা হইতেই বুঝিতে পারিতেছি, পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য নবী সাজিয়া কোন ছলনা করিতেছেন না। তোমরা বলিতেছ : দীন দরিদ্রেরাই বেশীর ভাগ তাঁহার শিষ্য হইতেছে। যে কোন সভ্য ধর্ম সম্বন্ধে চিরকাল ইহাই ঘটিয়া আসিতেছে। তোমরা বলিতেছ : জীবনে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই বা কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই। ইহাই নবীর লক্ষণ। ভাবিয়া দেখ, জীবনে যিনি মানুষ সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কথা বলিলেন না আল্লাহ্ সম্বন্ধে তিনি কেন মিথ্যা বলিতে যাইবেন? ইহা ছাড়াও তিনি তোমাদিগকে মহৎ উন্নত জীবন-যাপন করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছেন। কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, ইনি নিশ্চয়ই সেই

www.pathagar.com

ভাববাদী পয়গম্বর—সারা ধরণী যাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমার সুযোগ শক্তি থাকিলে আমি সেই মহাপুরুষের নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার পদধৌত করিয়া দিতাম।"

হিরাক্লিয়াসের এই কথায় সভাস্থলে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের নিকট কথাগুলি আদৌ ভাল লাগিল না। সম্রাটের উপর তাহারা খুব অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। হিরাক্লিয়াস ইহা বুঝিতে পারিলেন। সাম্রাজ্যের ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি তিনি এই কথার একটা কূট রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়া সকলকে শান্ত করিলেন।

বিশ্বনবীর আহ্বান-বাণী এইরূপে খ্রীষ্টান-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া দোল খাইয়া ফিরিতে লাগিল।

পারস্য-সম্রাট খসরুর নিকটেও হযরত মুহম্মদ অনুরূপ একখানি পত্র পাঠাইলেন। সে পত্রের এবারত ছিল এইরূপ :

"বিস্‌মিল্লাহির-রহমানির-রাহিম-

আল্লাহ্‌র রসুল মুহম্মদের নিকট হইতে পারস্য-সম্রাট খসরু সমীপে—যাহারা আল্লাহ্‌র বিধান মানে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলকে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি : আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং আমি তাঁহার প্রেরিত রসুল। জীবন্ত লোকদিগকে সতর্ক করিবার জন্য আল্লাহ্‌ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে। যদি না করেন, তবে আপনার প্রজাদিগের পাপের জন্য আপনি দায়ী হইবেন।"[১]

মহাপ্রতাপান্বিত পারস্য-সম্রাট। তাঁহার নিকট এমন করিয়া কে পত্র লিখিল? কাহার এতখানি বুকের পাটা? মুহম্মদ? কে এ কপটাচারী? কে তাহাকে চিনে? কেই-বা তাহাকে মানে? সম্রাট ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। টুকরা টুকরা করিয়া তিনি হযরতের পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। শুধু তাহাই নহে তৎক্ষণাৎ তিনি এয়মনের শাসনকর্তা 'বাজান'-কে হুকুম দিয়া পাঠাইলেন : "অনতিবিলম্বে মুহম্মদকে গ্রেফতার করিয়া আমার দরবারে হাযির কর।"

সম্রাটের আদেশক্রমে বাজান মুহম্মদের নিকট গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ দুইজন রাজকর্মচারীকে পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারীদ্বয় হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন: "সম্রাটের আদেশ পালন করুন অন্যথায় তাঁহার সেনাদল আসিয়া আরব দখল করিয়া লইবে।"

হযরত এ-কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "আজ আমি কিছুই বলিব না। কাল আসিও জবাব দিব।" এই বলিয়া সেদিনের মত তাহাদিগকে বিদায় দিলেন।

পরদিন কর্মচারীদ্বয় উপস্থিত হইলে হযরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "কাহার পরোয়ানা এ?"

---

১ সরকারী পত্রে এই কায়দা এখনও অনুসৃত হয়। From.....To এই ভাবেই সরকারী পত্র লেখা হয়। আগে To......পরে From.......এর রীতি নাই। বলা বাহুল্য, এ রীতি হযরত মুহম্মদ হইতেই আসিয়াছে।

www.pathagar.com

মকাউকিসের নিকট হযরতের পত্র

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কর্মচারীদ্বয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন : "কেন সম্রাট খসরুর।"

হযরত বলিলেন : "সম্রাট খসরু? তিনি ত জীবিত নাই! যাও, তোমাদের প্রভুকে গিয়া বল, খসরু যেমন করিয়া আমার পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছেন আল্লাহ্ তাঁহার রাজ্যকে ঠিক তেমনি করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন। দেখিবে, শীঘ্রই ইসলামের রাজ্য পারস্যের রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।"

কর্মচারীযুগল স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অগত্যা তাহারা ফিরিয়া চলিলেন। যাত্রাকালে হযরত তাহাদিগকে পুনরায় ডাকিয়া বলিলেন : "বাজানকে গিয়া বলিও, সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহা হইলে আমি তাহাকে পূর্বপদে বহাল রাখিব।"

দূতদ্বয় অবাক হইয়া এয়মনে ফিরিয়া গেলেন। যাইয়াই শুনিতে পাইলেন সম্রাট খসরু তৎপুত্র শেরওয়াঁ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। নূতন সম্রাট বাজানকে ইহাও লিখিয়া পাঠাইয়াছেন : "সেই আরবীয় নবী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করিবেনা।"

কর্মচারীদিগের মুখে হযরত মুহম্মদ সংক্রান্ত সমস্ত কথা অবগত হইয়া বাজান অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন : পারস্য-সম্রাট সম্বন্ধে যখন মুহম্মদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, তখন পারস্য-সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও তাঁহার কথাই বা কেন না ফলিবে? নিশ্চয়ই তবে ইনি একজন পয়গম্বর। ইনি আমাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন; বলিয়া পাঠাইয়াছেন, যদি আমি মুসলমান হই, তবে এয়মনের শাসনকর্তার পদে আমি বহাল থাকিব। একথা আমাকে মানিতেই হইবে, না মানিলে কল্যাণ নাই। ইহাই ভাবিয়া তিনি অনতিবলম্বে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেক অগ্নি-উপাসকও মুসলমান হইয়া গেল।

হযরতকে গ্রেফতার করিতে গিয়া বাজান এইরূপে নিজেই গ্রেফতার হইয়া পড়িলেন।

হযরতের তৃতীয় পত্র প্রেরিত হইল আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর নিকটে। নাজ্জাশী হযরতের নিকট, অথবা হযরত নাজ্জাশীর নিকট অপরিচিত ছিলেন না। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, কোরেশদিগের অত্যাচারে মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানেরা যখন জর্জরিত হইতেছিলেন, তখন হযরত এই ন্যায়পরায়ণ হাবশী সম্রাটের নিকটেই দুইদল মুসলমানকে পাঠাইয়াছিলেন। নাজ্জাশীও সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া মুসলমানদিগকে সাদরে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমন কি হযরতের পত্র প্রেরণের সময় পর্যন্তও একদল মুসলমান আবিসিনিয়াতেই অবস্থান করিতেছিলেন। যাহাই হউক, নাজ্জাশী হযরতের পত্রের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতকে বিনীতভাবে লিখিয়া জানান যে, নানা রাজনৈতিক কারণে নিজে আসিয়া তাঁহার পতাকা তলে দাঁড়াইতে না পারায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিত।

হযরত নাজ্জাশীকে আর একখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে আবিসিনিয়ার প্রবাসী মুসলমানদিগকে মদিনায় পাঠাইয়া দিবার অনুরোধ ছিল। নাজ্জাশী হযরতের অনুরোধও রক্ষা করিয়াছিলেন। একখানি জাহাজ ভর্তি করিয়া তিনি মুসলমানদিগকে মদিনায় পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রত্যাবৃত্ত মুসলিম নরনারীদের মধ্যে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাও ছিলেন ওবায়দুল্লাহ্ নামক জনৈক মুসলমানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ওবায়দুল্লাহ্

www.pathagar.com

উম্মে-হাবিবাকে সঙ্গে করিয়াই আবিসিনিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়; ফলে উম্মে-হাবিবা নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন। মদিনায় আসিলে হযরত উম্মে-হাবিবাকে বিবাহ করিয়া আপন পরিবারভুক্ত করিয়া নেন। এই বিবাহের মূলে হযরতের মহাপ্রাণতা ত ছিলই, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও অনাবিল মানবপ্রীতিও ছিল। জীবন-পথের সর্বপ্রধান শত্রু যে, তাহার কন্যাকে এত সহজে কেহ বিবাহ করিতে পারে? কোরেশদিগের সহিত হযরত শুধু একটা আদর্শের জন্যই যুদ্ধ করিতেছেন, অন্যথায় তিনি যে তাহাদিগকে অন্তর দিয়া ভালবাসেন এবং কোন শত্রুতা পোষণ করেন না. এই বিবাহ দ্বারা তিনি তাহাই প্রমাণ করিলেন। মানবতার দাবী এখানে বড় হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে আবু সুফিয়ানের মনের গ্লানি ও বিকার বহু পরিমাণে কটিয়া গেল; প্রতিহিংসা-বাসনার সেই তীব্রতা আর রহিল না। কাহার সহিত সে আর এখন যুদ্ধ করিবে? মুহম্মদ যে এখন তাহার জামাতা। কাজেই বলা যাইতে পারে, প্রেম দিয়াই হযরত আবু সুফিয়ানের চিত্ত জয় করিয়া লইলেন। উত্তরকালে আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কোরেশগণ যে হযরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবে, একথা এখন হইতেই অনুমান করা যায়।

মিসরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিসের নিকটেও হযরতের আহ্বানলিপি গিয়াছিল। তিনিও সে আহবানে সাড়া দিয়াছিলেন। মুকাউকিস প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহার মন যে ভিতরে ভিতরে হযরতের চরণে আত্মনিবেদিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিনয়নম্র ভাষায় তিনি হযরতের পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ হযরতের নিকট মেরী ও শিরী নাম্নী দুইটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া খ্রীষ্টান মহিলা[২] ও একটি দুষ্প্রাপ্য শ্বেতবর্ণের অশ্ব উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। হযরত এই উপহার প্রত্যাখান করেন নাই। ইতিপূর্বে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্র হইতে বিভিন্ন অবস্থায় কতিপয় নারীকে তিনি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া সার্বজনীন প্রীতি ও বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন খ্রীষ্টান নারীকে বিবাহ করেন নাই। এইবার সেই সুযোগ জুটিল হযরত নিজে মেরীকে বিবাহ করিলেন এবং শিরীকে কবি হাস্সানের সহিত বিবাহ দিলেন। এইরূপে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টান জগতের দিকে মহানবী তাঁহার হৃদয়-দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া ধরিলেন। প্রেমকে তিনি সত্য ও মানবতার বাহন করিলেন।

এই মেরীর গর্ভেই তাঁহার চতুর্থ পুত্র ইব্রাহীম জন্মগ্রহণ করেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বটিকেও হযরত সাগ্রহে নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই উহাতে সওয়ার হইয়া বেড়াইতেন। উহারই নাম ছিল 'দুল-দুল'। হযরতের মৃত্যুর পর ইমাম হোসেন ইহাকে ব্যবহার করিতেন।

এইরূপে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দিকে দিকে ইসলামের অগ্নিবাণী বিঘোষিত হইল। মহানবীর মহাআহ্বানে তিনটি মহাদেশেই এক অপূর্ব স্পন্দন ও আলোড়নের সৃষ্টি হইল—সম্রাটদিগের রাজসিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল। পৃথিবীর খ্যাতনামা সম্রাট ও বীরগণ যুদ্ধ করিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, নিঃস্ব নিরক্ষর একজন মরুবাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া শুধু তাঁহার বাণী দ্বারা তাহাই সম্পন্ন করিলেন।

---

২. এই দুইজন মহিলা কুমারী ছিলেন কিনা, নিশ্চিত বলা যায় না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪৯
খায়বার বিজয়

সিরিয়া প্রান্তরে এক বিশাল শ্যামল ভূখণ্ডের নাম ছিল খায়বার। ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু দুর্গ দ্বারা এই স্থানটি সুরক্ষিত ছিল। পূর্ব হইতেই এইখানে ইহুদীরা বসতি স্থাপন করিয়াছিল। মদিনার বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরা এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

মদিনা হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া ইহুদীরা যে শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মত বসিয়াছিল, পাঠক তাহা মনে করিবেন না। তাহাদের মনে ছিল গভীর দুরভিসন্ধি। হযরতের উপর—তথা মুসলমানদিগের উপর—তাহাদের জাতক্রোধ ত ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও তাহারা তলে তলে চেষ্টা করিতেছি তাহাদের ইচ্ছা ছিল, মুসলমান ও কোরেশদিগের মধ্যে যুদ্ধ লাগাইয়া দিয়া উভয়ে দুর্বল করিয়া ফেলিবে এবং সেই সুযোগে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবে।

খন্দক-যুদ্ধের পর ইহুদীরা মনে করিল, কোরেশগণ নিশ্চয়ই দুর্বল হই পড়িয়াছে, মদিনা আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে আর এখন সম্ভবপর নহে মুসলমানদিগের শক্তিও ওহুদ-যুদ্ধে অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছাড়া এখনও তাহারা তত বেশী শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই; চেষ্টা করিলে অনায়াসেই এখন তাহাদিগকে পরাজিত করা যায়। বেশী বিলম্ব করিলে সব সুযোগই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে—কারণ শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তাহারা সময় পাইবে। অতএব যদি কিছু করিতে হয় তবে এখনই।

বনি-কাইনুকা ও বনি-নাজির গোত্রের ইহুদীরা খায়বারে তাহাদের জ্ঞাতিভাইদিগের সহিত যোগ দিবার পর তাহাদের দুষ্ট মনোভাব আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। ইহুদীরা সংঘবদ্ধ হইয়া বিরাট ও ব্যাপকভাবে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে মনস্থ করিল। মদিনা আক্রমণ করিবার জন্য তাহারা তলে তলে সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিল। ইসলামের চিরশত্রু গৎফান গোত্রও ইহুদীদিগের সহিত যোগ দিল।

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে ইহুদীরা ছোট-খাটো আক্রমণ দ্বারা মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। একবার তাহারা মুসলিম বণিকদিগের একটি কাফেলাকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বহু মুসলমানকে হত্যা করিল এবং তাহাদের ধনসম্পদ লুটিয়া লইল। আর একবার তাহারা মদিনা সীমান্তে অতর্কিতে আসিয়া হযরতের কতিপয় উট ও একটি মুসলিম নারীকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। এই ধরনের অত্যাচার-উপদ্রবের প্রতিকারকল্পে হযরত অভিযান প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন। জায়েদের নেতৃত্বে 'ওয়ালিদ্-কোরা' অভিযান এবং আলির নেতৃত্বে 'ফদক' অভিযান এই কারণেই প্রেরিত হইয়াছিল।

কিন্তু এরূপ ধরনের ছোট-খাটো অভিযানে ইহুদীরা ভয় পাইবে কেন? বরং তাহাদের মদিনা আক্রমণের সঙ্কল্প ইহাতে আরও দৃঢ় হইতে লাগিল। 'আসির' নামক জনৈক ব্যক্তি ইহুদীদিগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল : "এতদিন

www.pathagar.com

আমরা মুহম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলাম, আজ হইতে তাহা পরিত্যাগ করিলাম। মদিনা আক্রমণই হইবে এখন আমাদের লক্ষ্য।”

ইহুদীদিগের এই চক্রান্তের কথা হযরতের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। গুপ্তচর পাঠাইয়া সন্ধান লইয়া তিনি জানিলেন, ইহুদীরা মদিনা আক্রমণের জন্যই আয়োজন করিতেছে।

হযরত তখন আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা সমীচীন মনে করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি চৌদ্দশত পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মদিনা হইতে খায়বার প্রায় একশত মাইলের পথ। হযরত এত দ্রুতবেগে সৈন্যচালনা করিলেন যে, ইহুদীরা কোন পূর্বাভাষই পাইল না। হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে খায়বারের কৃষকগণ মাঠে আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহাদের সম্মুখে বিরাট মুসলিম সেনাদল। ভয়ে তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া নগরবাসীকে এই সংবাদ দিল।

ইহুদীরা হতভম্ব হইয়া পড়িল। গৎফান বা অন্যান্য গোত্রের সাহায্য বা সহযোগিতা লাভের আর অবসর তখন রহিল না। ইহুদীরা ভীত হইয়া দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইল।

এদিকে গৎফানীরাও ভীত হইয়া পড়িল। এত অল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যকে দেখিয়া তাহারা মনে মনে ভাবিল : মুসলমানদিগের ইহা ছলনা মাত্র, মুহম্মদ নিশ্চয়ই আরও বহু সৈন্য পিছনে রাখিয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় আমরা যদি খায়বারের ইহুদীদিগকে সাহায্য করিতে যাই, তবে নিশ্চয়ই মুসলমানগণ পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া আমাদের ঘরবাড়ি ও স্ত্রী–পুত্রদিগকে আক্রমণ করিবে। তখন আমরা দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া একেবারে মারা পড়িব। ইহাই ভাবিয়া তাহারা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীয় পল্লীতে বসিয়া রহিল।

হযরত প্রথমে ইহুদীদিগের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহুদীরা সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করিল। তখন বাধ্য হইয়াই তিনি মুসলমানদিগকে যুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। আদেশক্রমে মুসলিম বীরগণ প্রস্তুত হইলেন। প্রথমেই তাঁহারা নায়েন দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণেই দুর্গটি মুসলমানদিগের অধিকারে আসিল। আরও কয়েকটি ছোট–খাটো দুর্গ ও গ্রাম অধিকারের পর মুসলমানগণ বিখ্যাত 'কামুস্' দুর্গের সম্মুখীন হইলেন। কেনানা নামক দলপতির অধীনে ইহুদীরা এই দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। মুসলমানদিগকে এইখানে তাহারা প্রাণপণে বাধা দিবে বলিয়া পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিতেই দুর্গাভ্যন্তর হইতে মোরাহ্হাব নামক প্রখ্যাত ইহুদী বীর বাহিরে আসিয়া মুসলমানদিগকে খণ্ডযুদ্ধে আহ্বান করিল। আমের নামক জনৈক সাহাবী হযরতের অনুমতি লইয়া মোরাহ্হাবের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুভার্গ্যক্রমে আমের নিজের তরবারির আঘাতে নিজেই মারাত্মকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া মাসলামা নামক আর একজন বীর অগ্রসর হইয়া মোরাহ্হাবকে আক্রমণ করিলেন। মোরাহ্হাব সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। ঠিক এই সময়ে বীরকেশরী আলি ছুটিয়া গিয়া মোরাহ্হাবকে আযরাইলের হস্তে সোপর্দ করিলেন।

www.pathagar.com

মোরাহ্‌হাবকে নিহত হইতে দেখিয়া তাহার ভ্রাতা ছুটিয়া আসিয়া পুনরায় মুসলমানদিগকে সদর্পে আহ্বান করিল। এবার বীরবর জুবায়ের অগ্রসর হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি ইহুদী বীরপুরুষের যুদ্ধসাধ মিটাইয়া দিলেন।

প্রথম দিন সৈন্যচালনার ভার পড়িল আবুবকরের উপর। ইসলামের হিলালী ঝাণ্ডা তাঁহারই হস্তে অর্পণ করা হইল। দ্বিতীয় দিন ওমর নেতৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। দুইদিনের আক্রমণে শত্রুগণ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইল বটে, কিন্তু দুর্গের পতন হইল না। তৃতীয় দিন শেরে খোদা আলির নেতৃত্বে মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ইহুদীরা সেই দুর্বার গতিবেগ সহ্য করিতে পারিল না। কামুস দুর্গের পতন হইল।

যুদ্ধশেষে দেখা গেল ইহুদীদিগের নিহতের সংখ্যা ৯২ এবং মুসলমানদিগের ১৯।

প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর খায়বারের সমস্ত ইহুদী দুর্গ মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। তখন নিরুপায় হইয়া ইহুদীরা হযরতের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল।

কিন্তু এহেন বিশ্বাসঘাতক মারাত্মক শত্রুকে পরাজিত করিয়াও হযরত তাহাদিগকে কি শাস্তিবিধান করিলেন? তিনি তাহাদিগকে নির্মূল করিয়াও ফেলিলেন না, অথবা জোর করিয়া কাহাকেও মুসলমানও করিলেন না। নিম্নলিখিত শর্তে তিনি ইহুদীদিগের সহিত শান্তি স্থাপন করিলেন :

১. ইহুদীরা পূর্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাহাদের ধর্ম-পালন করিতে পারিবে, কেহ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না।

২. মুসলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগের যুদ্ধ করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে না।

৩. তাহাদের বাড়িঘর ও ধনসম্পত্তি পূর্ববৎ তাহাদেরই স্বত্বাধিকারে থাকিবে, তবে এখন হইতে তাহাদের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি মদিনার মুসলমান-সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৪. উৎপন্ন শস্যাদির অর্ধাংশ রাজস্বস্বরূপ মদিনায় পাঠাইতে হইবে।

৫. অন্য কোন কর তাহাদিগকে দিতে হইবে না।

শুধু কি তাহাই? ইহুদীদিগের সহিত সম্প্রীতি-স্থাপনের জন্য হযরত আরও এক ধাপ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি অপরাধে কামুস-দুর্গের অধিপতি কেনানার প্রাণদণ্ড হয়। কেনানার স্ত্রী সফিয়া পূর্ব হইতেই ইসলামের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। হযরতের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের খ্যাতি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের সহধর্মিণী হইবার সাধ প্রকাশ করেন। হযরত তাঁহার এই সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই। সফিয়াকে তিনি বিবাহ করিয়া আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন।

কিন্তু এত করা সত্ত্বেও ইহুদীদিগের খাসলাৎ বদলাইল কই? বিশ্বাসঘাতকতা যাহাদের রক্তমাংসে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে কে সুপথে আনিবে? হযরত ইহুদীদিগের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য বারে বারে বুক পাতিয়া দিতেছেন, অথচ প্রতিবারেই তাহারা সেই বুকে ছোরা বসাইবার চেষ্টা করিতেছে। শুনিলে সত্যই দুঃখ হয়, ইহুদীদিগকে সর্বপ্রকার সুবিধা দান করা সত্ত্বেও এবং তাহাদের সহিত নানাভাবে হৃদ্যতা দেখান সত্ত্বেও এই মুনাফিকগণ হযরতকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে

www.pathagar.com

কুণ্ঠিত হইল না। খায়বারের যুদ্ধশেষে ইহুদীদিগের সহিত যখন শান্তিস্থাপন হইয়া গেল এবং হযরত যখন সফিয়াকে বিবাহ করিয়া তাহাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় দিলেন, ঠিক সেই সময়েই এক নিদারুণ আঘাত আসিল। জয়নব নাম্নী এক ইহুদী রমণী হযরতকে দাওয়াত করিল। হযরত সে-দাওয়াত কবুল করিলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাকেও সেই সঙ্গে দাওয়াত করা হইল। ইহুদিনী অতি সুন্দর গোশ্‌ত রাঁধিয়া হযরতের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। হযরত সরল বিশ্বাসে খানা খাইতে বসিলেন। এক টুকরা গোশ্‌ত খাইয়াই তিনি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "সাবধান, এই গোশ্‌ত কেহ খাইও না, ইহাতে বিষ মিশানো আছে।" বশর নামক জনৈক সাহাবী পূর্বেই খানিকটা গোশ্‌ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কাজেই অল্পক্ষণ পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি কুদরৎ। হযরতের কিছুই হইল না, তিনি বাঁচিয়া গেলেন। পাপিষ্ঠা ইহুদিনীকে ডাকা হইল। পিশাচিনী দোষ স্বীকার করিয়া বলিতে লাগিল : "এ কাজ ইচ্ছা করিয়াই আমি করিয়াছি। মুহম্মদ, তোমার জন্য আমার পিতা, পিতৃব্য এবং স্বামী যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছে। তুমি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া দাবী করাতেই আমাদের এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমার সাধ জাগিল—তোমাকে একবার পরীক্ষা করিব। তুমি যদি সত্যই পয়গম্বর হও তবে ত পূর্ব হইতেই বিষের কথা জানিতে পারিয়া এই মাংস ভক্ষণ করিবে না, আর যদি তুমি ভণ্ড হও, তবে নিশ্চয়ই তুমি এই মাংস ভক্ষণ করিবে এবং এই বিষে তোমার মৃত্যু ঘটিবে; তখন আমরাও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইব। ইহাই ছিল আমার মতলব। এখন দেখিতেছি, তুমি পয়গম্বর নও, তুমি ভণ্ড, কারণ খাদ্যে যে বিষ মিশানো আছে, তাহা ত জানিতে পারিলে না! তোমার মৃত্যু অনিবার্য।"

হযরত স্মিতমুখে বলিলেন : "জয়নব, তোমার আশা পূর্ণ হইবার নহে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থাকিলে বিষ খাইয়াও আমি বাঁচিতে পারি। এই দেখ না, আমি ত মরি নাই।"

জয়নব দেখিল, সত্যই ত তাই। গোশ্‌ত বিষ মিশানো আছে জানিয়া প্রত্যাখ্যান করিলে সে এক পরীক্ষা হইত বটে, কিন্তু এ পরীক্ষাও ত তার চেয়ে কম নয়। একই বিষ দুইজনে খাইল; একজন মরিল, একজন মরিল না। বিষ খাইলেও যাহার মৃত্যু হয় না, সে ত সাধারণ মানুষ নহে। তবে কি মুহম্মদ সত্যসত্যই পয়গম্বর? জয়নবের মনে দোলা লাগিল।

মুহূর্ত-মধ্যে জয়নব হযরতের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বারে বারে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

হযরত ব্যক্তিগতভাবে জয়নবকে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বশরের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে বাধ্য হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইল। বলা বাহুল্য, এ বিধান খুবই সঙ্গত হইয়াছিল। হযরতের দুইটি সত্তা ছিল; এক সত্তা তাঁহার ব্যক্তিগত, আর এক সত্তা তাঁহার জাতিগত। ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু একটা জাতির নেতা বা প্রতিনিধি হিসাবে যাহা খুশি করা যায় না। সেখানে দেশের বা জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবিতে হয়। বশর ছিলেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। বিষদানে তাঁহাকে হত্যা করা নিশ্চয়ই ইহুদিনীর পক্ষে গুরুতর অপরাধ। রসুলুল্লাহ্ আরব রাষ্ট্রের প্রধান পুরুষ হইয়া এই ইচ্ছাকৃত অপরাধকে ক্ষমা করিতে পারেন না। তাই ন্যায়সঙ্গতভাবেই ইহুদিনীর প্রাণদণ্ড হইল। অতি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনেও ইহার সমর্থন মিলিবে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫০

মুলতবী হজ

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর কাটিয়া গেল। আকাশ-কোণে আবার জিল্‌হজের চাঁদ দেখা দিল। সন্ধির শর্তানুসারে হযরত তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া এইবার তাঁহাদের মুলতুবী হজ সমাপন করিতে মনস্থ করিলেন।

আদেশক্রমে ২০০০ মুসলিম মক্কায় হজ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

নির্দিষ্ট দিনে হযরত ভক্তবৃন্দসহ যাত্রা করিলেন। কুরবানীর জন্য ৬০টি উট সঙ্গে লওয়া হইল।

সন্ধির শর্তানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমান মাত্র একখানি করিয়া তরবারি সঙ্গে লইলেন; তাহাও কোষবদ্ধ অবস্থায়। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে হযরত এইবার একটু পাঠগ্রহণ করিলেন। পাছে কোরেশগণ বিশ্বাসঘাতকতা করে, এই আশঙ্কায় তিনি ২০০ মুসলিম বীরকে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রসহ মক্কার বাহিরে একটি নিভৃত উপত্যকায় পূর্বেই পাঠাইয়া দিলেন। হযরতের আদেশের অপেক্ষায় তাহাদিগকে তথায় মোতায়েন থাকিতে বলা হইল।

হযরত ধীরে ধীরে ভক্তবৃন্দসহ নীরবে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। আল্-কাসোয়ার পৃষ্ঠে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে তিনি চলিলেন, পশ্চাতে ২০০০ ভক্ত শিষ্য অনুগমন করিতে লাগিলেন। পবিত্র কাবা-গৃহ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেই হযরত সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন : "লাব্বায়েক! লাব্বায়েক!-সঙ্গে সঙ্গে দুই হাজার কণ্ঠে সেকথার প্রতিধ্বনি উঠিল ঃ লাব্বায়েক! লাব্বায়েক! প্রভু হে, আমরা হাযির।"

হযরতের মনে আজ কত ব্যথা-কত আনন্দ। দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আজ তিনি জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই মক্কা, সেই কাবা, সেই হেরা, সেই আবদুল মুত্তালিব, সেই খাদিজা-সব কিছুই তাঁহার মনে পড়িল। প্রাণের দুলালকে বুকে পাইয়া বিমর্ষ মক্কানগরী যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

এইদিকে কোরেশ-প্রধানগণ হযরতের আগমন সংবাদে পূর্ব হইতেই নগর ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইহা ছাড়া আর উপায়ই বা কি ছিল? যে মুহম্মদকে সদলবলে তাহারা একবার দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, সেই আজ তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া সকল শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া সেই কাবা-গৃহে আসিয়া হজ করিবে। এই দৃশ্য কেমন করিয়া তাহারা দেখিবে? এ ত দস্তুরমত তাহাদের পরাজয়। হাজার লোকের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে এই কাণ্ড ঘটিবে। লোকে কি বলিবে? নিশ্চয়ই তাহাদের মুখ ছোট হইয়া যাইবে, মাথা হেঁট হইয়া পড়িবে। তাহার চেয়ে মানে মানে সরিয়া পড়াই ভাল নহে কি?

এইরূপই একটা মানসিকতার ফলে তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হযরত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। মক্কার মুসলমানগণ তাঁহাদের পরিত্যক্ত গৃহ ও পরিচিত স্থানগুলি দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই গৃহে প্রবেশ করিলেন না; বাহিরে তাম্বু ফেলিয়াই বাস করিতে লাগিলেন।

তবু তাঁহাদের কত আনন্দ! আজ তাঁহারা সত্যই কি বিজয়ী নহেন?

ইসলাম কি আজ জয়যুক্ত নহে? হোদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব ও সার্থকতা আজ সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

www.pathagar.com

হযরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া কাবা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। ছাদের উপর উঠিয়া বেলাল উচ্চকণ্ঠে আযান ফুকারিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ ছুটিয়া আসিয়া একত্র হইলেন। হযরত সকলকে লইয়া জোহরের নামায পড়িলেন। চতুর্দিকে পাষাণ-প্রতিমাগুলি যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

দূর হইতে কোরেশগণ এই দৃশ্য দেখিতে পাইল। ভিতরে ভিতরে তাহাদের রক্ত টগবগ করিতে লাগিল। অনেকে মুসলমানদিগকে উত্যক্ত করিয়া খামাখা বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হযরতের সহনশীলতার গুণে তাহা ঘটিতে পারিল না।

হযরত যথারীতি হজ সমাপন করিলেন। সাফা ও মারওয়া পর্বত সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া উটগুলিকে সেইখানে কুরবানি দিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। চতুর্থ দিনে কোরেশগণ আসিয়া হযরতকে নগর ত্যাগ করিতে বলিল। হযরত তাহাই করিলেন।

কী অপূর্ব সত্যনিষ্ঠা! কোরেশদিগের নিকট হযরত যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। আপন বাসভূমি, আপন আত্মীয়-স্বজন কোথায় দূরে দূরে পড়িয়া রহিল হযরত এবং তাঁহার শিষ্যগণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সত্য ও ন্যায়ের খাত্বিরে, তাঁহারা আপন জন্মভূমিতেও প্রবাসীর মত তিন দিন কাটাইয়া গেলেন। গৃহের মায়া, আত্মীয়-স্বজনের প্রেম তাঁহাদিগকে হাতছানি দিয়া ডাকিল; আকাশ তাহাদিগকে নীল নয়ন মেলিয়া মমতা জানাইল; বাতাস তাঁহাদিগকে স্নেহের পরশ বুলাইয়া গেল। কত স্মৃতি, কত আকর্ষণ তাঁহাদের অন্তরকে বারে বারে দোলা দিয়া গেল, কিন্তু হযরত ও তাঁহার শিষ্যগণ একেবারে নির্বিকার। ইচ্ছা করিলেই হযরত একটা বিদ্রোহের সৃষ্টি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করিলেন না। সত্য ও ন্যায়ের পাষাণ-প্রাকারে ঘা খাইয়া অনুভূতির সকল আবেদন নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া গেল।

কিন্তু এই অল্পপরিসর সময়ের মধ্যে আর একটি কাণ্ড ঘটিল। হযরত যে-তিনদিন মক্কায় ছিলেন, সে-তিনদিন কাহারও গৃহে প্রবেশ করেন নাই বটে, কিন্তু কোন কোন কোরেশ নাগরিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। সেই সূত্রে মায়মুনা নাম্নী তাঁহারই জনৈক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়া বিধবা রমণী হযরতের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তাব পাঠাইয়া দেন। হযরত তাঁহার এ বাসনা পূর্ণ করেন। মায়মুনাকে তিনি সঙ্গে করিয়া মদিনায় লইয়া যান।

এই বিবাহের এক আশ্চর্য ফল ফলিল। বীরকেশরী খালিদ ছিলেন মায়মুনার আপন ভগিনীর পুত্র। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে এই খালিদের অসাধারণ বীরত্ব ও রণচাতুর্যের ফলেই ওহদ-যুদ্ধে মুসলমানদিগের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। মায়মুনার বিবাহের পরই খালিদ অপ্রত্যাশিতভাবে মদিনায় গিয়া হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু কি খালেদ? আরও দুইজনকে তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন। একজন মক্কার প্রখ্যাত কবি আমর ইবনুল্ আ'স অন্যজন কাবা গৃহের কুঞ্জি-রক্ষক ওসমান-বিন তাল্হা। এই তিনজন শক্তিমান পুরুষের ইসলাম গ্রহণে কোরেশদিগের মেরুদণ্ড যে একেবারে ভাঙিয়া পড়িল সে কথা বলাই বাহুল্য।

হযরত মক্কায় গিয়া কোরেশদিগের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা নিজেও লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন। একমাত্র আবু সুফিয়ান ছাড়া এখন যে তাহাদের মধ্যে আর কোন উল্লেখযোগ্য নেতা নাই এবং তাহাদের বিষদন্ত যে প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে এই সত্য আর গোপন রহিল না। চরম বিজয়ের অপেক্ষায় তিনি প্রহর গনিতে লাগিলেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫১

মূতা–অভিযান

মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হযরত বনি–সালেম গোত্রের নিকট একটি প্রচার–সংঘ পাঠাইয়া দিলেন। গোত্রের নেতা ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের নিকট আসিয়া বলেন যে, যদি একদল মুসলমানকে বনি–সালেম গোত্রের নিকট পাঠান যায়, তবে তাহারা মুসলমান হইতে পারে। তদনুসারে হযরত ৫০ জন মুসলমানকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা গিয়া বনি–সালেমদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু বনি–সালেমগণ মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিয়া সে আহ্বানের জবাব দেয়। অধিকাংশ মুসলমানই তাহাদের হস্তে শহীদ হন। অবশ্য শহীদদিগের পবিত্র রক্ত বিফলে যায় নাই। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই বনি–সালেমগণ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারে এবং মুসলমান হইয়া তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

ইহার পর ১৪ জন মুসলমানের আর একটি শান্তি–সংঘ প্রেরিত হয় সিরিয়া প্রান্তরে জাৎ–আৎলা নামক একটি স্থানে। এখানেও একটা শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। মুসলমানগণ ইসলামের নামে অধিবাসীবৃন্দকে আহ্বান করিতেই তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মুসলমানগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু একজন ব্যতীত সকলেই শহীদ হন।

এই সময়ে আরও একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটে। ইসলামের দাওয়াতপত্র সঙ্গে দিয়া হারিস–বিন্–ওমায়ের নামক জনৈক প্রিয় শিষ্যকে হযরত বসরার শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। ওমায়ের মুতা নামক স্থানে উপনীত হইলে শোরাহ্ বিন নামক জনৈক খ্রীষ্টান–প্রধান তাহাকে আটক করিয়া ফেলে এবং অশেষ যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করে। কোন দূতকে এরূপভাবে হত্যা করা সকল দেশের আন্তর্জাতিক নীতিরই বর্‌খেলাফ্। এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবার জন্য হযরত বদ্ধসংকল্প হন।

শুধু দূতকে হত্যা করিয়াই যে খ্রীষ্টানগণ ক্ষান্ত রহিল, তাহাও নহে। রোমক–সম্রাট হিরাক্লিয়াস প্রথমত হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি দেখাইলেও পরে অবস্থার চাপে পড়িয়া তিনিও ইসলামের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। দিকে দিকে যখন ইসলামের লাল মশাল জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, তখন তিনি বিপদ গনিলেন। কিসে ইসলামের এই বিজয় গতিকে রোধ করা যায়, ইহাই হইল তাঁহার প্রধান চিন্তা।

এই সময়ে হিরাক্লিয়াসের মনোভাব যে কিরূপ ছিল তাহা একটি ঘটনায় সুপ্রকট হইয়া আছে। ফারোয়া নামক জনৈক আরব–খ্রীষ্টান তখন সিরিয়ার 'মা–আন' প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত ছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি মুসলমান হন এবং একখানি পত্র লিখিয়া হযরতের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেন। এই সংবাদ শুনিয়া হিরাক্লিয়াস পদোন্নতির প্রলোভন দেখাইয়া ফারোয়াকে পুনরায় খ্রীষ্টধর্মে ফিরাইয়া আনিতে প্রয়াস পান। কিন্তু ফারোয়া প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। হিরাক্লিয়াসকে তিনি জানাইয়া দিলেন : "আমি কিছুতেই মুহম্মদদের ধর্ম ত্যাগ করিব না। যীশুখ্রীষ্ট ইঁহার সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন, ইহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনিও হয়ত মুসলমান হইতেন, কেবল রাজ্য ও প্রতিপত্তি হারাইবার ভয়ে তাহা পারিতেছেন না।"

www.pathagar.com

ক্রুদ্ধ সম্রাট ফারোয়ার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু ইহাতেও ফারোয়া বিচলিত হইলেন না। অতুল সুখসম্পদ ও উচ্চ রাজপদ তুচ্ছ করিয়া সত্যের জন্য হাসিমুখে তিনি মরণ বরণ করিলেন।

এইখানেই খ্রীষ্টানদিগের দুষ্কৃতির শেষ হইল না। মদিনা আক্রমণের জন্য তাহারা গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিল। শোরাহ্ বিল হইল তাহার প্রধান পাণ্ডা।

হযরতের নিকট যথাসময়ে এই সংবাদ পৌঁছিল। অবিলম্বে তিনি তিন হাজার সৈন্যের একটি অভিযান মূতার দিকে প্রেরণ করিলেন।

এই অভিযানের নায়ক হইলেন জায়েদ— সেই ক্রীতদাস জায়েদ—হযরত যাঁহাকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিন হাজার সম্ভ্রান্ত বংশীয় মোহাজের ও আনসারদিগের নেতা আজ এই ক্রীতদাস! আলির ভ্রাতা জাফর, কবি আবদুল্লাহ্ বিন্-রওয়াহা, নবদীক্ষিত বীর-যোদ্ধা খালিদ প্রমুখ গণ্যমান্য বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই অভিযানে যোগ দিয়াছিলেন; কিন্তু সবার শীর্ষে স্থান লাভ করিলেন জায়েদ। জাফর আবিসিনিয়া হইতে সবেমাত্র মদিনায় আসিয়াছিলেন, বংশ মর্যাদার মোহ হয়ত তখনও তাঁহার মনে জাগিয়াছিল; তিনি তাই প্রথমত: জায়েদের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলেন; কিন্তু হযরত যখন জাফরকে একটু মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বিশদ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন জাফর নীরব হইলেন। দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি অন্যান্য সকলের মতই জায়েদকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

বিস্ময়ের বিষয় বটে! ইসলাম মানুষকে কোথা হইতে কোথায় টানিয়া তুলিতে পারে, পাঠক তাহা একবার লক্ষ্য করুন।

এই অভিযান প্রেরণের সময় হযরত যথেষ্ট দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্ববর্তী অন্যান্য অভিযানে হযরত মাত্র একজনকেই নেতা নিযুক্ত করিয়া দিতেন কিন্তু এবার তিনি অন্যরূপ নির্দেশ দিলেন। বলিলেন : "যদি জায়েদের পতন হয়, তবে জাফর এবং জাফরের যদি পতন হয়,তবে আবদুল্লাহ-বিন-রওয়াহা সেনাপতি পদে বরিত হইবেন। যদি পর পর তিনজনই নিহত হন, তবে মুসলমানগণ নিজেদের মধ্য হইতে তাহাদের সেনাপতি নির্বাচিত করিয়া লইবে।"

যাত্রাকালে হযরত 'বিদায়-পর্বত' পর্যন্ত অভিযাত্রীদের সঙ্গে গেলেন। সকলকে উপদেশ দিয়া বলিয়া দিলেন : "সাবধান! কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে, বালক-বালিকাকে বা স্ত্রীলোককে বধ করিও না। শত্রুদিগের কোন বৃক্ষ ছেদন করিও না, কোন গৃহ জ্বালাইয়া দিও না, শুধু আল্লাহ্র শত্রুকেই বধ করিবে এবং সর্বদা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিবে।" অতঃপর সকলকে শুভাশিস জানাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

জায়েদ সেনাদলসহ সিরিয়া সীমান্তে উপনীত হইতেই শুনিতে পাইলেন, 'মআব' অঞ্চলে এক লক্ষ খ্রীষ্টান সৈন্য তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং স্বয়ং কায়সার তাহাদিগকে পরিচালনা করিতেছেন। এই সংবাদে মুসলমানগণ একটু দমিয়া গেলেন। এক লক্ষ সুসজ্জিত শত্রুসেনার মুকাবেলায় মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য! সকলে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন : অবস্থা যখন এইরূপ, তখন মদিনায় সংবাদ পাঠানোই সমীচীন। আবদুল্লাহ্-বিন্-রওয়াহা একথা সমর্থন করিলেন না, উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন : "হে মুসলিম বীরবৃন্দ, এ কী কথা বলিতেছ আজ? আসিবার সময় আমরা ত লাভ-লোকসানের খতিয়ান করিয়া আসি নাই। শুধু

www.pathagar.com

জয়লাভই ত আমাদের কাম্য নহে, শাহাদতও আমাদের কাম্য। জয়লাভ করিতে পারি ভালই, অন্যথায় ইসলামের নামে—আল্লাহ্‌র নামে—আমরা শহীদ হইব। জয় হইলেও আমাদের লাভ, পরাজয় হইলেও আমাদের লাভ। কেন তবে আজ ভীত হইতেছ? কোন ভয় নাই: চল তিন হাজার সৈন্য লইয়াই আমরা এক লক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। ঈমানের তেজে আমরা জয়ী হইব।"

এই জ্বলন্ত বীরবাণী শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সকল দুর্বলতা মুহূর্ত মধ্যে কোথায় ভাসিয়া গেল। শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য বীরদল তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন। মুতা নামক স্থানে উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

জায়েদ দক্ষতার সহিত সৈন্য বিন্যাস করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন ইসলামের জয় পতাকা তিনিই তুলিয়া ধরিলেন। বহুক্ষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবার পর জায়েদ নিহত হইলেন। তখন জাফর ছুটিয়া গিয়া সেই পতাকা তুলিয়া লইলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তিনিও শহীদ হইলেন। এইবার আবদুল্লাহ্‌র পালা। তাড়াতাড়ি তিনি ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও বেশীক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিলেন না—শত্রু হস্তে অচিরেই প্রাণ হারাইলেন। মুসলমানগণ তখন বিপদ গনিলেন। কাহাকে এইবার নেতৃত্ব দান করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি পরামর্শ করিবার পর সকলের মনোনয়ন পড়িল বীরেন্দ্র খালিদের উপর। খালিদ অম্লানবদনে নতমস্তকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

মুহূর্ত-মধ্যে পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। কোন্ তড়িৎশক্তি বলে মুসলমানগণ যেন শক্তিমান হইয়া উঠিলেন। সেনাদলের নষ্ট শৃঙ্খলা এবং আহত মনোবল আবার ফিরিয়া আসিল। কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই খালিদের!

কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সেদিনকার মত যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাদপসরণ করাই খালিদ সঙ্গত মনে করিলেন। অতি সুকৌশলে তিনি মুসলিম সেনাদলকে বাঁচাইয়া হটিয়া আসিলেন। বলা বাহুল্য, এই পশ্চাদপসরণ খালিদের অসামান্য রণচাতুর্যের ফলেই সম্ভব হইল।

এইরূপ একটা বিভ্রাট যে ঘটিবে মাদিনায় বসিয়া হযরত তাহা আপন মনেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। হযরত তাই পূর্ব হইতেই একদল সহকারী সেনা মুতা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এই সেনাদল আসিয়া খালিদের সহিত মিলিত হইল। তখন মুসলমানগণ আবার নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিলেন। নবরূপে ব্যূহবিন্যাস করিয়া খালিদ আবার খ্রীষ্টানদিগের সম্মুখীন হইলেন। খ্রীষ্টানেরা বিস্মিতও হইল, ভীতও হইল। ভাবিল মদিনা হইতে এবার অসংখ্য সেনা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে।

পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মুসলমানগণ প্রচণ্ড বেগে খ্রীষ্টানদিগকে আক্রমণ করিলেন। একা খালিদের হস্তেই আটখানি তরবারি ভাঙিয়া গেল। এইদিন মুসলমান সৈন্যের প্রত্যেকেই এমন দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং সর্বত্রই এমন অসামান্য বীরত্ব দেখাইলেন যে, খ্রীষ্টানগণ বেশীক্ষণ আর তিষ্ঠিতে পারিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।

মুসলিম বীরদল তখন জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিলেন। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ বিজয়-গৌরবে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন।

www.pathagar.com

জাফর ও জায়েদকে হারাইয়া হযরত অন্তরে খুবই বেদনা অনুভব করিলেন। জাফরের গৃহে যাইয়া তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগকে কোলে লইয়া তিনি আদর করিতে লাগিলেন। জাফরের স্ত্রী আস্‌মা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কান্না দেখিয়া হযরত স্থির থাকিতে পারিলেন না, অশ্রুসজল চোখে নীরবে বাহির হইয়া আসিলেন।

অতঃপর হযরত জায়েদের গৃহে গমন করিলেন। জায়েদের শিশু কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিয়া হযরতের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হযরতও নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে জনৈক সাহাবী হযরতকে বলিলেন : "ইয়া রাসুলুল্লাহ্! আপনি যদি এমনভাবে কাঁদিবেন,তবে আমরা কি করিব? এরূপ করিয়া কাঁদিতে ত আপনিই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।"

হযরত তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন : "এ কান্না দোষের নহে; ইহা বন্ধুর প্রতি বন্ধুর সমবেদনা প্রকাশ।"

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫২
মক্কা–বিজয়

অষ্টম হিযরী। রমযান মাস।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল।

সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, আরবের যে-কোন গোত্র হযরত মুহম্মদের সহিত অথবা কোরেশদিগের সহিত স্বাধীনভাবে যোগাযোগ রাখিতে পারিবে, তাহাতে কোন পক্ষই বাধা দিবে না। এই সন্ধির বলে মক্কার 'খোজা' সম্প্রদায় মুহম্মদের পক্ষ অবলম্বন করিল এবং বনি-বকর সম্প্রদায় কোরেশদিগের সহিত যোগ দিল। বনি-খোজা ও বনি-বকর গোত্রের মধ্যে পূর্ব হইতেই ভীষণ শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। কাজেই খোজাগণ মুহম্মদের পক্ষ গ্রহণ করায় বনি-বকরগণ তাহাদের উপর কুপিত হইয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণও খোজাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মক্কায় বাস করিয়া মুহম্মদের সহিত মিতালি? কোরেশদিগের প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন! খোজাদিগকে জব্দ করিবার জন্য তাই তাহারা বনি-বকরদিগকে উস্‌কাইয়া দিল।

'ওয়াতির' নামক একটি নিভৃত পল্লীতে ছিল খোজা গোত্রের বসতি। একদিন রাত্রিকালে স্ত্রী-পুত্র-পরিজনসহ তাহারা সুখে ঘুমাইয়া আছে, এমন সময় কোরেশ ও বনি-বকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাহাদের পল্লী আক্রমণ করিল। এই অতর্কিত নৈশ আক্রমণের ফলে নিরীহ খোজাদিগের বহু নরনারী প্রাণ হারাইল। অনেকে প্রাণ ভয়ে ছুটিয়া গিয়া কাবা-গৃহে আশ্রয় লইল। কাবার চতুঃসীমার মধ্যে নরহত্যা নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু পাষণ্ডরা সেকথাও ভুলিয়া গিয়া খোজাদিগকে ধরিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিল।

এই হত্যাকাণ্ডের পর খোজাগণ হযরতের নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। হযরত দেখিলেন : রাজনীতি বা ধর্মনীতি যে কোন দিক্ দিয়াই তিনি এখন খোজাদিগকে সাহায্য করিতে বাধ্য। বিভিন্ন জাতি যখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষামূলক (Offensive and defensive) সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, তখন একের বিপদে অপরকে সাহায্য করিতেই হয়। ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। হযরত তাই আশ্রিত খোজা সম্প্রদায়কে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সোজাসুজি কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিয়ান না পাঠাইয়া তিনি প্রথমত তাহাদের নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের মারফৎ এই কয়েকটি প্রস্তাব পাঠান হইল :

১. হয় তোমরা বনি-খোজা গোত্রকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার কর;

২. নহে ত বনি-বকর গোত্রের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন কর;

৩. নহে ত হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা কর।

কোরেশদিগের মন পূর্ব হইতেই বিষাক্ত হইয়াছিল; কাজেই এই তিনটি শর্তের মধ্যে শেষোক্ত শর্তটি তাহারা গ্রহণ করিল। উৎসাহের সহিত তাহারা বলিয়া দিল; আমরা তৃতীয় শর্তই মানিয়া লইলাম।

www.pathagar.com

দূত মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া হযরতকে সব কথা বলিলেন, হযরত তখন বুঝিলেন, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

এদিকে কোরেশ নেতা আবু সুফিয়ান একটু ভীত হইয়া পড়িল। হোদায়বিয়ার সন্ধি বাতিল করিয়া তাহারা যে ভাল কাজ করে নাই, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। হয়ত শীঘ্রই মুহম্মদ মক্কা আক্রমণ করিবে–এ আশঙ্কাও তাহার মনে জাগিল। সে তখন তাড়াতাড়ি মদিনায় আসিয়া হযরতকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল; "বনি–বকর গোত্রকে সাহায্য করিলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ত তাহাতে ক্ষুণ্ন হইতেছে না। আমরা সে সন্ধি মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছি।"

কিন্তু এ ধোঁকাবাজিতে হযরত ভুলিবেন কেন? তিনি বলিলেন : "হোদায়বিয়ার সন্ধি যদি মানিয়াই চলিবে, তবে উপযুক্ত অর্থ দিয়া বনি–খোজাদিগের ক্ষতিপূরণ করিতেছ না কেন? যদি ইহা করিতে, তবেই বুঝিতাম যে, সত্যই তোমরা আমার সহিত শান্তি বজায় রাখিতে ইচ্ছুক। শুধু মুখের কথায় চলিবে না।"

আবু সুফিয়ান এই কথার জবাব দিল না। মদিনার মস্‌জিদ–প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া সে ঘোষণা করিল : "মদিনাবাসীগণ শোন, আমি হোদায়বিয়ার সন্ধিকে পুনঃস্থাপিত করিয়া গেলাম।" এই বলিয়া সে মদিনা ত্যাগ করিল।

হযরত বৃথা কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিন যুদ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন।

সতর্কতার সহিত সমস্ত আয়োজন চলিতে লাগিল। অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন : এমন কি, প্রথম প্রথম জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরও এ–সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। অভিযানের সংবাদ যাহাতে মক্কায় না পৌঁছিতে পারে, হযরত সেজন্য মদিনার চারিপাশে কড়া পাহারা বসাইলেন।

এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি? পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জাগিতে পারে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, মক্কা অভিযানের সংবাদ যদি কোরেশগণ পূর্বাহ্নেই জানিতে পারে, তবে তাহারাও বিপুল সমরায়োজন করিবে; ফলে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিবে এবং কোরেশগণ নির্মূল হইয়া যাইবে। হযরত এরূপ ধ্বংসমূলক বিজয় চান নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন কোরেশদিগকে রক্ষা করিতে; তিনি চাহিয়াছিলেন প্রেম দিয়া জয় করিতে, মানবতা দিয়া জয় করিতে। এই জন্যই তিনি কোরেশদিগকে প্রস্তুত হইবার কোন অবসর দেন নাই।

হাতিব নামক হযরতের জনৈক বিশ্বস্ত সহচর এই সময়ে একটি কাণ্ড করিয়া বসিলেন। হযরতের সহিত তিনি মদিনায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী–পুত্রাদি তখন পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করিতেছিল। এজন্য তিনি আশঙ্কা করিতেছিলেন, মক্কা–আক্রমণের সময় তাঁহার স্ত্রী–পুত্রের উপর কোরেশগণ চরম অত্যাচার করিবে। এই কারণে কোরেশদিগের সহানুভূতি আকর্ষণের বাসনায় তিনি একখানি গোপন পত্রসহ উম্মেসারা নাম্নী জনৈকা ক্রীতদাসীকে মক্কায় পাঠাইয়া দেন। সেই পত্রে মক্কা আক্রমণের সংবাদ দিয়া কোরেশদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয়, হযরত এই গুপ্তকথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন। আলি ও জুবায়েরকে ডাকিয়া বলিলেন : "শীঘ্র যাও, রওজাখাক নামক স্থানে না পৌঁছিয়া দম লইবে না সেখানে গিয়া দেখিবে একজন ক্রীতদাসীর নিকট একখানা পত্র আছে, সেখানা লইয়া আইস।"

www.pathagar.com

আদেশ শ্রবণমাত্র আলি ও জুবায়ের অশ্বারোহণে দ্রুতগতিতে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। দেখি ন. উম্মে-সারার নিকট সত্যিই একখানি পত্র রহিয়াছে। পত্রসহ ক্রীতদাসীকে ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহারা হযরতের হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই কার্যের জন্য হাতিবের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হইল। হাতিব হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া অকপটে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। নিজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই যে তিনি এ কার্য করিয়াছেন, ইহা ছাড়া যে তাঁহার মনে অন্য কোন দুরভিসন্ধি নাই, এ কথা তিনি বুঝাইয়া বলিলেন। উগ্রমনা ওমর হাতিবের এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইলন না; কওম ও মিল্লাতের স্বার্থকে বিপন্ন করিয়া হাতিব নিজের স্বার্থের চিন্তা করিয়াছে, এই অপরাধে তিনি হাতিবকে 'গর্দান' মারিবার জন্য হযরতকে বলিলেন। কিন্তু ইসলামের জন্য হাতিবের সেবা ও ত্যাগ নগণ্য ছিল না। কাজেই হযরত তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে দশ হাজার মুসলিম সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হইয়া গেল। ১০ই রমযান তারিখে হযরত সকলকে লইয়া মদিনা হইতে যাত্রা করিলেন। "দশ সহস্র ন্যায়নিষ্ঠ সহচরসহ তিনি আসিলেন-" হযরত মুসার এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সফল হইতে চলিল।

মক্কার উপকণ্ঠে 'মার-উজ্-জহ্রান' নামক গিরি-উপত্যকায় আসিয়া হযরত শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। সন্ধ্যার পর খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য শিবিরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে পর্বতটি এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করিল। মক্কা হইতে কোরেশগণ সে দৃশ্য দেখিয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতবড় অভিযান লইয়া হযরত এত শীঘ্র যে মক্কা আক্রমণ করিবেন, কোরেশগণ তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। এই অভিযানের পূর্বায়োজন সম্বন্ধেও তাহারা আজ পর্যন্ত কোন খবর পায় নাই—এতই সংগোপনে ও সতর্কতার সহিত মস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

কোরেশ-নেতা আবু সুফিয়ান হতভম্ব হইয়া পড়িল। কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। মদিনাবাসীরা সত্যসত্যই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিতেছে কিনা, সৈন্য-সংখ্যাই বা কত, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য তাহার বড় কৌতূহল জন্মিল। রাত্রিবেলায় হাকিম ইব্নে-নিজাম এবং বুদায়েল নামক দুইজন সহচরসহ সে উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইল।

সহসা কৃষ্ণবর্ণের কয়েকটি ছায়ামূর্তি তাহাদের সম্মুখে আসিয়া গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিল : "দাঁড়াও। তোমরা বন্দী।"

ওমর একদল রক্ষী সৈন্যসহ ছদ্মবেশে চতুর্দিকে পাহারা দিয়া ফিরিতেছিলেন। আবু সুফিয়ান ও তাহার বন্ধুদ্বয় তাঁহাদেরই হস্তে বন্দী হইল।

ওমর বন্দীত্রয়কে লইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হইলেন।

প্রাণের বৈরী—ইসলামের বৈরী-আল্লাহ্‌র বৈরী এই আবু সুফিয়ান। সুদীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া হযরতের উপর এবং নিরপরাধ মুসলমানদিগের উপর কী নিষ্ঠুর অত্যাচারই না করিয়াছে সে। এহেন শত্রুকে হাতে পাইয়া নূরনবী কি করিলেন? কতল করিবার হুকুম দিলেন? না। জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করিলেন? তা-ও না। মহাপুরুষের অন্তর করুণায় বিগলিত হইয়া গেল। কোরেশ—নেতার ভ্রান্তি ও পাপের জন্য তিনি বেদনা অনুভব করিলেন। করুণ-মধুর স্বরে আবুসুফিয়ানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

www.pathagar.com

"আবুসুফিয়ান, এখনও কি তোমার ভুল ভাঙিবে না? এখনও কি তুমি আমাকে আল্লাহ্‌র রসুল বলিয়া স্বীকার করিবে না? এখনও কি দেব-দেবীদিগকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে?"

আবু সুফিয়ান উত্তর দিল : "কিছুদিন যাবৎ এই প্রশ্ন আমারও মনে জাগিতেছে। দেব-দেবীকে কি করিয়া আর এখন সত্য বলি? তাহারা সত্য হইলে নিশ্চয়ই এই বিপদে আমাদিগকে সাহায্য করিত।"

আবু সুফিয়ানের মনের আঁধার কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া হযরতের প্রাণ খুশিতে ভরিয়া উঠিল। বলিলেন : "তবে আর কেন? বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্!"

আবু সুফিয়ানের প্রাণ একথায় সম্পূর্ণ সায় দিল না। আলো-আঁধারের মাঝখানে দোল খাইতে খাইতে ভাঙা কণ্ঠে সে ঘোষণা করিল : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্।"

হযরত তখন আবু সুফিয়ানের মনের অবস্থা বুঝিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। সত্য যে ধীরে ধীরে তাহার আপন আসন সম্পূর্ণভাবেই অধিকার করিয়া লইবে, একথা তিনি বুঝিলেন।

হযরত তখন আবু সুফিয়ানকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিলেন। এক অপূর্ব বেহেশ্‌তী দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। চিরজীবনের বৈরী আজ তাঁহার মিত্র হইতেছে, আজ তাঁহারই নিকট সে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কত বড় বিজয় এ! এতদিনকার সব বিজয় অপেক্ষা এই বিজয়কেই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন।

আবু সুফিয়ান নম্রভাবে বলিলেন : "মুহম্মদ, তুমি কি কোরেশদিগকে আজ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে? আজ যদি তুমি অনুগ্রহ না দেখাও, তবে তোমার স্বজাতি ও স্বগোত্রের লোকেরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

এই সময় হযরতের চাচা আব্বাসও হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এতদিন তিনি কোরেশদিগের ভয়ে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু এবার সে ভয় তাঁহার দূর হইল। সুযোগ বুঝিয়া এখন তিনি হযরতের সহিত যোগ দিয়া প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আবু সুফিয়ানের পক্ষ হইয়া তিনি বলিলেন : 'মুহম্মদ, আবু সুফিয়ান ছিলেন এতদিন কোরেশদিগের নেতা। আজিকার দিনে তুমি তাঁহাকে একটা কিছু বিশেষ অনুগ্রহ দেখাও নতুবা তাঁহার মর্যাদা থাকে না।"

হযরত বলিলেন : "নিশ্চয়ই আমি সে মর্যাদা তাহাকে দিব।" অতঃপর আবু সুফিয়ানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন : "নগরে গিয়া ঘোষণা করিয়া দাও, আবুসুফিয়ানের নাম যাহারা করিবে, অথবা তাহার গৃহে যাহারা আশ্রয় লইবে, তাহাদের কোন ভয় নাই। এতদ্ব্যতীত নিজগৃহে যাহারা আবদ্ধ থাকিবে, অথবা কাবা গৃহের শরণ লইবে, তাহাদিগকেও আজ আমি কিছু বলিব না।"

আবুসুফিয়ান তাড়াতাড়ি মক্কায় ফিরিয়া গিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন : 'কোরেশগণ, শোন, মুহম্মদ দশ হাজার সৈন্য লইয়া আমাদের দুয়ারে দণ্ডায়মান। আজ আর কাহারও নিস্তার নাই। যে-কেহ কাবা-গৃহে অথবা আমার গৃহে আশ্রয় লইবে, অথবা নিজগৃহে আবদ্ধ থাকিবে, সে-ই আজ নিরাপদ। জানিয়া রাখ, আমি আর এখন তোমাদের দলপতি নই, আমি এখন মুসলমান।"

www.pathagar.com

কোরেশগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া উঠিল। কেহ বা কাবা-গৃহে কেহ বা আবু সুফিয়ানের গৃহে ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল, কেহ বা তাড়াতাড়ি গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

প্রত্যূষেই বীর-নবী নগর-প্রবেশের আয়োজন করিলেন। বিভিন্ন দলপতিদিগকে বিভিন্ন দিক দিয়া মক্কা-প্রবেশের আদেশ দিলেন, কিন্তু কাহাকেও আজ আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। নিশান উড়াইয়া কাতারে কাতারে সেনাদল বীরপদভরে চলিতে লাগিল। সকলের শেষে ক্রীতদাস জায়েদের পুত্র ওসামার সহিত হযরত একই উটের পিঠে চড়িয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কী মোহনীয় এই দৃশ্য! ক্রীতদাসের সম আসনে আজ এই সম্রাট! অন্য কোন সেনাপতি হইলে আজ কী আড়ম্বরেই না নগর প্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইত। চতুর্দোলায় চড়িয়া নিশ্চয়ই তিনি বিজয়মত্ত সেনাদলের পুরোভাগে থাকিতেন। কিনতু হযরত চলিয়াছেন আজ সবার পিছনে সামান্য একটি উটে চড়িয়া। তাও আবার একজন ক্রীতদাসকে পার্শ্বে বসাইয়া। নতমস্তকে বিনীতভাবে সকলের আড়াল দিয়া বিজয়ী বীর আজ মুখ লুকাইয়া চলিয়াছেন। ইহা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব—মানুষকে যিনি অকপটে ভালবাসেন-মানুষের অজ্ঞানকৃত অপরাধকে যিনি ক্ষমার চক্ষে দেখেন—সকল বিজয়ের মাঝখানে যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌র করুণা স্পর্শ অনুভব করেন।

হযরতের হৃদয় বাস্তবিকই আজ ভাবের আবেগে বিহ্বল। দীর্ঘ একুশ বৎসর ধরিয়া শত অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিয়া বন্ধুর কন্টকাকীর্ণ পথ বাহিয়া আজ তিনি সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করিতেছেন। সকল কাঁটা আজ ফুল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। অতীতের কোন আঘাত বা বেদনার কথা আজ তাঁহার মনে নাই। আজ শুধু সার্থকতার আনন্দ—আজ শুধু বিজয়ের গৌরব। আজ বারে বারে তাঁহার মস্তক কৃতজ্ঞতায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নত হইয়া পড়িতেছে।

নগর-প্রবেশের পর হযরত সর্বপ্রথম শিষ্যবৃন্দকে লইয়া কাবা-শরীফের দিকে অগ্রসর হইলেন। পরম ভক্তি ভরে কাবার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। বহু কোরেশ নর-নারী এই সময় কাবা-গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা ভয়ে ভয়ে হযরতের গতিবিধির প্রতি নীরবে লক্ষ্য রাখিতে লাগিল। তাহাদের মনে আজ মহাভয়, মহা আতঙ্ক। কখন কী শাস্তি যেন তাহাদের উপর নামিয়া আসে, এই চিন্তায় তাহারা আজ ব্যাকুল। আত্মকৃত সকল অপরাধের চেতনা আজ দোযখের অগ্নির মত তাহাদিগকে দহন করিতে লাগিল।

হযরত কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ভরিয়া 'আল্লাহ আকবর' ধ্বনি করিতে লাগিলেন; ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে সে ধ্বনি রণিয়া রণিয়া ফিরিতে লাগিল। কাবার আকাশে-বাতাসে তখন শুধু তৌহিদের তড়িৎ-প্রবাহ খেলিতেছিল। স্তরে স্তরে সুসজ্জিত ৩৬০টি প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই হযরত তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন : "সত্য আজ সমাগত। মিথ্যা বিতাড়িত। মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" ইহাই বলিয়া তিনি ওমরকে মূর্তিগুলি বাহিরে ফেলিয়া দিতে বলিলেন। ওমর হযরতের আদেশ পালন করিলেন। পাষাণ দেবতার অধিকার হইতে আল্লাহ্‌র ঘর আজ মুক্ত হইল। আল্লাহ্‌র ঘরে আল্লাহ্ ফিরিয়া আসিলেন।

নামাযের সময় উপস্থিত হইল। হযরত বেলালকে আযান দিতে বলিলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া বেলাল আযান দিলেন। দলে দলে মুসলমানগণ কাবা-প্রাঙ্গণে সমবেত

www.pathagar.com

হইলেন। হযরত সকলকে লইয়া সেইখানে নামায পড়িলেন। কোরেশগণ সেই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

নামাযান্তে হযরতের দৃষ্টি পড়িল সমবেত কোরেশ নর-নারীর প্রতি। সকলকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন : "কোরেশগণ, বল, আজ তোমরা কি ভাবিতেছ?"

"আমাদের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছি,"-তাহারা উত্তর দিল। "দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা তোমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছি, আজ তুমি তাহার কি প্রতিফল দিবে। তাহাই ভাবিতেছি।"

আপন স্বজাতি ও স্বদেশবাসীর নিঃসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া মহাপুরুষের অন্তর করুণায় গলিয়া গেল। এত যে অবিচার, এত যে আঘাত, তবু তিনি হাসিমুখে বলিলেন: "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনই অভিযোগ নাই। তোমাদের সব অভিযোগ মাফ করিলাম। যাও, তোমরা সকলে আযাদ।"

এত বড় করুণা—এত বড় মহিমা কে কোথায় দেখিয়াছে? এত বড় ক্ষমা কে কোথায় করিয়াছে? প্রতিশোধ গ্রহণের কোন কথা নাই, বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার কোন মতলব নাই। হাতে পাইয়াও যিনি দুশ্‌মনকে এমনভাবে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনি কত মহৎ! কোরেশগণের মুখে কোন কথা সরিল না। তাহারা জাগ্রত না স্বপ্নাচ্ছন্ন বুঝিতে পারিল না। কোন্ এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রে তাহারা অভিভূত হইয়া পড়িল। অশ্রুসজল নয়নে তাহারা হযরতের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিল : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্!"

স্থলে-জলে অন্তরীক্ষে ইসলামের বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বিশ্ব-প্রকৃতি অনিমেষ নেত্রে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

কত সুন্দর-কত অদ্ভুত এই বিজয়! রক্তপাত নাই, ধ্বংস-বিভীষিকা নাই। প্রেম দিয়া, পুণ্য দিয়া, ক্ষমা দিয়া এই বিজয়! পৃথিবীর ইতিহাসে বহু চমকপ্রদ বিজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়া আছে বহু বীর-সেনাপতি বহু দেশ জয় করিয়া অমর হইয়াছেন। কিন্তু এতবড় রক্তবিহীন মহাবিজয় কোথাও কেহ দেখিয়াছে কি? এ বিজয় নূতন নূতন যুগের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়াছে; ইহার মধ্য দিয়া জগতে নবজাতি,নবরাষ্ট্র ও নবসভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্ধ কুসংস্কারের চাপে পড়িয়া ধরণী এতদিন আড়ষ্ট হইয়াছিল, পাপ-পঙ্কে তাহার প্রগতি-পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, বিকৃত নৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে মনুষ্য-বসতি একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়ছিল; কিন্তু এই বিজয়ের পর হইতে ধরণী আবার নববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। মহাসাগরের ঢেউ আসিয়া ইহার সকল জঞ্জাল ভাসাইয়া লইয়া গেল; মহাসূর্যের জ্যোতি আসিয়া ইহাকে আলোকে-পুলকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল; মানুষ আবার নূতন জীবন লাভ করিল। কণ্ঠে ফুটিল নূতন ভাষা, বক্ষে জাগিল নূতন আশা, চক্ষে লাগিল অনন্ত সম্ভাবনার স্বপ্ন। জগতের ইতিহাসে তাই ত এ এক মহাস্মরণীয় দিন।

মক্কা-বিজয় তাই কোন বিশেষ একটা দেশ বিজয় নয়, ইহা একটা আদর্শের বিজয়! এ বিজয় কোরেশদিগের উপর নয় মিথ্যার উপর ইহা সত্যের বিজয়, অন্ধকারের উপর ইহা আলোকের বিজয়! নিপীড়িত ধরণী যুগ যুগ ধরিয়া এই মুক্তি ফৌজের স্বপ্ন দেখিতেছিল—এই দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫৩
মক্কা–বিজয়ের পরে

মক্কা–বিজয়ের পরের দিন।

কাল আর আজ। কত পার্থক্য। কত ওলট–পালট। কাল যেখানে প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমার পূজা হইয়াছে, আজ সেখানে তৌহিদের কলঝঙ্কার উঠিতেছে। কাল যাহারা দেবতাকে আপন জানিয়া মানুষকে দূরে ঠেলিয়া দিয়াছে আজ তাহারাই দেবতাদিগকে নির্বাসিত করিয়া মানুষকে বুকে টানিয়া লইতেছে। কাল ছিল যে পরম শত্রু, আজ সে হইয়াছে অন্তরতম বন্ধু। নিয়তির কি বিচিত্র পরিহাস!

মক্কা–বিজয়ের পর হযরত নগরবাসীদিগের নিকট সাধারণ ক্ষমা ও অভয়বাণী ঘোষণা করিলেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা—ওহদ যুদ্ধে যে হামজার হৃৎপিণ্ড চিবাইয়া খাইয়াছিল—সেও আজ ক্ষমা পাইল। ফোজালা নামক এক পাষণ্ড কাবা–প্রদক্ষিণের সময় হযরতকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িয়াছিল; মহানবী আজ তাহাকেও ক্ষমা করিলেন। আবু যহেলের পুত্র ইকরামা যে এই হত্যার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং প্রাণভয়ে সমুদ্রতীরে পলাইয়া গিয়া একখানি বিদেশগামী জাহাজে দেশত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাকেও তিনি অভয় দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। 'রহমতুল্লিল–আল আমিনে'র করুণা–ধারায় আজ প্রত্যেকের হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

নগর–সীমার মধ্যে হযরত রক্তপাত নিষেধ করিয়া দিলেন। কিন্তু খোজাগণ সপক্ষীয়দের বিজয়ের সুযোগ লইয়া বনি–বকর গোত্রের কতিপয় লোককে সহসা আক্রমণ করিয়া বসিল এবং একজনকে নিহত করিয়া পূর্বপোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিল। সংবাদ শ্রবণ মাত্র হযরত খোজাদিগকে ডাকিয়া তিরস্কার করিলেন এবং বলিয়া দিলেন : "নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আমি নিজ হইতে দিতেছি; কিন্তু সাবধান, এখন হইতে যে–কেহ নরহত্যা করিবে, তাহাকে নিজের রক্ত দিয়া ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে।"

মক্কার উপকণ্ঠে কতিপয় গোত্র বাস করিত। হযরত তাহাদের নিকটেও শান্তির বাণী প্রেরণ করিলেন। বীরবর খালিদকে বনি-যাজিমা গোত্রের নিকট পাঠান হইল। খালিদ গিয়া তাহাদিগকে ইসলামের নামে আহ্বান করিলেন। কিন্তু বনি–যাজিমাগণ তাহার প্রত্যুত্তরে খালিদের প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিল।

যুদ্ধমনা খালিদ এ ধৃষ্টতা বরদাশ্‌ত করিতে পারিলেন না। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হইল এবং বনি-যাজিমাদিগের কয়েকজন লোক প্রাণ হারাইল। হযরতের নিকট যখন এই সংবাদ পৌছিল, তখন তিনি খালিদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন : "ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি জান, খালিদের এই কার্যের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই।" এই বলিয়া তিনি উপযুক্ত রক্তপণসহ আলিকে বনি-যাজিমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আলি গিয়া বনি–যাজিমাদিগের প্রতি হযরতের

www.pathagar.com

সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন এবং উপযুক্ত পণ অপেক্ষাও কিছু বেশী অর্থ তাহাদিগকে দিলেন। বনি-যাজিমাগণ যখন দেখিল হযরতের মনে কোন অসদাভিপ্রায় নাই, তখন তাহারা শান্ত হইল এবং হযরতের উদার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

বিজয়ের উন্মাদনা প্রশমিত হইলে দলে দলে লোক আসিয়া হযরতের নিকট দীক্ষা লইতে লাগিল। অবিশ্বাসী নরনারীর অন্তরের অবরুদ্ধ ভক্তিপ্রেম আজ যেন গৈরিক-নিঃস্রাবে ঢলিয়া পড়িল। ভক্ত-প্রবর আবুবকর তাঁহার শুভ্রকেশ কুব্জপৃষ্ঠ বৃদ্ধ পিতা আবু-কোহাফাকেও হযরতের নিকট লইয়া আসিলেন। বৃদ্ধ তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই; পৌত্তলিক বেশেই তিনি এতদিন মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। আবুবকর তখন তাঁহাকে আনিয়া হযরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন হযরত সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : "কেন উঁহাকে এখানে টানিয়া আনিয়া কষ্ট দিলে? আমাকে বলিতে ত আমি নিজেই উঁহার নিকট যাইতাম।" এই বলিয়া বৃদ্ধকে হাত ধরিয়া হযরত নিজের পাশে আনিয়া বসাইলেন এাবং তাহার হাতখানি আপন বুকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন : "আল্লাহ্র সত্য ধর্মকে এবার গ্রহণ করুন?" বৃদ্ধ ভক্তিগদগদচিত্তে সম্মতি জানাইলেন; কম্পিত ওষ্ঠে তিনি কলেমা শাহাদৎ পাঠ করিলেন : "আশ্হাদো-আল্-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদুহু লা-শারিকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।" (সাক্ষ্য দিতেছি : আল্লাহ্ ছাড়া কেহই উপাস্য নাই, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহম্মদ তাঁহার বান্দা ও রসুল।)

মক্কার বাহিরের দিকে হযরতের দৃষ্টি পড়িল। বহুদিন পরে স্বদেশের বুকে ফিরিয়া আসিতে পারিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন।

মক্কার আকাশ-বাতাস ও পথ-প্রান্তর আজ তাঁহার বড় ভাল লাগিল। উচ্ছ্বাসভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন : "হে আমার প্রিয় জন্মভূমি, পৃথিবীর মধ্যে আমি তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসি। আমার স্বদেশবাসী আমাকে তাড়াইয়া না দিলে আমি কখনও তোমাকে পরিত্যাগ করিতাম না।"

কাবা-শরীফের চতুর্দিকে যে সীমা-প্রাচীর ছিল, তাহা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। হযরত তৎক্ষণাৎ তাহা মেরামতের ব্যবস্থা করিলেন। ওসমান-বিন-তাল্হা ছিলেন কাবা শরীফের চাবি-রক্ষক। হযরত তাল্হাকে ডাকিয়া কাবার চাবি পুনরায় তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিলেন। হামজা ছিলেন জমজমের পানি সরবরাহের কর্তা; হযরত তাঁহাকেই সেই পদে বহাল রাখিলেন।

এইসব ছোট-খাটো ব্যাপারের মধ্য দিয়া হযরতের সহৃদয়তা কোরেশদিগের অন্তর স্পর্শ করিল। তাহারা বুঝিল, হযরত মক্কাকে তাহাদের মতই ভালবাসেন এবং কাহারও সম্মান বা প্রতিপত্তি নষ্ট করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়।

সুযোগমত হযরত মক্কাবাসীদিগকে লইয়া এক সভা করিলেন। সেই সভায় তিনি এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিলেন। কোরেশদিগকে সাম্য, মৈত্রী ও একতার বাণী শুনাইলেন। বলিলেন : "হে কোরেশগণ, অতীত যুগের সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা মন হইতে মুছিয়া ফেল। কৌলিণ্যের গর্ব ভুলিয়া যাও। সকলে এক হও। সকল মানুষই সমান-একথা বিশ্বাস কর। আল্লাহ্ বলিতেছেন :

www.pathagar.com

"হে মানুষ, আমি তোমাদের সকলকেই (একই উপাদানে) স্ত্রী-পুরুষ হইতে সৃজন করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে ও শাখায় পৃথক করিয়াছি—যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পার।"

এইরূপে সকল গ্লানি ও সকল মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়া হযরত কোরেশ -জাতির অন্তরে দিলেন এক নূতন ইস্‌ম্‌-ই-আযম; সকল ভেদজ্ঞান দূর করিয়া প্রাণে প্রাণে দিলেন এক অভিনব প্রেমের বন্ধন; বক্ষে দিলেন নূতন আশা, কণ্ঠে দিলেন নূতন ভাষা, বাহুতে দিলেন নূতন বল, নয়নে দিলেন নূতন মহাজাতির বীজ আরবের মরুবক্ষে সেদিন প্রোথিত হইল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ: ৫৪
হোনায়েন ও তায়েফ অভিযান

মক্কা-বিজয়ের পর হযরত রসুলে-করিমকে আরও কয়েকটি অভিযানে যোগদান করিতে হইয়াছিল।

হাওয়াজিন নামক একটি শক্তিশালী বেদুঈন গোত্র বহুদিন হইতে হযরতের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া আসিতেছিল। মক্কার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তায়েফের নিকটবর্তী একটি পার্বত্য অঞ্চলে ছিল তাহাদের বসতি। নানা-প্রশাখায় ইহারা পল্লবিত হইয়াছিল। কোরেশদিগের ন্যায় ইহারাও ছিল পৌত্তলিক। মক্কা-বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে ইহারা আরবের বিভিন্ন গোত্রকে হযরতের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়া আসিয়াছে। এতদিন মক্কা ছিল কোরেশদিগের হাতে, তাই তাহারা নিজদিগকে নিরাপদ মনে করিত। কিন্তু যখন দেখিল, মুহম্মদ মক্কা জয় করিয়া লইয়াছেন এবং কোরেশ ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা বিপদ গনিল। মুসলিমগণ তাহাদিগকেও আক্রমণ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া হযরতের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের আয়োজন করিল।

তায়েফের বিন-সাকিফ্ গোত্রও হাওয়াজিনদিগের সহিত যোগ দিল। এক বিরাট শক্তিশালী অভিযান রচনা করিয়া তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইল।

সংবাদ শুনিয়া হযরত তাড়াতাড়ি মক্কা হইতে সদলবলে বহির্গত হইলেন। দেড় হাজার মদিনাবাসীর সহিত এবার দুই হাজার নবদীক্ষিত কোরেশবীরও যোগ দিল। বলা বাহুল্য, এই দলের মধ্যে আবু সুফিয়ান প্রমুখ কোরেশ নেতৃবৃন্দও ছিলেন। কী অপূর্ব পরিবর্তন! সারাজীবন যিনি পৌত্তলিকদিগের নেতারূপে হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই আজ হযরতের ভক্তরূপে পৌত্তলিকদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চলিলেন!

মা'জ-বিন্-জাবাল নামক জনৈক কুরআন-বিশারদ তরুণ মদিনাবাসীকে হযরত তাঁহার অবর্তমানে মক্কার মু'আল্লিম নিযুক্ত করিলেন। আত্তার নামক আর একজন তরুণ কোরেশ-মুসলিমকে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল।

মক্কা হইতে দলে দলে মুসলিম সৈন্য বিচিত্র পতাকা উড়াইয়া কুচকাওয়াজ করিয়া চলিল। এই দৃশ্য দেখিয়া মুসলিম সেনাদল মনে মনে একটু গর্বিত হইয়া উঠিল। চার পাঁচ হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে বারো হাজারের এই অভিযান। জয় ত সুনিশ্চিত!

কিন্তু আ'লীমুল-গায়িব আল্লাহ্ বুঝি অলক্ষ্য হইতে একথা শুনিতে পাইয়া তাহাদের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। জয় পরাজয়ের মালিক ত মানুষ নয়। আল্লাহ্‌র হুকুম না হইলে মানুষের সাধ্য কী যে কিছু করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সহিত যুক্ত না হইলে মানুষের সব আশা-ভরসা, সব শক্তি, সব অহঙ্কার ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। মুসলমানগণ কি তাহা তখনও শিখে নাই? না শিখিয়া থাকিলে তাহাদিগকে ইহা শিখাইতে হইবে।

'হোনায়েন' নামক উপত্যকায় পৌছিয়া মুসলমানগণ রাত্রিযাপন করিল।

ইহার কিছু দূরেই 'আওতাস' নামক স্থানে হাওয়াজিন সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, মুসলমানগণ হোনায়েন পৌছিয়াছে, তখন তাহারা প্রস্তুত হইয়া পথের ধারের পর্বতগুলিতে আত্মগোপন করিয়া রহিল

www.pathagar.com

পরদিন ভোরবেলা মুসলিম সৈন্য হোনায়েন ত্যাগ করিয়া চলিল। চিত্ত তাহাদের ভাবনাহীন, গতি তাহাদের নিরঙ্কুশ! সহসা পথের দুইধার হইতে হাওয়াজিনগণ মুসলমানদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করিল। বৃষ্টিধারার ন্যায় তাহাদের উপর তীরবর্ষণ হইতে লাগিল। ভীষণ বিপদ! অপ্রস্তুত ও অসতর্ক অবস্থায় কী করিবে তাহারা? দিশাহারা হইয়া তখন সকলে যে যে দিকে পারিল, পালাইতে আরম্ভ করিল।

মুসলমানদিগের সকল অহঙ্কার পথের ধূলায় লুটাইয়া পড়িল। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাদিগকে যে এই হীন লজ্জাকর পরাজয় বরণ করিতে হইবে, স্বপ্নেও তাহারা তাহা ভাবে নাই। এতদিন সংখ্যায় অল্প হইয়া বহু সংখ্যক শত্রুসেনাকে জয় করিবার অভিজ্ঞতাই তাহারা অর্জন করিয়াছে, কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মধ্যে যে শক্তি নাই—এসত্য তাহারা কোনদিনই প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে নাই। আজ গর্বস্ফীত মুসলমান নিজে ঠেকিয়া সেই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিল। তাহারা পরিষ্কার বুঝিল, অল্পসংখ্যক হইলেই যে মানুষ পরাজিত হয়, তাহাও যেমন সত্য নয়; অধিকসংখ্যক হইলেই যে জয়লাভ করা যায়, তাহাও তেমনি সত্য নয়।

হযরত সবার পিছনে 'দুলদুলের' উপর সওয়ার হইয়া আসিতেছিলেন। মুসলমানদিগের এই দুর্গতি দেখিয়া তিনি চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন : "কোথায় চলিয়াছ? ফিরিয়া দাঁড়াও। এই যে আমি এখানে।" হযরতের পার্শ্বে ছিলেন আব্বাস। তিনিও উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া ফিরাইতে লাগিলেন। মুসলমানগণ আত্মস্থ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

তখন আবার নূতন ব্যূহ রচিত হইল। প্রচণ্ডবেগে মুসলমানগণ হাওয়াজিনদিগকে আক্রমণ করিল। হাওয়াজিন সেনা বেশীক্ষণ সে আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না; রণে ভঙ্গ দিয়া তাহারা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এমনভাবে তাহারা বিশৃংখল হইয়া পড়িল যে, রসদপত্র ত দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পরিল না। বহু সংখ্যক উট, ছাগল ও মেষ এবং প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্য মুসলমানদিগের হস্তগত হইল। কয়েকহাজার সৈন্য ও নর-নারীও বন্দী হইল।

এইখানে ওহদ-যুদ্ধের কথা স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। ওহদ এবং হোনায়েন-দুইটি মুসলমানদিগের-দারুণ শিক্ষাক্ষেত্র। ওহদে তাহারা জয়ী হইয়া পরমূহূর্তেই পরাজিত হইয়াছে,; হোনায়েনে তাহারা পরাজিত হইয়া পরমুহূর্তেই জয়ী হইয়াছে। ভাগ্যচক্রের উত্থান-পতনে নিজেকে কেমন করিয়া সামলাইয়া লইতে হয়, উভয়ক্ষেত্রেই মুসলমানরা তাহা ভাল করিয়াই শিখিয়াছে। ওহদে শিখিয়াছে নেতৃ-আদেশ লংঘন করিবার শোচনীয় পরিণাম, হোনায়েনে শিখিয়াছে অহঙ্কার করিবার মারাত্মক কুফল। মুসলমানদিগের ঈমানের পরীক্ষাও এই দুই স্থানে ভীষণভাবে হইয়া গিয়াছে। মুহম্মদ যে সত্যসত্যই আল্লাহ্ র প্রেরিত রসূল, আল্লাহ্ যে তাঁহার নিত্য-সহচর এবং পরম বন্ধু, সম্পদে-বিপদে আলোকে-আঁধারে তিনি যে তাঁহাকে চালনা করিতেছেন, তাঁহার সাহায্য এবং করুণা ব্যতীত কোন-কিছুই যে সম্ভব নয়, এই সত্য উভয় স্থানে সুপ্রকট হইয়া উঠিয়াছে। হোনায়েনের যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের যে-আয়াত নাযিল হয়, তাহাতেও আল্লাহ্ এই কথা বলিতেছেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে বহু যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া হোনায়েনের যুদ্ধক্ষেত্রে, যখন তোমরা তোমাদের সংখ্যা দেখিয়া গর্বিত হইয়াছিলে।

www.pathagar.com

কিন্তু সংখ্যাবহুলতা তোমাদিগকে একটুও উপকার করে নাই, এই বিশাল পৃথিবী তোমাদের কাছে তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ বোধ হইয়াছিল, কাজেই তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পালাইয়া গিয়াছিলে, তারপর আল্লাহ্ তাঁহার পয়গম্বরের উপর এবং বিশ্বাসীদিগের উপর করুণা বর্ষণ করিলেন এবং অগণিত সৈন্য (ফেরেশ্‌তা) পাঠাইলেন–যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই–এবং তাহাদের দ্বারা তিনি অবিশ্বাসীদিগকে শাস্তিদান করিলেন। এবং ইহা অবিশ্বাসীদিগের যোগ্য পুরস্কার।"

(৯ : ২৫–২৬)

হাওয়াজিনগণ পালাইয়া গিয়া তায়েফ নগরে আশ্রয় লইল।

আল্‌–হিজরা নামক উপত্যকায় বন্দী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভার রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া হযরত তায়েফ অবরোধ করিলেন। তায়েফের দুর্গ তখনকার দিনে খুব সুরক্ষিত ছিল। সুদক্ষ তীরন্দাজ বলিয়া তায়েফদিগের সুনাম ছিল; তাহা ছাড়া তাহারা এক প্রকার আগ্নেয় অস্ত্রেরও ব্যবহার জানিত। দুর্গ–মধ্য হইতে তায়েফী সৈন্য তীর এবং অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মুসলমানদিগের তাহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হইল না—তাহারা একটু দূরে সরিয়া রহিল। তবে ইহাও সত্য যে, এই অগ্নিবাণের ভয়ে তাহারা দুর্গ আক্রমণ করিতেও পারিল না।

দুই সপ্তাহ যাবৎ মুসলমানগণ দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল; ইহা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিল না। দুর্গের চতুর্দিকে অসংখ্য আঙ্গুরবাগের অবস্থানহেতু তায়েফবাসীদিগকে বেশ সুবিধা হইয়াছিল; আবরণের আড়ালে থাকিয়া তাহারা তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। হযরত এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য দ্রাক্ষাকুঞ্জ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। এমন মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া তায়েফ–নেতাগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। হযরতের নিকট দূত পাঠাইয়া এই কার্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য তাহারা তাঁহাকে অনুরোধ করিল। হযরত বিনাশর্তে তাহাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তবে নগর–মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন : "তায়েফ নগরে যে সমস্ত ক্রীতদাস আছে, তাহারা যদি বাহিরে আসিয়া মুসলমানদের সহিত যোগ দেয়, তবে তাহারা মুক্ত।"

এই ঘোষণা–বাণীতেও তায়েফ–নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। অনেক ক্রীতদাসই পলাইয়া হযরতের শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইসলামের গুপ্ত শক্তি তায়েফবাসীদের অন্তরে এই প্রথম ক্রিয়া করিল।

বিরোধে কোনই ফল হইবে না দেখিয়া হযরত অবরোধ তুলিয়া লইয়া হিজরায় ফিরিয়া আসিলেন। ভাবিলেন অবরোধই শত্রুজয়ের একমাত্র পন্থা নহে; বন্ধন দিয়া যাহাদিগকে ধরা গেল না, মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে ধরিতে হইবে।

হিজরায় ফিরিয়া আসিতেই একটি ব্যাপার ঘটিল। বন্দীদিগের মধ্য হইতে জনৈক বৃদ্ধাকে সঙ্গে লইয়া একজন দেহরক্ষী সৈন্য হযরতের নিকটে আসিয়া বলিল : "হযরত, এই বৃদ্ধা বলিতেছে আপনি তাঁর দুধ ভাই। সত্য কি?"

হযরত দেখিলেন, এই বৃদ্ধা সত্যসত্যই শায়েমা—শৈশবে যাঁহার কোলে তিনি চড়িয়া বেড়াইয়াছেন। হযরত অমনি শায়েমার বন্ধন মুক্ত করিবার আদেশ দিলেন; তারপর আদর করিয়া তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বসাইলেন এবং সঙ্গে করিয়া মদিনায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শায়মা তাহাতে রাযী হইলেন না। তখন হযরত তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকনসহ আপন আত্মীয়–স্বজনের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

www.pathagar.com

এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া হাওয়াজিনদিগের মনে খুব আশার সঞ্চার হইল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে তাহারা হযরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। তাহারা বলিল : "এই বন্দীদিগের মধ্যে আপনার দুধ ভাই, দুধ ভগিনী এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন রহিয়াছে। ছোটবেলায় আপনাকে আমরাই লালন-পালন করিয়াছিলাম। এখন আপনি কত উচ্চ আর আমরা কত তুচ্ছ। অতীতের কথা মনে করিয়া আজ আমাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করুন।"

হযরত এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। বলিলেন : "তোমরা কোনটি ফিরাইয়া চাও? স্ত্রী-পুত্রদিগকে, না তোমাদের ধনসম্পদকে?"

দূতগণ বলিল : "স্ত্রী-পুত্রদিগকে। স্ত্রী-পুত্রের বিনিময়ে আমরা অন্য কিছু চাহি না"

হযরত বলিলেন : "আগামীকল্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। আজ আর কিছুই বলিবনা।"

পরদিন দূতগণ আবার হযরতের নিকট উপস্থিত হইল। হযরত মুসলমানদিগকে ডাকিয়া বলিলেন : "ইহাদের নিকট আমি চিরঋণী; আমার ইচ্ছা, বন্দীদিগকে বিনাপণে মুক্তি দিই। তোমাদের মত কী?"

হযরতের ইচ্ছায় কেহই বাধা দিল না। সমুদয় নর-নারী বিনাপণে বিনাশর্তে মুক্তিলাভ করিল।

এই মুক্তিদানের ফল কী হইল, কৌতূহলী পাঠক তাহা লক্ষ্য করিতে থাকুন।

যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি হযরত তখন সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। এইবার মদিনাবাসীদিগকে তিনি কিছুই দিলেন না; সমস্তই মক্কার নবদীক্ষিত কোরেশ সৈন্যদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। মদিনাবাসীদিগের মধ্যে অনেকে ইহাতে একটু ক্ষুণ্ন হইলেন। কিন্তু হযরত সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন : "কোরেশগণ সারাজীবন আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইহ-পরকাল উভয়দিক দিয়াই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কাজেই তাঁহাদের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু দেখাইতেছি। আর এই অনুগ্রহ এমন কী-ই বা বেশী। ছাগল-ভেড়া লইয়া ইহারা ফিরিয়া যাইবে, আর তোমরা আল্লাহ্‌র রসুলকে লইয়া দেশে ফিরিবে!"

মদিনাবাসীরা এই উত্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, হযরত বুঝি বা এখন হইতে মক্কার কোরেশদিগের সঙ্গে বাস করিবেন। কিন্তু এই ঘোষণার পর সকলের মন হইতে সেই অমূলক আশঙ্কা দূর হইয়া গেল।

এদিকে হযরতের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া হাওয়াজিন-নেতা 'মালিক' আর স্থির থাকিতে পারিল না; হযরতের নিকট আসিয়া সদলবলে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। শুধু তাহাই নহে, যে তায়েফবাসীদিগের সঙ্গে মিশিয়া এতদিন তাহারা হযরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল, এইবার সেই তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধেই তাহারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, তায়েফবাসীদিগের ঘরের বাহির হওয়া অথবা পশুচারণ করা দায় হইয়া উঠিল। মুসলিম সৈন্য দ্বারা তায়েফ-দুর্গ অবরোধ অপেক্ষা তায়েফবাসীদিগের আপন লোক দ্বারা এ অবরোধ অধিকতর কৌতূহলপূর্ণ নহে কি?

তারপর কী হইল-একটু পরেই বলিতেছি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫৫

তাবুক অভিযান ও অন্যান্য ঘটনা

নবম হিযরী পড়িল।

এই হিযরীর প্রধান সামরিক ঘটনা তাবুক অভিযান। হযরতের জীবনে ইহাই শেষ যুদ্ধ-বিগ্রহ।

মদিনায় ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন পর হযরত জানিতে পারিলেন, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরবদেশ জয় করিবার বাসনা রোম-সম্রাটদিগের মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু কোনদিনই তাহাদের সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবার নূতন করিয়া এই আরব জয়ের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। মুতা-অভিযানের অকৃতকার্যতা তাঁহার মনের সংকল্পকে আরও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিল। এইবার অধিকতর ব্যাপকভাবে তিনি এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন।

সমস্ত সিরিয়া প্রদেশ হইতে অসংখ্য সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। সৈন্যদিগের এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইল। লাখম, জুজাম, গাসান প্রভৃতি গোত্রও রোমানদিগের সহিত যোগ দিল।

কিছুদিনের মধ্যেই হযরত জানিতে পারিলেন, বিরাট বাইজান্টাইন বাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে এবং তাহাদের অগ্রগামী সেনাদল 'বেল্‌কা' পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া হযরত মুসলমানদিগকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। এইবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন—রোমানদিগকে বাধা দিবার জন্য সিরিয়াতে অভিযান করিতে হইবে।

একে ত গ্রীষ্মকাল, তাতে পথ অতি দীর্ঘ ও বন্ধুর। কিন্তু ইসলামের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের মনে কোনই দুর্বলতা নাই। হযরতের আদেশ শ্রবণমাত্র তাঁহারা যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হযরতও এইবার বিরাটভাবে আয়োজন করিলেন। মক্কা-জয়ের পর আরবের বহু গোত্র তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। হযরত সকলকেই সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। দলে দলে লোক আসিয়া সৈন্য-শ্রেণীতে ভর্তি হইতে লাগিল। প্রায় চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল, তন্মধ্যে দশ হাজার অশ্বারোহী।

এত বড় বিরাট বাহিনীকে রক্ষা ও চালনা করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু সে অর্থ কোথায়?

হযরত অর্থের জন্যও ভক্তবৃন্দের নিকট আহ্বান পাঠাইলেন। এ আহ্বান বিফল হইল না। আল্লাহ্‌র নামে—ইসলামের নামে—ভক্তগণ অকাতরে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। সে এক অপরূপ দৃশ্য! কে কত দান করিতে পারে, তাহারই যেন পাল্লা চলিতে লাগিল। ওমর নিজের যাবতীয় সম্পত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ আনিয়া হযরতের চরণে উপহার দিলেন। যে-কোন সদনুষ্ঠানে দান করিবার জন্য আবুবকরের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। ওমর ভাবিলেন, এইবার বুঝি তাঁহার দানই সকলের

www.pathagar.com

শীর্ষস্থান অধিকার করে। কিন্তু তাহা হইল কৈ! দানবীর আবুবকর তাঁহার যথাসর্বস্ব আনিয়া হযরতের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন : "তোমার পরিবারবর্গের জন্য কী রাখিয়া আসিলে?" ভক্তকুলশিরোমণি অম্লান-বদনে উত্তর দিলেন : "আল্লাহ্ আর তাঁহার রসূলকে।"

ওসমানের দানও সামান্য নহে। তিনি দিলেন এক সহস্র উট, সত্তরটি অশ্ব এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

হায়! এই মুসলমানদিগের বংশধরই কি আমরা! আজ ইসলামের জন্য—জাতির জন্য—কল্যাণকর্মের জন্য মুসলমানের অর্থাভাব। কিন্তু সত্যিকার অর্থাভাব ত এ নহে। দানের অভাব নহে—প্রাণের অভাব।

সংগৃহীত অর্থ দ্বারা হযরত যথাসাধ্য সাজ-সমরাম ও রসদপত্র ক্রয় করিলেন। তবু অস্ত্রশস্ত্রের অভাবে বহু মুসলমানকে সৈন্য-শ্রেণীতে ভর্তি করা গেল না। স্বদেশ ও স্বধর্মের এই চরম দুর্দিনে তাঁহারা যে কোন কাজেই আসিলেন না, এই খেদে তাঁহারা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া হযরত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তাঁহাদেরও ব্যবস্থা হইয়া গেল। যুদ্ধের পোশাক ও অস্ত্র কোনরূপ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইল। এই বিরাট বাহিনীর অধিনায়ক হইয়া বীর নবী চলিলেন তাবুক অভিযানে।[১]

চল্লিশ হাজার মুসলিম-বীরের এই বিশাল বাহিনী যখন নিশান উড়াইয়া কাতারে কাতারে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন একটা দেখিবার মত দৃশ্য হইল বটে। এতবড় বাহিনী মুসলমানগণ ইহার পূর্বে আর কখনো বাহির করিতে পারে নাই।

বীরবর আলি এই অভিযানে যোগ দিতে পারিলেন না। মদিনা রক্ষার জন্য হযরত তাঁহাকে রাখিয়া গেলেন।

বহু ক্লেশ স্বীকার করিবার পর হযরত সকলকে লইয়া সিরিয়ার তাবুক প্রান্তরে উপনীত হইলেন।

মুসলমানদিগের এই বিপুল সমরায়োজন দেখিয়া তথাকার খ্রীষ্টান দলপতিদিগের চমক ভাঙিল। এতদিন তাহারা হযরতের শক্তি ও সামর্থ সম্বন্ধে একটা হীন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন দেখিল লোকবলে ও শৌর্যবীর্যে ইনি ত কম নহেন! রোমের রাজকীয় বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবার মত শক্তি, সাহস ও যোগ্যতা যে ইহাদের আছে, এইবার তাহা সকলে উপলব্ধি করিল। রোম-সম্রাটকে তাহারা একথা জানাইয়া দিয়া যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিল।

চল্লিশ হাজার মুসলিম বীরের সহিত যুদ্ধ করা সোজা নহে। চল্লিশ হাজার সৈন্য যদি এই যুদ্ধে আসিতে পারে, তবে কমপক্ষে আরও বিশ হাজার সৈন্য তাঁহার রক্ষিত আছে। যে-ব্যক্তির অঙ্গুলি-সংকেতে, অর্ধলক্ষেরও বেশী লোক অকাতরে প্রাণ দিতে পারে, সে-ব্যক্তির শক্তি নিশ্চয়ই তুচ্ছ নহে। তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিছক আহাম্মুকি। ইহাই ভাবিয়া হিরাক্লিয়াস ভীত ও সংকুচিত হইয়া

---

১. তাবুক অভিযানই রসূলুল্লাহ্র শেষ যুদ্ধ অভিযান। তিনি সর্বমোট ২৭টি যুদ্ধে যোগদান করেন, তন্মধ্যে ৯টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।-(ই-ই)

www.pathagar.com

পড়িলেন। যুদ্ধ সাধ তাঁহার মিটিয়া গেল। সৈন্যদল লইয়া অচিরে তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন।

রোমানদিগের পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর তাবুক ও তৎপাশ্ববর্তী খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায় খুব ভীত হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ তাহারা হযরতের নিকট আসিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল: অনেকে মুসলমান হইয়া গেল। হযরত ইহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদিগকে পরাজিত বা নিহত করিয়া তাহাদের দেশ ও দৌলত অধিকার করিয়া লইতে পারিতেন, কিন্তু সেরূপ কোন দুরভিসন্ধি ত তাঁহার ছিল না। শান্তি ও সত্য প্রচারই ছিল বিশ্বনবীর প্রধান লক্ষ্য।

তাবুক হইতে ফিরিয়া আসিবার পর চতুর্দিক হইতে হযরতের নিকট শান্তির প্রস্তাব আসিতে আরম্ভ করিল। বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধি পাঠাইয়া হযরতের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে লাগিল। বনি-তামিম, বনি-মুস্তালিক, বনি-কিন্দা, বনি-আজাদ, বনি-তাঈ প্রভৃতি বহু গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিল। আরবের সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাতেম তাই-এর পুত্র আবি ইবনে-হাতেম এই সময় মুসলমান হন। হাতেম তখন জীবিত ছিলেন না; থাকিলে তিনিও যে হযরতের চরণে শরণ লইতেন, সে কথা অনায়াসে বলা যায়।

বিখ্যাত কোরেশ কবি কা'ব-ইবনে-জোহায়েরও এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মক্কা বিজয়ের পর ক'বের ভ্রাতা ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরতের সহিত মদিনায় প্রস্থান করেন। তথা হইতে তিনি এক পত্র লিখিয়া কা'বকেও ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু কা'ব তদুত্তরে অশিষ্ট ভাষায় ইসলাম হযরত ও মুহম্মদকে গালাগালি দিয়া এক পত্র লিখেন। হযরত তাঁহা জানিতে পারিয়া কা'বের উপর রুষ্ট হন। অবশেষে কা'বের মতি পরিবর্তিত হয়। তিনি তখন অনুতপ্ত হইয়া হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বদ্ধপরিকর হন।

এতদুদ্দেশ্যে তিনি একদিন সহসা মদিনার মস্‌জিদে উপস্থিত হইয়া হযরতকে সম্বোধন করিয়া বলেন : "কবি ক'াব অনুতপ্ত হইয়া আপনার চরণে শরণ লইতে চাহে। যদি অনুমতি করেন, তাহাকে লইয়া আসি।" হযরত সম্মতি দিলেন। তখন কা'ব বলিলেন : "হযরত, আমিই সেই অধম কবি।" এই বলিয়া তিনি হযরতের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মুসলমান হইলেন।

এই ঘটনাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য ক'াব সেইখানেই হযরতের উদ্দেশ্যে একটি 'নাতিয়া' রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। তাহার শেষ দুইটি চরণ এইরূপ :

"তুমি নূর, ঘুচায়েছ তুমি সারা বিশ্বের আঁধার
আল্লাহ্‌র হাতের তুমি জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার।"

এই নাতিয়া শ্রবণে হযরত অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং পুরস্কারস্বরূপ কবিকে আপন উত্তরীয় (খিরকা) দান করিলেন।

এই মহামূল্য সম্পদ কবি সযতনে রক্ষা করিয়াছিলেন। কা'বের মৃত্যুর পর উত্তরীয়খানি খলিফাদিগের অধিকারভুক্ত হয় এবং পুরুষানুক্রমে উহা সাম্রাজ্যের পবিত্র

www.pathagar.com

বস্তুরূপে সমাদর লাভ করে। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাতারীদিগের বাগদাদ আক্রমণের ফলে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ বীর তারেকও[২] এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

নজরান প্রদেশের আরব খ্রীষ্টানগণও এই সময়ে হযরতের বশ্যতা স্বীকার করে। মুগীরা নামক জনৈক ভক্তকে হযরত প্রথমে নজরানে ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠাইয়া দেন। তিনি বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলে হযরত জনৈক দূত-মারফৎ নজরানের বিশপকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। এই পত্র পাইয়া বিশপ বিচলিত হইয়া পড়েন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ৬০ জন পাদ্রীর এক প্রতিনিধি-সংঘ মদিনায় পাঠাইয়া দেন।

আসরের নামাযের পর খ্রীষ্টান-সংঘ মদিনার মসজিদে আসিয়া উপনীত হইলেন। ক্রমে খ্রীষ্টানদিগের সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত হইল; তাঁহারা সেই মসজিদেই উপাসনা করার অনুমতি চাহিলেন। এদিকে মুসলমানদিগেরও মাগরিবের নামাযের সময় সমাগত। কাজেই সাহাবাদিগের অনেকেই খ্রীষ্টানদিগের সেই প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু হযরত সে আপত্তি শুনিলেন না; পবিত্র মসজিদুন্নবীর ভিতরেই তিনি খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগকে উপাসনা করিবার অনুমতি দিলেন। পাদ্রীরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া খ্রীষ্টান প্রথায় তাঁহাদের উপাসানা করিতে লাগিলেন; আর মুসলমানেরা কাবা-শরীফের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিজেদের নামায সমাধা করিলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ হযরতের এই মহানুভবতা ও উদারতা দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন।

ধর্মসংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনার পর খ্রীষ্টান দূতগণ আন্তর্জাতিক আরব গণতন্ত্রের সভ্য হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং ইহার জন্য হযরতের উপরেই শর্ত নির্ধারণের ভার দিলেন। খ্রীষ্টানগণকে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে, তাহা সাব্যস্ত হইয়া গেল। তখন হযরত নজরানের অধিবাসীবৃন্দের প্রতি নিম্নলিখিত সনদ দান করিলেন।

"নজরানের পাদ্রী, পুরোহিত ও সাধারণ নাগরিকদের প্রতি—আল্লাহ্‌র নামে তাঁহার রসুল মুহম্মদ এই প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সর্বপ্রকার সম্ভবপর চেষ্টা দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব; তাহাদের দেশ, তাহাদের জীবন ও ধনসম্পদ অক্ষুণ্ন থাকিবে; তাহাদের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না; কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিতকে পদচ্যুত করা হইবে না; কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় ব্যাঘাত জন্মান হইবে না; তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করা হইবে না; যে পর্যন্ত তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে, সে পর্যন্ত এই সনদের শর্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে।"

খ্রীষ্টানগণ এই সনদপত্রসহ দেশে ফিরিয়া গেলেন। আনুপূর্বিক সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া এবং হযরতের মহানুভবতার পরিচয় পাইয়া নজরানের প্রধান বিশপের এক ভ্রাতা দেশের সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন : "ইনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানবী, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম।" এই বলিয়া যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি মদিনায় আসিয়া

---

২. প্রসিদ্ধ বীর তারেক (ইবনে যিয়াদ) ৬১ খ্রীঃ স্পেন জয় করেন। কাজেই হযরত জীবতকালে তাহার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্ভব নহে। তবে তারেক ইবনে আবদুল্লাহ্ নামে এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ফিরে নিজ গোত্রে ইসলাম প্রচার করেন। নবম সংস্করণ, সংশোধনী দ্রঃ।

www.pathagar.com

হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নজরানের আর একজন সন্ন্যাসীও এ যাবৎ তপস্যা-মগ্ন ছিলেন। প্রতিনিধিদিগের মুখে শেষ পয়গম্বরের বিষয়ে জানিতে পারিয়া তিনিও দেওয়ানা হইয়া দেশত্যাগী হইলেন এবং সত্বর হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে নজরান প্রদেশে ইসলামের আলো ছড়াইয়া পড়িল।

তায়েফ হইতে অবরোধ উঠাইয়া আনিবার পর তায়েফবাসীদিগের ভাগ্যে কি ঘটিল? এইবার তাহা বলি। এক আশ্চর্য উপায়ে তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন আসিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রক্কালে ওরওয়া নামক জনৈক তায়েফ-প্রধান হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। সেই ওরওয়া এখন মদিনায় আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, যে-আবেকওসর তিনি নিজে পান করিলেন, দেশবাসীকেও তাহা পান করাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। হযরতকে বলিলেন : "হযরত, যদি অনুমতি করেন তবে তায়েফে ফিরিয়া গিয়া আমার দেশবাসীদিগের মধ্যে আমি ইসলাম প্রচার করি।" হযরত বলিলেন : "খুব ভাল কথা, কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে, তোমার স্বজাতিয়েরা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।" ওরওয়া বলিলেন : "দেশবাসীরা আমাকে খুব ভালবাসে, আশা করি তাহারা আমার কথা শুনিবে। আর যদি তাহারা আমাকে মারিয়াই ফেলে তাহাতেই বা দুঃখ কী? সত্যের জন্য হাসিমুখে আমি যে-মরণ বরণ করিব।"

ওরওয়া তায়েফ যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যার সময় গৃহে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা দেশবাসীর নিকট ঘোষণা দিলেন এবং সকলকেই সত্য পথে আসিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। শুনিয়াই লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যূষে তিনি ছাদের উপর উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে আযান দিতে আরম্ভ করিলেন। এইবার সকলের ধৈর্যের বাঁধ টুটিল। নাগরিকেরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একটি তীর তাঁহার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল! আল্লাহ্‌র নাম করিতে করিতে তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন এবং একটু পরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলিয়া গেলেন : "হে আমার দেশবাসী, তোমাদের জন্য আমি এই রক্ত দান করিলাম। বন্ধুগণ, তোমাদের ঈমান আসুক। বিদায়।"

ওরওয়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন হযরতের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। ওরওয়ার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া বলিলেন : "ওরওয়াকে নবী আল-ইয়াসিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইয়াসিন লোকদিগকে আল্লাহ্‌র নামে আহ্বান করিতে গিয়া তাহাদের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন।"

ওরওয়ার রক্তদান বাস্তবিকই বিফলে গেল না। অনেকের মনেই কল্যাণ-জিজ্ঞাসা জাগিল; অনেকেই মনে মনে তাহার মত ও পথ অনুসরণ করিল। তায়েফবাসীরা দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া পড়িল।

এদিকে আর এক কাণ্ড ঘটিল। যে হাওয়াজিন গোত্রের সহিত মিতালি করিয়া তায়েফবাসীরা হযরতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, সেই হাওয়াজিন গোত্রই এখন তাহাদের প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ইসলাম গ্রহণের পর তাহারা প্রতিনিয়ত

www.pathagar.com

তায়েফবাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। দিনে দিনে এমন হইল যে, তায়েফীদের ঘরের বাহিরে আসা অথবা ছাগমেষাদি মাঠে চরাণ দায় হইয়া উঠিল। ভিতর-বাহির দুই দিক হইতেই এইরূপ চাপে পড়িয়া তাহারা বিব্রত হইয়া পড়িল। শান্তি-স্থাপনের জন্য বাধ্য হইয়া তাহারা হযরতের নিকটে দূত পাঠাইলেন। ছয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এই কার্যের জন্য মনোনীত হইলেন।

প্রতিনিধিগণ মদিনায় পৌঁছিলে হযরত তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পৌত্তলিক জানিয়াও মসজিদ-প্রাঙ্গণে তাঁহাদের স্থান দিলেন। কয়েকদিন যাবৎ তাঁহারা হযরতের নিকট ইসলামের তত্ত্বকথা শুনিলেন, মুসলমানদিগের নামায পড়া দেখিলেন এবং তাঁহাদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিলেন। তারপর এক শুভ-মুহূর্তে সকলে হযরতের হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু কয়েকটি বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের এই সাধের দেবমূর্তিগুলির কী হইবে? ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে? সে ত সহজ কথা নহে! তাহা ছাড়া প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া নামায পড়াও ত মুশকিলের ব্যাপার! প্রতিনিধিগণ তাই হযরতকে বলিলেন : "হযরত, তায়েফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে ভরসা আমরা রাখি। কিন্তু ইসলামের বিধি-নিষেধের সবগুলিই একদিনে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তাই আমাদের অনুরোধ ঠাকুর প্রতিমাগুলিকে যাহাতে আমরা তিন বৎসর পর্যন্ত রাখিতে পারি এবং যাহাতে নামায পড়িবার দায় হইতে মুক্তি পাই, দয়া করিয়া সেই ব্যবস্থা করুন।"

হযরত বলিলেন : অসম্ভব। ইসলাম তৌহিদের ধর্ম। ইসলাম ও প্রতিমা তাই একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যে-মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাদিগকে পৌত্তলিকতা বর্জন করিতে হইবে। তিন বৎসর ত দূরে থাকুক, একদিনের-এক মুহূর্তেরও অবসর তোমাদিগকে দেওয়া হইবে না। আর নামাযের কথা বলিতেছ? নামায অপরিহার্য। নামাযই ত ইসলামের পরিচয়। ইহাকে বাদ দিলে আর থাকিল কি? সমস্ত কল্যাণের উৎস-মূল এই নামায। এই নামায তোমরা বর্জন করিতে চাও?

প্রতিনিধিগণ শান্ত হইলেন। তবে বলিলেন : "আমাদের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, আমরা নিজ হস্তেই প্রতিমাগুলিকে ধ্বংস করিতে পারিব। কিন্তু মুশকিল হইতেছে অশিক্ষিত জনসাধারণ ও স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া! বিশেষ করিয়া 'লাৎ' ঠাকুরের মূর্তিই হইতেছে আমাদের প্রধান দেবমূর্তি। তাহাকে ভাঙিতে গেলে লোকেরা কাঁদাকাঁদি করিবে। কাজেই এই কাজটি আপনাদিগকে করিতে হইবে।"

হযরত তখন দুইজন উপযুক্ত প্রতিনিধিদিগের সঙ্গে দিলেন। একজন হইলেন মুগীরা, আর একজন আবু সুফিয়ান। বলা বাহুল্য, ইহারা দুইজনেই ছিলেন তায়েফবাসীদিগের পরম বন্ধু। হায়! এক সময়ে যাঁহারা দেবমূর্তির রক্ষক ছিলেন, আজ তাঁহারাই সংহারক সাজিলেন! প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য যাঁহারা এক সময়ে আল্লাহ্‌র রসূলকে কতল করিতে বাহির হইয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই চলিলেন সেই রসূলের নির্দেশক্রমে সেই প্রতিমা ধ্বংস করিতে। নিয়তির কী অদ্ভুত পরিহাস!

দেশে ফিরিয়া প্রতিনিধিগণ অধিকাংশ স্বদেশবাসীকে ইসলামে দীক্ষিত করিলেন তখন আসিল প্রতিমা ভাঙার পালা। মুগীরা প্রকাণ্ড কুঠার হস্তে অগ্রসর হইলেন ভয়ঙ্কর

www.pathagar.com

সেই দৃশ্য! লাৎ ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মুগীরা যখন 'আল্লাহ্ আকবর' রবে কুঠার উত্তোলন করিলেন, তখন বহু নর-নারী কাঁদিয়া আকুল। ক্রন্দন-রোলের মধ্যে দেবতার পাষাণ প্রতিমা খান্ খান্ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

বিখ্যাত খাজরাজ নেতা আবদুল্লাহ্ বনি উবাই-এর পরলোকগমনও এই সময়কার একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যদিও এই পৌত্তলিক নেতা একজন মুনাফিক ছিলেন এবং যদিও তিনি ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের সহিত মিশিয়া বারে বারে হযরতকে বহু দাগা দিয়াছেন, তবু তাঁহার মৃত্যুতে হযরত সহানুভূতি না দেখাইয়া পারেন নাই। আবদুল্লাহ্র মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়াই তিনি তাঁহার কাফনের জন্য আপন উত্তরীয় পাঠাইয়া দেন এবং গোরস্থান পর্যন্ত শবাধারের অনুগমন করেন।

আবদুল্লাহ্র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিধর্মীদিগের বাধদানের আর কোন শক্তি বা সম্ভাবনাই রহিল না।

এদিকে পবিত্র কাবা-গৃহও পৌত্তলিকতার বিষবাষ্প হইতে চিরতরে মুক্ত হইল।

নবম হিযরীর শেষভাগে যখন হজের সময় আসিল, তখন হযরত খাঁটি ইসলামী প্রথায় হজ শিক্ষা দিবার জন্য আবুবকরের অধীনে মাত্র ৩০০ জন মুসলমানকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কিছু পরেই কুরআনের এই আয়াত নাযিল হইল :

"হে বিশ্বাসীগণ, পৌত্তলিকেরা অপবিত্র, এই বৎসরের পরে তাহাদিগকে আর পবিত্র কাবা শরীফে (হজ করিতে) আসিতে দিও না।" (৯ : ২৮

তখন কালবিলম্ব না করিয়া হযরত একটি হুকুম-নামাসহ আলিকেও মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। হজ সমাপনের পর সমবেত তীর্থযাত্রীদিগের নিকট আলি হযরতের এই ঘোষণা পাঠ করিলেন :

"এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এখন হইতে কোন পৌত্তলিক আর কাবা শরীফে হজ করিতে পারিবে না। কাবা-গৃহে তাহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।"

পৌত্তলিকেরা নীরবে এই আদেশ শ্রবণ করিল। কি করিবে তাহারা? প্রতিকারের শক্তি ত তাহাদের নাই। আকাশ হইতে আলোক যখন নামে, ধরণীর জমাট-বাঁধা অন্ধকার তখন ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া বাধা দিতে চায় কিন্তু পারে কি? নীরবে অন্ধকারকেই বিদায় লইতে হয়। পৌত্তলিকরাও ঠিক সেইরূপভাবেই কাবা হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিল।

এইরূপে সবদিক দিয়াই ইসলাম জয়যুক্ত হইল। হযরত এখন সত্য সত্যই বিজয়ী। যে সংগ্রাম বিশ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল, এইবার তাহার চরম অবসান হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সকল সীমান্তই এখন নীরব। দীর্ঘকাল ধরিয়া চতুর্দিকে যে আগুন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, ধীরে ধীরে তাহা নিভিয়া গেল। ঝঞ্ঝা বাদল কাটিয়া গিয়া আকাশে এবার চাঁদ উঠিল। সেই আলোকে স্নান করিয়া ধরণী আবার পুলকিত হইল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫৬

বিদায় হজ

দশম হিযরীর অধিকাংশ সময় হযরত বিভিন্ন স্থানে প্রচারক পাঠাইতে এবং বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদিগকে গ্রহণ করিতে ব্যস্ত রহিলেন। অনুগত দেশ ও গোত্রদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিবারও তিনি ব্যবস্থা করিলেন।

এই বৎসর তাঁহার পারিবারিক জীবনে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। হযরতের একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১৭ কি ১৮ মাস হইয়াছিল। একমাত্র পুত্রের তিরোধানে হযরত অন্তরে দারুণ আঘাত পাইলেন। মৃত পুত্রের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নীরবে তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল। জনসাধারণ ইহাতে মনে করিল, হযরতের পুত্র বিয়োগে প্রকৃতি এই বিমর্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। হযরত যখন একথা জানিতে পারিলেন, তখনই ইহার প্রতিবাদ করা সঙ্গত মনে করিলেন। লোকদিগকে ডাকিয়া তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন : "তোমাদের এ ধারণা ভুল। আমার পুত্র বিয়োগের সঙ্গে সূর্যগ্রহণের কোন সম্বন্ধ নাই। আমার পুত্র মারা না গেলেও ঠিক ঐ সময়েই সূর্যগ্রহণ লাগিত। আল্লাহ্‌র অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে সূর্যগ্রহণ অন্যতম। গ্রহণের সময় তোমরা তাঁহার অসীম কুদরতের কথা চিন্তা করিয়া মুনাজাত করিবে।"

মহামানবের কী গভীর সত্যপ্রীতি। অন্য কোন ভণ্ড তপস্বী হইলে নিজের বুজুর্গী জাহির করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ নিশ্চয়ই সে এমন করিয়া নষ্ট করিত না।

দেখিতে দেখিতে দশ হিযরীও শেষ হইয়া আসিল। আবার হজের সময় আসিয়া পড়িল। হযরত এইবার হজ করিতে যাইবেন বলিয়া নিয়ত করিলেন। জিল্‌কদ মাসের শেষেই তাঁহার এই অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল, দলে দলে মুসলমানেরা হযরতের সহিত হজ করিবার মানসে মক্কায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

হযরত এইবার তাঁহার স্ত্রীদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

এই হজই হযরতের জীবনের শেষ হজ। কাজেই ইহা 'বিদায় হজ' নামে পরিচিত।

জিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে হযরত শিষ্যবৃন্দকে লইয়া হজযাত্রা করিলেন। অসংখ্য নর-নারীর সে কী বিপুল সমারোহ! একত্ব ও সাম্যের সে কী মোহনীয় চিত্র!

আজ ইতর-ভদ্রে, ধনী-দরিদ্রে, বাদশা-গোলামে কোন প্রভেদ নাই। সকলেই আজ সমান, সকলেরই আজ একই পোশাক, একই পরিচ্ছদ; সকলের মুখে আজ একই বাণী—একই ভাষা, একই পোশাক, একই পরিচ্ছদ; সকলের মুখে আজ একই বাণী—একই ভাষা, একই স্বপ্ন, একই আশা, একই ধ্যান, একই ধারণা, একই লক্ষ্য, একই বাসনা। মানুষ মাত্রেই যে এক আদমের সন্তান—বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াও এ-সত্য আজ যেন মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল।

পথ হইতেও অসংখ্য মুসলমান এই মহা হজে যোগদান করিলেন। প্রায় দুই লক্ষ মুসলমান সঙ্গে লইয়া হযরত জিলহজ মাসের পাঁচ তারিখে মক্কা শরীফে উপনীত হইলেন।

www.pathagar.com

মক্কার প্রবেশ-দ্বারে পৌছিয়াই হযরত কাবা-গৃহকে দেখিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ ভক্তিগদগদকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া মুনাজাত করিলেন : "ইয়া আল্লাহ্, এই গৃহকে চিরকল্যাণ ও চিরমহিমায় মণ্ডিত কর এবং যাহারাই এখানে হজ করিতে আসিবে, তাহাদের সুখ-শান্তি ও মানমর্যাদা বৃদ্ধি কর।

হযরত অতঃপর ভক্তবৃন্দকে লইয়া কাবা-গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সাতবার ইহাকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিলেন।

হজের দিন আসিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের 'লাব্বায়েক' ধ্বনিতে কাবা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। কী বেহেশ্‌তী দৃশ্য আজ! মূর্তি নাই, পুরোহিত নাই। আছে সেই সর্বশক্তিমান নিরাকার আল্লাহ্ আর তাঁহার রসূল আর তাঁহার উম্মত! এতদিন আল্লাহ্ তাঁহার রসূল এবং তাঁহার ধর্ম যেখানে নির্বাসিত হইয়াছিল, আজ সেখানেই উঠিয়াছে আল্লাহ্‌র গুণগান, সেখানেই দেখিতেছি মুসলমান, সেখানেই উড়িতেছে ইসলামের বিজয়নিশান।

হযরত মুসলমানদিগকে লইয়া আরাফাতের দিকে চলিলেন। তারপর মীনা-উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া বিশাল জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত খুৎবা (ভাষণ) দান করিলেন :

"হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ যে-কথা তোমাদিগকে বলিব, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিও। আমার আশঙ্কা হইতেছে, তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ করিবার সুযোগ আর আমার ঘটিবে না।

হে মুসলিম, আঁধার যুগের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকে ভুলিয়া যাও, নব আলোকে পথ চলিতে শিখ। আজ হইতে অতীতের সমস্ত মিথ্যা সংস্কার, অনাচার ও পাপ-প্রথা বাতিল হইয়া গেল।

মনে রাখিও—সব মুসলমান ভাই ভাই। কেহ কাহারও চেয়ে ছোট নও, কাহারও চেয়ে বড় নও। আল্লাহ্‌র চোখে সকলেই সমান। নারী জাতির কথা ভুলিও না। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার আছে, পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার আছে। তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিও না। মনে রাখিও—আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রাখিয়া তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।

সাবধান! ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলিয়া জানিবে। যেমন পবিত্র আজিকার এইদিন—ঠিক তেমনিই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ। হে মুসলমানগণ হুঁশিয়ার! নেতৃ-আদেশ কখনও লঙ্ঘন করিও না। যদি কোন কর্তিত-নাশা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করিয়া দেওয়া হয় এবং সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে। দাস-দাসীদের প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করিও। তাহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না। তোমরা যাহা খাইবে তাহাদিগকেও তাহাই খাওয়াইবে; যাহা পরিবে তাহাই পরাইবে। ভুলিও না—তাহারাও তোমাদের মত মানুষ

www.pathagar.com

সাবধান! পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদিগকে স্পর্শ না করে। শির্‌ক করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না, ব্যভিচার করিও না। সর্বপ্রকার মলিনতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিও। চিরদিন সত্যাশ্রয়ী হইও।

মনে রাখিও—একদিন তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র নিকটে ফিরিয়া যাইতে হইবে। সেদিন তোমাদের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। বংশের গৌরব করিও না। যে ব্যক্তি নিজ বংশকে হেয় মনে করিয়া অপর এক বংশের নামে আত্মপরিচয় দেয়, আল্লাহ্‌র অভিশাপ তাহার উপর নামিয়া আসে।

হে আমার উম্মতগণ, আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা যদি তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাক, তবে কিছুতেই তোমাদের পতন হইবে না। সেই গচ্ছিত সম্পদ কী? তাহা আল্লাহ্‌র কুরআন এবং তাঁহার রসুলের আদেশ।

নিশ্চয় জানিও, "আমার পর আর কেহই নবী নাই। আমিই শেষ নবী। যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা অনুপস্থিত সকল মুসলমানের নিকট আমার এই সকল বাণী পৌছাইয়া দিও।"

হযরতের মুখমণ্ডল ক্রমেই জ্যোতিদীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কণ্ঠস্বর করুণ ও ভাবগম্ভীর হইয়া আসিল। ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন : "হে আল্লাহ্, হে আমার প্রভু, আমি কি তোমার বাণী পৌছাইয়া দিতে পারিলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিলাম?"

লক্ষ্য কণ্ঠে নিনাদিত হইল : "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!"

তখন হযরত কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন : "প্রভু হে, শ্রবণ কর, সাক্ষী থাকো; ইহারা বলিতেছে, আমার কর্তব্য আমি পালন করিয়াছি।" ভাবের আতিশয্যে হযরত নীরব হইয়া রহিলেন। বেহেশ্‌তের জ্যোতিতে তাঁহার মুখ-কমল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই সময় কুরআনের শেষ আয়াত নাযিল হইল :

"হে (মুহম্মদ) আজ আমি তোমার দীনকে সম্পূর্ণ করিলাম এবং তোমার উপর আমার নিয়ামৎ পূর্ণ করিয়া দিলাম। ইসলামকেই তোমার ধর্ম বলিয়া মনোনীত করিলাম।" —(৫ : ৩)

হযরত ক্ষণকাল ধ্যানমৌন হইয়া রহিলেন। বিশাল জনতা তখন নীরব। কিছুক্ষণ পরে তিনি নয়ন মেলিয়া করুণ স্নেহমাখা দৃষ্টিতে সেই জনসমুদ্রের প্রতি তাকাইয়া বলিলেন : "বিদায়! একটা অজানা বিয়োগ-বেদনা সবারই হৃদয়ে ছায়াপাত করিয়া গেল।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫৭

পরপারের আহ্বান

কার্যশেষে রাজদূত যেমন আপন রাজ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হযরতের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপই হইল। বিদায় হজের পর তিনি যেন কেমন বিমনা হইয়া পড়িলেন। মহাসিন্ধুর ওপার হইতে যেন কোন্ বেতার-বার্তা তিনি শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি এ পারের জরুরী কাজগুলি সারিয়া লইবার জন্য, তাই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে একাদশ হিযরীর প্রথম মাস। হযরতের বয়স তখন ৬৩ বৎসর। মীনা-প্রান্তরে শেষ আয়াত যেদিন নাযিল হইল, সেইদিনই হযরত বুঝিতে পারিয়াছিলেন : তাঁহার কাজ ফুরাইয়াছে; শীঘ্রই তাঁহাকে এখান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে।

এই মহাপ্রস্থানের মহামুহূর্ত তাঁহার জীবনে কখন ঘনাইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। আল্লাহ্ পূর্বেই একটি আয়াতে বলিয়া দিয়াছিলেন :

"যখন আল্লাহ্র সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং যখন তুমি দলে দলে লোকদিগকে আল্লাহ্র ধর্ম (ইসলাম) গ্রহণ করিতে দেখিবে, তখন আল্লাহ্র গুণগান করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিও, কারণ তিনি ক্ষমাশীল।" (সূরা নস্র)

বিদায় হজের প্রাক্কালে অসংখ্য গোত্রকে দলে দলে ইসলামের পতাকা তলে মিলিত হইতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আল্লাহ্র সেই সাহায্য ও বিজয় সত্য সত্যই নামিয়াছে, কাজেই তাঁহার বিদায়-সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিয়াছে।

হযরতের সকল কার্যে ও সকল চিন্তায় তাই একটা পরিবর্তন দেখা দিল। বেলা শেষে সাগর কূলে দাঁড়াইয়া পরপারের দিকে তিনি তাকাইলেন। অস্তপারের দেশে তাঁহার মন উধাও হইয়া গেল। সেই ধ্যান ও সেই স্বপ্ন তাহার চোখে নামিল।

হজ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় তাই তিনি ওহদ-প্রান্তরে উপনীত হইয়া শহীদদিগের মাজারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের রুহ-শাফায়াতের জন্য মুনাজাত করিলেন। মৃত বীরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :

"হে সমাধি শায়িতগণ, তোমাদের আত্মার উপর আল্লাহ্র অনন্ত রহমত নাযিল হউক। আমরাও শীঘ্রই তোমাদের সহিত মিলিত হইতেছি।"

মদিনায় পৌঁছিয়াও হযরত একদিন নীরব নিশীথে 'জান্নাতুলবাকী' নামক গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া একইভাবে মৃত মুসলমানদিগের রুহ্-শাফায়াতের জন্য প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু এই বিদায় যাত্রার মুখে দাঁড়াইয়াও মহানবী এপারের কতব্যকর্মে এতটুকুও অবহেলা করেন নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কর্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

মুতা–অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিবার পর সিরিয়া অঞ্চলে আবার বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পাইল। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ কিছুতেই সন্ধির শর্ত সম্যকরূপে পালন করিল না। এ কারণে পুনরায় তথায় অভিযান প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিল। হযরত তৎক্ষণাৎ মুসলমানদিগকে সিরিয়া যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। এবারকার এ অভিযানের নেতৃত্ব ভার অর্পণ করিলেন জায়েদের পুত্র ওসামার উপর। বিংশতিবর্ষ বয়স্ক তরুণ যুবক এই ওসামা, তাহাতে আবার ক্রীতদাস পুত্র। তিনি হইলেন সেনাপতি আর তাঁহারই অধীনে সাধারণ সৈনিক বেশে যোগ দিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ আবুবকর ও ওমর। দুনিয়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে ইসলামের নবসাম্যবাদ মুসলমানদিগের মধ্যে কতটা কার্যকরী হইয়াছে, তাহাই যেন একবার দেখিয়া যাইবার জন্য মহানবী এই ব্যবস্থা করিলেন। আবুবকর ওমর অথবা অন্যান্য সাহাবাগণ যাঁহারা দীর্ঘদিন হযরতের সাহচর্যে থাকিয়া ইসলামের সমস্ত ধ্যান–ধারণা আপন জীবনে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা নির্বিচারে অবনত মস্তকে এ আদেশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু একদল তরুণ মুসলমান ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। ওসামার নেতৃত্ব স্বীকার করিবার মত মনোভাব তাঁহাদের ছিল না। হযরত একথা বুঝিতে পারিয়া আবার সকলের নিকট ইসলামের সাম্যনীতির ব্যাখ্যা করিলেন। তখন সকলেই শান্ত হইলেন। একমনে একপ্রাণে ওসামার নেতৃত্বে মুসলিম বীরদল যুদ্ধে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু নগরবাসীর মনোযোগ শীঘ্রই আর একটি গুরুতর বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। ওসামাকে আদেশ দিবার পরদিনই হযরত হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন।

পীড়ার সূচনা এইরূপ হইল :

'জান্নাতুল বাকী' হইতে ফিরিয়া আসিয়া হযরত বিবি আয়েশার গৃহে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন : আয়েশা শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া বলিতেছেন, "উঃ। মাথা গেল। মাথা গেল।" তাহা শুনিয়া হযরত বলিলেন : "আয়েশা, কার মাথা গেল? তোমার না আমার?" এই বলিয়া তিনি নিজের অসুস্থতার কথা জানাইলেন। অতঃপর একটু হালকা সুরে বলিলেন : "তোমার মাথা গেলেই বা ক্ষতি কী, আয়েশা', আমার পূর্বে যদি তুমি মারা যাও, তবে কি তুমি সুখী হও না? আমি তোমাকে আপন হাতে গোসল করাইয়া কাফন পরাইয়া কবরে শোয়াইয়া দিব, তার চেয়ে মধুর আর কী হইতে পারে?"

আয়েশা তদুত্তরে একটু হাসিয়া বলিলেন : "হ্যাঁ, তা বৈকি। আপনি ত তাই চান। আমি মারা গেলে একটি নূতন বিবি আনিয়া আমারই এই ঘরে আপনি নূতন সংসার পাতিবেন, এই বুঝি আপনার মতলব?"

আয়েশার এই স্নিগ্ধ বিদ্রূপ হযরত প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলেন। দাম্পত্য জীবনের এই চিত্রটুকু কত সুন্দর—কত মধুর।

হযরতের পীড়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যান্য সকল স্ত্রীর সম্মতি লইয়া তিনি আয়েশার গৃহে শয্যা গ্রহণ করিলেন

হযরতের পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার প্রিয় দুহিতা বিবি ফাতিমা পিতাকে দেখিতে আসিলেন। হযরত ফাতিমাকে কাছে ডাকিয়া তাঁহার কানে কানে কি যেন গোপন কথা বলিলেন। ইহাতে ফাতিমা উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন

www.pathagar.com

হযরত আবার তাঁহার কানে কানে আর একটি গোপন কথা বলিলেন। এইবার ফাতমা হাসিয়া উঠিলেন।[১] কেহই এই কান্না হাসির অর্থ বুঝিল না।

দ্বিতীয় দিন হযরতের জ্বর হইল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। বারে বারে বলিতে লাগিলেন : "খায়বারে ইহুদিনী যে বিষ দিয়াছিল, সেই বিষের যন্ত্রণা এখন আমি অনুভব করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি সকলকে তাঁহার মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢালিতে বলিলেন।

কিন্তু নূর নবী তখনও একেবারে শয্যাশায়ী হন নাই। রুগ্ণ শরীর লইয়াই তিনি প্রত্যহ মসজিদে গিয়া ইমামতি করিতে লাগিলেন।

নামায শেষে একদিন তিনি খুৎবা দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন : "আল্লাহ্ তাঁহার এক বান্দাকে দুনিয়ার সমস্ত সুখ-সম্পদ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্‌কে গ্রহণ করিল।" কেহই এই অসংলগ্ন কথার গূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিল না, কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকর এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া কাঁদিয়া জার জার হইতে লাগিলেন। সাধারণ লোক মনে করিল : বৃদ্ধ আবুবকরের মাথা খারাপ হইল নাকি? হযরত একটি লোক সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিতেছেন, ইহাতে কাঁদিবার কী আছে?

অতঃপর হযরত বলিলেন : "নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্য হইতে প্রেম ও ভক্তিতে আবুবকরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানি। এই মসজিদের সমস্ত দরজা আজ হইতে বন্ধ হইয়া যাক, শুধু খোলা থাক আবুবকরের দরজা।"

হযরতের মৃত্যুর পর আবুবকরই যাহাতে মুসলমানদিগের খলিফা নির্বাচিত হন, এই ইঙ্গিতই সেদিন তিনি দিলেন।

জীবনের আলো ম্লান হইয়া আসিতেছে জানিয়া তিনি আর একদিন বিবি আয়েশার গৃহে সমবেত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "হে মুসলমানগণ, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ্ তোমাদের উপর প্রসন্ন হউন। তাঁহারই শক্তিবলে তোমাদের জীবন ও কর্ম সাফল্যমণ্ডিত হউক। অক্ষুণ্ণ কল্যাণে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক। আজ হইতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসিবে, তোমাদের মধ্যবর্তিতায় তাহাদের সকলের প্রতিই আমি আমার সালাম ও দোওয়া পৌঁছিয়া দিলাম।"

অন্য আর এক সময় তিনি বলিলেন : "সাবধান! তোমরা যেন আমার কবরকে পূজা না কর। পৃথিবীর বহু জাতি এই পাপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।"

সফর মাস শেষ হইয়া গেল। রবিউল আউয়াল মাস পড়িল। হযরতের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

সেদিন মাসের এগার তারিখ। রবিবার। এশার নামাযের আযান ধ্বনিত হইল। হযরত অজু করিবার জন্য পানি চাহিলেন। অতি কষ্টে অজু করিয়া তিনবার উঠিতে

---

১. পরবর্তীকালে বিবি ফাতিমা নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন : "প্রথমবার হযরত তাঁহার আসন্ন মৃত্যু-সংবাদ দিয়াছিলেন, তাই আমি কাঁদিয়াছিলাম। দ্বিতীয়বার তিনি বলিয়াছিলেন : ফাতিমা কাঁদিও না। আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমিই আমার সঙ্গে বেহেশ্‌তে মিলিত হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি হাসিয়াছিলাম।" বলা বাহুল্য, হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাসের মধ্যে বিবি ফাতিমা ইন্তিকাল করেন।

www.pathagar.com

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, নামাযে যোগদান করিতে পারিলেন না। তখন আবুবকরকে নামায পড়াইবার জন্য তিনি আদেশ পাঠাইলেন। আদেশক্রমে আবুবকর নামায আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু হযরতকে অনুপস্থিত দেখিয়া ভক্তবৃন্দ উতলা হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন, বুঝি বা হযরত আর ইহজগতে নাই। হযরত তাহা বুঝিতে পারিয়া দুইজন আত্মীয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া মস্‌জিদে উপস্থিত হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আবুবকর মিম্বার হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন; কিন্তু হযরত তাহা নিষেধ করিলেন। আবুবকরের পার্শ্বে বসিয়াই সেদিন তিনি নামায পড়িলেন।

নামায শেষে তিনি সকলকে বলিলেন : "হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তোমরা নিষ্ঠার সহিত তাহার আদেশ-নিষেধ পালন করিও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। বিদায়!"

হযরতের অবস্থা দেখিয়া সাহাবীরা কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত যে এত শীঘ্র তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, একথা কিছুতেই কাহারও বিশ্বাস হইল না।

সারা রাত্রি হযরতের খুব কষ্টে কাটিল।

সোমবার। প্রভাত হইতেই ফযরের আযান ধ্বনিত হইল। হযরত উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। আবুবকর নামায পড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন বিবি আয়েশাকে মস্‌জিদ-সংলগ্ন দরজাটি খুলিয়া দিতে বলিলেন। খোলা দরজা দিয়া ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া আসিয়া হযরতের গায়ে লাগিতে লাগিল। নবপ্রভাতের অরুণ-আলো আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িল। এইদিন এই সময়ে তিনি দুনিয়ায় আসিয়াছিলেন, সেকথা তাঁহার মনে পড়িল। নীরব দৃষ্টি মেলিয়া তিনি মস্‌জিদের নামাযরত মুসলমানদিগের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। একটা পবিত্র শান্তি ও আনন্দ তাহার চোখেমুখে খেলিয়া গেল। তাঁহার ইন্তিকালের পর মুসলিমগণ কিরূপভাবে নামায পড়িবে, কিরূপভাবে চলিবে, সেই স্বপ্ন যেন আজ তাঁহার চোখে ঘনাইয়া আসিল। নব-সূর্যের নব-আলোকে এক নবীন জাতির অভ্যুত্থান তিনি দেখিতে পাইলেন। অনাগত ভবিষ্যতের গৌরবোজ্জ্বল চিত্র দেখিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার জীবন-সাধনা যে সফল হইয়াছে, আল্লাহ্‌র বাণীকে তিনি যে জয়যুক্ত দেখিয়া যাইতে পারিতেছেন, এ গৌরব ও আনন্দে তাঁহার বুক ভরিয়া গেল। পবিত্র মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিল।

সকাল বেলা হযরতের অবস্থা আশাতিরিক্তরূপে ভালো বলিয়াই বোধ হইল সকলের সহিত তিনি বেশ কথা বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইল। ভক্তবৃন্দ শুকুর-গুজারি করিতে লাগিলেন। হযরত আরোগ্যলাভ করিতেছেন ভাবিয়া আবুবকর, ওমর, আলি, ওসমান প্রমুখ সকলেই আপন আপন কার্যে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এই সময়ে আবুবকরের স্ত্রী (আয়েশার জননী) মাদিনার উপকণ্ঠে সুনুহ নামক পল্লীতে বাস করিতেছিলেন। হযরতের আশাপ্রদ অবস্থা দেখিয়া আবুবকর আপন স্ত্রী লইয়া আসিবার জন্য হযরতের অনুমতি চাহিলেন। হযরত সম্মতি দিলেন। দ্বিধাহীন চিত্তে আবুবকর সুনুহ যাত্রা করিলেন।

হযরতের অসুস্থতা নিবন্ধন ওসামা এতদিন সিরিয়া যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া এক সময় হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ওসামার মস্তকে হস্ত

www.pathagar.com

রাখিয়া হযরত তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে সিরিয়ায় অভিযান করিবার জন্য পুনরায় তাঁহাকে তাকিদ দিলেন।

বিবি আয়েশা দিবারাত্রি হযরতের পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তখনও তরুণ-বয়স্কা, কিন্তু তবু কী আদর্শ স্বামীভক্তি! কী অনুপম সেবাপরায়ণতা! স্বামীর পবিত্র মস্তক আপন কোলে রাখিয়া তিনি তাঁহাকে সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে হযরতের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হইল। পীড়ার গতি মন্দের দিকে চলিল। বিবি আয়েশা ও অন্যান্য সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। সংবাদ শুনিয়া ওমর ও অন্যান্য সাহাবাগণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত একবার ওমরকে কালি-কলম লইয়া আসিতে বলিলেন। উদ্দেশ্য : লিখিতভাবে তিনি কোন উপদেশ রাখিয়া যাইবেন। কিন্তু ওমর তাহা আনিলেন না। হযরতকে বাধা দিয়া বলিলেন : "ইয়া রসুলুল্লাহ্ লিখিত উপদেশের কী প্রয়োজন? আমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র কুরআন এবং আপনার আদর্শই ত যথেষ্ট।" কী প্রয়োজন? আমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র কুরআন এবং আপনার আদর্শই ত যথেষ্ট।" কী অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবল এই তেজোদৃপ্ত মানুষটির!

এই সময়ে আবুবকরের পুত্র আবদুর রহমান একখানি মেস্ওয়াক হস্তে হযরতের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। হযরত সেখানির প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। হযরত সব সময়ে মেস্ওয়াক করিয়া দাঁত পরিষ্কার রাখিতে ভালবাসিতেন। বিবি আয়েশা তাহা জানিয়া হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "মেস্ওয়াকখানি আপনি চান কি? হযরত সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বিবি আয়েশা তাহা লইয়া হযরতের হাতে দিলেন। হযরত তাহা মুখে দিয়া দেখিলেন, বড় শক্ত। তখন বিবি আয়েশা বলিলেন : "আমি কি চিবাইয়া উহা নরম করিয়া দিব?" হযরত মাথা নড়িয়া সম্মতি জানাইলেন। তখন বিবি আয়েশা দাঁত দিয়া চিবাইয়া মেস্ওয়াকখানির অগ্রভাগ মোলায়েম করিয়া দিলেন। তাহা দিয়া হযরত দন্তমঞ্জন করিলেন। কী অনুপম চিত্র এ!

ইহার পর হঠাৎ একটা অবসাদ দেখা দিল। হযরত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। হস্তপদ অসাড় হইয়া আসিল। বিবি আয়েশা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি হযরতের মস্তক আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন এবং নিজ হস্তে হস্তদ্বয় মর্দন করিতে লাগিলেন। হযরত মৃদুস্বরে আয়েশাকে বলিলেন : "হাত সরাইয়া লও।" বিবি আয়েশা তাহাই করিলেন। ধীরে ধীরে হযরতের জীবন-প্রদীপ নিভিয়া আসিতে লাগিল। বিশ্বপ্রকৃতি তখন বাহিরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; দিকে দিকে বিদায়ের করুণ রাগিণী বাজিতেছে। একটা মহাশোকের মাতম যেন বিশ্বের দুয়ারে ঘনাইয়া আসিতেছে। এত বড় বিরহ ত ধরণীতে আর কোন দিন আসে নাই।

একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

হযরত একদৃষ্টে ঊর্ধ্ব-আকাশপানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন : "ইয়া রফীকে-আ'লা! হে আমার পরম বন্ধু! তোমার কাছে!!"

সব শেষ হইল। বিশ্বনবীর রুহ্-মুবারক জান্নাত-লোকে প্রস্থান করিল।[২]

---

২. খ্রীষ্টান পঞ্জিকা অনুসারে রসূলুল্লাহ্ ইনতিকাল করেন : ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুন, মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল, ১১শ হিযরী। (Vide Encyclopaedia Britanica : Mohammad)

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫৮
শেষ কথা

রসুল নাই! রসুল নাই! ধরণীর অন্তস্তল হইতে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উত্থিত হইয়া আকাশ-বাতাসকে উতলা করিয়া তুলিল। এতদিন যাহাকে পাইয়া বিশ্বপ্রকৃতি শান্ত হইয়াছিল, আজ আবার তাঁহাকে হারাইয়া সে হাহাকার করিতে লাগিল। মিলনোৎসবের প্রধান অতিথি চলিয়া গেলে সভাগৃহ যেমন নিষ্প্রভ হইয়া যায়, চমনবাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেলে যেমন করিয়া তরু পল্লবে বিরহ ঘনায়, বিশ্বধরণীরও আজ সেই দশা হইল। যাঁহার আগমনে তোরণে- তোরণে একদিন বাঁশি বাজিয়াছিল, নানা পত্রপুষ্পে যাঁহাকে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল, দিকে দিকে আনন্দমেলা বসিয়াছিল, সেই সম্মানিত প্রধান অতিথি আজ চলিয়া গেলেন। উৎসবভূমি আজ মলিন নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল। স্থলে-জলে, লতায়-পাতায়, ফুলে-ফলে, তৃণে-তৃণে শোকের ছায়া নামিল। সমস্ত হাসিগান থামিয়া গেল, দিকে দিকে শুধুই একটা করুণ ক্রন্দনের সুর শোনা যাইতে লাগিল। মেষশিশুরা তৃণ মুখে দিয়া হঠাৎ ব্যথার সুরে কাঁদিয়া উঠিল, মরু পথে চলিতে চলিতে উটেরা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া মদিনা পানে মুখ তুলিয়া জল ছলছল নয়নে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বাগিচা হইতে বুলবুল উড়িয়া গেল; ফুলদল ঝরিয়া পড়িল; পাখিরা গান ভুলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; সমীরণ গতি হারাইল। 'লু'-হাওয়া ধরণীর অন্তর্দাহ বহন করিয়া মরুদিগন্ত হাহাকার করিয়া ফিরিতে লাগিল। উদাসীন বেদুঈন তাহার বল্লম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অশ্ব হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। অশ্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিমর্ষভাবে বারে বারে হ্রেষারব করিতে লাগিল জড়চেতনে আজ এমনি করিয়া শোকের মাতম উঠিল। সকলেই মনে করিতে লাগিল : কী যেন তাহার নাই, কী যেন সে আজ হারাইয়া ফেলিয়াছে, কোথায় যেন খনিকটা শূন্য হইয়া গিয়াছে।

মুহূর্ত-মধ্যে হযরতের মৃত্যু সংবাদ মদিনার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। আবুবকর তখনও সুন্‌হতেই অবস্থান করিতেছিলেন; সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে হযরতের ইন্তিকালের সংবাদে বিহ্বল হইয়া ওমর তাড়াতাড়ি বিবি আয়েশার গৃহে উপস্থিত হইলেন। হযরতের দেহাবরণ উন্মুক্ত করিয়া একদৃষ্টে তিনি মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। সেই প্রশান্ত জ্যোতির্ময় মুখখানি দেখিয়া ওমর কিছুতেই মনে করিতে পারিলেন না যে, হযরত তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। সেই মুখ, সেই হাসি, সেই কমনীয়তা—সমস্তই বিদ্যমান; মৃত্যুর কোন লক্ষণ সেখানে নেই। ওমর বলিয়া উঠিলেন : "কে বলে হযরত নাই? মিথ্যা কথা। হযরত মরেন নাই—মরিতে পারেন না।" বলিতে বলিতে তিনি উন্মাদের ন্যায় বাহির হইয়া আসিলেন এবং গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন : "হযরত মরেন নাই, মরিতে পারেন না যে বলিবে তিনি মারা গিয়াছেন, তাহার গর্দান লইব।" বলিতে বলিতে

www.pathagar.com

তিনি কোষ হইতে তরবারি তুলিয়া লইলেন। হযরতের মৃত্যুতে ওমর যে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই উক্তি যে তাঁহার অন্তর্বেদনারই বহিঃপ্রকাশ সকলেই তাহা বুঝিতে পারিলেন।

ঠিক এই সময়ে হযরত আবুবকর আসিয়া পৌঁছিলেন। তাড়াতাড়ি তিনি বিবি আয়েশার গৃহে প্রবেশ করিয়া হযরতের মুখাবরণ তুলিয়া অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। ভক্তিভরে নত হইয়া হযরতের পবিত্র ললাটে বারে বারে 'বোসা' (চুম্বন) দিতে দিতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি বলিতে লাগিলেন : "জীবনে যেমন সুন্দর ছিলে, মরণেও তুমি ঠিক তেমনি সুন্দর দেখাইতেছ!" তারপর দুই হাতে হযরতের মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া ধীরে ধীরে পুনরায় তাঁহাকে শোওয়াইয়া দিয়া বলিলেন : "হে আমার প্রিয় বন্ধু, তুমি আজ সত্যিই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে!"

ব্যথিত চিত্তে আবুবকর বাহিরে আসিলেন। ওমর তখনও অসি হস্তে দুয়ারে দণ্ডায়মান। সাহস করিয়া কেহই তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছেন না। তাহা দেখিয়া আবুবকর অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন : "ওমর কী করিতেছ! ক্ষান্ত হও। বাচালতা পরিত্যাগ কর। হযরত মারা গিয়াছেন, ইহাতে আশ্চর্যের কী আছে? আল্লাহ্ তাঁহার রসুলের নিকট কি এই আয়াত নাযিল করেন নাই?–

"নিশ্চয়ই তুমি মরিবে এবং তাহারাও (অন্যান্য লোকেরাও) মরিবে।" তারপর ওহদ–যুদ্ধের অবসানে কি আল্লাহ্ বলেন নাই :

"মুহম্মদ একজন প্রেরিত নবী ছাড়া কিছুই নহে! নিশ্চয়ই তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীরা ইন্তিকাল করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কী করিবে? তিনি যদি মারাই যান, অথবা নিহতই হন, তবে কি তোমরা (পূর্বের অবস্থায়) ফিরিয়া যাইবে?"

অতএব হে লোক সকল, অবহিত হও। যাহারা এতদিন মুহম্মদের পূজারী ছিলে তাহারা জানো যে মুহম্মদ মারা গিয়াছেন। আর যাহারা আল্লাহ্‌র পূজা করিতে, তাহারা জানো যে আল্লাহ্‌র মৃত্যু নাই–তিনি চিরজীবন্ত–তিনি হাইউল–কাইউম।"

আবুবকরের এই জ্বলন্ত সত্যবাণী শুনিয়া ওমরের চৈতন্য হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলি যেন সবেমাত্র নাযিল হইল—উহাদের তাৎপর্য তিনি যেন আজ নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলেন। ওমর থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল, বিহ্বল হইয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

এই সময় একটা নূতন সমস্যার উদ্ভব হইল। হযরতের মৃত্যুর পর যে প্রশ্ন অনিবার্য হইয়াছিল, এখনই তাহা দেখা দিল। মুসলমানদিগের নেতা বা খলিফা এখন কে হইবেন? এই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজন ছিল, কারণ ইহা না হইলে কোন কাজ করাই আর সম্ভব হইত না। অনতিবিলম্বে একটি পরামর্শ সভায় মোহাজের ও অনসারগণ মিলিত হইলেন। মদিনাবাসী আনসারদের অর্ধেকেরই ইচ্ছা ছিল—তাঁহাদের দলপতি সা'দ বিন উবাদাকে খলিফা নির্বাচিত করেন। কিন্তু ওমর, আবু উবাদা প্রমুখ

www.pathagar.com

তাহাতে সম্মত হইলেন না, তাহারা জ্ঞানবৃদ্ধ আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "বন্ধুগণ, রসুলুল্লাহ্‌র ইঙ্গিত কি এখনও আপনারা বুঝিতে পারেন নাই? জীবিত থাকাকালীন তিনি এক আবুবকরকেই এমামতি করিবার হুকুম দেন নাই? এমন কি নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নামায পড়েন নাই? আবুবকরকে কি তিনি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন না? অতএব আসুন, আমরা সকলেই আবুবকরকে খলিফা বলিয়া মানিয়া লই।" ইহা বলিয়াই তিনি আবুবকরের হস্ত ধারণ পূর্বক তাহার নিকট বয়েৎ হইলেন। তখন সকল বাধা-বিপত্তি ভাসিয়া গেল। একে একে সকলেই আসিয়া আবুবকরকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করিলেন। যাঁহারা সা'দ-বিন্-উবাদাকে সমর্থন করিতেছিলেন. তাঁহারাও সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের সম্মতি জানাইলেন। এইরূপে আবুবকর মুসলমানদিগের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হইলেন।

আবুবকর তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন : "হে মুসলমানগণ, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই, সে কথা জানি; তবু তোমাদের ইচ্ছানুসারেই আমি তোমাদের খলিফা হইলাম। যদি আমি ভুল করি বা বিপথে চলি, তবে তোমরা আমাকে সংশোধন করিয়া লইও। মনে রাখিও, মিথ্যা বা দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা কোন জাতি বড় হইতে পারে না, সততার মধ্যেই জাতির শক্তি নিহিত থাকে। যে জাতি ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চক ও নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী, সে জাতিকে আল্লাহ্ ঘৃণা করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, অতএব, তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার আদেশ পালন করিবে। আমি যতখানি আল্লাহ্ ও তাঁহার রসুলকে মানিয়া চলিব, তোমরা ঠিক ততখানি আমার কথা মানিয়া চলিবে।" ইহা বলিয়া তিনি সকলকে শান্ত করিলেন।

হযরতের মৃতদেহ চব্বিশ ঘন্টা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সোমবার অপরাহ্নে তিনি ইন্তিকাল করেন, মঙ্গলবার অপরাহ্নে তাঁহাকে দাফন করা হয়। এই চব্বিশ ঘন্টা ধরিয়া দলে দলে ভক্তবৃন্দ আসিয়া হযরতকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার পবিত্র আত্মার উপর আল্লাহ্‌র রহমত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বহু দূরপথ হইতে বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রী, বালক, বালিকা—কাতারে কাতারে মদিনা পানে ছুটিয়াছে, সকলেরই মুখ মলিন, সকলেরই চোখে আসু, সকলেরই কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি। মদিনার সর্বত্র সেদিন এমনই শোকের মাতম।

হযরতের মৃতদেহ কোথায় দাফন করা হইবে, তাহা লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ বলিতেছিলেন : মস্‌জিদুন্নবীর মিম্বারের পাশে কেহ বলিতেছিলেন মিম্বারের নিম্নে। কিন্তু আবুবকর কাহারও প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া বলিলেন জীবিতকালে হযরতকে বলিতে শুনিয়াছি : "পয়গম্বরেরা যেখানেই দেহত্যাগ করেন সেইখানেই তাহাদিগকে সমাহিত করিতে হয়।' অতএব হযরত যেখানে শায়িত আছেন, সেখানেই তাঁহাকে দাফন করিতে হইবে।" এই নির্দেশ অনুসারে বিবি আয়েশার গৃহেই হযরতের সমাধি রচিত হইল।

মঙ্গলবার অপরাহ্নে হযরতের দাফন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। মদিনা-মস্‌জিদে তখন অগণিত লোক। হযরতকে সমাধি-শয়নে শায়িত করিবার পূর্বে খলিফা আবুবকর সকলের তরফ হইতে এই মুনাজাত করিলেন :

www.pathagar.com

"হে রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্‌র অনন্ত রহমত তোমার পবিত্র আত্মার উপর বর্ষিত হউক। আমরা সাক্ষ্য দিতেছি, তুমি আল্লাহ্‌র বাণী যথাযথভাবে আমাদের কাছে পৌছাইয়া দিয়াছ; যতদিন না সত্য জয়যুক্ত হইয়াছে, ততদিন জীবনপণ করিয়া জিহাদ করিয়াছ। এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই মা'বুদ নাই—এ কথা তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ এবং তাঁহার সান্নিধ্যে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছ;বিশ্বাসীদিগের প্রতি তুমি চিরদিনই সদয় ব্যবহার করিয়াছ। আল্লাহ্‌র ধর্ম সকলের দুয়ারে পৌছাইয়া দিবার বিনিময়ে তুমি কোনদিন কোন প্রতিদান চাও নাই, অথবা অধর্মকে কাহারও নিকট বিক্রয়ও কর নাই। হে দরদী বন্ধু, আল্লাহ্‌র অনন্ত করুণায় তোমার রুহ-মুবারক অভিষিক্ত হউক। আমিন।"

আসুন পাঠক, আমরাও এই সুরে সুর মিলাইয়া বলি : "আমিন!"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় খণ্ড

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বাভাষ

আল্লাহ্তায়ালার অসীম অনুগ্রহ যে এই অধম তাহার প্রিয় নবীর জীবন-কথার একাংশ আজ শেষ করিতে পারিল। ইহাকে আমি আমার জীবনের চরম সঞ্চয় ও পরম গৌরব বলিয়া মনে করি।

প্রথম খণ্ডে আমরা আঁ-হযরতের জীবনেতিহাস আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহার চরিত্রের ও শিক্ষার নানা দিক এবং নানা সমস্যার আলোচনা করিব।

পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা কিছুটা স্বতন্ত্র। হযরত মুহম্মদকে আমরা শুধু 'মানুষ'ও বলি নাই, 'অতি-মানুষ'ও বলি নাই। তিনি আমাদের মতই একজন 'মাটির মানুষ' ছিলেন—ইহাও যেমন ভুল ধারণা, তিনি একজন অলৌকিক ব্যক্তি বা অতি-মানুষ ছিলেন—ইহাও তেমনি ভুল ধারণা। পক্ষান্তরে যদি বলি যে, তিনি মানুষ ছিলেন না, অথবা কোন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব তাঁহার ছিল না, সে ধারণাও ভুল। মানুষ এবং অতি-মানুষের তিনি ছিলেন সমন্বয়। ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু ইসলামের আলোকে রসূলুল্লাহর এই দ্বৈতরূপ নির্ভুল হইবে না। ইসলাম অতি-মানবতাবাদকে (দেবত্ববাদকে) অস্বীকার করে। সাধারণ জ্ঞানে যাহা অতি মানবতা বলিয়া মনে হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তাহাও মানবতা। তথাকথিত অতি মানবতা মানবতারই পূর্ণরূপ। কাজেই, দেবত্বের বা অতি-মানবতার কোন প্রয়োজনই ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলাম বলে, আল্লাহ্র নিচেই মানুষের স্থান। জ্ঞানে-গুণে শক্তি ও সম্ভাবনায় মানুষ আল্লাহ্রই প্রতিনিধি। আল্লাহ্ এবং মানুষের মধ্যে তাই তৃতীয় কোন শক্তি নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে মানুষের সংজ্ঞা এবং সীমানা নির্ণয়ে আমাদের গণ্ডগোল আছে। মনুষের সংজ্ঞা এবং ধারণা খাটো করিলেই অতি-মানুষের বা দেবতার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু মানুষের সংজ্ঞা, শক্তি এবং সম্ভাবনাকে যদি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি, তবে দেবত্ববাদ আর দাঁড়াইতে পারে না, মানবতার গণ্ডির মধ্যেই তাহাকে ধরা যায়। মানুষ বলিলে যদি বুঝি যে, আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সে, স্রষ্টার প্রতিনিধি সে, আল্লাহ্র নিচেই তাহার আসন; চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র তাহার সেবায় নিয়োজিত, অফুরন্ত তাহার শক্তি, সীমাহীন তাহার সম্ভাবনা, তাহা হইলে অতি-মানবতার কল্পনা কেন করিব?

হযরত মুহম্মদকে ইসলামী অর্থে তাই 'মানুষ' বলিতে বাধা নাই। তিনি ছিলেন এমন মানুষ—যাহার উপর অহি নাযিল হইত, আকাশ পৃথিবী জুড়িয়া যাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত ছিল, গ্রহনক্ষত্র যাঁহার পায়ের ভৃত্য ছিল, সর্বোপরি যিনি ছিলেন আল্লাহ্র রাজপ্রতিনিধি বা খলিফা। এই ব্যাপক গণ্ডির মধ্যে বিচরণশীল একজন মানুষের রূপই ছিল হযরত মুহম্মদের।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, হযরত দুই নামে পরিচিত ছিলেন। এক নামে তিনি ছিলেন 'মুহম্মদ' অর্থাৎ 'চরম প্রশংসিত' ; অন্য নামে তিনি ছিলেন 'আহমদ' অর্থাৎ 'চরম প্রশংসাকারী'। চরম প্রশংসিত বলিলে বুঝা যায় তিনি ছিলেন চরম পূর্ণ অর্থাৎ

www.pathagar.com

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ আর 'চরম প্রশংসাকারী' বলিলে বুঝা যায় তাঁহার প্রদত্ত আল্লাহ্‌র প্রশংসা বা পরিচিতি সর্বাপেক্ষা সত্য, সুন্দর, ব্যাপক এবং পরিপূর্ণ। কাজেই হযরত মুহম্মদের জীবনের লক্ষ্য (mission) সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে সব সময়েই আমাদের দৃষ্টিকোণকে এই দুই বিন্দুতে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে, অর্থাৎ আমাদিগকে দেখিতে হইবে : (১) তিনি আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ছিলেন কিনা, (২) আল্লাহ্‌র যে পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা চরম এবং পরম হইয়াছে কিনা। হযরতের জীবনের সার্থকতা ও মূল্যায়নও এই বিচারের মধ্যে নিহিত আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রধানত আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করিব। আমরা দেখাইব যে, হযরত সত্য সত্যই বিশ্বনিখিলের জন্য পরিপূর্ণ আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত আল্লাহ্ পরিচিতিই সর্বাপেক্ষা সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

এতদ্ব্যতীত আরও এমন কতকগুলি বিষয় আছে—যাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিলে হযরতের জীবনচিত্র অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। সেরূপ কয়েকটি মূল্যবান বিষয়ের আলোচনাও পাঠক এই দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাইবেন।

বলা বাহুল্য আল্লাহ্ এবং রসূলকে চিনিতে গেলেই স্রষ্টা এবং সৃষ্টির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটিয়া যাইবে এবং সেই পরিচয়ের মধ্যে আমাদের স্থান কোথায় এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব কী, সে কথা বলাও তখন সহজ হইবে। এই উদার বিশ্ববোধই ইসলামের জীবন-দর্শন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১

হযরত মুহম্মদের জন্ম—তারিখ কবে

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট, মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার, হযরত মুহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন।

কিন্তু আধুনিক যুগের কোন কোন পণ্ডিতের মতে হযরতের সঠিক জন্ম-তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল, ১২ই নহে। ইহাদের প্রায় সকলেই মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতির্বিদ পণ্ডিত মুহম্মদ পাশা ফলকীকে অনুসরণ করেন। পাশা মহোদয় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাতায়েযুল আফ্‌হাম' নামক একখানি আরবী পুস্তিকা রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, হযরতের জন্ম ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে হইয়াছিল, কেননা হিসাব করিলে দেখা যায় ৯ তারিখেই সোমবার পড়ে ১২ তারিখে পড়ে না।

মওলানা শিবলী নোমানী তাঁহার বিখ্যাত 'সীরাতুন-নবী' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় পাশা মহোদয়ের উক্তির সারাংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

১. সহী হাদিসে বর্ণিত আছে যে, হযরতের শিশুপুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল,

২. হিযরী ৮ম সালের জিলহজ মাসে ইব্রাহিমের জন্ম হয়, ১৭/১৮ মাস বয়সে হিযরীর দশম সালে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল,

৩. হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে উল্লিখিত সূর্যগ্রহণ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর তারিখে ৮-৩০ মিনিটের সময় লাগিয়াছিল,

৪. ঐ তারিখ ধরিয়া হিসাব করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হযরতের জন্ম সন ১২ এপ্রিল তারিখ রবিউল আউয়াল মাসের ১লা তারিখ হইয়াছিল,

৫. জন্মদিনের তারিখ নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রবিউল আউয়াল মাসের ৮ই হইতে ১২ই তারিখ পর্যন্ত এই মতভেদ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই,

৬. ৮ই হইতে ১২ রবিউল আউয়ালের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই। অতএব, নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল আউয়াল, ২৩ শে এপ্রিল, সোমবার হযরত মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[১]

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, উপরোক্ত প্রস্তাবনা (premise) এবং যুক্তিধারা (syllogism) অনুসারে কী করিয়া যে "নিশ্চিতরূপে" প্রমাণিত হয় যে, ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। যুক্তি প্রমাণের যে-সব উপকরণ জনাব পাশা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হইতে কোনক্রমেই উপযুক্ত সিদ্ধান্তে (conclusion) পৌছা যায় না। স্বীকার করিলাম ইব্রাহিমের মৃত্যুদিনে যে সূর্যগ্রহণ লাগিয়াছিল তাহা ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর

---

১. জনাব মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। (দেখুন : মোস্তফা-চরিত ১৪৩ পৃঃ)

www.pathagar.com

তারিখে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তার পর? মাত্র এইটুকু প্রস্তাবনা হইতে কী করিয়া হযরতের জন্ম-তারিখে পৌঁছানো যায়? এই তারিখটিকে ভিত্তি করিয়া যদি আমাদিগকে হযরতের জন্ম তারিখ নির্ধারণ করিতেই হয়, তবে যুক্তির ধারা নিম্নরূপ হইবে :

(১) ইব্রাহিমের মৃত্যু-তারিখ (অর্থাৎ ৭ই নভেম্বর ৬৩২ খ্রী) আরবী অমুক তারিখ ছিল;

(২) ঐ তারিখে হযরতের বয়স এত বৎসর, এত মাস. এত দিন ছিল;

(৩) অতএব, হিসাব করিলে দেখা যায় যে, হযরতের জন্ম অমুক আরবী সনের অমুক তারিখে হইয়াছিল।

কিন্তু পাশা সাহেবের যুক্তিধারা সে-পথে চলে নাই। একটি হইতে অন্যটি, অন্যটি হইতে আর একটি—এইরূপভাবে চলিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে : "অতএব, নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

পাশা সাহেবের যুক্তিধারা যদি উপরোক্ত রূপও হইত, তবু হযরতের সঠিক জন্ম তারিখ বাহির করা সম্ভব হইত না। "১৭ বা ১৮ মাস বয়সে ইব্রাহিমের মৃত্যু হইয়াছিল" বলিলে ত সব সঠিকতার মূলে সেইখানেই কুঠারাঘাত করা হইয়া যায়। এই অনিশ্চিত প্রতিজ্ঞার (promise) উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া হযরতের সঠিক জন্ম তারিখ বাহির করা ত দূরের কথা, ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখও নির্ভুলরূপে বাহির করা সম্ভব হয় না। আর ইব্রাহিমের জন্ম-তারিখ বাহির করিয়াই বা লাভ কী? সেখানেও ত ঐ একই প্রশ্ন জাগিবে, ইব্রাহিমের জন্মদিন আরবী কোন্ তারিখ ছিল? এবং সেই তারিখে হযরতের বয়স কত বৎসর, কত মাস, কত দিন ছিল?

দ্বিতীয় কথা এই : মিসরীয় পাশা মহোদয়ের গণনা যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া ফেলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ১২ই রবিউল আউয়াল হইতে ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরতের জন্ম-তারিখ স্থানান্তরিত হইলে মাত্র তিন দিনের অগ্রপশ্চাৎ ঘটিয়া যায়। কিন্তু তাহা মোটেই নহে। এই ৯ই রবিউল আউয়াল ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রবিউল আউয়াল মাসের ৯ই তারিখ নহে, ইহা ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই রবিউল আউয়াল, অর্থাৎ হযরতের প্রচলিত জন্ম-তারিখ প্রায় এক বৎসর পরবর্তী। সুতরাং "৮ই হইতে ১২ই তারিখের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই" এ যুক্তি খুবই বিভ্রান্তিকর।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেকগুলি মূল্যবান কারণ আছে, যাহাতে পাশা মহোদয়ের গণনার উপর নির্ভর করা চলে না। কারণগুলি এই :

১. ইংরেজী বর্ষগণনা-পদ্ধতির সহিত আরবী বর্ষগণনা-পদ্ধতির কোন মিল নাই, কেননা একটি সৌরবৎসর, আর একটি চান্দ্রবৎসর; একটির দিন রাত্রি ১২টার পর হইতে আরম্ভ হয়, অপরটির দিন সূর্যাস্তের পর হইতে আরম্ভ হয়। চন্দ্রের উদয়াস্তের সঙ্গে চান্দ্রমাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কাজেই ইংরেজী কোন্ তারিখের সহিত হিযরী কোন্ তারিখের সামঞ্জস্য আছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এমন কি এই বৈজ্ঞানিক যুগেও তাহা সম্ভব হয় নাই। সরকারী ছুটি নির্ধারণের জন্য আজও সর্বত্র নির্দেশ

www.pathagar.com

দেওয়া হইয়া থাকে, যদি চাঁদ অমুক দিনে দেখা যায়, তবে অমুক দিনে ছুটি হইবে। বর্তমানেই যখন উভয় তারিখের মধ্যে মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন এখানে বসিয়া অঙ্ক কষিয়া কি করিয়া প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বের ঘটনা সম্বন্ধে বলা যায় যে, অমুক খ্রীষ্টাব্দের অমুক মাসের অমুক তারিখে হিযরী সনের অমুক তারিখ ও অমুক দিন পড়িয়াছিল? সৌরমাসের একটা বিধিনির্দিষ্ট স্থিরতা আছে, কিন্তু চান্দ্রমাসের সেরূপ স্থিরতা কোথায়? চাঁদ না দেখা পর্যন্ত কোন কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

২. একই ঘটনার সৌর ও চান্দ্র তারিখ নির্ধারণ করিতে গেলে, অর্থাৎ ইংরেজী তারিখের মোতাবেক হিযরী তারিখ বাহির করিতে গেলে, অনেক ক্ষেত্রে এমন বিভ্রাট ঘটিয়া যায় যে, কিছুতেই তাহা রোধ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাউক, ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সোমবার দিনগত রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় একটি শিশুর জন্ম হইল। কিন্তু ঐদিন সন্ধ্যাকালে রবিউল আউয়াল মাসেরও প্রথম চাঁদ দেখা দিল; অর্থাৎ ১লা তারিখ পড়িল। এক্ষণে শিশুটির জন্ম-তারিখ যদি কেহ লিপিবদ্ধ করিতে চায়, তবে তাহাকে লিখিতে হইবে : ১লা জানুয়ারী সোমবার, মোতাবেক ১লা রবিউল আউয়াল তারিখে শিশুর জন্ম হইল। কিন্তু সেই শিশুটি যদি পরদিন (মঙ্গলবার) সকাল বেলা ১০ ঘটিকার সময় মারা যায়, তবে তাহার মৃত্যু-তারিখ কিভাবে লিখিত হইবে? একথা অবশ্যই লেখা হইবে যে, ২রা জানুয়ারী শিশুটি মারা গিয়াছে। কিন্তু এই ২রা জানুয়ারী মোতাবেক রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ লিখিতে হইবে? সেখানে আর ২ রবিউল আউয়াল লিখিলে চলিবে না। ১লা লিখিতে হইবে; কারণ ১লা রবিউল আউয়াল তখনও শেষ হয় নাই। অতএব, দেখা যাইতেছে ইংরেজী তারিখ অনুসারে শিশুটির মৃত্যু তাহার জন্মের একদিন পরে ঘটিতেছে, কিন্তু হিযরী তারিখ অনুসারে জন্মের দিনেই ঘটিতেছে। এক্ষেত্রে যিনি লিখিবেন যে, শিশুটি জন্মের দিনই মারা গিয়াছিল, তাহার কথাও যেমন নির্ভুল হইবে, যিনি লিখিবেন একদিন পরে মারা গিয়াছে, তাহার কথাও ঠিক তেমনি নির্ভুল হইবে। একদিনের ব্যাপারেই যখন এই, তখন দেড় হাজার বছরের পূর্বকার ঘটনা সম্বন্ধে যে পার্থক্য ও মতবিরোধ দেখা দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

৩. চাঁদ না দেখা পর্যন্ত কোন চান্দ্রমাসের পহেলা তারিখই নিরূপণ করা সহজ নহে। কোন সময় চাঁদ মেঘে ঢাকা থাকে, কেহ দেখিতে পায়, কেহ পায় না। আবার একস্থানে দেখা গেলেও, দূরবর্তী অন্য কোন স্থানে সেই দিনই যে দেখা যাইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা থাকে না; বোম্বাইতে আজ চাঁদ দেখা গেলে কাল হয়ত কলিকাতায় দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অথবা রেডিওর সাহায্যে একস্থানে দেখা গেলেই অন্য স্থানে সে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। কিন্তু হযরতের যুগে ত এ-সব কোন সুবিধাই ছিল না। মক্কায় দেখা গেলেই যে সে-চাঁদ মদিনাতেও সেইদিনই দেখা যাইত, তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। কাজেই আরবী মাসের ১লা তারিখ নির্ণয় করা, তখনকার দিনে সহজ ছিল না; উহা সর্ববাদীসম্মত নাও হইতে পরিত।

৪. হযরতের জন্ম-সময়ে আরবে কোনই প্রচলিত সন-তারিখ ছিল না। বর্তমানে যে-হিযরী সন চলিতেছে, তাহাও হযরতের জন্মের ৫২ বৎসর পর (অর্থাৎ ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে) আরম্ভ হয়।

www.pathagar.com

৫. এখন যে পদ্ধতিতে হিযরী সন গণনা করা হইতেছে, হযরতের জন্ম-সময় ঠিক সেই পদ্ধতিতেও আরবী বর্ষ গণনা করা হইত না। তখন প্রত্যেক বৎসরের মাস ও দিন সংখ্যাও সমান থাকিত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর একরূপে গণনা করা হইত, তৃতীয় বৎসর অন্যরূপে গণনা করা হইত। প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ৩৫৪ দিন থাকিত, তৃতীয় বৎসরে ৩৮৪ দিন থাকিত। এইরূপে প্রতি তিন বৎসরের গড় ধরিলে তবে এক বৎসরে ৩৬৪ দিন পাওয়া যাইত : যথা (৩৫৪+৩৫৪+৩৮৪)+৩=৩৬৪। অন্য কথায় প্রথম দুই বৎসরের প্রত্যেকটিতে ১০ দিন করিয়া কম থাকিত এবং প্রতি তৃতীয় বৎসরে ৩০ দিনের একটি অতিরিক্ত মাস (intercalary month) জুড়িয়া দেওয়া হইত। এইরূপে গোঁজামিল দিয়া প্রতি তিন বৎসরান্তে সৌর ও চান্দ্রবর্ষের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা হইত।[২] বলা বাহুল্য এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে কোন বৎসরের কোন্ মাস কখন আরম্ভ হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যাইত না। এই অনিশ্চয়তার দরুন আরবের 'পবিত্র' মাসগুলির (অর্থাৎ মহররম, রজব, জিলকদ্ এবং জিলহজ্) স্থিরতা থাকিত না। ফলে দস্যু ও লুণ্ঠনকারীরা ইহার সুযোগ লইয়া পবিত্র মাসগুলিতেও লুটতরাজ করিত।

৬. কোন্ সময়ে যে এই অতিরিক্ত মাসটি জুড়িয়া দেওয়া হইত, তাহার কোন রেকর্ড বা প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

৭. আরবী বর্ষগণনায় এই বিভ্রাট লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং আল্লাহ্ ইহার সংশোধনের জন্য এক আয়াত নাযিল করেন।[৩] কিন্তু এই আয়াতও হিযরী ১০ম সনে অবতীর্ণ হয়, অর্থাৎ হযরতের জন্মের প্রায় ৬২ বৎসর পরে। অতঃপর ১১শ হিযরী হইতে অতিরিক্ত (intercalary month) যোগ করিবার প্রথা রহিত হইয়া যায়। কিন্তু এই নূতন গণনাপদ্ধতিও সরকারীভাবে অনুমোদিত হয় ১৭শ বা ১৮শ হিযরীতে, অর্থাৎ হযরত ওমরের খেলাফত সময়ে। কাজেই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, হযরতের জীবদ্দশায় আরবী বর্ষগণনার কোনই বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ছিল না; যাহা ছিল তাহাও হযরত ওমরের সময় হইতে রদ-বদল হইয়া গিয়াছিল।

৮. শুধু আরবী পঞ্জিকারই যে সংস্কার হইয়াছে তাহাই নহে, ইংরেজী পঞ্জিকারও (calender) সংস্কার হইয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় কিসের উপর নির্ভর করিয়া যে এই বিষয়ে গবেষণা চলিতে পারে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুত এ সম্বন্ধে এখন কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমরা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে করি।

উপরে যে সমস্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা বিবেচনা করিলে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতে হইবে যে, হযরতের আবির্ভাবকালে আরবী পঞ্জিকায় যে

---

২. স্যার উইলিয়াম মূয়র বলিয়াছেন :
"There is reason to believe at the (Arabic) year was originally lunar so continued till the beginning of the fifth century. When imitation of the Jews it was turned, by the interjection of a month at the close of every third year, into a luni-solar period." (The life of Mohammad, page cii)

৩. নিশ্চয় আল্লাহ্র বিধানে যেদিন আকাশ-পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছে সেদিন হইতে মাসের সংখ্যা ১২টি; ইহাদের মধ্যে চারটি পবিত্র। ইহাই ঠিক গণনা, অতএব তাহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম করিও না। (৯ : ২৬)

www.pathagar.com

গোঁজামিল ছিল, তাহার সুমীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক কোন গবেষণাই নির্ভুল হতে পারে না। হযরতের জন্ম-তারিখ নির্ধারিত হইয়াছিল এক পদ্ধতিতে, এখন গণনা করা হইতেছে অন্য পদ্ধতিতে। আরবী ও ইংরেজী বর্ষগণনা-পদ্ধতির হেরফেরের দরুনই যে এই বিভ্রাট দেখা দিয়াছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এখনকার গণনালব্ধ ৯ই তারিখ যে সেই যুগের গণনালব্ধ ১২ই তারিখ ছিল না এবং ১২ই তারিখেই যে সোমবার পড়ে নাই, তাহারই বা প্রমাণ কী? এরূপ অবস্থায় বর্তমান গণনার কোন সার্থকতাই দেখি না। এরূপ গবেষণা দ্বারা চমক লাগান যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত সত্য নিরূপণ হয় না। বস্তুত ঘটিয়াছেও তাহাই। গবেষণাকারীদিগের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। কেহ বলিতেছেন ২০শে এপ্রিল, কেহ বলিতেছেন ৮ই রবিউল আউয়াল, কেহ বলিতেছেন ১০ই রবিউল আউয়াল। ইহার উপরে বৎসরের গোলমাল ত আছেই। কেহ বলিতেছেন ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে, কেহ বলিতেছেন ৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে, কেহবা ৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে।[৪]

পক্ষান্তরে ১২ই রবিউল আউয়াল ঠিক রাখিলেই যে ইহার মোতাবেক ইংরেজী তারিখ ২৯শে আগষ্ট ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, আরবী পঞ্জিকার ন্যায় ইংরেজী পঞ্জিকারও সংস্কার করা হইয়াছে। বর্ষগণনার সূচনা হয় প্রাচীন মিসরে অথবা ব্যবিলনে। আনুমানিক ৪২৪১ (খ্রীঃ পূঃ) সালে সর্বপ্রথম বর্ষগণনা আরম্ভ হয়। চান্দ্রমাস অনুসারেই তখন সময় নির্ণয় করা হইত। পরে সৌরবৎসর গণনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়। ৩৬৫ দিনে তখন এক বৎসর

ধরা হইত, কিন্তু চান্দ্র ও সৌর বৎসরের সমীকরণে তিন মাসের গোঁজামিল রহিয়া যায়। জুলিয়াস সীজার এই গোঁজামিল দূর করিতে চেষ্টা করেন (৪৫ খ্রীঃ পূঃ)। তিন মাস সময়কে বাদ দিয়া তিনি নূতনভাবে বর্ষগণনা আরম্ভ করেন। তাঁহার পঞ্জিকার নাম তাই, Julian Calender, কিন্তু সীজারের ক্যালেণ্ডারও নির্ভুল হয় নাই। ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে Pope Gregory XIII আবার নূতন করিয়া ক্যালেণ্ডারের সংশোধন করেন। তাঁহার সময়ে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একটি সৌর বৎসর হইত। গ্রেগরী দেখিলেন এই সিকি দিনটুকুর জন্য (সিকিও নয়, প্রকৃতপক্ষে ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট) হিসাবে বড়ই গণ্ডগোল বাধে। তাই তিনি নির্দেশ দেন যে, ভগ্নাংশটুকু বাদ দিয়া শুধু ৩৬৫ দিনেই এক বৎসর ধরিতে হইবে। সিকি দিনগুলি সম্বন্ধে এই বিধান দেন যে, প্রতি চতুর্থ বৎসরে একটি দিন বাড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাকে বলা হইবে 'লিপ-ইয়ার'। 'লিপ-ইয়ার' বৎসরে তাই থাকে ৩৬৬ দিন। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে না হইয়া ২৯ দিনে হয়। এই নির্দেশ দেওয়ার সময় দেখা যায়, ১১ দিনের গোঁজামিল আছে। গ্রেগরী তখন উক্ত ১১ দিনকে একদম উড়াইয়া দেন, অর্থাৎ ৩রা অক্টোবর তারিখকে ১৪ই অক্টোবর বলিয়া ঘোষণা করেন। গ্রেগরীর এই বিধান সমস্ত ক্যাথলিক দেশগুলি মানিয়া লয়, কিন্তু গ্রীক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট দেশগুলি অস্বীকার করে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড গ্রেগরীর মত অনুসরণ করিয়া ইংরেজী ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করে। তদনুসারে ৩রা সেপ্টেম্বরকে ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই

---

৪. Washington Irving বলেন : "Mahomet was born in Mecca in april, in the year 569 of the Christian era." (Life of Mahomet)

www.pathagar.com

বৎসর আরও একটি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে। এতদিন ২৫শে মার্চ হইতে খ্রীষ্টান বৎসর গণনা করা হইত; এবার ১লা জানুয়ারী হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হইল।[৫]

আরও একটি সমস্যা আছে। প্রতিদিনের তারিখ (date-line) কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইবে, তাহাও সুনির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন। বর্তমানে রাত্রি ১২টা (Zero hour OH) হইতে দিন গণনা আরম্ভ হয় কিন্তু এই OH সর্বত্র সমান থাকে না। Longitude-এর বিভিন্ন কোণে ইহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিভাবে ইহা সংঘটিত হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকদের মুখ হইতেই শুনুন :

"Let us take more example to clarify the matter. Take any day and hour at the prime meridian of Greenwitch, for instance, 7 p. m. (19H). May 1. At this moment the time at

longitude 90° (=6H) West is 13H on May 1. and farther westward yet, at 180° the time would be 7H (7 a.m.) May 1. From Greenwitch, again, let us consider the time going eastward to a station at 60° (=4H) E; it would be 23H (11 p.m.) At 75° E 24H on May 1, which is 7H of May 2: at 90° E, it would be IH, May 2: at 180°, 7H (7 a.M.) May 2. There is, then, a discrepancy of 1 day in the two methods of reckoning, but our reckoning is correct in each, the moment the west-bound traveller crosses the line, the date changes from May 1 and becomes May 2 for him; the moment the east-bound traveller crosses the line, the date changes from May 2 and becomes May 1 to him.

(New Handbook of the Heavens

by Bernard-Bennett-Rice, p. 186,

অতএব, আমাদের বক্তব্য এই যে, এ-কথা যখন 'নিশ্চিত'রূপে প্রমাণিত হইতেছে না যে, ৯ই রবিউল আউয়াল তারিখেই হযরতের জন্ম হইয়াছিল, তখন প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে প্রচলিত এবং মুসলিম জাহানের সর্বত্র স্বীকৃত ও প্রতিপালিত ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার তারিখকেই আমরা হযরতের জন্মদিন বলিয়া মানিয়া লইব।

---

৫. এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন, Encyclopaedia of Britanica vol. VI. Article : Calender.

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ২

কাবা–শরীফ কখন নির্মিত হইয়াছিল

কাবা-শরীফ জগতের প্রাচীনতম উপাসনাগৃহ। ইসলামের ইতিহাসে সত্যই ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইসলামের সহিত কাবার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। দেহের সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, ফুলের সহিত গন্ধের যে সম্বন্ধ, প্রদীপের সহিত শিখার যে সম্বন্ধ, কাবার সহিত ইসলামের ঠিক সেই সম্বন্ধ। একটি ছাড়া অন্যটির কল্পনা তাই অত্যন্ত দুরূহ।

কাবা-গৃহ কখন নির্মিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অনেকে বলেন : হযরত ইব্রাহিমই ইহার প্রথম নির্মাতা। আবার অনেকে বলেন : হযরত আদমের হস্তেই ইহা প্রথম নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার উৎসমূল আরও পশ্চাতে।

"শোয়াব-উল্-ঈমান" নামক বিখ্যাত হাদিস-গ্রন্থে কাবা-গৃহের জন্ম ইতিহাস এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে :

হযরত আদম ও বিবি হাওয়া যখন বেহেশ্ত হইতে দুনিয়ায় নির্বাসিত হন, তখন আদম 'সারণ' দ্বীপে (বর্তমান সিংহলে?) এবং বিবি হাওয়া আরব দেশে পতিত হন। প্রায় একশত বৎসর উভয়ে এইরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন। অতঃপর অনেক সাধনার পর হযরত আদম আসিয়া আরব দেশে বিবি হাওয়ার সহিত মিলিত হন। তখন আদম কৃতজ্ঞতা ভরে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন : "হে আল্লাহ্, বেহেশ্‌তে অবস্থানকালে 'বায়তুল মামুর' নামক যে জ্যোতির্ময় মসজিদে ফেরেশ্‌তাদিগের সহিত আমি নিত্য তোমার ইবাদৎ করিতাম, সেইরূপ একটি মসজিদ তুমি আমাকে দাও—যাহাতে দুনিয়াতেও আমরা তোমার গুণগান করিতে পারি।" আদমের এই প্রার্থনা আল্লাহ্ কবুল করেন। তখন ফেরেশ্‌তাগণ বায়তুল-মামুরের একটি প্রতিকৃতি (tabernacle) দুনিয়ায় নামাইয়া আনেন। হযরত আদম সন্তুষ্টচিত্তে সেখানে ইবাদৎ করিতে থাকেন। একটি ঝর্ণাধারাও সেখানে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহাই সেই পবিত্র "জমজম্"।

আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কালে কালে এখানে লোকালয় স্থাপিত হইল। আদমের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণও এই পবিত্র মস্‌জিদকে কায়েম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কালক্রমে লোকেরা যখন আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভুলিয়া গেল, তখন আর এই মস্‌জিদের কেহই যত্ন লইল না। অবশেষে হযরত নূহের সময়ে যে বিশ্বব্যাপী তুফান হইল, তাহাতেই ইহা লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়িয়া গেল। আল্লাহ্‌র অভিশাপে পৌত্তলিকগণও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সমগ্র আরবদেশ মরুভূমিতে পরিণত হইল।

বহুযুগ পরে হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্‌র হুকুমে বিবি হাজেরা ও শিশু-পুত্র ইসমাইলকে ঠিক এই স্থানেই নির্বাসন দিয়া আসিলেন। শিশু ইসমাইলের পদাঘাতে যে ঝর্ণাধারা উন্মুক্ত হইল, উহাই সেই জমজম্। কালক্রমে এই উৎসের চতুষ্পার্শ্বে নূতন করিয়া আরব-জাতির বসতি স্থাপিত হইল। হযরত ইব্রাহিম আসিয়া বিবি হাজেরা ও ইসমাইলের সহিত যখন এইখানে বসবাস করিতে লাগিলেন, তখন আল্লাহ্ তাঁহার সেই লুপ্তঘরের বা বায়তুল্লাহ্‌র পুনর্নির্মাণের জন্য ইব্রাহিম-ইসমাইলকে আদেশ দান

www.pathagar.com

করিলেন। তৎক্ষণাৎ পিতাপুত্র প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু কোথায় যে সেই পবিত্র গৃহ অবস্থিত ছিল, তাহা সঠিকরূপে বুঝিতে পারিলেন না। তখন আল্লাহ্‌র নির্দেশে একখণ্ড মেঘ আসিয়া প্রাচীন মস্‌জিদের স্থান নির্ণয় করিয়া দিল। পিতাপুত্র মাটি খুঁড়িয়া সেই মস্‌জিদের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করিলেন এবং সেই ভিত্তিমূলের উপরেই নূতন করিয়া কাবা-গৃহ নির্মাণ করিলেন।[১] বর্তমান কাবা-প্রাঙ্গণে যে একখানি কৃষ্ণ প্রস্তর লক্ষিত হয় এবং হাজীগণ যাহাতে ভক্তিভরে চুম্বন করিয়া থাকেন, অনেকের মতে সেই প্রস্তরখানি হযরত আদমের সময়কার কাবা-গৃহেরই প্রস্তরখণ্ড বিশেষ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কাবা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমেরও বহুপূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল।

কাবা-গৃহ যে হযরত ইব্রাহিমের পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল, পবিত্র কুরআন হইতেও তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। হযরত ইব্রাহিম যখন বিবি হাজেরা ও ইসমাইলকে নির্বাসন দিয়া আসেন, তখনকার কথা কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যাবর্তনের সময় হযরত ইব্রাহিম যতক্ষণ দৃষ্টি চলে, ততক্ষণ বারে বারে পিছন ফিরিয়া প্রিয়তমা পত্নী ও প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তারপর যেই তিনি দৃষ্টিসীমার বাহিরে গিয়া পড়িলেন, অমনি তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিল। কাতরকণ্ঠে তিনি প্রার্থনা করিলেন :

"হে প্রভু, আমি আমার সন্তান-সন্ততির এক অংশ শস্য-ফলহীন-মরু-উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে রাখিয়া আসিলাম—-যাহাতে তাহারা তোমার ইবাদত করিতে পারে, অতএব, তুমি মানুষের মনকে তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট কর এবং কিছু ফলমূল তাহাদিগকে দাও। হয়ত তাহারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

ইহা দ্বারা বুঝা যায় : নির্বাসিত হাজেরার সন্নিকটেই "আল্লাহ্‌র ঘর" বিদ্যমান ছিল, হযরত ইব্রাহিম তাহা জানিতেন এবং সেই জন্যই তিনি এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

"তফসির-ই-হাক্কানীতে" ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবি হাজেরা যখন বিজন মরুভূমির মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় মনে করিয়া ভীত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন জনৈক ফেরেশ্‌তা আসিয়া কানে কানে তাঁহাকে এই আশ্বাস দিলেন : "হাজেরা, কাঁদিও না। এইখানেই আল্লাহ্‌র ঘর পুশিদা আছে। তোমার পুত্র ইসমাইল বড় হইয়া এই ঘরকে পুনর্নির্মাণ করিবে।" ইহাই শুনিয়া হাজেরা আশ্বস্ত হইলেন।

হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের উপর আল্লাহ্ যখন কাবা-গৃহ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেন, তখন আল্লাহ্ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতেও জানা যায় যে, কাবা পূর্ব হইতেই তথায় বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"এবং আমি ইব্রাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম : আমার গৃহকে পবিত্র কর-।"

কোন গৃহের অস্তিত্ব পূর্ব হইতেই বিদ্যমান না থাকিলে তাহা পবিত্র করিবার কথা আসিতে পারে না। বিশেষ করিয়া হযরত ইব্রাহিম ও হযরত ইসমাইলের হস্তে যে ঘর নির্মিত হইল, তাহা যে অপবিত্র ছিল, এ কথারও কোন মানে হয় না। কাজেই এখানে

---

১. তফসীর-ই হাক্কানি'তেও কাবা-শরীফের আদিবৃত্তান্ত মূলত এইরূপই লিখিত হইয়াছে। (দেখুন : ২১১-২১২ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

যে হযরত ইব্রাহিমের পূর্ববর্তী অবস্থার কথাই বলা যাইতেছে, তাহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। হযরত ইব্রাহিম কর্তৃক কাবা-গৃহের নির্মাণ প্রসঙ্গেও কুরআন-পাকে যে আয়াত আছে, তাহাও এই কথারই সমর্থন করে :

"এবং যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল (কাবা-গৃহের) ভিত উঁচু করিতেছিলেন, তখন তিনি (ইব্রাহিম) প্রার্থনা করিলেন : হে আমার প্রভু, আমাদের ইহা (এই সুকার্য) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি শ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" (২ : ১২৭)

এখানে অধিকাংশ তফসীরকারই 'ভিত উঁচু করিবার' অর্থ পুনর্নির্মাণ (rebuild) বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আল্লাহ্ এই কাবা-গৃহকে দুনিয়ার 'প্রথম গৃহ' (The First House) এবং 'সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গৃহ' (The Ancient House) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা :

"নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম-স্থাপিত গৃহ বাক্কার গৃহ (অর্থাৎ কাবা) যাহা আশীর্বাদপ্রাপ্ত এবং জাতিসমূহের পথপ্রদর্শক।" (৩ : ৯৫)

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই কাবা-গৃহই বিশ্বের সর্বপ্রথম গৃহ; ইহার পূর্বে দুনিয়ায় আর কোন গৃহ নির্মিত হয় নাই। আদি মানব হযরত আদমের সমসাময়িক না হইলে কিছুতেই ইহাকে "মানুষের জন্য প্রথম স্থাপিত গৃহ" বলা যাইত না। অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"অতঃপর তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিতে ও পরিচ্ছন্ন হইতে বল এবং তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালন করুক এবং 'প্রাচীন গৃহের' চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করুক।" (২২ : ১৯)

অতএব, একথা নিশ্চিতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাবা-গৃহের অস্তিত্ব হযরত ইব্রাহিমের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল।

কাবা দুনিয়ার প্রথম গৃহ। আদিকাল হইতে এই 'খোদার ঘরের' অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে এবং রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। কাবা-গৃহ সত্যই 'বায়তুল মামুরের' প্রতীক। কাবার দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে বায়তুল মামুরের দিকেই মুখ ফিরানো হয়, আর বায়তুল মামুরের দিকে মুখ ফিরাইলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র দিকেই মুখ ফিরানো হয়। এই জন্যই বিশ্বের মুসলমান যে যেখানেই থাকুক, 'কা'বাতিশ শারিফাতে আল্লাহু আকবর' বলিয়া প্রতিদিন নামায পড়ে। বেতার-যন্ত্র অথবা টেলিফোনের সংযোগ কেন্দ্রের ন্যায় ইহাও একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ কেন্দ্র। আল্লাহ্র সহিত সংযোগ চাহিলে, এই কাবা-গৃহের সঙ্গেই তাহাকে প্রথম যোগস্থাপনা করিতে হয়। এই পবিত্র গৃহ তাই আল্লাহ্তায়ালার চির আশীর্বাদপ্রাপ্ত পুণ্য নিকেতন। অনন্তকাল ধরিয়া আল্লাহ্র করুণা ইহার শিরে বর্ষিত হইবে—রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত এ-গৃহ কায়েম থাকিবে, তারপর ধ্যানলোকের সেই বায়তুল মামুরে পুনরায় মিলাইয়া যাইবে। মাওলানা মুহম্মদ আলি কাবা-শরীফ সম্বন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন :

"If, on the one hand, Mecca is declared to be the First House raised on the earth for the worship of the Divine Being, it is on the other announced to be 'Mubarak' which word, though ordinarily rendered as blessed, signifies the continuance for ever of the blessings which a thing possesses and thus it is the first as well as

www.pathagar.com

the last House in which the nations of the world have found, and will find, their true inspiration and guidance." (The Quran, p. 171)

অর্থাৎ : একদিকে যেমন মক্কার কাবাকে আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য জগতের সর্বপ্রথম গৃহ বলা হইয়াছে, অন্যদিকে উহাকে 'মুবারক' বলিয়াও অভিহিত করা হইয়াছে। মুবারক শব্দের সাধারণ অর্থ 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত' কিন্তু ইহার গূঢ় অর্থ চিরদিনের জন্য ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্‌র কোন বস্তু। এই অর্থেই কাবা জগতের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ গৃহ; এখানেই বিশ্বের সকল জাতি যুগে যুগে সত্যকার প্রেরণা এবং পথের দিশা পাইয়া আসিয়াছে এবং পাইবে।

কাবা-শরীফ যে হযরত আদমের দ্বারাই নির্মিত হইয়াছিল, একথা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতও সমর্থন করেন। Nicholson তাঁহার Literary History of the Arabs নামক গ্রন্থে বলেন :

"Legend attributes its foundation to Adam who built it by Divine command after a celestial archetype. At the Deluge it was taken up into heaven, but was rebuilt on its former site by Abraham and Ismael."

অর্থাৎ : ধর্ম-প্রবাদ এইরূপ যে, হযরত আদম বেহেশ্‌ত হইতে প্রেরিত একটি প্রতিকৃতির অনুকরণে কাবা-গৃহ নির্মাণ করেন। কিন্তু নূহের তুফানের সময় ফেরেশ্‌তারা উহাকে আসমানে তুলিয়া লইয়া যায়, পরে ইব্রাহিম ও ইসমাইলের দ্বারা ইহা পূর্ব ভিত্তির উপরে পুনর্নির্মিত হয়।

Encyclopaedia of Islamও অবিকল একই কথা বলে।

বস্তুত কাবা যে সত্য সত্যই 'অতি প্রাচীন গৃহ' বা দুনিয়ার 'সর্বপ্রথম গৃহ' ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ বিদ্যমান। Sir William Muir বলেন :

"A very high antiquity must be assigned to the main features of the religion of Mecca. Although Herodotus does not refer to the Kaba, yet the names as one of the chief Arab divinities ALILAT; and this is strong evidence of the worship at the early period of Al-Lat, the great idol of Mecca. He likewise alludes to the veneration of the Arabs for stones. Diodorus Siculus, writing about half a century before our era, says of Arabia washed by the Red Sea : there is in this country a temple greatly revered by the Arabs. These words must refer to the Holy house of Mecca, for, we know of no other which ever commanded suck universal homage. Early historical tradition gives no trace of its first construction. Some authorised assert that the Amelikites rebuilt the edifice which they found and retained it for a time under their charge. All agree that it was in existence under the Jurham (about the time of the Christian era) and being injured by a flood of rain was then repaired. Tradition represents the Kaba, as from time immemorial the scence of pilgrimage from all quarters of Arabia"

(The life of Muhammad pp'cii-ciii)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : মক্কার ধর্মানুষ্ঠান যে অতি প্রাচীন, সে কথা অনস্বীকার্য। যদিও হেরোডোটাসের বিবরণে কাবার উল্লেখ নাই, তবু তিনি আরবদের অন্যতম প্রধান দেবতা 'আলিলাতের' উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে আরবদের প্রধান দেবতা 'আল্-লাতের' নামান্তর। তিনি আরবদের প্রস্তর প্রীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। ডিওডোরাস্ সিকাউলাস্ খ্রীষ্টপূর্ব অর্ধ শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন : আরব দেশ লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত, এদেশে একটি বিখ্যাত ধর্ম মন্দির আছে। আরবেরা তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। ইহা নিশ্চয়ই মক্কার কাবা-শরীফের প্রতি ইঙ্গিত। এই মন্দির ছাড়া সে-যুগে জগতের অন্য কোথাও কোন সুবিখ্যাত ধর্ম মন্দির ছিল বলিয়া জানা যায় না। প্রাচীন ঐতিহাসিকের কোন বিবরণীতেও ইহার প্রথম নির্মাণ-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন : এমেলিকাইটগণ এই মন্দির পুনর্নির্মাণ করিয়াছিল এবং কিছুকাল যাবৎ ইহা তাহাদের অধীন ছিল। এ বিষয়ে সবাই একমত যে, খ্রীষ্টের জন্ম-সময়ে এ মন্দির জুরহাম গোত্রের অধিকারে ছিল এবং প্রবল বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুন তাহারা ইহার সংস্কার সাধন করিয়াছিল। বস্তুত স্মরণাতীতকাল হইতে এ মন্দির আরব জাতির ভজনালয়রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে।

সত্যই কাবা-শরীফ এক অপরূপ সৃষ্টি। আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে এ এক চিরন্তন স্বর্ণসেতু। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে সৃষ্টির নিবেদিত একটি নীরব প্রণতি অনন্তকালের জন্য যেন রূপ ধরিয়া এখানে দাঁড়াইয়া আছে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৩
ইসলাম ও পৌত্তলিকতা

হযরত মুহম্মদকে সারাজীবন কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ-সংগ্রামের বিরাম ছিল না। কিন্তু কিসের জন্য এই সংগ্রাম? এ-সংগ্রামের মূল কারণ কি ছিল? লক্ষ্য, উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? ইহার পশ্চাতে ছিল কি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির তাড়না? ছিল কি কোন অহেতুক রাজ্যজয়ের বাসনা? অথবা অন্য কোন মনোবিলাস? না। সমস্ত সংগ্রামের মূল প্রেরণা ছিল পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়া তৌহিদকে জয়যুক্ত করা। এ-সংগ্রাম তাই প্রকৃতপক্ষে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে নহে, মক্কার বিরুদ্ধে নহে, ইহুদী-খ্রীষ্টানদিগের বিরুদ্ধে নহে-জগৎজোড়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে। মানুষের মনের আঙিনায় যে অসংখ্য সূরৎ আল্লাহ্কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মুহম্মদ চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া আল্লাহ্ ও মানুষের চিরন্তন যোগসূত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে। ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—একমাত্র সাধনা। এই লক্ষ্য হইতে কোনদিন তিনি একবিন্দু বিচ্যুৎ হন নাই। পৌত্তলিকতার নিবিড় অন্ধকারে ধরণী যখন একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল সে সময় সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় একা দাঁড়াইয়া জগতের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তিনি তৌহিদের অগ্নিবাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার জীবন-বীণা এক সুরে বাঁধা ছিল। কত ভয়-ভীতি, কত অত্যাচার, কত উৎপীড়ন, কত প্রলোভন তাহার গতিপথে বাধার বিন্ধ্যাচল রচনা করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ কোন স্থানে এতটুকু শঙ্কা মানেন নাই; জীবন-মরণ পণ করিয়া তিনি তাঁহার সত্যবাণীকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোরেশগণ কত সময় বলিয়াছে : "মুহম্মদ, যাহা চাও সব দিব শুধু ঐ একটি কথা ভোল—শুধু বল যে, আমাদের দেবতারাও সত্য।" কিন্তু মুহম্মদ বলিয়াছেন : "তোমরা যদি আমার এক হাতে চন্দ্র আর এক হাতে সূর্য আনিয়া দাও তবু বলিব : একমাত্র আল্লাহ্ সত্য—তিনি ছাড়া আমাদের আর কোন উপাস্য নাই।" তায়েফবাসী পৌত্তলিকগণ বলিয়াছিল : "আমরা ইসলাম গ্রহণ করিতেছি, কিন্তু আমাদের মূর্তিগুলি ভাঙিতে বড় মায়া লাগে; একটু সময় আমাদিগকে দিন।" হযরত বলিয়াছিলেন : "ইসলাম ও মূর্তিপূজা একসঙ্গে থাকিতে পারে না যে-মুহূর্তে তুমি ইসলাম কবুল করিবে, সেই মুহূর্তেই তোমাকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করিতে হইবে।" বস্তুত হযরত কোন অবস্থাতেই ইসলামের মূল সত্য বিস্মৃত হন নাই। আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়াছেন, সমাজ ও স্বজাতিকে ছাড়িয়াছেন, দেশত্যাগ করিয়াছেন, কঠোর বিপদকে বরণ করিয়াছেন, বারে বারে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে, তবু তিনি আপন আদর্শ হইতে একটুও স্খলিত হন নাই। পৌত্তলিকদিগকে মানুষ হিসাবে তিনি ভালবাসিয়াছেন, তাহাদের বহু অপরাধকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন; এমন কি তাহাদের সহিত সন্ধি করিয়া দেশের কাজও করিয়াছেন, কিন্তু পৌত্তলিকতার সহিত কোন দিন তিনি সন্ধি করেন নাই। আদর্শের বেলায় কোন আপোষ চলে না। অন্ধকার ও আলোকের মত ইহারা দুই পরস্পর বিরোধী বস্তু। একই স্থানে একই সময়ে উভয়ের অবস্থান অসম্ভব।

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতার সঙ্গে ইসলামের কেন এত বিরোধ? জগতের এত পাপ, এত দুর্নীতি বিদ্যমান থাকিতে হযরত কেন এই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন?

কারণ আছে। মানুষের জীবনে পৌত্তলিকতার অভিশাপ অত্যন্ত ভয়াবহ। বহু পাপ, বহু দুর্নীতি, বহু অধঃপতনের মূলই হইতেছে এই পৌত্তলিকতা। সত্যদ্রষ্টা মুহম্মদ তাই এই পৌত্তলিকতাকে উচ্ছেদ করিবার জন্যই এত দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন।

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় : একদিকে আল্লাহ্‌কে না-চেনা, অপরদিকে নিজেকে না-চেনা, এই উভয়বিধ অজ্ঞানতা হইতেই পৌত্তলিকতার জন্ম। আল্লাহ্ যে 'রব', আল্লাহ্‌ই যে আমাদের জীবনমরণের প্রভু, তিনি ছাড়া আমাদের যে কোন গতি নাই, সহায় নাই, শরণ নাই, বিশ্ব-নিখিল যে তাঁহারই সৃষ্টি এবং সবার উপর যে একমাত্র তাঁহারই প্রভুত্ব বিরাজমান, এই সহজ এবং স্বাভাবিক সত্যোপলব্ধির অভাবই হইতেছে পৌত্তলিকতার মূল। মানুষ যদি জানে এবং মানে যে, আল্লাহ্ এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান, যাহা কিছু চাহিতে হয়, তাঁহারই কাছে চাহিতে হয়, তবে কেন সে আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবে? আল্লাহ্ মানা লোক কখনও পৌত্তলিক হইতে পারে না।

পৌত্তলিক নিজেকেও চেনে না। নিজে কত বড় তাও সে জানে না। আত্মবিস্মৃত রাজপুত্রের মত সে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ায়। সে জানে না তার মধ্যে কী অসীম ও অনন্ত সম্ভাবনা লুকাইয়া আছে। সে জানে না সে ছোট নহে, তুচ্ছ নহে—সে 'আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি'। সে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—আশ্‌রাফুল-মাখ্‌লুকাৎ। সে জানে না তাহার চেয়ে অন্য কেহ বড় নহে, অন্য কেহ নমস্য নহে। চন্দ্র-সূর্য, মেঘ-বিদ্যুৎ, গিরি-নদী,-মরু প্রান্তর জড়প্রকৃতির সমস্তই তাহার আয়ত্তাধীন—সকলেই তাহার সেবায় নিয়োজিত।[১] একদিকে আল্লাহ্‌কে সর্বশক্তিমান বলিয়া না মানা, অপরদিকে নিজেকে ছোট বলিয়া জানাই হইতেছে পৌত্তলিক মনোবৃত্তির দুই প্রধান উপাদান।

অতএব, সত্যকার মানুষ হইতে হইলে এবং আমাদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ করিয়া তুলিতে হইলে আমাদের সর্বপ্রথম প্রয়োজন—এই অসীম অনন্ত এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌কে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া এবং তাঁহার সহিত আত্মার নিবিড় যোগ স্থাপন করা; উন্নত মস্তকে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করা : আমি মানুষ, আমার চেয়ে দেবতা বড় নহে, দেবতার চেয়ে আমি বড়। অসীম অনন্ত ও বিরাটের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না করিলে কেমন করিয়া মানুষ বড় হইবে?

মানব-জীবনে এই অসীমের অনুভূতির প্রয়োজন আছে। মানুষের দুইটি অংশ : জড় এবং চৈতন্য (matter and spirit)। এই দুই-এর সমন্বয়েই তাহার সৃষ্টি। জড়দেহের

---

১. "এবং যখন তোমার প্রভু ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিলেন : আমি দুনিয়ায় (আমার) প্রতিনিধি পাঠাইব।" (২ : ৩০)

"এবং তিনি—যিনি তোমাদিগকে জগতে তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৩৫ : ৩০)

"এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের অধীন করিয়াছেন রাত্রিকে, দিনকে, সূর্যকে, চন্দ্রকে এবং তারকাদিগকে—তাঁহার আদেশ অনুসারেই তোমাদের অধীন করা হইয়াছে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে চিন্তাশীলদিগের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।" (১৬ : ১২)

www.pathagar.com

পুষ্টির জন্য যেমন তাহার স্থূল খোরাকের প্রয়োজন, চিন্ময় সত্তার পরিপুষ্টির জন্যও তেমনি তাহার আধ্যাত্মিক খোরাকের প্রয়োজন। এই খোরাক আর কিছুই নহে—সেই অসীম নিরাকারের স্পর্শানুভূতি। সেই জ্যোতিঃসাগরের সহিত আমাদের জীবনধারার যোগ রাখা তাই নিতান্ত প্রয়োজন। সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইলে মানুষ তখন চলমান থাকে না, বদ্ধপঙ্ক পুষ্করিণীর মত পঙ্গু অচল হইয়া পড়ে। সে তখন আর পরিপূর্ণ মানুষ থাকে না, অর্ধাংশ হইয়া যায়; তাও নিকৃষ্ট অর্ধাংশ—যাহা সাধারণ পশুদের মধ্যেও বিদ্যমান। কাজেই নিরাকার আল্লাহ্‌র ধ্যান ও ধারণা—সে যতই অস্পষ্ট হউক না কেন, মানুষের জীবনের এক মস্তবড় সম্পদ। আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীতে যে অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় রহস্যলোক রহিয়াছে, মানুষ যদি তাহার সন্ধান না পাইল, জড়-জীবনের সঙ্কীর্ণ পিঞ্জরের মধ্যেই যদি সে চিরকাল বাস করিয়া গেল, অসীম অনন্ত আকাশে যদি তাহার মনোবিহঙ্গ রঙিন পাখা মেলিয়া উড়িতেই না শিখিল, তবে আর তাহার এমন কী-ই বা গৌরব।

আমরা বাহ্যত যাহা দেখি বা শুনি তাহাতেই আমাদের সকল দেখাশুনার শেষ হয় না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে এক গোপন রহস্যলোক আছে। সেই অতীন্দ্রিয় লোকে পৌছিতে পারিলেই আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হয়। অদৃশ্যে বিশ্বাস সেই লোকে পৌছিবার একমাত্র খেয়াতরী। সেই তরীতে একটি সূক্ষ্ম মনেরই স্থান আছে, অন্য কোন স্থূল বস্তু সঙ্গে লইবার উপায় নাই, নিলেই এ তরীর ভরাডুবি হয়। যাত্রীকে তাই সর্বপ্রকারে মুক্ত হইয়া হালকা হইতে হয়। সাকার মূর্তি বা জড়পূজা এই জন্যই আমাদিগকে বর্জন করা দরকার। আত্মার উন্নয়নে এ এক মস্তবড় বাধা।

অনেকে বলেন : নিরাকারকে ধারণা করিতে পারি না, তাই একটা মূর্তি দিয়া তাহাকে ধ্যান করি। কিন্তু নিরাকারকে বিশুদ্ধভাবে ধারণা করা যদি কঠিন হয়, তবে সেই নিরাকারকে আকার দিয়া ধারণা করা ত আরও কঠিন—আরও অসম্ভব। যাইতে চাই আকাশে, পথ ধরি পাতালের; বুঝিতে চাই আলোককে; ধ্যান করি আঁধারের। কোন লক্ষ্যবস্তুকে পাইতে হইলে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী আরেক বস্তু দ্বারা তাহার বাস্তব উপলব্ধি (positive realisation) কিরূপ করিয়া সম্ভব। কাজেই নিরাকারকে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইবে সাকারকে মনের সম্মুখ হইতে সরাইয়া দেওয়া নিরাকারকে ধারণা করিতে পারি না—এই উপলব্ধিই ত নিরাকারের ধারণা। নিরাকারকে যদি ধারণা করিতেই পারিলাম, তবে আর সে নিরাকার রহিল কোথায়? যে নিরাকারকে ধারণায় ধরা যায়, সেও ত সাকার! সেও ত অসীম। তাই যাহারা নিরাকারকে আকার দিয়া ধরিতে চায়, তাহারা ভ্রান্ত। তবে এই কথা ঠিক যে সাকারকে অস্বীকার করিলেও নিরাকারকে ধ্যান করা যায় না। সমস্ত জ্ঞান আমাদের দ্বন্দ্বধর্মী। আলোককে বুঝিবার জন্য যেমন আঁধারের প্রয়োজন, নিরাকারকে বুঝিবার জন্য তেমনি সাকারের প্রয়োজন। সাকারকে এই আলোকে গ্রহণ করিলে দোষ নাই; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে স্বীকার করিলে দোষ হয়। সাকার নিরাকারের পাদপীঠ। ইহার উপর দাঁড়াইয়া অসীম দিগন্তে ঝাঁপ দেওয়া যায়।

স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সান্ত হইতে অনন্তে, সীমা হইতে অসীমে ছুটিয়া চলা মানব-মনের চরম লক্ষ্য ও পরিণতি। প্রত্যেক বস্তু তাহার বিপরীতকে খুঁজিবে—ইহাই দার্শনিক সত্য। শুধু দর্শন নহে বিজ্ঞানও আজ সেই কথাই বলে। "Dematerialisation

www.pathagar.com

of Matter" অর্থাৎ জড় হইতে অজড়ে পৌঁছানই বিজ্ঞানের নবতর সাধনা। মানব জীবনের লক্ষ্য এবং পরিণতিও তাই। সে অসীম, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই চাহিবে অসীমের স্পর্শ, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। আকার-বিশ্লিষ্ট মানুষ তাই আর এক আকারকে পূজা করিতে পারে না। পৌত্তলিকতা এই বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। সীমা হইতে অসীমে না ছুটিয়া অসীমকে সে সীমার মধ্যে টানিতে চায়। সত্য উপলব্ধির এই বিপরীতমুখিতাই পৌত্তলিকতার প্রধান অভিশাপ।

প্রত্যেক মানুষের মনের কোণে স্বভাবতই একটা দূরের পিয়াসা জাগিয়া আছে। সান্তকে লইয়া বেশীদিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে না; অনন্তের জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল চঞ্চল হইয়া উঠে। পৌত্তলিকতা আমাদের এই অনন্তের স্বপ্নকে ভাঙিয়া দেয়' জীবনের দিকচক্রবালকে সে সঙ্কীর্ণ করিয়া আনে; মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ হইয়া আসে; স্থূলকে অতিক্রম করিয়া সে আজ উর্ধ্বে উঠিতে পারে না। মাকড়সা যেমন তাহার চারিপাশে জাল বুনিয়া নিজেকে বন্দী করিয়া রাখে, পৌত্তলিক মন তেমনি করিয়া কুসংস্কারের জালে জড়াইয়া যায়। বাহিরে তাহার বিশাল জগৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহার সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকে না, একটা আবরণ আসিয়া তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে যখন অসীমের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায়, চিত্ত-মুকুরে আর যখন অনন্তের জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয় না, তখন স্বভাবতই মানুষ আপনার জড় জীবনের মধ্যে ফিরিয়া আসে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য প্রভৃতি যাবতীয় স্থূল প্রবৃত্তিগুলিই তখন প্রবল হইয়া দেখা দেয়; মানুষ তখন আর উর্ধ্বমুখীন হইতে পারে না, দেহের ক্ষুধাকেই সে চরম এবং পরম বলিয়া মনে করে। তখন হিংসা-দ্বেষ, অবিচার-ব্যভিচার প্রভৃতি পশুজীবনের যাবতীয় পাপ ও দুর্নীতি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। এইরূপে তাহার নৈতিক মৃত্যু ঘটে। পৌত্তলিকতার কুফল বর্ণনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন :

"মুগ্ধ, ওরে, স্বপ্ন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন-কোণে
ধূলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস সংগোপনে
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ-যুগান্তরে!"

অতএব, আমাদিগকে অসীম, অনন্ত ও নিরাকারের ধেয়ানী হইতেই হইবে, শুধু স্থূলদর্শী বস্তুতান্ত্রিক হইলে চলিবে না, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি আমাদের চাই-ই চাই। নিরাকারের ধারণা ত অস্পষ্ট হইবেই, তবু ইহাকে বর্জন করা চলিবে না। সবকিছু সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিতে চাওয়াও মানুষের আর এক অভিশাপ। উহাতে আনন্দ নাই। আমাদের অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি উহাতে আড়ষ্ট হয়। এই জন্য অস্পষ্টতাও আমাদের জীবনে একান্ত প্রয়োজন। ঈমান-বিল্-গায়িব বা বিরাট অজানাতে বিশ্বাস তাই আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন।

www.pathagar.com

পৌত্তলিকতার আর একটি অভিশাপ : মানুষকে সে ভীরু, দুর্বল ও দাসভাবাপন্ন করিয়া তুলে। নিজেকে কত হীন ভাবিলে সামান্য একটা শিলাখণ্ডকে বড় বলিয়া পূজা করা যায়। একজন চৌকিদার ও রাজপ্রতিনিধিতে যে প্রভেদ, একজন পৌত্তলিক ও নিরাকারবাদীতে সেই প্রভেদ। চৌকিদার পথে বাহির হইলেই দেখিতে পায় চতুর্দিকে তাহার অসংখ্য প্রভু বিদ্যমান। সকলকেই তাই যে 'সেলাম' করিয়া চলে। গ্রামের মোড়ল হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাট পর্যন্ত সকলেই তাহার মনিব—সকলেরই সে ভৃত্য। কিন্তু রাজপ্রতিনিধিদের মন এই দাসমনোভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি জানেন, স্বয়ং সম্রাটের পরেই তাহার স্থান—একমাত্র সম্রাটই তাঁহার নমস্য; সম্রাট ছাড়া আর সকলের উপরেই তিনি প্রভুত্ব করিবার অধিকারী। পদমর্যাদা ও শক্তির গৌরবে তাই তিনি উচ্চশির।

পৌত্তলিকতা মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকেও বিকৃত ও কলুষিত করিয়া তুলে। সকল মানুষ যদি এই কথা বুঝিতে পারিত যে, একই উৎসমুখ হইতে তাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তবে একথাও স্বতঃসিদ্ধভাবেই স্বীকৃত হইত যে, তাহাদের সকলেরই জন্মগত অধিকার সমান, সকলেই তাহারা ভাই-ভাই। বিচিত্র এবং বিভিন্ন হইয়াও পুষ্পমালার মত তাহারা একই মিলন-সূত্রে গ্রথিত থাকিতে পারিত। কিন্তু পৌত্তলিকতা সেই নিগূঢ় ঐক্যকে নষ্ট করিয়া দেয়। পৌত্তলিকতা বহুত্বেরই প্রতীক; কাজেই পৌত্তলিক হইলেই তাহার মনের চারিপাশে খণ্ডতার স্বপ্ন ভিড় জমায়। নানা দলে, নানা সম্প্রদায়ে গোটা সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়ে; জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়। একটা পুরোহিত শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায় আপনা-আপনি গড়িয়া উঠে; তাহারাই দেয় সমাজ-বিধান, তাহারাই হয় সমাজ-নেতা। বিস্ময় লাগে সেইখানে—যেখানে কোটি কোটি মানুষ এই মুষ্টিমেয় পুরোহিতদলকে অম্লানবদনে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লয় এবং নিজদিগকে সত্য সত্যই ছোট ভাবিয়া পশ্চাতে হটিয়া আসে। যুগ যুগান্তরের মত তাহাদের মনে ক্ষুদ্রত্বের ছাপ পড়িয়া যায়, তাহারা আর ভাবিতেই পারে না যে, কোনকালে তাহারা বড় ছিল অথবা বড় হইতে পারে। আল্লাহ্ যে তাহাদিগকে ছোট করেন নাই, ইচ্ছা করিলে তাহারাও যে আর দশজনের মতই বড় হইতে পারে—এ বিশ্বাস তাহাদের মন হইতে মুছিয়া যায়। কোটি কোটি মানুষ এমনি করিয়া পৃথিবী হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া যায়। তাহাদের শক্তি জাতির বা দেশের কোন কাজে লাগে না। জনশক্তির এই বিরাট অপচয়ের জন্য পৌত্তলিকতা বহুলাংশে দায়ী।

পৌত্তলিকের স্বদেশপ্রেমও লাভ করে একটা সঙ্কীর্ণ সাকার রূপ। দেশের অর্থে সে বুঝে দেশের মাটিকে—দেশের মানুষকে নহে। স্বদেশ তাহার নিকট দেশ-মাতৃকা বা দেশ-জননীরূপে প্রতিভাত হয়। স্বদেশপ্রীতি তখন স্বদেশ পূজায় পরিণত হয়। একটা উৎকট পৌত্তলিক ভঙ্গিতে তখন লোকেরা স্বীয় দেশকে দেখিতে আরম্ভ করে। ইহারই ফলে জন্মলাভ করে অন্য দেশ ও অন্য ধর্মের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ। এই উৎকট স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে মহাকবি ইকবাল কি সুন্দরই না বলিয়াছেন :

"ইন্ তাজা খোদাওঁ নে বড়া সবৃছে উহ্ ওতন হ্যয়
যো পিরহান উস্‌কা হ্যয় উহ্ মজাবকা কাফন হ্যয়।"

অর্থাৎ : এইসব তাজা দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতা হইল স্বদেশ। স্বদেশের যাহা রূপসজ্জা ধর্মের তাহাই কাফন।

www.pathagar.com

কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প, ললিতকলা—যে কোন ক্ষেত্রেই হউক না কেন, পৌত্তলিকতার অভিশাপ সর্বত্রই সমান। যেখানে সে ঢুকিবে, সেখানেই সে আনিবে মনের খর্বতা ও দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা। পৌত্তলিক কবি কখনও অতীন্দ্রিয় লোকের খবর দিতে পারে না; তাহার কাব্যে থাকে শুধুই বস্তুতান্ত্রিকতা। সে কখনও চরমপন্থী হইতে পারে না। সঙ্গীতেও ঠিক তাহাই। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের লক্ষণ হইতেছে অনির্বচনীয়কে রূপ দেওয়া; শুধু আভাসে, শুধু ইঙ্গিতে সেই চির-অব্যক্তকে ব্যক্ত করা। কিন্তু কোন পৌত্তলিক গায়কের কণ্ঠে ইহা প্রায়ই সম্ভব হয় না। নিরাকারবাদী ও স্বপ্ন-বিলাসী কোন দরদী সুরশিল্পীর মিহিন সুরের জাল না পাতিলে কোন কালেও সেই কল্পলোকের মায়াপুরীরা ধরা দেয় না।

মোটের উপর যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, পৌত্তলিকতা মানুষের আত্মবিকাশের পথে মস্তবড় বাধা। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষকে সে অগ্রসর হইতে দেয় না; পদে পদে তাহাকে পিছনের দিকে টানে।[২]

পৌত্তলিকতার এই বিষময় ফল বুঝিতে পারিয়াই মহামানব হযরত মুহম্মদ পৌত্তলিকতাকে বর্জন করিবার জন্য একটা তাগিদ দিয়া গিয়াছেন।

পৌত্তলিকতাকে বর্জন করিলে মানুষের যে কী কল্যাণ হয়, ইসলামের ইতিহাস তাহা ভালও করিয়াই জগৎকে দেখাইয়াছে। শৌর্য, বীর্য, বীরত্ব বিদ্যা ও সাহস; ধর্ম, সত্য ন্যায় ও নীতি; ত্যাগ, সেবা, সংযম, সততা; প্রতিভা, বুদ্ধি ও কৌশল; সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও কাব্য—সর্বক্ষেত্রেই তাহার অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলিয়া যায়।

কেমন করিয়া দিকে দিকে ইসলামের বিজয়-নিশান উড়িল? কেমন করিয়া মুষ্টিমেয় আরব-সন্তান দিগ্বিজয় করিল? আটলান্টিক হইতে কেপ কুমারিকা পর্যন্ত কেমন করিয়া তাহাদের পদানত হইল? তারিক, মুসা, খালিদ, অলিদ, আলি, হামজা, সুলতান মাহমুদ, মুহম্মদ ঘোরী, কাসিম, কুতুবুদ্দিন, বখতিয়ার, আকবর, চাঁদ সুলতানা, আওরঙ্গজেব-কেমন করিয়া এতগুলি প্রতিভা জন্মলাভ করিল? কেমন করিয়া হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম, ইবনে রুশদ, আবুসিনা প্রমুখ মনীষীর আবির্ভাব হইল? তানসেন, আমীর খসরু, সনদ, কদর প্রমুখ অসংখ্য সুরশিল্পী জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিল? কেমন করিয়া তাজমহল, জুমা-মসজিদ ও আলহামরা রচিত হইল? এক কথায় বলিব—তৌহিদের ইস্মে-আযম লাভ করিয়া।

এস তবে, হে মানুষ, তোমার ঐ হাতে গড়া পাষাণ-প্রাচীরকে ভঙ্গ করিয়া উদারমুক্ত নীল আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াও। আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া উদাত্ত কণ্ঠে সারা প্রাণ দিয়া ঘোষণা কর : "হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু! তুমি ছাড়া আমাদের আর কেহ উপাস্য নাই। একমাত্র তোমাকেই আমরা বন্দেগী করি, তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" আল্লাহ্কে এইরূপে আমাদের সাধারণ কেন্দ্র বলিয়া মানিয়া লইলেই আমরা পরস্পর ভাই হইব, আমাদের সকল বৈষম্য দূরে যাইবে; বিশ্ব আমাদের স্বদেশ হইবে, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতার স্বপ্ন সেইদিন আমাদের সফল হইবে।

---

২. এই প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে পৌত্তলিকতাকে দেখা হইতেছে। ইসলাম কি তাহা বুঝিতে হইলে পৌত্তলিকতার সহিত কোথায় কতটুকু বিরোধ, তাহা জানিতেই হয়। সেই হিসাবেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে। ধর্ম হিসাবে পৌত্তলিকতাকে নিন্দা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে। পরধর্মকে নিন্দা করা ইসলামের রীতি-বিরুদ্ধ।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৪

ইসলাম ও মো'জেজা

ইসলামের সহিত মো'জেজার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে মো'জেজাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মো'জেজাকে অস্বীকার করিলে ইসলামের অনেক মূলবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। জ্ঞানের অনেক পরিধিও বাহিরে পড়িয়া থাকে। মো'জেজায় বিশ্বাস মুসলমানদের ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ।

ইসলামের সমস্ত ধ্যান-ধারণার উপরেই এই মো'জেজার বা অলৌকিকের ছাপ আছে। আল্লাহ্ যে মাত্র একটি 'কুন' শব্দ দ্বারা অনস্তিত্বের মধ্য হইতে এক বিচিত্র বিশ্ব রচনা করিয়াছিলেন, হযরত আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশ হইতে যে বিবি হাওয়াকে পয়দা করিয়াছিলেন, বেহেশ্‌ত হইতে যে আদম-হাওয়া দুনিয়ায় নামিয়া আসিয়াছিলেন, হযরত নূহের সময় যে ভীষণ তুফান হইয়াছিল, হযরত মুসা যে তুরপাহাড়ে আল্লাহ্‌র নূর দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তস্থিত লাঠি যে মাটিতে পড়িয়াই সর্পাকৃতি ধারণ করিয়াছিল, নীল নদের পানি যে দুইভাগ হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল এবং হযরত মুসা যে বনি ঈসরাইলদিগকে লইয়া তাহার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন, হযরত মুহম্মদ যে সশরীরে মি'রাজে গিয়াছিলেন, জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা যে তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র বাণী পৌছাইয়া দিতেন—ইত্যাদি সমস্তই ত অলৌকিক ব্যাপার, রোজ-কিয়ামত, রোজ-হাশর, দোজখ, বেহেশ্‌ত হুরপরী—ইহার কোনটিকে মুসলমান অস্বীকার করিবে?

আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআন মজিদের প্রথমেই তাই মুসলমানদিগের অদৃশ্যে বিশ্বাস বা ঈমান-বিল্-গায়ীবের উপর তাগিদ দিয়াছেন। সত্যকার মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন :

> "নিশ্চয়ই এই কিতাব (কোরআন)-যাহাতে কোন সন্দেহ নাই সেই সব লোকের জন্য পথপ্রদর্শক-যাহারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে; যাহারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, এবং প্রার্থনা করে, এবং আমি যাহা তাহাদিগকে দিয়াছি তাহা হইতে দান করে; এবং তোমাদের প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে; নিশ্চয়ই তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে কোন ভয় নাই।" (২ : ৪)

উপরোক্ত আয়াত হইতে এই কথাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, আদর্শ মুসলমান হইতে হইলে অদৃশ্যে বিশ্বাস আমাদের অপরিহার্য।

আমাদিগকে প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহার অতীতেও না-দেখা ও না-শোনা অনেক কিছু আছে। অন্য কথায় আমাদের ঈন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নহে; যাহা জানি এবং যাহা জানি না; যাহা দেখি এবং যাহা দেখি না—সমস্তটা একত্র করিলে তবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নির্ণীত হইতে পারে। চৈনীক ধর্ম-প্রচারক কনফুসিয়াস তাই সত্যই বলিয়াছেন :

"To know what we know and to know what we do not know—that is wisdom."

www.pathagar.com

অর্থাৎ : যাহা জানি তাহা জানা এবং যাহা জানি না তাহা জানা—ইহারই নাম জ্ঞান।

দার্শনিক ভঙ্গিতে দেখিলেও দেখা যায় মানুষের জীবনের তিনটি স্তর আছে : অচেতন, চেতন ও উর্ধ্বচেতন। কোন্ রহস্য হইতে আমাদের উৎপত্তি এবং কোন্ রহস্যে তাহার অবসান, আমরা তাহা জানি না। শুধু মধ্যবর্তী খানিকটা চেতন ও সক্রিয় অংশের সঙ্গেই আমাদের পরিচয়। কিন্তু এই পরিচয় অসম্পূর্ণ, কেননা সম্পূর্ণ পরিধির পরিচয় এ নহে। দুই প্রান্তকে মিলাইলে তবেই এ পরিচয় পূর্ণ হয়।

কাজেই যেটুকু দেখি বা যেটুকু শুনি, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যদি আমরা বলি, ইহার বাহিরে আর কিছুই নাই; তবে তাহা নিছক বেকুফি ছাড়া আর কিছু নহে। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দৃষ্টি এবং শ্রবণের অন্তরালে আর একটি অজানা রহস্যলোক আছে—যেখানে বসিয়া সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ অনেক কিছু কুদ্রৎ প্রকাশ করিতেছেন।

অতএব, এই না-দেখা না-শোনাকে স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে যাত্রা শুরু করিতে হইতেছে। অদৃশ্য বিশ্বাস ছাড়া এমন কি সাধারণ জ্ঞানও আমরা অর্জন করিতে পারি না। পৃথিবী যে গোলাকার তাহা কেহই আমরা দেখি না; পুস্তকের কথায় অথবা শিক্ষকের কথায় বিশ্বাস করিয়া এ জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি। এইরূপ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদের জ্ঞানের দুই-তৃতীয়াংশই এইরূপ বিশ্বাস বা অথরিটি (authority) হইতে প্রাপ্ত।

এই অজানাকে অস্বীকার করিলে আমাদের কী দশা ঘটে, আল্লাহ্ তাহাও বলিয়া দিতেছেন :

"নিশ্চয়ই যাহারা অবিশ্বাসী, তাহাদিগকে সতর্ক করা না-করা সমান, তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর এবং শ্রবণের উপর সীলমোহর মারিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের চোখের উপর আবরণ টানিয়া দিয়াছেন এবং পরকালে তাহাদের জন্য ভীষণ শাস্তি আছে।" (২ : ৭)

বাস্তবিকই অবিশ্বাসী হইলে আমাদের কল্যাণ নাই। না-দেখিয়া না-শুনিয়া কিছুই বিশ্বাস করিব না। এরূপ বলিয়া আমরা যদি সবকিছু বর্জন করি, তবে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের শাস্তিভোগ করিতে হয় প্রচুর। এইরূপ করিলে আমাদের হৃদয় এবং শ্রবণ রুদ্ধ হইয়া যায়, আমাদের নয়নে অন্ধ যবনিকার আড়াল পড়ে; আমরা তখন যাহা দেখি এবং যাহা শুনি, তাহার বাহিরে আর কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাই না, আমাদের অনুভূতি নষ্ট হইয়া যায়, অজানাকে জানিবার জন্য মনে আর কৌতূহল জাগে না, আমাদের আত্মা আর অনন্তের পথে উধাও হয় না। আমাদের জীবনের পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা আমরা পাই না; সম্ভাবনার যে বিরাট জগৎ এখনও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় বাহিরে পড়িয়া আছে চিরদিনের মত তাহা আমাদের নিকট রুদ্ধ হইয়া যায়। আমাদের অন্তর শ্রবণ ও নয়ন চাপা পড়িয়া গেলে এই দশাই ঘটে। আমরা তখন পশুদের মত মাটির পৃথিবীকে আঁকড়াইয়া ধরি। এর চেয়ে চরম শাস্তি মানুষের পক্ষে আর কী আছে?

নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এতবড় সতর্কবাণী লাভ করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে অনেকেই এই না-দেখা ও না-শোনাকে বিশ্বাস করিতে চাহে না। মানবীয় জ্ঞান-

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ জানিয়াও তাঁহারা মনে করেন : তাঁহারা যাহা দেখেন বা শোনেন তাহার বাহিরে আর কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই। পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞান এই মনোভাবকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে "জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত" হইলেই তাঁহারা আর কোন কিছুকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। যুক্তিজ্ঞানকে তাঁহারা সত্য-নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু ইহাই যে সত্যকার বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি, তাহাও ত নহে। "জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য ও অভিজ্ঞতার বিপরীত" হইলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে, এই কথা আর যে-কেহই বলুক, কোন বৈজ্ঞানিক বলিবে না। বৈজ্ঞানিকের মনের দরজা সব সময় খোলা থাকে; সহজে কাহাকেও সে প্রত্যাখ্যান করে না। "সমস্তই সম্ভব"-ইহাই হইতেছে বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিলে তাহার কোন আবিষ্কারই আর সম্ভব হয় না। কাজেই অদৃশ্য ও অনাগতের উপর বৈজ্ঞানিকের প্রগাঢ় বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক আগে কল্পনা বলে hypothesis খাড়া করে, তারপর তাহারই উপর গবেষণা করিতে থাকে। এইরূপেই নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বপ্রকৃতিতে যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে, একইরূপ কারণ ঘটিলে যে একই রূপ কার্য ঘটিবে, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ বিশ্বাস থাকে। কাজেই গোড়াতেই তাহাকে যাত্রা করিতে হয় এই বিশ্বাসের পুঁজি লইয়া। বিশ্বাস হারাইলে সে একদম পঙ্গু হইয়া পড়ে। যুক্তির ভিতরেও বিশ্বাস আছে। যুক্তিতে যাহা পাই, তাহা যে সর্বত্র একইরূপ ক্রিয়া করিবে, এই বিশ্বাস না থাকিলে বৈজ্ঞানিক যুক্তিও অচল হয়। এ সম্বন্ধে বর্তমান যুগের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক Prof. A N. Whitehead কি বলিতেছেন শুনুন :

"It is the faith of every one of us that the base of things we shall not find mere arbitrary mystery. The faith in the order of nature which has made possible the growth of science is a particular example of deeper faith. (Science and the Modern World. p 30-31)

অর্থাৎ : আমাদের বিশ্বাস আছে যে, সমস্ত জিনিসের মূলে গিয়া আমরা কোন খামখেয়ালের পরিচয় পাইব না। প্রকৃতির শৃঙ্খলার উপর এই আস্থা—যাহা না হইলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রগতিই সম্ভব হইত না—আমাদের অন্তরের গভীরতর বিশ্বাসেরই একটা সুন্দর নিদর্শন।

বাহির হইতে কোন সত্যবাণীও যে আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে, বিজ্ঞান তাহা অবিশ্বাস করে না। জনৈক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :

"Science will not exclude the possibility of authentic message from without. Cautious in accepting or rejecting theories within her own recognized domain she will even more cautious before rejecting, as well as before accepting, theories which relate to the vast region that lies as yet outside."

(Belief and Action-Viscount Samuel. p. 49)

অর্থাৎ : বাহির হইতে কোন সত্য বাণী আসিবার সম্ভাবনাকে বিজ্ঞান কখনও অস্বীকার করে না। তাহার নিজ সীমার অন্তর্ভুক্ত কোন মতবাদকে স্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করিতে সে যেমন হুঁশিয়ার, তাহার এলাকার বহির্ভূত এবং অদ্যাবধি আবিষ্কৃত কোন মতবাদকে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে সে তদপেক্ষা আরও হুঁশিয়ার।

www.pathagar.com

ইহাই যদি হয় বিজ্ঞানের স্বরূপ, তবে বিজ্ঞানের নামে কি করিয়া সেই বিরাট অজানা জগৎকে অস্বীকার করা যায়?

বস্তুত বৈজ্ঞানিকদের জানার গর্ব আজ বড় নহে। সকল বৈজ্ঞানিক আজ অকুণ্ঠচিত্তে এই কথা বলিতেছেন : "We do not know?— আমরা জানি না।

এই কথার মধ্যে মানবীয় জ্ঞানের অপূর্ণতার সুরই ধ্বনিত হইতেছে। জ্ঞান-বুদ্ধির দ্বারা মানুষ চির-অজ্ঞাত চির-অজ্ঞেয়কে কিছুতেই আজ ধরিতে পারিতেছে না, যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার লক্ষ্যবস্তু আরও দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাই এই হাহাকার।

যুক্তিজ্ঞান বা চিন্তা যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না, ইহা দার্শনিক সত্য। খ্যাতনামা ভারতীয় দার্শনিক Sir Radhakrishnan সত্য-নির্ণয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :

"Thought itself is self-contradictory or inadequate. Thought is incapable of giving us the whole of reality. The "that" exceeds the "What" in Bradly's words. Thought gives us knowledge, and nor reality. What thought reveals is not opposed to reality but it revelatory of a part cf it. The Partial Views are contradictory only because they are partial. They are true so far as they go, but they are not the whole truth. Reality can be apprehended by a form of felling or intuition : (Indian Philosophy. p. 42—43)

অর্থাৎ : চিন্তা নিজেই আত্মবিরোধী ও অসম্পূর্ণ। চিন্তা আমাদিগকে সম্পূর্ণ সত্য দিতে পারে না। দার্শনিক ব্রাডলির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, "তাহা" চিরদিনই "কী" কে অতিক্রম করিয়া আছে। চিন্তা আমাদিগকে সত্যের জ্ঞান দান করে বটে, কিন্তু সে শুধু জ্ঞানই আসল সত্য নহে। চিন্তা যাহা ধরিয়া দেয়, তাহা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত নহে বটে, কিন্তু আংশিক। আংশিক সত্য আংশিক বলিয়াই পরস্পর-বিরোধী। তাহারা তাহাদের সীমানার মধ্যেই সত্য, কিন্তু পূর্ণ সত্য নহে। অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারাই সত্যকে পাওয়া যায়।

Sir Radhakrishnan আরও বলেন :

"It is when thought becomes perfected in intuition that we catch the vision of the real."

অর্থাৎ : জ্ঞান যখন প্রত্যক্ষ অনুভূতির মধ্যে আসিয়া পূর্ণ হয়, তখনই আমরা সত্যের দেখা পাই।

অবস্থা যখন এই, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নামে মো'জেজাকে বিশ্বাস না করা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় নহে কি? জগতের কোন্ বস্তুটি বা কোন্ ঘটনাটি অলৌকিক নহে? মাটি ফুঁড়িয়া গাছ বাহির হইতেছে, ডালপালা উঠিতেছে, শাখায় শাখায় রং-বেরং এর ফুল ফুটিতেছে; প্রতিদিন সূর্য উঠিতেছে আবার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে পূর্বাকাশে দেখা দিতেছে; বাতাসকে দেখিতে পাইতেছি না, অথচ অনুভব করিতেছি যে সে আছে; মেঘেরা দল বাঁধিয়া আকাশে বেড়াইতেছে, আবার বৃষ্টিধারায় নামিয়া ধরণী ভাসাইয়া দিতেছে; কোন্‌টি রাখিয়া কোন্‌টির কথা বলি? কোন্‌টি অলৌকিক নহে?

Walt Whitman এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন :

www.pathagar.com

"Why who makes much of miracls? As to me I know nothing else but miracles."

অর্থাৎ : অলৌকিক লইয়া এ হৈ-চৈ কেন? আমি ত অলৌকিক ছাড়া অন্য কিছুই জানিনা।

Laurence Housman নামক আর একজন মনীষী বলিতেছেন :

"Find something that isn't a miracle, you'll have cause to wonder then."

অর্থাৎ : এমন একটি জিনিস খুঁজিয়া বাহির কর যাহা অলৌকিক নহে, তখন তোমাকে ভাবিতে হইবে।

Prof. Huxley-র ন্যায় বৈজ্ঞানিকও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :

"The miracles of the Church are child's play to the miracles I see in Nature."

অর্থাৎ : প্রকৃতিতে যে মো'জেজা নিত্য দেখিতে পাই, তাহার তুলনায় ধর্ম সংক্রান্ত মো'জেজা ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়।

সত্যই তাহা নহে কি? বিশ্বপ্রকৃতি অত্যাশ্চর্য মো'জেজায় পরিপূর্ণ। কিন্তু তবু আমাদের মো'জেজায় বিশ্বাস হইতে চাহে না কেন? তাহারও কারণ আছে।

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণা বা পূর্বসংস্কারই মো'জেজায় অবিশ্বাসের প্রধান কারণ। আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বভাবের নিয়ম ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া যায় বলিয়া মানুষ মো'জেজাকে সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। আগুনের স্বভাবধর্ম সবকিছুকে পুড়াইয়া ছাই করা; সর্বক্ষণ আমরা এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করিতেছি। মানুষ, গরু, বাড়ি, ঘর—সমস্তই আমরা আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইতে দেখি। এ ক্ষেত্রে যদি বলা যায় যে, অমুক ব্যক্তিকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে পুড়িল না, দিব্যি তাহার মধ্যে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তবে তৎক্ষণাৎ আমাদের মনের বদ্ধমূল ধারণায় আঘাত লাগে, কাজেই আমরা বলি : ইহা অসম্ভব।[১] কিন্তু এই সম্ভব-অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কি চূড়ান্তরূপে এবং অভ্রান্তরূপে সত্য? আমাদের বদ্ধমূল ধারণা বা বিশ্বাসের কি কোন দিনই কোন ব্যক্তিক্রম ঘটে না, বা ঘটিতে পারে না? সূর্য যে কোন দিনই পশ্চিম দিক হইতে উদিত হইবে না, একথা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? নিশ্চয়ই না, কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা এখনও অসম্পূর্ণ।

বস্তুত স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই হইতেছে মো'জেজায় অবিশ্বাসের সর্বপ্রধান অন্তরায়। কাজেই, প্রথমে আমরা এই স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করিব। কোন্‌টি স্বাভাবিক, কোন্‌টি অস্বাভাবিক, স্বাভাবিকের সংজ্ঞা কি, আর তার সীমা কোথায়; কোন্‌খান পর্যন্ত স্বাভাবিক থাকে, আর কোন্‌খান হইতে অস্বাভাবিক অরম্ভ হয়; আমরা যাহাকে অস্বাভাবিক মনে করি, সত্যসত্যই তাহা অস্বাভাবিক কিনা-এ সমস্ত সমস্যার সম্যক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের দোহাই দিয়া মো'জেজাকে অস্বীকার করা আমাদের সঙ্গত হইবে না। অতএব, স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমরা এখানে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

---

১. নমরুদ যখন হযরত ইব্রাহিমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, তখন আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন : "ইহ্ নারো কূনি বরদাঁও ওয়া সালামান আলা ইব্রাহিম"।-(২১ : ৬৯) অর্থাৎ : "হে অগ্নি ইব্রাহিমের উপর তুমি শীতল এবং শান্তিদায়ক হইয়া যাও।" বলা বাহুল্য, এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম আগুনে পুড়েন নাই।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৫
স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক

'অস্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে 'স্বাভাবিক'কে বুঝিতে হয়, আর 'স্বাভাবিক'কে বুঝিতে হইলে আগে বুঝিতে হয় 'স্বভাব'কে।

স্বভাব (Nature) কী?

বিশ্বজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহার মূলে রহিয়াছে একটা শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা। যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই একটা বিধি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটিতেছে; অন্ধভাবে বা খেয়ালের বশে কেহ চলিতেছে না। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র তাহাদের নির্ধারিত পথে চলাফেরা করিতেছে, কোথায়ও বিরোধ নাই। বিশৃঙ্খলা নাই। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পূর্বদিকে সূর্য উঠিতেছে, পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে, রাত্রির পর দিন, দিনের পর রাত্রি আসিতেছে; আম গাছে আম ফলিতেছে, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলিতেছে, আজ পূর্বদিকে, কাল পশ্চিম দিকে সূর্য উঠিতেছে না; আম গাছে কাঁঠাল,কাঁঠাল গাছে আম ফলিতেছে না। এইরূপে সর্বত্রই নিয়ম-শৃঙ্খলার পরিচয় পাইতেছি। আল্লাহ্‌র এই নিয়ম-রাজ্যের নামই হইতেছে স্বভাব বা প্রকৃতি।

স্বভাবের একটা স্থিরতা বা ধারাবাহিকতা আছে, একটা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। যে-কারণে একবার একটি ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, সেই কারণ উপস্থিত হইলে পুনরায় সেই ঘটনাটি ঘটিতেছে। একইরূপ কারণ দেখিলে তাই আমরা বুঝিতে পারি যে, একইরূপ কার্য ঘটিবে ("like cause produce like effect") আবার একইরূপ কার্য বা ফল দেখিলে বুঝিতে পারি যে, এর মূলে আছে একইরূপ কারণ। এই স্বভাবধর্মের কোন ব্যতিক্রম নাই; যুগে যুগে দেশে দেশে ইহা সত্য। "Nature never breaks her own law"—স্বভাব তাহার নিজের নিয়ম কখনও ভঙ্গ করে না ইহাই হইতেছে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা স্বভাবের এই স্থিরতা বা বিশ্বস্ততার উপরেই নির্ভর করে। কাজেই যদি কেহ বলে যে, অমুক লোকটিকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল, কিন্তু সে তাহাতে পুড়িয়া মরিল না, আগুনের মধ্যে বসিয়া ফুলের মত দিব্যি হাসিতে লাগিল, তবেই আমাদের তাহা বিশ্বাস হইতে চাহে না, কারণ আমরা জানি যে, স্বভাব ধর্মের ইহা ব্যতিক্রম। এইজন্য আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার বিপরীত কিছু ঘটিলেই আমরা বলি যে, উহা অস্বাভাবিক।

কিন্তু স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের এই ধারণা খুবই ভ্রান্ত। স্বভাবের জ্ঞান জন্মে আমাদের অভিজ্ঞতা হইতে আর অভিজ্ঞতা জন্মে আমাদের ভূয়োদর্শন হইতে, অর্থাৎ, একই ঘটনা বারে বারে দেখিবার ফলে। কাজেই এই দেখা বা observation-এর উপরেই আমাদের স্বভাব-অস্বভাবের ধারণা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু এই দেখার উপরে আমরা কতটুকু আস্থা স্থাপন করিতে পারি? স্বভাবকে আমরা কতটুকু দেখিয়াছি? কোন বস্তুকে আমরা চূড়ান্তরূপে দেখিতে পারি কি? একবার দুইবার, একশত বার, হাজার বার—যতবারই দেখি না কেন, সে-দেখা নিশ্চয়ই আমাদের শেষ দেখা নহে। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, অতীত এবং বর্তমান দেখিয়া আমরা একেবারে নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি না। সূর্য পূর্বদিক হইতে উঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়; অতীত

www.pathagar.com

হইতে এ-ঘটনা প্রতিদিন সত্য হইয়া আসিতেছে, এখনও ইহা ঘটিতে দেখিতেছি। কাজেই আমরা অনুমান করি যে আগামীকল্য বা আগামী বৎসর বা একশত বৎসর পরেও সূর্য পূর্বদিক হইতেই উঠিবে। কিন্তু এ অনুমান যে নির্ঘাৎ সত্য হইবেই, তাহা কি আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি? নিশ্চয়ই না। ভবিষ্যতে কী ঘটিবে কে জানে? কাজেই সূর্য যে প্রতিদিন পূর্বদিক হইতে উঠিবেই, একথা যদি আমরা চিরসত্যরূপে গ্রহণ করি তবে আমাদের ভুল হইবে। কেননা আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই।

স্বভাবের নিয়মানুবর্তিতা (Uniformity of Nature) সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। আমরা মনি করি, স্বভাব কোন অবস্থাতেই তাহার নিয়ম ভঙ্গ করে না। কিন্তু এ ধারণাও ভুল। জড়প্রকৃতি সম্বন্ধে এই ধারণা হইতে পারে বটে, কিন্তু জড় জগতের বাহিরে Uniformity of nature খাটে না; সেখানে প্রকৃতি নিতান্ত খামখেয়ালের পরিচয় দেয়। জড়পদার্থের বেলায় প্রকৃতি স্থিরতার নীতি (Principle of Determinacy) মানিয়া চলে বটে, কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক জগতে সে মানে স্বাধীন ইচ্ছা বা অনিশ্চয়তার নীতি (Principle of Free-will বা Indeterminacy)। এ সম্বন্ধে Sullivan বলিতেছেন :

"The question is : Which of these principle does Nature obey? And the answer we have obtained so far is that the ultimate processess of Nature are not strictly determined. This theory has no difficulty in explaining the fact that in practice when we deal with appreciable lumbs of matter. Nature exhibits strict laws of cause and effect. For, this apparent uniformity of nature is merely a statisitical effect. The idiosyncrasies of the individual electrons and atoms in any perceptible piece of matter cancel out, a sit were indeed one of the real tasks of Science at present is to deduce the laws that give its ultimate constituents. The deduction cannot be effected otherwise round. It is the electron that is the key to the universe." (Limitation of Science. pp. 93—94)

অর্থাৎ : প্রশ্ন হইতেছে-এই নীতিগুলির কোন্‌টি স্বভাব মানিয়া চলে? এ-পর্যন্ত যে উত্তর পাইয়াছি তাহা এই যে, স্বভাবের শেষ পদ্ধতিতে স্থিরতার নীতির কড়াকড়ি নাই। এই থিওরী দ্বারা একথা বেশ ব্যাখ্যা করা যায় যে, কার্যত যখন আমরা কোন স্থূলকায় জড়পদার্থ লইয়া বিচার করিতে বসি, তখন স্বভাব কার্যকারণনীতিটি খুব মানে; এই আপাতঃদৃষ্ট নিয়ানুবর্তিতা শুধু হিসাবেই পাওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু ও ইলেকট্রনের বেলায় দেখা যায় যে, তাহারা খামখেয়ালী। বস্তুত স্থূল জগতে নহে, স্থূল জগতের অন্তরালে ইলেকট্রন জগৎ কোন্ নিয়মে চালিত হইতেছে, তাহা নির্ণয় করাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের প্রধান কর্তব্য। সৃষ্টির মূল রহস্যই এইখানে।

অতএব, স্বভাব-অস্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা একেবারে অভ্রান্ত নহে। যতই দেখি না কেন, আমাদের generalisation (অর্থাৎ এই ঘটনাকে বহুবার

www.pathagar.com

ঘটিতে দেখিয়া সে সম্বন্ধে সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ) কিছুতেই অবিসম্বাদিতরূপে নির্ভুল হইতে পারে না; উহার মধ্যে খানিকটা অনুমান বা অন্ধ বিশ্বাস থাকিয়াই যায়।

আমাদের দেখার ভিতরেও অনেক গলৎ থাকে। সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় লইয়া আমরা যাহা দেখি বা অনুভব করি, তাহা সব সময় সত্য হয় না। ইহা অসম্ভব নহে যে, আমরা দেখিতেছি একরূপ, কিন্তু ঘটিতেছে অন্যরূপ। সৃষ্টির সমস্ত রহস্য আমাদের নিকট এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই; আমরা জানি না কোথায় কি ঘটিতেছে, অথবা কেমন করিয়া ঘটিতেছে। সৃষ্টি–রসহ্য এতই গভীর এবং দুর্বোধ্য। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের বিশ্ব (Universe) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা অনুমান সর্বত্র নির্ভুল নহে। তাহার প্রমাণ : পণ্ডিতগণ আজ যাহা বলিতেছেন কালই তাহা বদলাইয়া যাইতেছে। প্রকৃত সত্য তাই এখনও আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে রহিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ আজ অকুণ্ঠচিত্তে বলিতেছেন :

"We can never say that any theory is final or corresponds to absolute truth, because at any moment new facts may be discovered and compel us to abandon it."

(The new Background of Science, by Sir James Jeans.)

অর্থাৎ : আমরা কোন চরম থিওরীকেই চরম এবং ধ্রুব সত্য বলিতে পারি না, কারণ যে–কোন মুহূর্তে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং তাহার ফলে বাধ্য হইয়া আমরা পুরাতন মতকে বর্জন করিতে পারি।

বলা বাহুল্য : এই কারণেই স্বভাবের সীমারেখাও চূড়ান্তরূপে সুনির্দিষ্ট হয় নাই। কোন্‌টি স্বাভাবিক আর কোন্‌টি অস্বাভাবিক, কেহই তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। স্বভাবের রাজ্য ক্রমবিস্তারশীল। আজ যাহা ভাবিতেছি কালই তাহা স্বাভাবিক হইয়া যাইতেছে। কাজেই কোন নূতন ঘটনা ঘটিতে দেখিলেই যে তাহাকে অস্বাভাবিক বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে, এর কোন মানে নাই। প্রত্যেক স্বাভাবিক ঘটনাই এক সময় অস্বাভাবিক ছিল।

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এ-সম্বন্ধে কী সুন্দরই না বলিয়াছেন :

"The supernatural of one generation is the natural of the next.

অর্থাৎ : এক যুগে যাহা অস্বাভাবিক মনে করি, পরবর্তী যুগে তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

স্বভাবের স্থিরতা (Uniformity of nature) অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের তাই এখন আর সেরূপ বিশ্বাস নাই। একই কারণে যে একই ঘটনা ঘটিবেই, অথবা একই ঘটনা ঘটিলে যে তাহার মূলে একই কারণ বিদ্যমান থাকিবেই একথা জোর করিয়া বলা এখন শক্ত। স্বভাব যে সর্বত্র নিয়ম-নিগড়েই বাঁধা রহিয়াছে, কোন দিনই যে তার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাও নহে।

বৈজ্ঞানিকগণ* পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, একই নিয়ম দ্বারা স্বভাব সর্বত্র কাজ করে না। মনে হয়, কোন এক অদৃশ্য গোপন শক্তি যেন আড়ালে থাকিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের একটু হের-ফের করিয়া দেয়। এই অজানা বা অদৃষ্টকে বৈজ্ঞানিকেরা আজ নতমস্তকে স্বীকার করিতেছেন :

"Although we are still for far any positive knowledge,it seems possible that they may be some factor for which we have so far

www.pathagar.com

found no better name than fate, operating in nature to neutralise the cast-iron inevitability of 'he old law of causation. The nature may not be as unalterably determined by the past as we used to think : in part at least it may rest on the knees of whatever gods there be." (The mysterious Universe by Sir James Jeans, p. 38.)

অর্থাৎ : "যদিও আমরা এখনও স্থির-নিশ্চিত নই, তবু বলিব স্বভাবের মধ্যে এমন একটা কিছু কার্য করিতেছে, যাহাকে আমরা অদৃষ্ট ছাড়া অন্য কোন ভাল নামে অভিহিত করিতে পারি না; এই অদৃষ্টই কঠোর কার্য-কারণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া করিতেছে। আমরা পূর্বে যেরূপ ভাবিতাম যে, অতীতের দ্বারাই ভবিষ্যৎ সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেরূপ নাও হইতে পারে। অন্তত কিছুটা অংশ 'দেবতাদের' উপর (তাহারা যাহারাই হউক) নির্ভর করিতেছে।"

স্বভাবের যে ভুল হয় এবং চুল-চেরা হিসাব-নিকাশ করিয়া সে যে সর্বত্র কাজ করে না, বৈজ্ঞানিকগণ সে সম্বন্ধে এখন সজাগ :

"Nature permits certain margin of error' and if we try to get within this margin, Nature will give us no help; she knows nothing, apparently, of absolutely exact measurements."

(The Mysterious Universe, p. 39)

অর্থাৎ : স্বভাবের খানিকটা জায়গায় গলৎ আছে, সেখানে যদি আমরা ঢুকি তবে সে আমাদিগকে কিছুই সাহায্য করে না। মনে হয়, ঠিক ঠিক মাপ-জোকের সে কিছুই জানে না।

খ্যাতনামা জার্মান বৈজ্ঞানিক Prof. Heisenberg-এরও মত যে, "Nature abhors accuracy and precision above all things."

অর্থাৎ : মাপা-জোকা সঠিকতাকে স্বভাব সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করে।

স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কত অসম্পূর্ণ, আশা করি উপরের আলোচনা হইতে সে-কথা এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা নহে স্বয়ং বৈজ্ঞানিকেরাই আজ হতাশ হইয়া একই কথা বলিতেছেন। এক সময়ে যাঁহারা স্পর্ধা করিয়া বলিতেন যে, স্বভাবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা (Order) এবং ব্যতিক্রমহীনতা (Uniformity) আছে এবং এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা জগতে যে-কোন ব্যাপারকে কার্যকারণ-নিয়মের (law of causation) বশবর্তী করিয়া যান্ত্রিক উপায়ে (Mechanically) ব্যাখ্যা করা যায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্ধত স্পর্ধায় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে পর্যন্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায় নামিয়াছেন দেখুন। বৈজ্ঞানিক আজ অদৃষ্টবাদী। বৈজ্ঞানিক আজ আল্লাহ্ বিশ্বাসী। (Viscount samuel) কি সুন্দরই না বলিতেছেন :

'Indeed in so far as it accepts and emphasizes the principle of causality and in so far as it Perceives that the univers as we see it cannot be self-caused, science leads inevitalby to the conclusion that there must be a casual factor, not comprised within our view of the universe. If this be Deity, then science has made atheism impossible." (Belief and action, p. 33)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : বিজ্ঞান যে-সমস্ত কার্য-কারণ বিধিকে মানিয়া চলিবে এবং যে পর্যন্ত বুঝিবে যে,এই বিশ্ব আপনা আপনি সৃষ্ট হয় নাই, সে পর্যন্ত তাহাকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, ইহার পিছনে নিশ্চয়ই এমন একটি আদি কারণ আছে—যাহা আমাদের বিশ্বসম্বন্ধীয় দৃষ্টিসীমার বাহিরে রহিয়াছে। এই আদি কারণে যদি কোন দেবতা (আল্লাহ্) হয়, তবে এ-কথা সত্য যে, বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

কাজেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হইলে সে কখনও নাস্তিক হইতে পারে না; বরং তুলনায় সে-ই হয় ভাল আস্তিক। মো'জেজাতেও তার বিশ্বাস হয় গভীর ও জ্ঞানসমৃদ্ধ। জানিয়া শুনিয়া সে স্বীকার করে এক অব্যক্ত পরম অদৃশ্য শক্তিকে।

এই মহাশক্তিই ত আল্লাহ্।

-

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৬

স্বাভাবিক ও অতিস্বাভাবিক

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক লইয়া আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম। এই আলোচনায় আমরা দেখিলাম : স্বভাবের প্রকৃত স্বভাব এখনও নিরূপিত হয় নাই; অন্য কথায় স্বভাবকে আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে চিনি নাই। কাজেই, কোন্‌টি যে স্বাভাবিক, আর কোনটি অস্বাভাবিক, সে-কথা নিশ্চিতরূপে আমরা বলিতে পারি না।

কিন্তু এইখানেই আমাদের সমস্যার শেষ নহে। স্বভাব ও অস্বভাবের দ্বন্দ্বে আরও একটি তৃতীয় পক্ষ আছে, তাহার দাবী ও বক্তব্য না শুনিলে কিছুতেই এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় না।

সেটি হইতেছে অতিস্বভাব।

অতিস্বভাব কী?

স্বভাবের যাহা উর্ধ্বে তাহাকেই আমরা অতিস্বভাব বলিয়া জানি। আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, স্বভাবের যে একটা বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন আছে, স্বভাব তাহা কখনও ত্যাগ করে না। একটি ঢিল উর্ধ্ব দিকে ছুঁড়িয়া দিলে সে মাটিতে পড়িবেই—ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কোন কারণবশত ঢিলটি মাটিতে না পড়িয়া ক্রমাগত উর্ধ্ব দিকেই ছুটিতে থাকে, তবে বলিব ইহা অতিস্বাভাবিক : অর্থাৎ স্বভাব-ধর্মের উহা বাহিরে। অতএব, স্বভাবের নিয়মকে লংঘন করিয়া যে-সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহাদিগকে আমরা অতিস্বাভাবিক বলিতে পারি। নীলনদের বিভক্ত জলরাশির মধ্য দিয়া হযরত মূসার হাটিয়া নদী পার হওয়া হযরত ঈসার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ মুহম্মদের মি'রাজ ভ্রমণ ইত্যাদি যাবতীয় অলৌকিক ঘটনাই অতিস্বাভাবিক পর্যায়ভুক্ত।[১]

কোন অতিস্বাভাবিক ঘটনা নিত্য ঘটিতে পারে না, কারণ নিত্যঘটমান হইলেই সে আর অতিস্বাভাবিক থাকে না—স্বাভাবিক হইয়া যায়।

অতএব, এ-কথা এখানে সুস্পষ্ট হইতেছে যে, অস্বাভাবিকের ন্যায় অতিস্বাভাবিকও স্বভাবের ব্যতিক্রম বিশেষ; এ-কারণে স্বভাবের সহিত তাহারও বিরোধ। তবে অতিস্বাভাবিক একেবারে অস্বাভাবিক নয়; মনে হয় যেন উভয়ের মধ্যবর্তী।

তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি, আসমান-যমীনে যাহা কিছু ঘটিতেছে, সমস্তই হয় স্বাভাবিক (natural), নয় ত অতিস্বাভাবিক (Supernatural), নহে ত অস্বাভাবিক (unnatural); অন্য কথায় যাবতীয় ঘটনাকেই তিন ভাগে ভাগ করা যায়; (১) স্বাভাবিক, (২) অতিস্বাভাবিক, (৩) অস্বাভাবিক।

স্বভাব ও অস্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক সেই প্রশ্নই করিতেছি : কোন্‌টুকু স্বাভাবিক আর কোন্‌টুকু অতি স্বাভাবিক? উভয়ের কোন চৌহদ্দী আছে কী?

---

১. অবশ্য 'অস্বাভাবিক' ও 'অতিস্বাভাবিকের' মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দুই-ই প্রচলিত স্বভাবের বিপরীত।

www.pathagar.com

পূর্বেই বলিয়াছি, স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা বা পূর্বসংস্কারই হইতেছে যত অনর্থের মূল। স্বভাবকে আমরা একেবারে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখি বলিয়া আমাদের এই দুর্ভোগ। মানুষকে ছোট করিয়া দেখিলে যেমন অতিমানুষ বা দেবতাকে স্বীকার করিতে হয়, স্বভাবকে ছোট করিয়া দেখিলেও ঠিক তেমনি অতিস্বাভাবিককে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যদি আমরা ভাবি যে, যাহা-কিছু সমস্তকে লইয়াই স্বভাব, তবে আর অনর্থক এই বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। যদি কোন বস্তু বা ঘটনা একবার ঘটিয়াই গেল, তবে আর তাহা অতিস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক রহিল কোথায়? অতিস্বাভাবিকও ত তখন স্বাভাবিক হইয়া গেল।

স্বভাব, অস্বভাব বা অতিস্বভাবের তারতম্য তাই নিতান্তই আমাদের মনগড়া। বিশ্ব-নিখিলের যাবতীয় ঘটনাকে এক অখণ্ড রূপ দিয়া দেখিলে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিকের প্রশ্ন আর আমাদের মনে জাগে না। Prof. Huxley কী সুন্দরই না বলিতেছেন :

"I employ the words 'supernature' and 'supernatural' in their popular sences. For myself. I am bound to say that the term 'Nature' covers the totality of that which is. The world of physical phenomena aeapprs to me to be as much part of nature as the world of physical phenomena and I am unable to perceive any justification for cutting the universe into two halves, one natural and one supernatural." (Huxley's Essays, Vol. V. P. 39)

অর্থাৎ : 'অতিস্বভাব' এবং 'অতিস্বাভাবিক' শব্দ দুইটিকে আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি বলিতে বাধ্য যে, বিশ্বজগতে যাহা-কিছু আছে, সমস্তই স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী জড়জগতের ঘটনাবলীর মতই স্বভাবের অংশ; কাজেই সমগ্র জগতটাকে 'স্বাভাবিক' এবং 'অতিস্বাভাবিক'- এই দুই খণ্ডে ভাগ করিবার আমি কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

বাস্তবিকই তাই। 'স্বভাব' অর্থে আমরা শুধু জড়জগতের ঘটনাবলীকেই মানিতেছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগৎকে মানিতেছি না। অথচ জড়জগতের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগৎ যে আছে এবং সে জগতে যে নিত্য নব-নব ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বভাবের সমগ্র রূপের কথা আমাদিগকে তাই ভাবিতে হইবে। সমগ্র স্বভাব কোন্ নিয়ম দ্বারা চালিত হইতেছে তাহা জানিতে হইবে। স্বভাব সম্বন্ধে আংশিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াই কোন্‌টি স্বাভাবিক, কোনটি অস্বাভাবিক, তাহা বিচার করিতে যাওয়া আমাদের মূর্খতা।

আমাদের জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণতা হইতেই অতিস্বভাব ও অস্বভাবের ধারণা জন্মে। জ্ঞান দ্বারা যাহাকে ধরিতে পারি না, বুদ্ধি দ্বারা যাহাকে বুঝিতে পারি না, অভিজ্ঞতা দ্বারা যাহার কোন সমর্থন পাই না, তাহাকেই আমরা বলি অতিস্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক। আমরা সব বুঝি , কিন্তু সব যে বুঝি না, এইটুকু বুঝি না। কুব্জ যেমন চায় যে, তাহার কুব্জতা ভাল না হইয়া দুনিয়ার অন্যান্য সকলেও তাহারই মত কুব্জ হউক; আমরাও ঠিক সেইরূপ মনে করি যে, আমাদের সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

জ্ঞান-অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত না হইয়া জগতের সব কিছু আমাদের বুদ্ধির আয়ত্তের মধ্যে আসুক।

এ মনোবৃত্তি নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ নহে। আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতার দৈন্য স্বীকার করা উচিত। যদি কোন অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা আমরা না করিতে পারি, তবে তাহাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান না করিয়া অন্তত এইটুকু বলা উচিত যে, ঘটনাটি সম্ভব হইতে পারে, তবে ইহার কারণ আমরা জানি না। জনৈক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য লেখক এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, শুনুন :

"The only reasonable attitude for a sensible man to adopt towards and problem dealing with the supernatural which cannot be submitted to a scientific standard of truth, is that of saying : I do not know, yet such and such is my opinion."

(The Evidence for the Supernatural, p. 12).

অর্থাৎ : "অতিপ্রাকৃতিক কোন ঘটনাকে যদি কোন বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিতে না আনা যায়, তবে তখন যে- কোন জ্ঞানী ব্যক্তির মাত্র এই কথাই বলা উচিত যে, "আমি নিশ্চিতরূপে এটা জানি না, তবে আমার মত এই।"

বস্তুত অতিস্বাভাবিক হইলেই অস্বাভাবিক হয় না। অতিস্বাভাবিকও স্বাভাবিক। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা যাহাকে অতিস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে তাহা অতিস্বাভাবিক নাও হইতে পারে। স্বভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা বাড়িলে হয়ত আমরা দেখিব, আজ যাহাকে অতিস্বাভাবিক ভাবিতেছি, তাহাও স্বাভাবিক।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। ঊর্ধ্ব দিকে কোন-কিছু ছুঁড়িয়া দিলে তাহা মাটিতে পড়িবেই; ইহাই আমাদের ধারণা। কিন্তু একজন প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে একটি বুলেট ছুঁড়িলে দেখিবে, সে বুলেট আর মাটিতে ফিরিয়া আসিবে না। তখন নিশ্চয়ই মনে হইবে, একটা অলৌকিক বা অতিস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনই অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করিয়া তদূর্ধ্বে উঠিতে পারিলে কোন বস্তুই যে আর মাটিতে ফিরিয়া আসেনা ইহা এখন বৈজ্ঞানিক সত্য। কোন বস্তুর ফিরিয়া আসা না আসা নির্ভর করে তাহার গতির (Velocity) উপর। সে গতি হইতেছে প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল অর্থাৎ ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল।

অতএব, অলৌকিক বা অতিস্বাভাবিককে অস্বীকার করিবার কোনই সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই সীমাহীন রহস্যলোকের মধ্যে আমরা ডুবিয়া আছি; ইহা কিছুটা আমরা জানি, বাকীটা সবই আমাদের অজানা। কাজেই জানার ঔদ্ধত্য ও অভিযান নিশ্চয়ই আমাদের শোভা পায় না।

তাহা হইলে অতিস্বাভাবিক সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত কী? আমরা ইহাকে মানিব না মানিব না?

দুই উপায়ে আমরা এ-সমস্যার সমাধান করিতে পারি; হয় আমাদের স্বভাব-অতিস্বভাবের সীমা-প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া সব একাকার করিয়া লইতে হয় এবং বলিতে হয় : 'যাহা কিছু ঘটে সবই স্বভাব; না হয় ত স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে অতিস্বভাবের অস্তিত্বকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়, অর্থাৎ আমাদিগকে বিশ্বাস

www.pathagar.com

করিতে হয়, আমাদের জানা-স্বভাবের বাহিরেও একটা বৃহত্তর অজানা-স্বভাব আছে, যেখানে কোন অজ্ঞাত কারণে অনেক কিছু অলৌকিক কাণ্ড সংঘটি হইতেছে।'

অতিস্বাভাবিক সম্বন্ধে যাহা সত্য, অতিমানবিক সম্বন্ধেও ি ক তাহাই সত্য। 'মানুষের' সংজ্ঞা ও গণ্ডিকে যদি ছোট করা হয়, তবেই অতিমা ুষের প্রশ্ন জাগে। আর যদি স্বীকার করা হয় যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ এত শক্তি ও সম্ভাবনা দিয়া রাখিয়াছেন যে, সে শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে মানুষ অনেক 'অসম্ভবকেও' সম্ভব করিতে পারে, তবে আর অতিমানবতা দাঁড়াইতেই পারে না। অতিমানুষ অ-মানুষ নয়, মানুষেরই উন্নততর ও পূর্ণতর প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, এই হিসাবে হযরত মুহম্মদকে আমরা মানুষও বলিতে পারি, অতিমানুষও বলিতে পারি। মানুষের সংজ্ঞা ব্যাপক হইলে তিনি মানুষ, সঙ্কীর্ণ হইলে তিনি অতিমানুষ। আমরা বলিব তিনি ছিলেন মানুষ।

স্বভাব, অস্বভাব ও অতিস্বভাবের বৈজ্ঞানিক রূপ আমরা এতক্ষণ দেখিলাম। এই আলোকে, আসুন পাঠক, আমরা একবার আমাদের মো'জেজার সমস্যাকে বিচার করিয়া দেখি।

উপরে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে মো'জেজাকে অস্বীকার করা আর আমাদের শোভা পায় কি? নিশ্চয়ই না। স্বভাবের ধারণা আমাদের বদলাইয়া গেলে মো'জেজা আর আমাদের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা বুঝিব যে, 'আমাদের স্বভাবের' (Our nature) আইন-কানুনের সহিত মো'জেজার মিল না থাকিলেও 'সমগ্র স্বভাবের' (all nature) আইন-কানুনের সহিত ইহার গরমিল নাই। জনৈক খ্যাতনামা লেখক এ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বলিতেছেন :

They (miracles) exceed the laws of our nature, but it does not therefore follow that they exceed the laws of all nature."

অর্থাৎ : অলৌকিক ঘটনাবলী 'আমাদের স্বভাবের' নিয়ম লংঘন করে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা এ-কথা বলা চলে না যে, তাহারা 'সমগ্র-স্বভাবের' নিয়মকেই লংঘন করে।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মো'জেজা স্বভাব-নিয়মকে লঙঘন করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। উচ্চতর-কর্মচারী আসিলে নিম্নতর কর্মচারীর প্রচারিত বিধান যেমন সাময়িক অচল বলিয়া মনে হয়, মো'জেজা দ্বারাও স্বাভাবের নিয়ম ক্ষণিকের জন্য সেইরূপ স্তব্ধ হয় মাত্র :

"We should see in miracle not the inraction of law but the neutralizing of a lower law, the suspension of it for a time by a higher.

অর্থাৎ : অলৌকিকের মধ্যে স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটে না, উচ্চতর নিয়মের দ্বারা নিম্নতর নিয়মের ক্ষণিকের অচলতা মাত্র।

বস্তুত মো'জেজা উর্ধ্ব স্বাভাবিক (preter-natural) হইতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই উহা বিরুদ্ধ স্বাভাবিক (contranatural) নহে।

স্বভাবের কার্য-কারণ নিয়ম সম্বন্ধে যাহারা অতি বিশ্বাসী, তাহাদিগকেও বলা যায় মো'জেজা এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটায় না। কারণ ছাড়া যদি কোন কার্য ঘটিতে না পারে, তবে মো'জেজার পশ্চাতেও যে একটা কিছু কারণ আছে ইহা নিশ্চিত।

www.pathagar.com

"A miracle, then, is no contradiction in the law of cause and effect; it is merely a new effect upposed to be introduction of a new cause."

অর্থাৎ : মো'জেজা কার্য-কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নহে; নূতন কারণঘটিত ইহা এক নূতন কার্য।

পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, স্বভাবকে আমরা বড় ছোট করিয়া ফেলিয়াছি : স্বভাবের বৃহত্তম অংশ এখনও আমাদের কাছে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। সমতল ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া আমরা যখন দেখি, তখন সব-কিছুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখি, কিন্তু ঊর্ধ্বলোক হইতে ব্যাপক দৃষ্টি দিয়া দেখিলে সমস্ত খণ্ডতা এক মহা-ঐক্যের মধ্যে মিলিয়া যায়। মো'জেজাও ঠিক তাই। যে-স্বভাবের সহিত আমরা পরিচিত সেখান হইতে দেখিলে মনে হয় মো'জেজার সহিত স্বভাবের কোন মিল নাই; কিন্তু এই স্বভাব হইতে আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া দেখিলে আমরা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব-সমস্তই একই নিয়মে চালিত হইতেছে, কোথাও বৈষম্য নাই, বৈসাদৃশ্য নাই। Archbishop Trench বলিতেছেন :

"The true miracle is a higher and a purer nature, coming down out of the world of untroubled harmonies into this world of ours, Which so many discords have jarred and distributed, and bringing this back again, though it be but for one mysterious prophetic moment, into harmony with that higher." (Notes on Miracles, p. 15)

অর্থাৎ : প্রকৃত মো'জেজা ঊর্ধ্বতর এবং পবিত্রতর স্বভাবের নামান্তর; সেই সাম্যলোক হইতেই উহা আমাদের এই নিম্নের বিশৃঙ্খল ধরণীতে ক্ষণিকের জন্য নামে এবং উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ঘটায়।

বস্তুত স্বভাবকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখার ফলেই আজ আমাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। আল্লাহ্‌র রাজ্যে অস্বাভাবিক বলিয়া কোন কিছু নাই; কাজেই যা-ই কিছু হউক না কেন, ঘটিলেই তাহা স্বাভাবিক হইয়া যায়। স্বভাবের পূর্ণ-পরিচয়ও তার নিয়ন্ত্রণ-রহস্য জানিতে পারিলে মো'জেজাও আর অস্বাভাবিক বা অতিস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবে না। আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতে বিশ্বাস করিলে সবই স্বাভাবিক ও সম্ভব হইয়া যায়। জনৈক ইংরেজ পাদ্রীর সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও বলি :

"Once belive that there is a God and miracles are not incredible."

অর্থাৎ : একবার মাত্র বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ আছেন, তবেই আর মো'জেজাতে অবিশ্বাস হইবে না।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৭

বিজ্ঞান আজ কোন্ পথে

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ-যুগের মানুষ বিজ্ঞানমনা : বিজ্ঞানের উপর তাহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। বিজ্ঞান যাহা বলে অম্লানবদনে তাহারা তাহা মানিয়া লয়। শুধু তাহাই নহে নিজেরাও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সমস্ত কাজ করিতে ভালবাসে। তাহাদের চিন্তায় ও কার্যে, যুক্তি ও তর্কে কোনরূপ বিশৃংখলা বা অন্ধানুসরণ না থাকে, তাহাদের বিচার বুদ্ধি গোঁড়ামি বা পূর্বসংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, এক কথায় তাহাদের চিন্তা, কার্য ও ধ্যান-ধারণা বিজ্ঞানসম্মত হয়-ইহাই তাহাদের লক্ষ্য।

শরীয়ৎ বা শাস্ত্রবাণীর সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ ঘটিলে লোকের মন স্বভাবত বিজ্ঞানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বিজ্ঞানকেই তাহারা বড় বলিয়া মানে এবং বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরেই তাহারা শাস্ত্রকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। বলা বাহুল্য, লোকের ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতার ইহাই হইতেছে প্রধান কারণ। লোক এখন আর অন্ধভাবে শাস্ত্রের আদেশ-নিষেধকে মানিয়া লইতে চাহে না; শাস্ত্রবিধানের পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে কিনা, জানিতে চাহে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না দিতে পারিলে কোন ধর্মবিধানই তাহাদের মনঃপূত হয় না।

এইরূপ মননশীলতা যে খুব দোষের তাহা অবশ্য নহে। জ্ঞানবুদ্ধির আলোকে সকল কিছুই যাচাই করিয়া লওয়া বুদ্ধিমানের কাজ, সন্দেহ নাই। মুক্তবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত কিছুর সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিয়া লওয়া খুবই ভাল কথা। নির্বিচারে কোন কিছু নাই বা মানিয়া লইলাম। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার কে চায়?

কিন্তু, এইখানেই যত গণ্ডগোল। এক কূল ত্যাগ করিয়া আমরা আর এক কূলে যাইতেছি, কিন্তু যে-কূলে যাইতেছি, সে-কূল স্থির আছে ত? ইহাই হইতেছে আমাদের একমাত্র প্রশ্ন। শাস্ত্রবাণীকে বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করা বা ব্যাখ্যা করা অন্যায় নহে। কিন্তু কোন শাস্ত্রবাণীর পশ্চাতে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বা সমর্থন না পাইলেই যে সে-শাস্ত্রবাণী মিথ্যা, এরূপ সিদ্ধান্তে ঝাঁপাইয়া পড়া অনুচিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের সন্দেহ জাগা উচিত। যে-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমরা ধর্মকে বর্জন বা অস্বীকার করিতেছি, সেই বিজ্ঞান সত্য ত? সে আমাদিগকে যাহা বলিতেছে, তাহা নির্ভরযোগ্য ত? একথা প্রথমেই আমাদের বিচার করিয়া দেখা উচিত। স্বর্ণের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিতে হইলে আমরা তাহাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করি; কিন্তু সেই কষ্টিপাথর খাঁটি কি-না, তাহা ত আমাদিগকে আগে দেখিতে হয়। শুধু অন্ধভাবে বিজ্ঞানের নামে মাতোয়ারা হইলে ত চলিবে না! বিজ্ঞানী কী বলে এবং যাহা বলে বা এতদিন যাহা বলিয়া আসিয়াছে, তাহার মূল্য কতখানি তাহার বিচার আগে করিতে হইবে; তারপর গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিচার হইবে।

আর গোঁড়ামি ও কুসংস্কার কাহাকে বলি? তুমি যাহাকে কুসংস্কার বলিতেছ, আমার কাছে তাহা কুসংস্কার নাও হইতে পারে, আবার আজ যাহা কুসংস্কার মনে হইতেছে, কাল যে তাহা পরীক্ষিত সত্য হইয়াও দাঁড়াইতে পারে অথবা আজ যাহা অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি, কাল যে তাহা মিথ্যা বলিয়া

www.pathagar.com

প্রতিপন্ন হইবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? কাজেই ধ্রুবকে না জানা পর্যন্ত কোন কিছুকেই আমরা গোঁড়ামি বা অন্ধবিশ্বাস বলিয়া উপহাস করিতে পারি না।

গোঁড়ামির সংজ্ঞা কি? পুরাতনকে নির্বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনকে অস্বীকার করার নাম যদি গোঁড়ামি হয়, তবে নূতনকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া এবং পুরাতনকে নির্বিচারে বর্জন করাও ত একপ্রকার গোঁড়ামি। গোঁড়ামি বলিয়া সকলকে যে গালাগালি দিয়া বেড়ায় সেও আর এক গোঁড়া। প্রকৃত বিজ্ঞানীর মন এই উভয় প্রান্তকেই এড়াইয়া চলে। সে তাহার মনকে রাখে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নির্বিকার। কাজেই 'হ্যাঁ' ও 'না'– এই উভয় প্রান্তে দাঁড়াইয়া কাহাকেও গোড়া বলিয়া গালাগালি দিবার অধিকার কাহারও নাই।

গোঁড়া হইবার গোঁড়ামি এবং গোঁড়া–না হইবার গোঁড়ামি উভয়বিধ গোঁড়ামির মূলেই থাকে একই প্রকার মনোবৃত্তি। যাহাদিগকে গোঁড়া বলি, তাহাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা যাহা জানে তাহা অন্ধভাবে মানে। যাহারা নিজদিগকে মুক্তবুদ্ধি বলিয়া প্রাচীনপন্থীদিগকেই ঘৃণা করে, তাহারাও অবিকল একইভাবে নিজেদের বর্তমান জ্ঞানবুদ্ধিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে। কাজেই প্রাচীনপন্থীরা যদি গোঁড়া বলিয়া চিহ্নিত হয়, তবে আধুনিকেরাও কেন গোঁড়া বলিয়া গণনা হইবে? বিজ্ঞান যখন এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই এবং যখন ইহার নিত্য–নূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে, তখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের চলমান মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা আদৌ প্রগতিশীল মনের পরিচয় নহে। বিজ্ঞান আজ যাহা বলিতেছে বা এতদিন যাহা বলিয়া আসিতেছে তাহাই যে ধ্রুব সত্য, তাহার প্রমাণ কি? প্রকৃত সত্য যদি আমাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়া থাকে, তবে আজিকার বিজ্ঞানকে আঁকড়িয়া থাকার মত গোঁড়ামি ও বেকুফী আর নাই। কাজেই আমরা যাহাতে বোকা বনিয়া না যাই সেজন্য আমাদের বিজ্ঞানের স্বরূপটা গোড়াতেই ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য, ধর্মসম্বন্ধীয় গোঁড়ামি যদি দোষের হয়, তবে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গোঁড়ামিও নিশ্চয়ই দোষের। কাজেই আমাদের সাধের বিজ্ঞানকে একবার পরখ করিয়া লওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এরূপ না করিলে হযরতের জীবনের বহু আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ঘটনাকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

বিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করা সহজ নহে। সে প্রতিনিয়ত আমাদের সহিত ছলনা করিয়া ফিরিতেছে। বহুরূপীর মত সে সর্বদা রূপ পরিবর্তন করে; তাই তাহার সাচ্চা চেহারা এখনও আমরা ধরিতে পারি নাই। বিজ্ঞানের এই চঞ্চলতার কথা আজ বিজ্ঞানীরা নিজ মুখে ব্যক্ত করিতেছেন। Prof. A. N. Whitehead বলিতেছেন :

"The eighteenth century opened with the quite confidence that at last nonsense had been got rid of. To-day we are at the opposite pole of thought. Heaven knows what secting nonsense may not to-morrow be demonstrated truth."

(Science and the Modern world. p. 137)

অর্থাৎ : অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ধারণা জন্মিল যে অবশেষে গাঁজাখুরি ব্যাপারের হাত হইতে আমরা মুক্তি পাইলাম। আজ কিন্তু আমরা ঠিক ইহার বিপরীত কথাই চিন্তা করিতেছি। আল্লাহ্ জানেন,

www.pathagar.com

কোন গাঁজাখুরি ব্যাপার কাল পরীক্ষিত সত্যরূপে আমাদের সম্মুখে দেখা না দিবে।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া পণ্ডিতেরা আজ আর বিজ্ঞানকে লইয়া পূর্বের ন্যায় অত বড়াই করিতেছেন না। বিজ্ঞান প্রকৃত সত্যকে এখনও পায় নাই একথা আজ ধরা পড়িয়াছে। চিন্তাশীল মনীষীরা তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন :

"The Scientific theories to-day differ greatly from those of a century ago; no one doubts that the theories of a century hence are likely to differ greatly from thoes of to-day. how then can we put faith in any of them?" (Belief and Action, Viscount Samuel, P. 25)

অর্থাৎ : আজিকার বৈজ্ঞানিক মতবাদ এক শতাব্দী পূর্বের মতবাদের সহিত বহু পরিমাণে মিলে না; এখন হইতে এক শতাব্দী পরের মতবাদের সহিতও আজিকার মতবাদ সেইরূপ মিলিবে না। কেমন করিয়া তবে ইহাদের একটাকেও আমরা বিশ্বাস করিতে পারি?

বিজ্ঞানের অনেক দাবীই যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বৈজ্ঞানিকেরা নিজ মুখেই তাহা আজ স্বীকার করিতেছেন :

"We have seen that the new selfconsiciousness of Science has resulted in the recognition that its claims were greatly exaggerated." (Limitations of Science, p. 194)

অর্থাৎ : বিজ্ঞান এতদিন যে-দাবী করিয়া আসিয়াছে, তাহার অধিকাংশই যে অতিরঞ্জিত, বিজ্ঞানের নবজাগ্রত আত্মচেতনা এ-সত্য এখন বুঝিতে পারিয়াছে।

বিজ্ঞান আমাদের যে অবিমিশ্র কল্যাণই দান করিয়াছে তাহা নহে, সে আমাদের জীবনকে বিড়ম্বিতও করিয়াছে :

"Science, inspite of all its practical benefits, had seemed to many thoughtful men, perhaps to the majority to have darkened life," (Ibid. P-174)

অর্থাৎ : অধিকাংশ চিন্তাশীল লোকই মনে করেন, বিজ্ঞান দ্বারা যদিও আমাদের নানা উপকার হইয়াছে তবু সে আমাদের জীবনকে দুঃখময় করিয়াছে।

সত্যই তাই। একথা সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের কিছু জানা দরকার। এইবার আমরা তাহাই অতি সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

আদিম যুগের মানুষ যখন প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিল, তখন প্রকৃতিকে সে দেখিল এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিমায়। সূর্য-চন্দ্র, মেঘ-বিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝা-বাদল ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া সে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। যাহারা চিন্তাশীল এবং আলোকপ্রাপ্ত, তাহারা বুঝিল এই সুন্দর সৃষ্টির পিছনে নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টা আছেন— যিনি সর্বশক্তিমান এবং লীলাময়; যখন যাহা খুশি তিনি তাহাই করিতে পারেন। কালে কালে মানুষের এই ধারণা আরো পরিপুষ্ট হইল। মানুষ বুঝিতে পারিল প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহা অন্ধভাবে ঘটিতেছে না, তাহার মূলে আছে একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধ, একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা। কোন্ কারণে কোন ঘটনা ঘটিতেছে—মানুষ তখন তাহাই

—২০

www.pathagar.com

জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। প্রকৃতির রহস্যলোকে মানুষের মন নিত্য আনাগোনা করিতে লাগিল। পণ্ডিতদিগের চেষ্টায় বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইল; বহু বিষয়ের কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন। এই কার্য-কারণ-পরম্পরা একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করিল সপ্তদশ শতাব্দীতে-যখন গ্যালিলিও ও নিউটন জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচলিত সমস্ত সংস্কার ও ধারণাকে তাঁহারা একেবারে উল্টাইয়া দিলেন। এতদিন লোকে মনে করিত সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; কিন্তু এখন তাহারা বলিলেন : না সূর্য স্থির হইয়া আছে, পৃথিবীই সূর্যের চারিপার্শ্বে ঘুরিতেছে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি, আলোক, বিদ্যুৎ, পদার্থ ইত্যাদি বিষয়ে বহু নূতন তথ্য এই সময়ে আবিষ্কৃত হইল। বাদল-ধনু, ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদি নৈসর্গিক দৃশ্য দেখিয়া এতদিন লোকে নানা কথা ভাবিত, কিন্তু এখন তাহারা এই নব বিজ্ঞানীদের মুখে ইহাদের নূতন ব্যাখ্যা শুনিল। পণ্ডিতেরা অঙ্ক করিয়া কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিলেন, কেমন করিয়া কী ঘটিতেছে এবং কখন কী ঘটিবে। সৌরজগতের অধিকাংশ রহস্যের এইরূপ কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহাদের স্পর্ধা ও অভিমান এতদূর বাড়িয়া গেল যে, তাঁহারা বিশ্বজগৎকে একটা যন্ত্র (machine) বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, যে-কোন ব্যাপারকেই তাঁহারা এই যন্ত্রবিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই যান্ত্রিক মনোভাব চরমে উঠিল। বহু ইঞ্জিনিয়ার-বৈজ্ঞানিক এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই ইঞ্জিনিয়ারী দৃষ্টিভঙ্গিতে এই জগৎকে দেখিতে লাগিলেন। Helmholtz নামক জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ঘোষণা করিলেন : "The final aim of all natural science to resolve itself into machanices"—অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই শেষকালে যন্ত্রবিজ্ঞানে আসিয়া পরিণত হয়। Waterson, Maxwell প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরাও এই মত সমর্থন করিলেন। মানুষের আত্মা, মন বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদিকে তাঁহার "evolution of gas" অর্থাৎ এক প্রকার গ্যাসেরই বিবর্তন—এই বলিয়া ব্যাখ্যা দিলেন। এই সৃষ্টির মূলে কোন একজন স্রষ্টা আছেন এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা নাস্তিকতা ও অবিশ্বাসের স্রোত বহিয়া চলিল। এই স্রোতে মানুষের ধর্মবিশ্বাস, ঈমান সমস্তই ভাসিয়া গেল। বিজ্ঞান-বিরোধী কোন কথাই আর কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহিল না।

নিরাশার অন্ধকারে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত হইল।

বিংশ শতাব্দীর নবারুণরাগে এক নূতন রহস্যলোকের দ্বার উদঘাটিত হইল; মানুষ আবার নূতন করিয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিতে শিখিল।

এ-যুগের বিজ্ঞান আনিল নূতন বাণী, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের চিন্তাজগতে সে আনিল এক মহাবিপ্লব। এতদিনকার সাধের সমস্ত বৈজ্ঞানিক মতবাদের বুনিয়াদ নড়চড় হইয়া গেল। জগৎ দেখিল, এতদিন বিজ্ঞান যে কথা বলিয়া আসিয়াছে তাহার প্রায় কোনটিই নির্ভুল নহে।

www.pathagar.com

এই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ নায়ক হইতেছেন মনীষী আইনষ্টাইন (Einstein)।[১]

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি থিওরী প্রচার করিলেন, তার নাম (Theory of Relativity). তিনি বলিলেন: বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান লাভ হইতেছে বা হইয়াছে তাহা ধ্রুব সত্য (Absolute Truth) নহে, তাহা আপেক্ষিক (Relative); অর্থাৎ আমরা যাহা দেখি বা শুনি, তাহা এক অবস্থায় আমাদের কাছে যে-পরিমাণে সত্য, অন্য অবস্থায় ঠিক সেই পরিমাণে সত্য নহে; অবস্থার পরিবর্তন হইলে আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিবর্তন হইয়া যাইবে। কাজেই বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সর্বদেশ, সর্বকাল ও সর্বলোকসম্মত কোন সত্যকে লাভ করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্থান, কাল ও গতির কথা বলা যাইতে পারে। আমরা সীমাবদ্ধ জীব, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অতি ক্ষুদ্র। আমরা এক ইঞ্চি স্থানকে বা এক সেকেণ্ড সময়কে খুবই কম বলিয়া মনে করি, আবার এক কোটি বৎসর সময় আমাদের কাছে খুব বেশী বলিয়া মনে হয়: তার কারণ আমরা বড়জোর একশত বৎসর বাঁচি এবং এক হাজার মাইল স্থানের খবর রাখি। কিন্তু অপর গ্রহেও যে আমাদের মতই ইঞ্চি এবং সেকেণ্ড দ্বারা স্থান কালের পরিমাপ করা হয় অথবা আমাদের মাইল ও ঘন্টার সহিত যে তাহাদের মাইল ও ঘন্টার মিল আছে, তাহার প্রমাণ কি? আমরা যাহাকে একঘন্টা সময় বলিতেছি, মঙ্গল গ্রহে তাহা এক ঘন্টা না-ও হইতে পারে। কাজেই আমরা যদি বলি যে, অত মাইল দূরে বা অমুক সময়ে অমুক ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তবে তাহা একটা ধ্রুব সত্যরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। স্থান, কাল ও গতি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নহে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মনে করুন, চিটাগাং মেইল ঢাকা হইতে 'পূর্ণবেগে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক ব্যক্তি একটি মধ্যবর্তী ষ্টেশনের প্লাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছে। সে দেখিল, ট্রেনখানি ঘন্টায় ৪০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। কিন্তু ট্রেনখানির গতিবেগ সম্বন্ধে কি এই কথাই চূড়ান্ত সত্য? কিছুতেই না। বিভিন্ন অবস্থা হইতে দেখিলে ইহার গতি বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে। ধরুন, অন্য এক ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগবান একখানি লোকাল ট্রেনে চাপিয়া একই দিকে (same direction) পাশাপাশি ছুটিতেছে। সে কী দেখিবে? সে দেখিবে চিটাগাং

---

১. আলবার্ট আইনষ্টাইন (১৮৭৯–১৯৫৫) দক্ষিণ জার্মানীর উলম নগরে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতাপিতা অতি দরিদ্র ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের সাহায্যে তিনি লেখাপড়া করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আইনষ্টাইন নব নব বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করিতে থাকেন। কিন্তু ইহুদী বংশে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার ভাগ্য বিড়ম্বিত হয়। উৎকট সেমিটিক বিদ্বেষের দরুন জার্মান জাতি আইনষ্টাইনকে সুনজরে দেখিতে পারিল না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহারা জাতিভেদ আনিল। আর্য বিজ্ঞান (Aryan Science) এবং ইহুদী বা সেমিটিক বিজ্ঞান (Jewish of Semimic Science) –এই দুই ভাগে তাহারা বিজ্ঞানকে বিভক্ত করিয়া ফেলিল। ইহুদী বিজ্ঞানকে তাহারা মনে করিত "Subversive and nonsenscial." প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাই জার্মানরা কোন ইহুদী বৈজ্ঞানিককে বিশ্বাস করে নাই বা কাজে লাগায় নাই–অনেকে তাই প্রাণ ভয়ে জার্মানী ছাড়িয়া অন্য দেশে পালাইয়া যান।

আইষ্টাইনের প্রতি নানারূপ নির্যাতনের ফলে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনিও কোনরূপে আমেরিকায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই হইতে তিনি আর দেশে ফিরেন নাই। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি জার্মান গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই মনীষী আমেরিকায় প্রাণত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

মেইল ঘন্টায় মাত্র ১৫ মাইল (৪০−২৫=১৫) বেগে চলিতেছে। আবার মনে করুন, তৃতীয় এক ব্যক্তি চট্টগ্রাম হইতে বিপরীত দিকে (opposite direction) ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগবান একখানি লোকাল ট্রেনে (ঢাকার দিকে) আসিবার কালে মধ্যপথে সে চিটাগাং মেইলকে পাশ কাটিয়া যাইতে দেখিল। সে দেখিবে চিটাগাং মেইল ঘন্টায় ৬৫ মাইল (৪০ + ২৫ = ৬৫) বেগে ছুটিতেছে। তিন অবস্থায় তিনজন তিন রকম দেখিল। কাহার দেখা সত্য? চিটাগাং মেইলের গতি প্রকৃতপক্ষে কত? ৪০ মাইল? ১৫ মাইল? ৬৫ মাইল? অথবা অন্য কিছু?

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

মনে করুন, উপরোক্ত চিটাগাং মেইলে এক ভদ্রলোক নিজের কামরা হইতে খাবার কামরায় (dinign car) যাইতেছেন। তিনি চলিয়াছেন ঘন্টায় দুই মাইল বেগে। পথের ধারের এক বাড়ির জানালা হইতে এক ব্যক্তি ট্রেনের দিকে চাহিয়া আছে। সে দেখিল ভদ্রলোকটি গাড়ীর সমান গতিতেই (অর্থাৎ ঘন্টায় ৪০ মাইল বেগে) অগ্রসর হইতেছেন। পক্ষান্তরে চন্দ্র বা মঙ্গল গ্রহ হইতে কেহ যদি দেখে, তবে দেখিবে লোকটি পৃথিবীর গতির সঙ্গে সামনে ছুটিয়া চলিতেছে-অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় ১০০০ মাইল বেগে যাইতেছে।

কার দেখা সত্য?

একদিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কেহই মিথ্যা দেখে নাই। নিজের নিজের দিক দিয়া প্রত্যেকের দেখাই সত্য হইয়াছে। কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, কোনটাই সত্য নহে। কোন-কিছুর গতি নির্ণয় করিতে হইলে তাহার বাহিরে একটা নির্দিষ্ট স্থান বা স্থির বিন্দু চাই-ই চাই। অন্যথায় কোন-কিছুর গতি নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। গতি নির্ণয় করিতে হইলেই কোন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে করিতে হয়। কোন ট্রেন ৪০ মাইল বেগে ছুটিয়া যাইতেছে বলিলে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কোন স্থির বিন্দু (fixed point) হইতে ঘন্টায় সে ৪০ মাইল দূরে সরিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেরূপ একটা নির্দিষ্ট বিন্দু এই বিশ্বজগতে আমরা পাই কোথায়? বিশ্ব প্রকৃতিতে সেরূপ কোন স্থির বিন্দু নাই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রতিনিয়িত বোঁ-বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে, কেহই স্থিরভাবে বসিয়া নাই। যে দাঁড়াইয়া আছে, সে মনে করিতেছে সে স্থির হইয়াই আছে, কিন্তু তাহা নহে। পৃথিবী অনবরত তাহার মধ্যশলাকার (axis) চারদিকে ঘুরিতেছে, কাজেই দাঁড়াইয়া থাকি, আর দৌড়াইয়া চলি, প্রত্যেকেই আমরা পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছি। অতএব, ট্রেনখানি সম্বন্ধে কাহারও দেখাই নির্ভুল হইতেছে না। পৃথিবীর অ্যাক্সিস্ হইতে দেখিলে নিশ্চয়ই ট্রেনখানির গতি অন্যরূপ প্রতিভাত হইবে। আবার সূর্যলোক হইতে যদি কেহ দৃষ্টিপাত করে, তবে ট্রেনের কোন গতি হয়ত তাহার দৃষ্টিগোচরই হইবে না; সে দেখিবে কেবলমাত্র পৃথিবীর গতি। এইরূপ ব্যক্তি অসংখ্য অবস্থা হইতে অসংখ্য রূপে ট্রেনখানিকে দেখিতে পারে। দৃষ্টিবিন্দুর (point of observation) তারতম্যে গতিরও তারতম্য ঘটিয়া যায়। এই জন্যই কোন-কিছুর সঠিক গতি নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। Sir James Jeans বলিতেছেন :

"Nature is such that it is impossible to measure an absolute velocity dy any means whatsoever."

(The new Background of Science by Jeans. p. 97)

www.pathagar.com

J. W. N. Sullivan বলিতেছেন :

"Let us suppose, for instance, that we are travelling by a train moving at sixty miles, per hour. What does that statement mean? Evidently it means that we are passing fixed objects outside, such as railway buffets, trees, telegraph posts at the rate of sixty miles an hour. But these so-called fixed objects are all partaking in the motion of rotation of the earth on its axis. So that with respect to the earth's axis, Our train is moving quite a different way. But even the earth's axis is not fixed in space. The whole earth is moving round the sun. And the sun and the whole solar system is moving quit rapidly through space towards the star Vega. And vega and the sun and the whole system of stars of which they form part are in motion with respect to other system of stars which are themselves moving with respect to one another. There is no absolutely fixed point from which we can measure or motion. Motion is relative."

অর্থাৎ : "মনে করুন আমরা ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগবান একখানি ট্রেনে যাইতেছি। এ কথার অর্থ কি? অর্থ এই যে, আমরা ঘন্টায় ৬০ মাইল বেগে বাহিরের কতিপয় স্থির বস্তুকে (যেমন বৃক্ষ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ইত্যাদি) অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই তথাকথিত 'স্থির' বস্তুগুলি সকলেই পৃথিবীর কক্ষপরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতেছে। কাজেই পৃথিবীর অ্যাক্সিস্ হইতে দেখিলে বলিতে হয়, আমাদের ট্রেনখানি অন্যভাবে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু পৃথিবীর এই অ্যাক্সিস্ও একস্থানে স্থির হইয়া নাই। পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এবং সমগ্র সৌরজগতও মহাশূন্যের মধ্য দিয়া 'ভেগা' (vega) নামক নক্ষত্রের দিকে দ্রুত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার এই 'ভেগা' সূর্য, এবং তাহাদের পরিবারভুক্ত নক্ষত্রমণ্ডলী অন্য আর একদল গতিশীল নক্ষত্রের চর্তুদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। কাজেই এই বিশ্বজগতে এমন কোন নির্দিষ্ট বিন্দু নাই— যেখান হইতে আমরা কোন বস্তুর গতি নির্ণয় করিতে পারি। গতি তাই আপেক্ষিক।"

ইহার উপরেও আর একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। এই গ্রহে যাহা সত্য, অপর গ্রহেও যে তাহা ঠিক, সেইরূপই সত্য, তাহা কে বলিবে? আমাদের এই পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে আমরা যেরূপ দেখিতেছি, সূর্য বা মঙ্গলগ্রহ হইতে দেখিলেও যে সেইরূপই দেখিব, তার কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের এখানকার স্থান এবং কালের ধারণার সহিত সেখানকার স্থান কালের ধারণা নাও মিলিতে পারে। কাজেই স্থান ও কাল সম্বন্ধে অন্য নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় সত্য জানিবার উপায় আমাদের নাই।

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে এই নূতন মতবাদ একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে। মনীষী আইনষ্টাইনের "Theory of Relativity" প্রকাশিত হইবার পর, প্রচলিত বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রায় সমস্তগুলিই একরূপ অচল হইয়া পড়িয়াছে। পদার্থ

www.pathagar.com

(Matter), স্থান (Space)[২], কাল (Time), আলোক (Light), বিদ্যুৎ (Electricity), মহাকর্ষ নীতি (Law of Gravitation), কার্যকারণ নীতি (Law of Causation) ইত্যাদি বিষয়ক সমস্ত মৌলিক ধারণাই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আইনষ্টাইন ও তাঁহার মতানুসারী পণ্ডিতেরা পূর্বতন মতগুলির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। বিজ্ঞান জগতে একটা প্রকাণ্ড ওলট-পালটের সূচনা হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে এই বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ও তাহার পয়গম্বর সম্বন্ধে পাঠকের অনেক ধারণা পরিবর্তিত হইয়া যাইবে।

পদার্থ (Matter)

প্রথমেই পদার্থের কথা বলা যাক।

জড়প্রকৃতির প্রধান উপাদান পদার্থ লইয়া পণ্ডিতদিগের গবেষণার অন্ত নাই। প্রাচীনকাল হইতেই প্রকৃতির এই দিকটায় তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম-এই পঞ্চভূতে আমাদের পৃথিবী রচিত। কালে কালে গবেষণা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিলেন, মোট ৭২ প্রকার উপাদান দ্বারা এই জগৎ গঠিত। ইহার পরে আরও গবেষণা চলিল : ফলে পদার্থের মোট সংখ্যা ৯২তে আসিয়া দাঁড়াইল। তারপর আসিল অণুবাদ বা Molecular Theory— এই থিওরীতে বলা হইল যে, প্রত্যেক পদার্থকে ক্রমাগত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করিয়া চলিলে অবশেষে যে চরম অবিভাজ্য অংশটি পাওয়া যায়, তাহার নাম অণু বা Molecule. Molecule-কে আর অধিক ভাগ করা চলে না, ইহাই পদার্থের শেষ ক্ষুদ্রতম অংশ; কিন্তু কিছুদিন পরে এই মতবাদও পরিত্যক্ত হইল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Dalton বলিলেন, Molecule-কে আরও সূক্ষ্মাংশে বিভাগ করা যায়; সেই সূক্ষ্মতম অংশের নাম Atom-বা পরমাণু। দুই বা ততোধিক Atom দ্বারা এক-একটি Molecule গঠিত হয়। কাজেই Atom-ই হইতেছে পদার্থের সর্বশেষ অবস্থা। ইহাই হইল Atomic Theory বা পরমাণুবাদ।

কিন্তু বিংশ-শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে Atomic Theory-ও উড়িয়া গেল। পণ্ডিতেরা দেখিলেন, Atom-ই পদার্থের শেষ অবস্থা নহে। Thomson, Rutherford প্রভৃতি খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করিলেন : সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ (electricity); সে বিদ্যুৎ আবার দুই প্রকারের : Electron ও Proton. Electron হইতেছে ঋণাত্মক (Negative) বিদ্যুৎ আর Proton হইতেছে ধনাত্মক (Positive) বিদ্যুৎ। ইলেকট্রন ও প্রোটনই হইতেছে সকল পদার্থের মূল। অনেকগুলি Electron ও Proton-লইয়া একটি Atom গঠিত। সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র যেমন প্রতিনিয়ত চক্রাকারে ঘুরিতেছে, এক একটি Atom-কে ঘিরিয়া Electron ও Proton-গুলিও তেমনই নৃত্য করিতেছে। এই Electron ও Proton হইতে অবিরত

২. স্থান (Space) সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকা উচিত। স্থান অর্থে শুধু পৃথিবীর উপরিভাগ নয়। আমাদের মাথার উপর ও চতুর্দিকে মহাশূন্য রহিয়াছে, যাহার মধ্যে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরাফিরা করিতেছে—সমস্তকেই স্থান বলে। Space অর্থে তাই মহাশূন্য বা অসীম।

www.pathagar.com

একটা তাপ বিকীর্ণ হইতেছে; সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সেই তড়িৎ-তরঙ্গ নাচিয়া চলিতেছে।

ইহাই হইতেছে পদার্থ সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ।

কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, পাঠক একবার লক্ষ্য করুন। পুরাতন বিজ্ঞান বলিতেছিল, এই জড়প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র উপাদান (Element) রহিয়াছে; তাহাদের মোট সংখ্যা কত, তাহাও বিজ্ঞানীরা গণনা করিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু নূতন বিজ্ঞান বলিতেছে, পদার্থের মূলে গেলে কোন স্বাতন্ত্র্যই দেখিতে পাওয়া যায় না; সেখানে শুধুই নূরের লীলা খেলা—সেখানে শুধুই জ্যোতির তরঙ্গ-দোলা।

স্থান ও কাল (Space and Time)

স্থান ও কাল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা একেবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী সমস্ত পণ্ডিতেরাই অনুমান করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা যে-পৃথিবীতে বাস করি, তাহার স্থান সমতল-গুণবিশিষ্ট এবং তাহার মাত্র তিনটি অবস্থান বা বিস্তার (dimension) আছে : দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা। এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আইনষ্টাইন ও তাঁহার সতীর্থেরা বলিলেন, স্থানের ধারণা আমাদের সম্পূর্ণ ভুল। ইউক্লিডের জ্যামিতি শুধু সমতল ক্ষেত্রের পক্ষেই খাটে, কিন্তু আমরা যে-জগতে বাস করি, সে-জগৎ ওরূপ সমতল বিশিষ্ট নয়।

"We live in a universe whose geometry is non-Euclidean."

অর্থাৎ : যে-জগতে আমরা বাস করি, তার জ্যামিতি ইউক্লিডের নহে। আমাদের জগৎ গোলক-ধর্মী (Spherical) অর্থাৎ বাঁকানো। কাজেই ইউক্লিডের জ্যামিতির নিয়মে বুঝিতে গেলে ঐ জগতের কিছুই আমরা বুঝিতে পারিব না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে : ইউক্লিড আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, যে-কোন ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান। কিন্তু এ-কথা শুধু সমতল ক্ষেত্রে অঙ্কিত ত্রিভুজের বেলায়ই খাটে, একটি ডিম্বের উপরে বা একটি গোলকের উপরে অঙ্কিত ত্রিভুজের বেলায় খাটে না। গোলকের উপরে ত্রিভুজ আঁকিলে সে ত্রিভুজের তিন কোণ কিছুতেই একত্রে দুই সমকোণের সমান হইবে না।

সরল রেখা (Straight line) সম্বন্ধেও ইউক্লিড আমাদের মনে যে ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন তাহাও ভুল। শুধু সমতল ক্ষেত্রের বেলাতেই ইউক্লিডের সংজ্ঞা খাটে, কিন্তু বিশ্বজগৎ(Universe)-এর বেলায় এ সংজ্ঞা খাটে না। উচ্চ গণিতে (higher mathematics) সরল রেখার সংজ্ঞা হইতেছে অন্যরূপ। সেখানে বৃত্তের (circle) পরিধিও বক্র না হইয়া সরল হইয়া যায়। আমরা কোন কেন্দ্র (centre) লইয়া যখন ছোট একটি বৃত্ত আঁকি তখন সে বৃত্তের পরিধি সুস্পষ্টভাবেই বক্র হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু বৃত্তটির ব্যাস (radious) যদি ক্রমাগত আমরা বাড়াইতে থাকি, অর্থাৎ বৃত্তটি যদি ক্রমাগত বড় হইতে থাকে, তবে দেখা যাইবে পরিধির বক্রতা ক্রমেই শিথিল হইয়া সরল রেখার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে পরিধিটি যদি অনন্তে (Eternity) প্রসারিত করিয়া দেওয়া যায়, তবে তখন তাহা সরল-রেখা হইয়াই দেখা দিবে।

www.pathagar.com

আবার ইউক্লিড বলেন : এক সরল রেখা দ্বারা কোন স্থানকে সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাহাও ভুল। পৃথিবী বা কোন গোলকের উপরে ক্রমাগত একটি সরল রেখা টানিয়া গেলে এক সরল রেখা দ্বারাও একটা নির্দিষ্ট স্থানকে সীমাবদ্ধ করা যায়।

আইনষ্টাইন এ কথাও বলিতেছেন যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির জ্ঞান আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে বলিয়াই বিশ্ব জগতের অনেক ঘটনাই আমরা বুঝিতে পারি না। নিউটনের মাধ্যকর্ষণ নিয়ম (Law of Gravitation) এর কোনই প্রয়োজন হয় না, যদি আমরা জানি যে আমরা ইউক্লিডের পৃথিবীতে বাস করি না। বক্রাকার জগতের স্বাভাবিক ধর্ম হিসাবেই মাধ্যাকর্ষণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যায়। J. W. N. Sullivan তাঁহার বিখ্যাত "Limitations of Science" নামক পুস্তকে বলিতেছেন :

"A great deal of Nature's behaviour can be explained if, we suppose that events are taking place in a non-Euclidean universe. Many of the happenings that have led us to invent laws of nature to account for them are merely natural consequences of the fact that we live in a universe whose geometry is non-Euclidean." (p. 75)

অর্থাৎ : স্বভাবের বহু আচরণকেই আমরা অনায়াসে ব্যাখ্যা করিতে পারি—যদি আমরা মনে করি যে, যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য আমাদিগকে স্বভাবের নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশই অতি স্বাভাবিকভাবেই এজন্য ঘটিতেছে যে, আমরা যে জগতে বাস করি তাহার জ্যামিতি ইউক্লিডের নহে।

আইনষ্টাইন তাই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন :

"The phenomenon of gravity is merely the effect of the curvature of the four-dimensional space-time World."

(One. Two. Three ... ...Eternity)

অর্থাৎ : আকর্ষণ ব্যাপারটা চারি-ডাইমেনশন বিশিষ্ট বক্রাকার জগতের স্বাভাবিক ধর্ম ছাড়া কিছু নহে।

জগৎ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণা তাহা হইলে একেবারে চুরমার হইয়া যাইতেছে না কি?

সময় সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। সময়ের ধারণাও আমাদের একেবারে ভুল। একটা মনগড়া হিসাব ও নিক্তি দ্বারা আমরা সময়কে পরিমাপ করিতেছি। একে ত সময় যে কী, তাহাই আমরা জানি না, তাহার উপর ঠিক-সময় কেমন করিয়া তবে আমরা নির্ণয় করিতে পারি? কোন্‌টি বর্তমান, কোন্‌টি অতীত, কোন্‌টি ভবিষ্যৎ, তাহাই বা কি করিয়া বুঝি? কোন ঘটনা ঘটা এবং তাহা দেখা বা শোনার মধ্যে যে-সময়ের দূরত্ব বা ব্যবধান থাকে তাহা সর্বত্র সমান নহে। দেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হইতেছে, যে বস্তুকে আমরা দেখি, তাহার আলোক বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে আসিয়া পড়ে এবং চক্ষু-ফলকের মধ্য দিয়া তাহা মস্তিষ্কে গিয়া একটা অনুভূতির সৃষ্টি করে এবং তখনই আমরা বুঝি যে সেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতেছি। কাজেই, কোন বস্তুর আলোক আমাদের চক্ষে না আসিয়া পৌঁছা পর্যন্ত আমরা বলিতে পারি না যে, সেই বস্তুটিকে আমরা দেখিতেছি। এই আলোক আমাদের চক্ষে আসিয়া পৌঁছিতে নিশ্চয়ই

www.pathagar.com

কিছু সময় লাগে। কারণ, পাঠক জানেন, আলোকের গতি আছে। প্রতি সেকেণ্ডে আলোক ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যাইতে পারে। কাজেই যে-মুহূর্তে কোন ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া আমরা মনে করি, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে সে-ঘটনাটি ঘটে তাহা নহে, তাহা পূর্বেই ঘটে। কত পূর্বে; তাহা নির্ভর করে ঘটনাটি হইতে আমাদের দূরত্বের উপরে। ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল দূরে ঘটিলে সে ঘটনাকে আমরা এক সেকেণ্ড পরে দেখিতে পাইব। এই হিসাবে ১,১১,৬০,০০০ মাইল দূরে ঘটিলে ১ মিনিট পরে দেখিব; ইহার দশগুণ দূরে ঘটিলে ১০ মিনিট পরে দেখিব-লক্ষগুণ দূরে ঘটিলে লক্ষ মিনিট পরে দেখিব। আমরা আকাশে যে-সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের কোন- কোনটি কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত; কাজেই তাহাদের আলোক এই পৃথিবীতে পৌঁছিতে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া যায়। এত দূরে তাহারা অবস্থিত যে, তাহাদের দূরত্ব বুঝিতে হইলে আমাদের পঞ্জিকার বৎসরে কুলায় না- আলোক-বৎসর (Light-year) দ্বারা বুঝিতে হয়।[৩] এমনও হইতে পারে, যে-নক্ষত্রটি আজ আমরা যেখানে দেখিতেছি অর্থাৎ যাহার আলো আজ আমাদের চক্ষে আসিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সে-নক্ষত্রটি হাজার হাজার বৎসর পূর্বে সেখানে দেখা দিয়াছিল কিন্তু আজ আর সেখানে সে নাই, এতদিনে সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে অথবা মরিয়া-পচিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব, এই পৃথিবীতে বসিয়া যাহাকে আমরা মনে করিতেছি যে, 'আজ' বা 'এখন' দেখিলাম, প্রকৃতপক্ষে তাহা 'এখনকার' ব্যাপার নয়—সুদূর অতীতের ব্যাপার। আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। মনে করুন : ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। যেদিন যুদ্ধ হয়, সেদিন যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল তাহাদের চক্ষে সে যুদ্ধের আলোক-চিত্র সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিভাত হওয়ায় তাহারা বুঝিয়াছিল যে, যুদ্ধটি সেই দিনই সেই সময়ে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পৃথিবী হইতে কোটি কোটি মাইল দূরবর্তী বহু গ্রহে বা নক্ষত্রে সে আলোক-চিত্র হয়ত এখনও পৌঁছায় নাই। কাজেই যে গ্রহে উহা আজ পৌঁছাইবে, সেখানকার অধিবাসীরা দেখিবে যে, পলাশীর যুদ্ধ আজ ঘটিতেছে—ঠিক তেমনি করিয়া ক্লাইভ আসিয়াছে, তেমনি করিয়া মোহনলাল বীরের মত যুদ্ধ করিতেছে ইত্যাদি। আবার যে-গ্রহে উহা এখনও পৌঁছায় নাই সে-গ্রহের অধিবাসীরা পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন খবর রাখে না। দশ বৎসর, বিশ বৎসর, একশত বৎসর পরে হয়ত তাহারা দেখিবে যে পলাশীর যুদ্ধ চলিতেছে। এ অবস্থায় আমরা কী বলিব? পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে? না ঘটিতেছে? না ঘটে নাই? বর্তমানই বা কাহাকে বলিব? অতীতই বা কাহাকে বলিব? আর ভবিষ্যৎই বা কাহাকে বলিব? যে ঘটনা আজ আমার নিকট 'অতীত', সেই ঘটনাই অপরের নিকট 'বর্তমান', আবার অন্য আর একজনের নিকট 'ভবিষ্যৎ'। অতএব আমরা দেখিতেছি সময় সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ঠিক নহে; উহা

---

৩. এক আলোক বৎসরের পথ প্রায় ৬০,০০০,০০,০০০,০০০ মাইল। অর্থাৎ এক বৎসরে আলোক ষাট হাজার কোটি মাইল যাইতে পারে। এক আলোক বৎসরের পথ বলিলেই তাই বুঝিতে হইবে ষাট হাজার কোটি মাইলের পথ।

www.pathagar.com

একটা আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। দৃষ্টবিন্দুর (Point of observation) তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়।

কোন কিছু দেখার ন্যায় শোনাও আমাদিগকে তুল্যরূপে বিভ্রান্ত করে। আলোকের ন্যায় শব্দেরও গতি আছে; কাজেই শব্দ দ্বারা স্থান বা কালকে নির্ণয় করিতে গেলেও অবিকল একইরূপ ভুল হইবে।

এইজন্যই আইনষ্টাইন প্রমুখ পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে, আমাদের স্থান, কাল বা গতির ধারণা আপেক্ষিক। তাঁহাদের মতে, আমাদের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম' (Standard time) বলিয়া কোন টাইম নাই; সকল টাইম 'লোকাল' (Local)। প্রকৃতির সঠিক সময় (True Time of Nature) যে কী, তাহা এখনও আমরা জানি না।

Sir James Jeans বলিতেছেন :

"True time implies the exisetnce of a body at rest in space. Not only have we no means of discovery as to when a body is at rest in space, but there is every reason to suppose that the phrase is meaningless. On these grounds, Einstein, maintained that all time is 'local' : there are as many local times as there are rockets or Planets or stars, moving through space and none of them is more fundamental than any other."

(The New Background of Science, p. 97)

অর্থাৎ : সঠিক সময় নির্ধারণ করিতে হইলে কোন স্থানে কোন একটি স্থির বস্তু চাই, কিন্তু প্রকৃতিতে সেরূপ কোন বস্তু নাই। এইজন্যই আইনষ্টাইন মনে করেন যে, সমস্ত টাইমই 'লোকাল', বিশ্ব-ভুবনে যত গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তত লোকাল টাইম আছে; তাহাদের কোনটাই কোনটা হইতে অধিক মৌলিক নহে।

স্থান ও কালের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বও নাই Minkowsk বলেন :

"Henceforth space itself and time by itself are doomed to fade away into mere shadow and only a kind of union of the two will preserve and independent reality."

(Limitations of Science. p. 72)

অর্থাৎ : এখন হইতে স্বতন্ত্রভাবে স্থান এবং কালের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, কেবল উভয়ের একটি মিলিত রূপই সত্য বলিয়া টিকিয়া থাকিবে।

J. W. N. Sullivan বলেন :

"Nature, it appears, knows nothing of the distinction we make between spce and time. The distinction we make is ultimately a psychological peculiarity of hours. There is nothing absolute about space or time." (Limitations of Science, p. 72)

অর্থাৎ : আমরা স্থান ও কালের মধ্যে যে পার্থক্য করি, প্রকৃতি সে সম্বন্ধে কিছুই জানে না বলিয়া মনে হয়। এই পার্থক্য আমাদের মনেরই এক অদ্ভুত খেয়াল বিশেষ। স্থান বা কাল সম্বন্ধে ধ্রুব কিছুই নাই। অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

www.pathagar.com

"Two events which are simultaneous for on observer are not sumultaneous for an observer who is moving with a dyfferent motion. There is no such thing as the time or the distance between two events, different observers reach different results."

(Ibid. pp. 70-71)

অর্থাৎ : দুইটি ঘটনা একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন-গতিসম্পন্ন আর একজন দর্শকের কাছে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে না। দুইটি ঘটনার মধ্যে সনাতন কোন কাল বা দূরত্ব নাই। বিভিন্ন দর্শক বিভিন্নভাবে তাহাদিগকে দেখিবে।

স্থান (space) সম্বন্ধে আইনষ্টাইন আরও একটি নূতন কথা বলিয়াছেন। আমাদের এই জগৎ(universe) সীমাহীন (infinite) নহে, সসীম (finite); কিন্তু তাই বলিয়া ইহার চতুঃসীমার দিশা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। সসীম হইয়াও ইহা ক্রমাগত বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে; নীহারিকাপুঞ্জ প্রতিনিয়ত অতি দ্রুতবেগে পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছে, কাজেই অমাদের জগৎ আয়তনে দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। একটি ডিম্বাকৃতি রবারের বেলুনের সহিত আমাদের এই ক্রমবর্ধমান জগতের (Expanding Universe) তুলনা হইতে পারে। মনে করুন, এই বেলুনটির মধ্যে পৃথিবী সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এখন এই বেলুনটিকে ক্রমাগত পাম্প করিয়া বাড়াইয়া দিলে যেরূপ দশা ঘটে, আমাদের জগতের ঠিক সেইরূপ দশাই ঘটিতেছে। এই ধরনের জগতে বাস করিয়া ইউক্লিডের জ্যামিতি দ্বারা আমাদের কোন কাজই চলে না। এই জন্যই প্রখ্যাত জার্মান গণিতবিদ রাইমান (Riemann) এক নূতন ধরনের জ্যামিতি আবিষ্কার করেন। বক্র জগতের স্থান নির্ণয়ের জন্য এই জ্যামিতিই কার্যকরী বলিয়া আইনষ্টাইন ইহাকে মানিয়া লইয়াছেন।

স্থানকাল (Spacetime)

স্থান ও কালের সঠিক স্বরূপ দেখাইয়া আইনষ্টাইন থামেন নাই। তিনি বলিতেছেন স্থান ও কালকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাও ভুল। প্রকৃতপক্ষে 'স্থান' ও 'কাল' বলিয়া কোন দুইটি আলাদা জিনিস নাই; যদি থাকে তবে তাহা ঢালাই-করা একটা অবিভাজ্য জিনিস—যাহাকে আমরা একসঙ্গে স্থানকাল (Spacetime) বলিতে পারি। কাজেই, স্থান সম্বন্ধীয় যে-কোন ঘটনাকে বুঝিতে হইলে এই সময়-সমস্যাকে (time factor) এড়াইয়া চলিবার উপায় আমাদের নাই। স্থানের ভিতরে যখন সময় মিশিয়া আছে, অর্থাৎ স্থান যখন সময় ছাড়া দাঁড়াইতেই পারিতেছে না, তখন স্থানের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিবে, সময়ের সঙ্গে সে সমস্তরই সম্বন্ধ থাকিবে। এই জন্যই আইনষ্টাইন বলিতেছেন যে, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য (length), প্রস্থ (breadth) এবং উচ্চতা (height) ছাড়া আরও একটি বিস্তার বা স্থিতি আছে, সেইটি হইতেছে সময়; এই সময় হইতেছে, তাঁহার মতে প্রত্যেক বস্তুর চতুর্থ বা fourth dimension. এইরূপ সময়বিশিষ্ট স্থানকে তিনি four dimensional continuam' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একখানি তানা পড়েন দেওয়া তাঁতের কাপড় যেমন আমাদের স্থান-কালও সেইরূপ একটা ঢালাই চাদর—যাহার উপর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনার চিত্র-মূর্তি আঁকা রহিয়াছে। আমরা একটির পর আর একটি দেখিয়া যাইতেছি, তাই

www.pathagar.com

আমাদের কাছে সময় ও দূরত্বের ধারণা জন্মিতেছে; কিন্তু প্রকৃতির কাছে এই সময় বা দূরত্বের কোন প্রশ্নই জাগে না। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান-সমস্তই সে একসঙ্গে দেখিতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির এই চাদরে সব কিছুই আঁকা রহিয়াছে; সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবার সমস্তই ঢালাই হইয়া আছে; বর্তমান বৎসর যেরূপ আছে, ২৯০০ সালও ঠিক তেমনি আছে। অষ্ট্রেলিয়া দেশটি আমরা অনেকেই দেখি নাই, তবু যেমন পৃথিবীর বুকে তাহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, ভবিষ্যতের ঘটনাও পূর্ব হইতেই সেইরূপ ঘটিয়া রহিয়াছে-আমরা কোনদিন তাহা দেখি না দেখি, তাহাতে কিছু যায় আসে না। কাজেই প্রকৃতির নিকট ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের কোন তারতম্য নাই-তাহার কাছে সমস্তই চির-বর্তমান।

প্রত্যেক বস্তুর স্থিতি বা অস্তিত্বের সঙ্গে তাই শুধু স্থানেরই সম্বন্ধ নাই, কালও তাহার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। যে-কোন লোকের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি বলি যে, তিনি অমুক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। 'কোথায় ছিলেন' প্রশ্নের সঙ্গে 'কখন ছিলেন' এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়। যে-কোন একটা ঘর, বাড়ি বা স্কুল সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গেলেও একই কথা বলিতে হয়। মহাকালের বুকে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্যন্ত অবস্থিত ছিল, তাহাও তাহার ভৌগোলিক পরিচয়ের সহিত বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন; অন্যথায় কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ বা সুনির্দিষ্ট হয় না। এই জন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সঙ্গে সময়-রেখারও হিসাব লইতে হয়। সাড়া-ব্রীজের পরিচয় দিতে গিয়া শুধু যদি ইহার দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করি, প্রস্থ বা উচ্চতার কথা না বলি, কিংবা শুধু যদি ইহার উচ্চতার কথা বলি, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের কথা না বলি তাহা হইলে যেমন সাড়া-ব্রীজ সম্বন্ধে আমাদের কোন পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না; দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার কথা বলিয়া সময়-রেখার উল্লেখ না করিলেও তেমনিই পরিচয়ে ত্রুটি থাকিয়া যায়। স্থান এবং কালের ধারণা তাই একসঙ্গে বাঁধা। এতদিন মানুষ শুধু দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার কথাই ভাবিয়াছে, সময়-রেখার কথা ভাবে নাই। আইনষ্টাইন সেই সত্য আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞান-জগতে বিপ্লব অনিয়াছে। তিনি বলেন, কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যেমন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার প্রয়োজন, সেই সঙ্গে তাহার কাল-নির্ণয়ের প্রয়োজন। সময়কে এই জন্যই প্রত্যেক বস্তুর চতুর্থ বিস্তৃতি (four dimension) বলা হয়।

আলোক ও বিদ্যুৎ (Light and Electricity)

আলোক সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। পূর্বে লোকে মনে করিত যে, চোখের জ্যোতিঃ দিয়াই আমরা জগতের সমস্ত কিছু দেখি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিলেন, চোখের কোনই জ্যোতিঃ নাই; প্রত্যেক পদার্থ বা বস্তুর নিজস্ব জ্যোতিই বিকীর্ণ হইয়া আমাদের চক্ষে পড়ে, তাই আমরা সমস্ত কিছু দেখি। এই মতবাদের ফলেই আলোক-রশ্মির গতি নির্ণয়ের সমস্যা আসিল এবং তাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে লাগিল। ইহারই ফলে নিউটনের 'Corpuscular Theory of Light' প্রকাশিত হইল। তিনি বলিলেন : আলোক-রশ্মি সর্বত্র সরল রেখায় পরিভ্রমণ করে এবং উহা সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু (Corpuscles) দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই মতবাদ সম্পূর্ণ নির্ভুল নহে। বৈজ্ঞানিকেরা

www.pathagar.com

দেখিলেন অলোক-রশ্মি সোজাভাবে চলে বটে, কিন্তু বাধা পাইলে সে বাধাকে ডিঙাইয়া যাইতে পারে। শব্দ (Sound) যেমন বাধা পাইলেও বাধাকে ডিঙাইয়া আমাদের কানে আসিয়া পৌছে, আলোক-রশ্মি বাধা পাইলেও তেমন সেই বাধাকে ডিঙাইয়া পুনরায় সরল পথে চলে। কেহ চিৎকার করিলে সেই ধ্বনি-তরঙ্গকে (Vibration) যেমন কোন বেড়া আড়াল টানিয়া একেবারে আটকাইয়া দেওয়া যায় না, তরঙ্গের ন্যায় উভয়েই তাহাদের সম্মুখের বাধাকে অতিক্রম করিয়া যায়। সমুদ্রের জলরাশির উপরিভাগে যেমন অসংখ্য তরঙ্গ দোলা দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহারা যেমন সোজাভাবেই চলে, আলোকও সেইরূপ তরঙ্গ-ভঙ্গিতে সরল রেখায় চলে।[৪] এই মতবাদের নাম হইল "Undulatory Theory of Light". একটা সরু চিরুনীকে লম্বালম্বিভাবে দেখিলে যেরূপ মনে হয়, আলোক-রশ্মিও ঠিক তদ্রূপ। দেখিতে একটা সরল রেখাই বটে, কিন্তু উহার প্রতিটি দাঁত উঠা-নামা করিয়া ঢেউয়ের মত বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

আলোক-তরঙ্গকে আরও সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিলেন, ইহারা তিন প্রকারের : ছোট, বড় এবং মাঝারি। বলা বাহুল্য এই তারতম্য অনুসারেই বৈজ্ঞানিকেরা আলোক-তরঙ্গকে 'খাটো' তরঙ্গ (Short wave), 'মাঝারি' তরঙ্গ (Medium wave) এবং 'লম্বা' তরঙ্গ (Long wave)—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা রেডিও বাজান, তাঁহারা ইহাদের বিষয় অল্প-বিস্তর জানেন।

ইহা হইতেই বর্তমান-যুগের অন্যতম নূতন মতবাদ "Quantum Theory" আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, রশ্মি-তরঙ্গ (photon) প্রতিবারে এক একটি ঝাঁকুনি (jerking) দিয়া থামিয়া চলে। এই ঝাঁকুনিগুলির (Quanta) পরিমাপ করিয়াই আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wavelength) নিরূপণ করা হয়।

আলোক সম্বন্ধে সূক্ষ্ম গবেষণা করিতে যাইয়া পণ্ডিতেরা যে আর একটি অভিনব তথ্যের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞান-জগতে কম বিস্ময় ও বিপ্লব সৃষ্টি করে নাই। সেটি হইতেছে "Cosmic Radiation বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন, কোন্ সুদূর হইতে এক প্রকার তাপ (radiation) প্রতিনিয়ত বিকীর্ণ হইয়া আমাদের এই সৌরজগতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, তাহার গতিরোধ কিছুতেই করা যাইতেছে না। এই তাপ অত্যন্ত ধ্বংসকারী সমুদয় পদার্থের অন্তর্নিহিত পরমাণুকে (Atoms) ধ্বংস করাই ইহার কাজ। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, প্রতি সেকেণ্ডে আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রতি এক কিউবিক ইঞ্চি পরিমিত স্থানের মধ্যে প্রায় ২০টি Atom-কে সে নিহত করিতেছে। সমস্ত পদার্থের পরিবর্তন, ধ্বংস বা ক্ষয় সম্ভবত এই কারণেই সাধিত হইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, নিখিল জগতের সমুদয় পদার্থের

---

৪. নিউটন আবিষ্কার করেন যে, প্রত্যেক গতিশীল বস্তুই স্বাভাবিক অবস্থায় সরলরেখায় পরিভ্রমণ করে। আলোক-রশ্মি সব অবস্থাতেই সোজা পথে চলিতে চাহে, চুম্বক বা অপর কোন প্রক্রিয়া দ্বারা ইহার গতিকে সাময়িকভাবে ফিরাইয়া দিলেও সে পুনরায় সোজা পথেই চলে—বাঁকা পথে চলে না।

"Everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by unforeseen forces." (Newton)

www.pathagar.com

পরমাণুসমূহ যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে বা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হইতেছে, তাহার কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা পাওয়া যাইতেছে না। কি নিয়মে বা কোন্ কারণে একটি পরমাণু নিহত হয়, কেহই তাহা বলিতে পারে না। একদল সৈন্যের উপর বাহির হইতে বন্দুকের গুলি চালাইলে যেমন বলা যায় না যে, কে কখন মরিবে, ইহাও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার। যে-পরমাণুটি বুড়া হইয়া গিয়াছে অথবা যেটি সামনে আসে, সেইটিই যে আগে মরিবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

রেডিয়াম (Radium) একটি ধাতু। এই ধাতুর পরমাণুগুলি দিনে দিনে সীসার (Lead) পরমাণুতে পরিবর্তিত হইতেছে। অন্য কথায় রেডিয়াম ধাতুর পরমাণুসমূহের মোট সংখ্যা দিনে দিনে কমিয়া যাইতেছে। জানা গিয়াছে প্রতি ২,০০০ পরমাণুর মধ্যে মাত্র ১টি পরমাণু এক বৎসরে মরিয়া যায়; কিন্তু এই দুই হাজারের মধ্যে কোনটি যে মরিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিবার উপায় নাই। আমরা হয়ত মনে করিতে পারি যে, যে পরমাণুটি অতি বৃদ্ধ অথবা যেটি অতি তরুণ, সেইটিই এই মহাতাপে প্রথম মরিবে; কিন্তু তাহা মোটেই নহে। ভাগ্যনিয়ন্তা নিতান্ত খামখেয়ালীর মতই যেটাকে খুশি নিহত করিতেছেন।

এই একটিমাত্র আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকদিগের এতদিনকার বদ্ধমূল ধারণা একেবারে চুরমার হইয়া গিয়াছে। এতদিন তাঁহারা মনে করিতেন : কার্যকারণ-নীতি (Law of Causation) ও স্বভাবের সমনিয়ানুবর্তিতা (Uniformity of Nature) দ্বারাই বিশ্ব-প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। অন্য কথায় : প্রকৃতির মূলে আছে একটা স্থিরতার নীতি বা "principle of determinacy" অর্থাৎ প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার মূলে কোন খামখেয়ালী নাই—আছে একটি পূর্ব নির্ধারিত বিধান এবং সে বিধানে কোন নড়চড় বা ব্যতিক্রম নাই। কিন্তু এই cosmic radiation-এর ব্যাপার দেখিয়া বৈজ্ঞানিকদিগের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা দেখিতেছেন, যান্ত্রিক নিয়মে এই জগৎ চলিতেছে না; এমন এক অদৃশ্য শক্তি ইহার পিছনে রহিয়াছে, সে কারণেই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা "principle of determinacy"-এর পরিবর্তে এখন মানিয়া চলিতেছেন "Principle of indeterminacy" অর্থাৎ অনিশ্চয়তার নীতি। পূর্বে জড়বাদই ছিল বৈজ্ঞানিকদের প্রধান চিন্তার বিষয়; অ-জড় হইতে তাঁহারা জড়ে নামিয়া আসিতেছেন, কিন্তু এখন তাঁহারা জড় হইতে অ-জড়ে চলিয়াছেন; "Dematerialization of matter"-ই এখন তাঁহাদের লক্ষ্য। কাজেই বলা যাইতে পারে, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আবার সেই আদিম যুগে ফিরিয়া চলিয়াছে। "যাহা কিছু সমস্তই আল্লাহ্‌র কুদরৎ, তিনি সর্বশক্তিমান, যাহা খুশি তাহাই তিনি করিতে পারেন"-এই মনোভাবই বিজ্ঞান জগতে আবার ফিরিয়া আসিতেছে। নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস দূরীভূত হইয়া গিয়াছে; অদৃশ্য শক্তিতে আবার মানুষের বিশ্বাস বা ঈমান আসিতেছে। Sir James Jeans তাই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :

"History, of course, may repeat itself, and once again an apparent capriciousness in Nature may be found, in the light of fuller knowledge, to rise out of the inevitable operation of the law of cause and effect." (Mysterious Universe, p. 34)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে, আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঠোর কার্যকারণ-নীতির মধ্য হইতে আবার আমরা প্রকৃতিতে আপাত-খোশ খেয়াল নীতির অভ্যুত্থান দেখিতে পারি।

বস্তুত আমাদের মনে হয় এতদিন পরে বৈজ্ঞানিক তাহার পথের দিশা পাইয়াছে। এক অপূর্ব রহস্যলোক এখন তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অবাক বিস্ময়ে সে শুধু অনাবিষ্কৃত নূতন জগতের পানে চাহিয়া আছে। সকল স্পর্ধা, সকল আস্ফালন তাহার সংযত হইয়া গিয়াছে; সে এখন জানিয়াছে সে কিছুই জানে না। সকল বৈজ্ঞানিক আজ তাই অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করিতেছেন : "We do not know"— আমরা কিছুই জানি না।

ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, বিজ্ঞানের মতিগতি আজ কিরূপভাবে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। এতকাল মনোজগৎকে অস্বীকার করিয়া জড় জগৎকেই সে সত্যবস্তু বলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এই ভুল আজ তাহার ভাঙিয়াছে। মানস-লোকের গোপন গহনে সে আজ প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সে আর এখন পূর্বের মত তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না; সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে সে এখন সাম্য খুঁজিয়া ফিরিতেছে। চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিকেরা তাই আজ বলিতেছেন :

"The science of mind, at present in such rudimentary state will one day take control." (Limitations of Science)

অর্থাৎ : মনোবিজ্ঞান যদিও এখন ইহার প্রাথমিক অবস্থায় আছে, তবু সে একদিন কর্তৃত্ব করিবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, নূতন বিজ্ঞান এখন আর পুরাতন বুলি আওড়াইতেছে না; সে আনিয়াছে নূতন বাণী—নূতন ইঙ্গিত—যাহার সঙ্গে ধর্মের কোনই বিরোধ ঘটিতেছে না।

Sir James-এর উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি :

"Our main contention can hardly be that the science of to-day has a pronouncement to make, perhaps it ought rather to be that science should leave off making pronouncements."

(Mysterious Universe, p. 118)

অর্থাৎ : ইহা আমাদের প্রধান দাবী নহে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কোন ঘোষণা-বাণী প্রচার করিবার আছে; বরং ইহাই আমাদের দাবী হওয়া উচিত যে, বিজ্ঞান যেন কোন কিছুই আর ঘোষণা না করে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৮
ইসলাম ও নূতন বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের ইতিহাস এবং স্বরূপ পাঠকবর্গকে কিঞ্চিৎ দেখাইলাম। এইবার পবিত্র কোরআনের সহিত তাহাকে একটু মিলাইয়া পাঠ করা যাউক :

১. পদার্থ (Matter) সম্বন্ধে বিজ্ঞান বলিতেছে : সমস্ত পদার্থের মূলে আছে বিদ্যুৎ; অর্থাৎ আকাশ-পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা মূলত আর কিছুই নহে-বিদ্যুতেরই লীলা-খেলা।

কোরআন বলিতেছে :

"আল্লাহ্ নূরস্‌সামাওয়াতে অল্ আরদ্"

অর্থাৎ : আকাশ-পৃথিবীর সমস্তই আল্লাহ্‌র নূর হইতে সৃষ্টি।

তাহা হইলে কোরআন যাহা যাহা বলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞান ঠিক সেই কথাই বলিতেছে নাকি?

বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন : কোন্ সুদূর অজ্ঞাতলোক হইতে প্রতিনিয়ত একটি জ্যোতিঃ আসিয়া আমাদের এই পৃথিবীতে পড়িতেছে; তাহার নাম "Cosmic radiation." এই Cosmic radiation যে কোথা হইতে আসিতেছে এবং ইহা যে কাহার জ্যোতিঃ বিজ্ঞান তাহা না জানিলেও ইসলাম তাহা জানে।

২. বিজ্ঞান বলিতেছে : সমস্ত পদার্থের মূলে যে বিদ্যুৎ আছে, তাহা দুই প্রকারের : ইলেকট্রনস্ (electrons) এবং প্রোটন্স (protons); ইলেকট্রন হইতেছে ঋণাত্মক (negative) বিদ্যুৎ আর প্রোটন হইতেছে ধনাত্মক (positive) বিদ্যুৎ। ইহাদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী বিদ্যুৎ বলা যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সৃষ্টির কোন কিছুই একাকী পড়িয়া নাই, প্রত্যেক বস্তুই জোড়ায় জোড়ায় (in pairs) সৃষ্টি হইয়াছে। ঠিক ইহারই সহিত কোরআনের আয়াত মিলাইয়া পড়ুন।

"সেই আল্লাহ্‌র মহিমা—যিনি পৃথিবীতে যাহা উৎপন্ন হয়, সে-সকল বস্তুর এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্তুর এবং যাহা তাহারা (মানুষ) জানে না, এমন বস্তুর প্রত্যেকটিকেই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৩৬ : ৩৬)

৩. বিজ্ঞান বলিতেছে : সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহই কোনখানে স্থির হইয়া নাই। কোরআন বলিতেছে : সূর্য চাঁদকে ধরিতে পারে না, রাত্রি দিনের নাগাল পায় না, সকলেই মহাশূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।"

(৩৬ : ৪০)

৪. বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন যে, স্বভাবের মধ্যে একটা চিরস্থির শৃঙ্খলা আছে (nature is orderly) এবং কার্যকারণ-নীতির দ্বারাই জগতের সবকিছু সংঘটিত হইতেছে। অর্থাৎ তাঁহারা মনে করিতেছেন : সবকিছুই নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ; কোন্ কারণে কি ঘটিবে তাহা পূর্বেই স্থির হইয়া আছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। এই জন্যই তাঁহারা "Principle & determinacy" অর্থাৎ স্থিরতার নীতিকে মানিয়া চলিতেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই মত বর্জন করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রকৃতি ঐরূপ কোন মাপাজোঁকা

www.pathagar.com

নিয়ম-নীতির ধার ধারে না; কাজেই তাঁহারা এখন "Principle of determinacy"-এর পরিবর্তে "principle of indeterminacy" (অনিশ্চয়তার নীতি) অথবা "free will"(স্বাধীনতার নীতি) মানিয়া চলিতেছেন; অন্য কথায় তাঁহারা এখন স্বীকার করিতেছেন যে, স্বভাব সর্বত্র কার্যকারণ-নীতি মনিয়া চলে না, কারণ ছাড়াও কার্য হয়। এইরূপ কেন হয়, তাহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা বলিতেছেন যে, সব কিছুর পিছনে এমন একটা অদৃশ্য শক্তি আছে-যাহা সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া আপন খুশিমত এইসব হের-ফের করে। অতি-আধুনিক একজন বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :

"Do event really happen because of causes or they don't? And can you prove it." (Flight into space by J. N. Leonard. P. 159)

অর্থাৎ : কারণ দ্বারাই যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা প্রমাণ করিতে পার?

এই সম্বন্ধে কোরআন বলিতেছে :

"আকাশ-পৃথিবীর সকল পদার্থই আল্লাহ্র গুণগান করে। তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। আসমান-যমীনের সমুদয় রাজ্য তাঁহারই। তিনিই জীবন-মৃত্যু ঘটান এবং সমস্ত কিছুর উপর তাঁহারই প্রভুত্ব বিদ্যমান।" (৫৭ : ১-২)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"আল্লাহ্ যাহা খুশি তাহাই সৃষ্টি করিতে পারেন, যখন, তিনি কোন কিছু ঘটাইতে চাহেন, তখন তাহাকে বলেন 'হও' আর অমনি হইয়া যায়।" (৩ : ৪৬)

সব-কিছুর উপরেই যে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব বা শক্তি রহিয়াছে, কোরআন তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছে :

'ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির।"

অর্থাৎ : সব কিছুর উপরে আল্লাহ্র কর্তৃত্ব।

ইহা দ্বারাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কারণ বা উপকরণের কোন প্রয়োজন হয়না।

৫. বিজ্ঞান বলিতেছে : সরল রেখায় চলাই হইতেছে আলোকের ধর্ম; তবে কখনও কখনও চুম্বক (magnet)-এর আকর্ষণে ইহা বাঁকিয়া যাইতে পারে। মানুষের মধ্যেও 'নূর' বা জ্যোতিঃ রহিয়াছে, কাজেই তাহার গতিপথও সরল রেখায় হওয়াই স্বাভাবিক। তবে পথে যদি কোথাও সে অন্য কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার পথ বাঁকিয়া যাইতে পারে। মানুষের পক্ষে এই আকর্ষণই হইতেছে 'শয়তান'। চুম্বকের আকর্ষণে আলোক যেমন বিপথগামী হয়, শয়তানের আকর্ষণে মানুষও তেমনি বিপথগামী হয়। যাহাতে এই শয়তানের প্রলোভন বা আকর্ষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া সে 'সিরাতল্ মুস্তাকিমে' (সরল পথে) চলিতে পারে, এই জন্যই আল্লাহ্ মানুষকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন :

"আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সেই সরল পথে চালাও- যে পথে তোমার অনুগৃহীত প্রিয়জনেরা চলে—নহে তাহাদের পথে, যাহারা পথভ্রান্ত ও অভিশপ্ত।" (সূরা ফাতিহা)

৬. বিজ্ঞান বলিতেছে, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন মানুষ তাহার আত্মাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক মুহূর্তের মধ্যে যেখানে খুশি চলিয়া যাইতে পারিবে এবং সেখানে গিয়া তথাকার জড়প্রকৃতি হইতে নিজের দেহের যাবতীয় উপাদান (আব

www.pathagar.com

আতশ, খাক, বাদ) সংগ্রহ করিয়া স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হইতে পারিবে। আত্মা ডাক দিলেই উপাদানগুলি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিয়া ঘনীভূত হইয়া তাহার দেহ নির্মাণ করিয়া দিবে। পুনরায় সেই দেহ ফেলিয়া পূর্ব স্থানে সে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।

ইহা যদি মানুষের দ্বারা এই জীবনেই সম্ভব হয়, তবে রোজহাশরে স্বমূর্তিতে আমাদের পুনরুত্থান সম্ভব হইবে না কেন? উপাদানগুলিকে আল্লাহ্ ডাক দিলেই ত একত্রীভূত হইয়া যাইবে।

এই সম্বন্ধে কোরআন-শরীফে আল্লাহ্ সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন :

"এবং যখন ইব্রাহিম বলিলেন : প্রভু, কেমন করিয়া তুমি মৃতকে পুনর্জীবিত কর তাহা আমাকে দেখাও। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন : কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না? তিনি (ইব্রাহিম) বলিলেন : নিশ্চয়ই (বিশ্বাস হয়), তবে দেখাইলে অন্তরে শান্তি পাইতাম। তিনি (আল্লাহ্) বলিলেন : তাহা হইলে (বিভিন্ন শ্রেণীর) চারটি পাখী আনিয়া তোমার অনুগত হইতে শিক্ষা দাও। তারপর তাহাদিগকে মাথা কাটিয়া রাখিয়া মাংসগুলি টুকরা টুকরা করিয়া এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রাখিয়া আইস। তারপর তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকো, দেখিবে তাহারা তোমার নিকট (নিজ দেহে) উড়িয়া আসিবে। এবং জানো যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞানী।" (২ : ২৬০)

হযরত ইব্রাহিম আল্লাহ্র নির্দেশিত পরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইলেন।

বলা বাহুল্য, হযরত ইব্রাহিম পাখীগুলির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন না, শুধু পোষ মানাইয়াছিলেন মাত্র। তাঁহার নিকটে যখন মৃত প্রাণীর সশরীরে পুনরাবির্ভাব সম্ভব হইল, তখন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্র নিকট তাহা সম্ভব হইবে না কেন?

নূতন বিজ্ঞান এখন কোন্ পথে এবং কোন্ লক্ষ্যে চলিয়াছে, আশা করি পাঠক ইহা হইতেই তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৭. বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান বৈজ্ঞানিক থিওরী হইতেছে সময়ের আপেক্ষিকতা (Relativity of time)— সময়ের কোন স্থিরতা নাই। অবস্থার তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়-ইহাই এই থিওরীর সারাংশ। আইনষ্টাইন বলেন : "There is no standard time; all time is local"—কিন্তু এই কথা আদৌ কোন নূতন আবিষ্কার নহে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই কোরআন এই সত্য ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছে। হযরত ইব্রাহিমের সময়কার একটি ঘটনায় সময়ের এই আপেক্ষিকতা সুন্দররূপে বিধৃত হইয়াছে। হযরত ইব্রাহিম যখন নমরুদের নিকট আল্লাহ্র মহিমা কীর্তন করিলেন তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। তাহার মনের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন : "তাহার (নমরুদের) অবস্থা সেই ব্যক্তির মত হইল—যে একটি গাধায় চড়িয়া একটি বিধ্বস্ত নগরের পাশ দিয়া যাইতেছিল। এমন সময় সেই নগরটি ধসিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোকজনও চাপা পড়িল। তখন সবিস্ময়ে লোকটি আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া আল্লাহ্ কেমন করিয়া তুমি আবার এইসব লোকদিগকে (রোজহাশরে) পুনর্জাগরিত করিবে? তখন আল্লাহ্ (তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য) তাহাকেও চাপা দিয়া মারিয়া রাখিলেন। একশত বৎসর পরে আল্লাহ্ আবার তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : আচ্ছা বলত, তুমি এখানে কতদিন ঘুমাইয়া ছিলে? লোকটি বলিল : একরাত্রি কিংবা তারও কম। আল্লাহ্

www.pathagar.com

বলিলেন : না, তুমি এখানে একশত বৎসর ঘুমাইয়া ছিলে। লোকটি অবাক হইয়া রহিল, কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন আল্লাহ্ বলিলেন, তোমার সঙ্গে যে খাদ্য ও পানীয় ছিল, সেদিকে চাহিয়া দেখ। দেখিল সময় তাহাদের উপর দিয়া মোটেই বহিয়া যায় নাই (অর্থাৎ তাহারা একদম অবিকৃত রহিয়াছে); তারপর আল্লাহ্ বলিলেন : এইবার তোমার গাধার দিকে চাও। দেখিল শুধু কংকাল পড়িয়া আছে.....।" (২ : ২৫৯)

এখানে দেখা যাইতেছে সময় সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। লোকটি বলিতেছে একরাত্রি। আল্লাহ্ বলিতেছেন একশত বৎসর। গাধার কংকাল হইতে তদ্রূপই অনুমিত হইতেছে। কিন্তু খাদ্য ও পানীয় দ্বারা বুঝা যাইতেছে সময় তাহাদের উপর দিয়ে আদৌ অতিবাহিত হয় নাই। ইহাই তো সময়ের আপেক্ষিকতা।

সুরা 'কাহাফের' ১০-১২ আয়াতেও সময়ের আপেক্ষিকতা বুঝান হইয়াছে। সাতজন খোদাভক্ত যুবক প্রাণভয়ে এক পর্বত-গুহায় প্রবেশ করে। সেখানে তাহারা ১৭৫ বৎসর (অন্যমতে ৩৭৫ বৎসর) ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু এত দীর্ঘ সময়ও তাহাদের কাছে এক রাত্রি বলিয়া মনে হয়।

আধুনিক space science সময়ের আপেক্ষিকতাকে আরও সহজবোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। দ্রুত গতিশীল রকেট আরোহীর সময়-জ্ঞান এবং একজন স্থিতিশীল পৃথিবীবাসীর সময়-জ্ঞান এক নহে। রকেটের দুই বৎসর পৃথিবীর ২০০ বৎসরের সমান হইতে পারে।

আমরা এখন নভোভ্রমণের যুগে আসিয়াছি। কিন্তু এই নভোভ্রমণের (space travelling) ধারণাও সর্বপ্রথম আমরা কোরআন হইতেই লাভ করি। হযরত মুহম্মদ ছিলেন আধুনিক যুগের সর্বপ্রথম নভোযাত্রী। রসূলুল্লাহ্‌র মি'রাজ এই কথার প্রমাণ। আল্লাহ্ কোরআন পাকে বলিতেছেন :

—"সেই আল্লাহর মহিমা-যিনি এক রাত্রে তাঁহার

বান্দাকে (মুহম্মদকে) পবিত্র কাবা মসজিদ হইতে দূরতম মসজিদ (বায়তুল মামুর) পর্যন্ত পরিভ্রমণ করাইয়াছিলেন—যে মসজিদ চির আশীর্বাদপ্রাপ্ত। উদ্দেশ্য : যাহাতে আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার মহিমার কিয়দংশ দেখাইতে পারেন।

নিশ্চয়ই তিনি শ্রোতা এবং জ্ঞাতা।" (১৭ : ১)

এইরূপ আরও আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, আধুনিক যুগের বহু বৈজ্ঞানিক সত্যই ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত।

এই পূর্ব ধারণা লইয়া আসুন পাঠক এইবার আমরা মি'রাজের বিভিন্ন দিক আলোচনা করি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ৯

মি'রাজ

মি'রাজ কী? ইহা স্বপ্ন, না সত্য?

মি'রাজের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে ইহা যে কিরূপ করিয়া সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহা শারীরিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক, কেহ বলেন স্বাপ্নিক।

এইরূপ মতভেদে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের মধ্যে সংঘটিত এমন একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ ব্যাপারকে যে নানা লোকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিবে ইহাই ত স্বাভাবিক। সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষ যখন তাহার আয়ত্তের বহির্ভূত কোন বিষয়বস্তু বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন এই দশাই ঘটে

মি'রাজ যে কি তাহা আমরাও বুঝি না। তবু বিভিন্ন দিক হইতে মি'রাজ সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন জাগিতে পারে; এক একটি করিয়া আমরা তাহাদের আলোচনা করিতেছি।

হযরত শরীরত গিয়াছিলেন কিনা

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মত : হযরতের মি'রাজ শরীরত ঘটিয়াছিল।

পক্ষান্তরে অনেকের মত : এই উপলব্ধি আধ্যাত্মিকভাবেই সাধিত হইয়াছিল।

মি'রাজের ঘটনা যে আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিতে পারে না, অথবা ঘটিলে যে হযরতের গৌরবের তাহাতে কোন হানি হয়, তাহা আমাদের মত নহে। এইসব ব্যাপার অনায়াসেই আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিতে পারে। আর তাহা ঘটিয়া থাকিলে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোন আপত্তির কারণও থাকিবার কথা নহে। কিন্তু আমাদের কথা এই : শরীরত ঘটিতেই বা বাধা কি?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হযরতের এই নভোভ্রমণ শরীরতই ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ তিনি সচেতন অবস্থায় সশরীরেই আকাশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা প্রমাণ করিব।

অবশ্য যুক্তিবাদীরা এই কথা মানিবেন না। তাঁহাদের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা এই কথা মানিতে বাধা দিবে। স্থূলদেহী মানুষ। জড়জগতের নিয়ম নিগড়ে সে আবদ্ধ। কেমন করিয়া সে আকাশ-লোকে বিহার করে? আমাদের এই পৃথিবীর উপরে যে বায়ুস্তর আছে, তাহার উচ্চতা মাত্র ৫২ মাইল; ইহার উর্ধ্বে আর বায়ুর অস্তিত্ব নেই; কেমন করিয়া তবে শ্বাস-প্রশ্বাস বিশিষ্ট জড়ধর্মী মানুষ সেই বায়ুহীন উর্ধ্বলোকে গিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে? জড়-প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোন মানুষের পক্ষে গ্রহে-গ্রহে বিচরণ করা কি কখনও সম্ভব?

বলা বাহুল্য, এই যুক্তি-বিজ্ঞানের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক মননশীলতা নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি : স্বভাবের সীমারেখা চিরদিনই মানুষের কাছে অজ্ঞেয় ও ক্রমবিস্তারশীল হইয়া রহিয়াছে। আজ যাহা অস্বাভাবিক, কাল যখন তাহা স্বাভাবিক হইয়া উঠিতেছে, তখন স্বভাবের দোহাই দেওয়া আর এখন বুদ্ধিমানের কার্য নহে। হযরত যে সজ্ঞানে শরীরতই নভোভ্রমণ করিয়াছিলেন, নিম্নের আলোচনা হইতেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

মি'রাজ ও মাধ্যাকর্ষণ

হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। প্রত্যেকে জানেন : পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আছে। যে-কোনো শূন্যে অবস্থিত স্থূলবস্তুকে সে মাটির দিকে টানিয়া নামায়। কাজেই যুক্তিবাদীরা বলেন, হযরতের শরীরত আকাশ-ভ্রমণ অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব।

কিন্তু এ-কথা এখন জোর করিয়া বলা যায় যে, বিরুদ্ধবাদীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ। যে মাধ্যাকর্ষণ নীতির (Law of Gravitation) দোহাই দিয়া তাঁহারা মি'রাজকে অস্বীকার করিতেন সেই নীতিকে আজ বৈজ্ঞানিকরা প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। মহাকর্ষের ব্যাখ্যা তাঁহারা অন্যভাবে দিতেছেন। শূন্যে অবস্থিত কোন স্থূলবস্তুকে পৃথিবী যে সব সময়ে সমভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না, আজ তাহা পরীক্ষিত সত্য। পৃথিবী যে সব সময়ে সব বস্তুকেই সমানভাবে টানিয়া নামাইতে পারে তাহাও নহে; প্রত্যেক গ্রহেরই নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি আছে। পৃথিবীর যেমন আকর্ষণী শক্তি আছে, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহেরও তেমনি আকর্ষণী শক্তি আছে। সূর্য ও পৃথিবী পরস্পর পরস্পরকে টানিয়া রাখিয়াছে। এই টানাটানির ফলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এমন একটা স্থান আছে যেখানে কোন আকর্ষণ-বিকর্ষণ নাই। কাজেই পৃথিবীর কোন বস্তু যদি এই নিষ্ক্রিয় সীমানায় (Neutral zone) পৌঁছিতে পারে, অথবা এই সীমানা পার হইয়া সূর্যের সীমানায় পা দিতে পারে, তবে তাহার আর পৃথিবীতে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। গতি-বিজ্ঞান (Dynamics) স্থির করিয়াছে যে, পৃথিবী হইতে কোন বস্তুকে যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৬.৯০ অর্থাৎ মোটামুটি ৭ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুঁড়িয়া দেওয়া যায় তবে তাহা আর পৃথিবীর বুকে ফিরিয়া আসিবে না।

"A bullet fired from the earths surface with a speed of 6.90 miles a second or more will fly into space."

(The Universe Around Us. by J. Jeans. p. 216)

ইহাও সত্য যে, পৃথিবী কোন বস্তুকে অনুরূপ বা তদূর্ধ্ব গতিবেগে যদি কেহ তুলিয়া লইতে পারে তাহা হইলেও তাহার বেলায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বুক হইতে কোন স্থূল বস্তু যতই উর্ধ্বে উঠিয়া যায়, ততই তাহার ওজন (weight) কমিতে থাকে। এ অবস্থায় তাহার অগ্রগতি ক্রমেই সহজ হইয়া আসে। এই সম্বন্ধে অতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক Arther G. Clark তাঁহার "The exploration of space" নামক পুস্তকে বলিতেছেন :

"As the distance from the earth lengthens into the thousands of miles, the reduction (of gravity) becomes substantial: twelve thousand miles up, an one-pound weight would weight only an ounce. It follows, therefore, that further away one goes from the Earth the easier it is to go onwards." (p. 15)

অর্থাৎ : পৃথিবী হইতে কোন বস্তুর দূরত্ব যতই বাড়িতে থাকে, ততই তাহার ওজন কমিতে থাকে, পৃথিবীর এক পাউণ্ড (আধসের) ওজনের কোন বস্তু ১২,০০০ মাইল উর্ধ্বে মাত্র এক আউন্স হইয়া যায়। ইহা হইতেই বলা যায় যে, পৃথিবী হইতে যে যত উর্ধ্বে অগ্রসর হইবে, ততই তাহার অগ্রগতি সহজ হইবে।"

www.pathagar.com

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

"Gravity steadily weakens as we go upwards away from Earth, until at very great distances it becomes completely negligible."

অর্থাৎ : পৃথিবী হইতে যতই উর্ধ্বে যাওয়া যায় ততই ওজন কমিতে থাকে; অবশেষে তাহার আকর্ষণ শক্তি মোটেই বুঝা যায় না।" এই অবস্থাকে বৈজ্ঞানিকেরা Zero Gravity বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

অতএব, দেখা যাইতেছে, কোন স্থূল বস্তুকে একটা নির্দিষ্ট গতিতে উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দিলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাহার বেলায় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগে উর্ধ্বলোকে ছুটিতে পারিলে পৃথিবী হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। ইহাকে 'মুক্তগতি' (Escape velocity) বলে।

"This velocity is 25,000 m. p. h. and is called the velocity escape." (Ibid. p. 34)

গতি-বিজ্ঞানের এইসব আবিষ্কারের ফলেই বৈজ্ঞানিকেরা এখন গ্রহ-ভ্রমণের (interplanatory flight) জন্য দিনরাত মাথা ঘামাইতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, এমন দিন শীঘ্রই আসিতেছে, যখন পৃথিবী হইতে মানুষ গ্রহে গ্রহে ভ্রমণ করিবে। গ্রহ-অভিযানের জন্য ইতিপূর্বেই রকেট (Rocket) সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; এখন বড় বড় "spaceship" নির্মিত হইতেছে। চন্দ্রলোক (Moon) এবং মঙ্গল গ্রহে (Mars) যাইবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে।[১]

অতএব, দেখা যাইতেছে, মাধ্যাকর্ষণের যুক্তি দ্বারা মি'রাজের সম্ভাবনাকে নিবারিত করা যাইতেছে না।

হযরতের দেহ কি জড়ধর্মী ছিল?

হযরতের সশরীরে আকাশ-ভ্রমণকে যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চাহেন না, তাঁহাদের অন্যতম যুক্তি এই যে, জড়দেহ লইয়া নভোলোকে পৌঁছানো অসম্ভব। কিন্তু আমাদের কথা এই : হযরত মানব ছিলেন বলিয়াই যে তাঁহার দেহ আমাদের ন্যায় জড় উপাদান বিশিষ্ট ছিল, তাহা ত নাও হইতে পারে। বুনিয়াদ বা জাত এক হইলেও প্রত্যেক বস্তুর প্রকারভেদ ত আছে। কয়লা হইতে হীরক প্রস্তুত হয় এবং উভয়ই পদার্থ; কিন্তু তাই বলিয়া কয়লা ও হীরক কি এক বস্তু? তাহা ছাড়া সমস্ত পদার্থের ধর্ম যে সর্বত্র একইরূপ থাকে তাহাও নহে। কাঁচ একটি জড় পদার্থ; বাধা দেওয়া জড় পদার্থের ধর্ম। আমাদের আঙুল উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে না অমনি সে বাধা দেয়; কিন্তু কোন আলোকরশ্মি দেখিলেই সে সসম্মানে তাহার জন্য নিজের দেহের ভিতর দিয়াই পথ ছাড়িয়া দেয়। আবার অনেক অস্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া সাধারণ আলো প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু যদি উহাদের উপর রঞ্জন-রশ্মি (X-Ray) নিক্ষেপ করা যায়

---

১. বৈজ্ঞানিকদের নভোভ্রমণের স্বপ্ন সফলতার পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত ৪/১০/৫৭ তারিখে রাশিয়া সর্বপ্রথম স্পুটনিক নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (satelite) আকাশে উড়াইয়াছে। উপগ্রহটি ঘন্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ছুটিয়া মহাশূন্যের মাঝে প্রতিবারে ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিটে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। ইহার পরও রাশিয়ান বৈমানিক গ্যাগারিন ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে সর্বপ্রথম রকেট নভোপরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া জগতে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছেন।

www.pathagar.com

তবে সে উহাদিগকে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। সাধারণভাবে দেখিতে গেলে একই পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় থাকিতে পারে। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় পদার্থের এই তিন রূপ। পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে, তখন বরফের আকার ধারণ করে এবং তাহা দিয়া বাড়ি-ঘর পর্যন্ত তৈয়ার করা চলে। যখন তরল অবস্থায় থাকে, তখন আবার ইহা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করে। আবার এই পানিকেই বাষ্পাকারে পরিণত করিলে সে আমাদের চোখের অলক্ষ্যে মেঘলোকে উড়িয়া যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় পানি সম্বন্ধে যদি বলি যে, পানি দ্বারা বাড়ি-ঘর তৈরী করা যায় না, অথবা পানি কখনও উড়িয়া যাইতে পারে না, তবে কি আমাদের কথা সত্য হইবে? কাজেই আমরা কোন পদার্থকে যে বেশে দেখিতেছি, তাহাই যে উহার একমাত্র সত্য রূপ, তাহা নাও হইতে পারে।

অতএব, আমাদের কথা এই, বাহির হইতে হযরতকে জড়দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে হয়ত তিনি জড়ধর্মী ছিলেন না; পদার্থের যাহা সার—সেই জ্যোতিঃ বা নূর দ্বারাই তাঁহার দেহ গঠিত ছিল। এইজন্যই প্রবাদ আছে : রসূলুল্লাহ্‌র দেহের কোন ছায়া ছিল না।

আল্লাহ্‌র নূর হইতেই হযরত মুহম্মদের সৃষ্টি ইহা শুধু আমাদের কথা নহে; হযরত নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সহি হাদিস হইতে জানা যায়, হযরত বলিতেছেন :

"আনা নূরুল্লাহে ওয়া কুল্লে শাইইন মিন্ নূরী।"

অর্থাৎ : আমি আল্লাহ্‌র নূর এবং সমুদয় বস্তু আমার নূর হইতে সৃষ্ট।

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

"আউয়ালো মা খালাকাল্লাহু নূরী।"

অর্থাৎ : আল্লাহ্ সর্বপ্রথম যাহা সৃষ্টি করেন, তাহা আমার নূর।

কোরআন পাকেও আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"কাদ্ যা'কুম মিনাল্লাহে নূর ও কিতাবুম-মুবিন।" (৫ : ১৫)

অর্থাৎ : নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে আসিয়াছে আল্লাহ্‌র নূর এবং তাঁহার কিতাব।

এই সমস্ত তথ্য হইতে অনুমিত হয় যে, হযরতের দেহ আমাদের মত স্থূল উপাদানে গঠিত ছিল না; তাঁহার দেহ গঠনের উপাদান ছিল নূর বা জ্যোতিঃ। এই কারণেই স্থূল দেহ লইয়াও তাঁহার পক্ষে আকাশ ভ্রমণ সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। কারণ নূরের কোন ওজন নাই।

যদিও ধরিয়াও লই যে, হযরতের দেহ জড় পদার্থ (matter) দ্বারাই গঠিত ছিল, তাহাতেই বা কী? মানুষের দেহ শুধু জড় উপাদানেই গঠিত নহে, তাহার মধ্যে চৈতন্য (spirit) বা প্রাণশক্তি (mind)-ও ত আছে। এই প্রাণশক্তিই চিরদিন জড়ের উপর প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে। চিদ্‌শক্তি-সম্পন্ন মানুষ ইচ্ছা করিলে তাই জড় জগতের নিয়ম-কানুন উল্টাইয়া দিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক Sir james jeans এই সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখুন :

"To say that mind cannot influence matter, now becomes as absurd as to say that mind cannot influence ideas."

www.pathagar.com

অর্থাৎ : কল্পনার উপর আমাদের মন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, এ কথা বলা যেমন বোকামি, পদার্থের উপর মনের কোন শক্তি নাই—এই কথা বলাও ঠিক তেমনি বোকামি।

ইহাই যদি সত্য হয়, তবে বিরাট প্রাণশক্তিসম্পন্ন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বরের নিকট তাঁহার জড়দেহ কেন আকাশ ভ্রমণে বাধার সৃষ্টি করিবে?

মি'রাজ কি আধ্যাত্মিকভাবে সাধিত হইয়াছিল?

আমাদের পরবর্তী বিচার্য হইল : মি'রাজের ঘটনাবলী আধ্যাত্মিক উপায়ে সাধিত হইয়াছিল কি-না। ঘটনাটি যে আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত, তাহতে আর সন্দেহ কি? এমন অদ্ভুত ব্যাপার নিশ্চয়ই সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচরযোগ্য নহে। কাজেই মি'রাজকে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলিতে আমাদের আপত্তি নাই; তবে সেই সঙ্গে ইহাও আমরা বলিতে চাই যে, হযরত যখন সশরীরে সজ্ঞানে সচেতন অবস্থাতেই এই মি'রাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা প্রমাণ পাইতেছি এবং সশরীরে নভোভ্রমণ যখন স্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে, তখন খামাখা আমরা ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাইব কেন? ব্যাপারটি শুধু আধ্যাত্মিক হইলে শরীরত ঊর্ধ্ব-প্রয়াণের কোন আবশ্যকই হইত না। একস্থানে বসিয়া ধ্যানযোগেই ত আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করা যায়। মি'রাজ এই শ্রেণীর সিদ্ধি লাভ নহে—ইহা আরও ব্যাপক ও গভীর—ইহা সত্যের বাস্তব উপলব্ধি—অথবা সত্য-দর্শন। মি'রাজ-রজনীতে আল্লাহ্ নিজের মহিমা এবং সৃষ্টিলীলার গূঢ় রহস্যের সহিত তাঁহার প্রিয় হাবিবকে সব দিক দিয়া পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন। দোযখ্-বেহেশ্ত, আরশ-কুর্সী ইত্যাদি সমস্ত রহস্যের দ্বারই সেদিন তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া আপন বন্ধুকে দেখাইয়াছিলেন। এই পূর্ণ পরিচয় বা দিব্যদর্শনই ছিল মি'রাজের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

মি'রাজ কি স্বপ্ন?

মি'রাজ নিশ্চয়ই স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন অতি নিম্ন স্তরের জিনিস। অবশ্য স্বপ্নেও অনেক আধ্যাত্মিক বিষয় প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করিয়া নবী-রসূলদিগের স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হয় না। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য: স্বপ্নের স্থান অতি নিম্নে। উহা পরিপূর্ণ সত্যদর্শন নহে, উহা সত্যের আভাস মাত্র। মি'রাজ নিশ্চয়ই এইরূপ স্বপ্ন ছিল না। স্বপ্নই যদি হইবে, তবে ইহা লইয়া এত আপত্তি উঠিবে কেন? হযরত যদি বলিতেন : আমি রাত্রে একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে লোকদের তাহা অবিশ্বাস করিবার কি কারণ থাকিতে পারিত? ব্যাপারটি ত সেইখানেই মিটিয়া যাইত। সশরীরে গিয়াছিলেন এবং স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছিলেন বলাতেই ত যত আপত্তি। হযরত শুধু ঐরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কোরআন-হাদিসে নাই।

মি'রাজ ও কালের প্রশ্ন

মি'রাজ সম্বন্ধে যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদের নিকট কালের প্রশ্নও একটা বড় যুক্তি। বিবরণে প্রকাশ, হযরত যখন বোরাকে চড়িয়া রওয়ানা হন, তখন তাঁহার অজু করিবার স্থান হইতে অজুর পানি যেইরূপভাবে গড়াইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন ফিরিয়া আসিয়া ঠিক সেইরূপভাবেই গড়াইয়া যাইতে দেখিলেন। নিমেষের মধ্যে কি করিয়া

www.pathagar.com

এত বড় কাণ্ড ঘটিল? ইহাই হইতেছে সন্দেহবাদীদের প্রশ্ন। কিন্তু যে-বিজ্ঞানের বলে তাঁহারা ইহা অবিশ্বাস করেন সেই বিজ্ঞানই ত বলিতেছে যে, সময়ের স্থিরতা কিছুই নাই, উহা আমাদের একটা মনের খেয়াল মাত্র।—সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা হিসাবও একেবারে ভুল। যে-হিসাবে কোন ঘটনাকে আমরা নির্ণয় করি, প্রকৃতি সে হিসাবের ধার ধারে না। আল্লাহ্‌র ঘড়ির সঙ্গে আমাদের ঘড়ি মিলে না। অন্য গ্রহে আমাদের ঘড়ি অচল। কাজেই যে ঘড়ি আমাদের একান্তই মনগড়া এবং যাহার কোনই মূল্য নাই, তাহাই লইয়া মি'রাজের সময় নির্ণয় করিতে যাওয়া আমাদের খুবই অন্যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ত পরিষ্কারই বলিয়া দিয়াছেন : স্বভাবের প্রকৃত সময় (true time of nature) আজও তাঁহারা জানেন না। কাজেই সময়ের প্রশ্ন মোটেই এখানে যুক্তিযুক্ত নহে।

সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ঠিক নহে, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখন একমত; দর্শকের নিজস্ব গতির উপরে কালের গতি নির্ভর করে। একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যেভাবে কোন ঘটনাকে ঘটিতে দেখিব দ্রুতবেগে দৌড়াইয়া গেলে সে গতিতে দেখিব না। মনে করুন, কোন ব্যক্তি তাহার ইচ্ছামত যে-কোন বেগে শূন্যলোকের মধ্য দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। সে যদি আলোকের গতি অপেক্ষা কম গতিতে ছুটে, তবে দেখিব স্বাভাবিকভাবেই ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে; অর্থাৎ সময় সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অন্য কথায় রবির পর সোম, সোমের পর মঙ্গল আসিতেছে। সে যদি আলোকের সম গতিতে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল বেগে ছুটিতে পারে, তবে দেখিব সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে অর্থাৎ সকাল কি সন্ধ্যা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। আবার আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত যদি সে ছুটিতে পারে, তবে দেখিব সময়ের গতি উল্টা দিকে চলিতেছে, অর্থাৎ কোন ঘটনা ভবিষ্যতের দিকে না গিয়া পিছাইয়া যাইতেছে; অন্য কথায় : রবির পর শনি, শনির পর শুক্র আসিতেছে।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, গতির তারতম্যে সময়ের তারতম্য ঘটিয়া যায়। এই সম্বন্ধে জনৈক অতি-আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন :

"If speeds that approach the velocity of light make time in a moving system run slower, a superlight velocity should turn the time backward." (One Two Three........Infinity, p. 105

অর্থাৎ : আলোকের গতির যত কাছে যাওয়া যায়, ততই যখন সময় শ্লথ হইয়া আসে তখন ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ যে, আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী দ্রুত গতিতে গেলে সময় উল্টা দিকে বহিবে। জনৈক কাব্য-রসিক বৈজ্ঞানিক আলোকের এই বিচিত্র গতিকে একটি ছোট কবিতায় চমৎকার রূপ দিয়াছেন :

"There was a young girl named Miss Bright
who could travel much foater than light
She departed one day, in Einsteinian way,
And came back on the previous night."

অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, আলোকের গতি অপেক্ষা বেশী গতিতে কেহই যাইতে পারে না। অন্য কথায়, আলোকের গতিই সর্বোচ্চ গতি এবং ইহাই ধ্রুবগতি (Absolute)। কিন্তু অধুনা এই মত পরিত্যক্ত হইতেছে।

www.pathagar.com

Harold Leland Goodwin বলেন :

"Would it be odd if one of them exceeded it some day and demonstrated that the velocity of light is not absolute?"

(Space Travel)

অন্যত্র তিনি বলিতেছেন :

"The constancy of the speed of the light has been challenged recently. A European scientist who has studied the subject for over a quarter century M. de Bray, says, that the alleged constancy of light is unsupported by observation." (Space Travel, p. 180—181)

বস্তুত আলোকের গতি অপেক্ষা মনের গতি ঢের বেশী। কাজেই আলোকের গতিই যে সর্বোচ্চ গতি, এখন তাহা মানা যায় না।

মি'রাজ ও নূতন বিজ্ঞান

স্থান, কাল এবং গতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমাদের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন; অন্যথায় মি'রাজের ন্যায় দুর্বোধ্য ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না।

নিম্নে অতি সংক্ষেপে এই সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করিতেছি :

ক. দর্শকের গতির তারতম্যে বস্তু বা ঘটনার স্থান-নির্ণয়ে তারতম্য ঘটে।

"Two events occurring at the same place, but at two different moments, from the point of view of one observer will be considered as occurring at different places, if viewed by another observer in a different state or in different states of motion."

(One Two Three...............Infinity, p. 92)

অর্থাৎ : একই স্থানে, কিন্তু বিভিন্ন মুহূর্তে সংঘটিত দুইটি ঘটনা বিভিন্ন গতিতে দেখিলে দর্শকেরা বিভিন্ন রূপে দেখিবে।

মনে করুন : দ্রুতগামী চলন্ত ট্রেনের খাবার কামরার জানালার ধারে একটি টেবিলে বসিয়া এক সাহেব খানা খাইতেছে। খাওয়া শেষ হইয়া গেলে সাহেব সিগারেট ধরাইল। পাশে খানসামা দাঁড়াইয়াছিল। সে দেখিল : দুইটি ঘটনাই (খানা খাওয়া ও সিগারেট ধরানো) একই স্থানে সংঘটিত হইল। ইহা সম্ভব হইল এইজন্য যে, ট্রেনের গতি, সাহেবের গতি এবং খানসামার গতি সমান ছিল। কিন্তু এই ব্যাপারটিই যদি লাইনের ধারে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি গুমটি ঘরের নিশানধারী দুইজন চৌকিদার লক্ষ্য করে, তবে প্রথম জন দেখিবে সাহেবটি খানা খাইতেছে, দ্বিতীয় জন দেখিবে সাহেব সিগারেট ধরাইতেছে; আর এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অন্তত পাঁচ মাইলের ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে। চলন্ত গাড়ীতে থাকিয়া খানসামা দুইটি ঘটনাকে একই স্থানে সংঘটিত হইতে দেখিয়াছে। কিন্তু মাটির উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় দুইজন চৌকিদার ঘটনা দুইটিকে দুই বিভিন্ন স্থানে ঘটিতে দেখিয়াছে। দর্শকের গতির তারতম্য এই পার্থক্যের কারণ।

• খ. একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত দুইটি ঘটনা দর্শকের গতির তারতম্যে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া মনে হইবে।

www.pathagar.com

"Two events occurring at the same moment (i. e. simultaneously) but at different places, from the point of view of one observer, will be considered as occurring at different moment, if viewed be another observer in a different state of motion." (Ibid)

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় : মনে করুন, উপরোক্ত চলন্ত ট্রেনের সাহেবটি যখন সিগারেট ধরাইল, ঠিক সেই মুহূর্তে ডাইনিং কারের অন্য কোণে অবস্থিত আর একজন সাহেব সিগারেট ধরাইল। খানসামা দেখিল একই সময়ে দুইটি ঘটনা ঘটিল। কিন্তু এই ঘটনাটি যদি মাটিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় কোন লোক দেখে, তবে সে দেখিবে একজন সাহেব অন্যজনের চেয়ে কিছু আগে সিগারেট ধরাইয়াছে; অর্থাৎ দুই জনের সিগারেট ধরাইবার মধ্যে ব্যবধান ঘটিয়া গিয়াছে।

স্থান এবং কালের ন্যায় গতি আপেক্ষিক। নির্দিষ্ট কোন গতির কথা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন :

মনে করুন, একখানি ট্রেন ঘন্টায় ৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। একজন যাত্রী তাহার কামরা হইতে বাহির হইয়া খাবার গাড়ীতে (dining car) যাইতেছে। কিন্তু রেল লাইনের ধারে কোন বাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া যদি একটি লোক এই চলন্ত গাড়ীর দিকে তাকাইয়া থাকে, তবে সে কি দেখিবে? সে দেখিবে লোকটি ৫০ মাইল বেগে যাইতেছে অর্থাৎ গাড়ীর গতির সমগতিতে সে চলিতেছে। আবার মঙ্গল গ্রহ হইতে দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমগতিতেই (অর্থাৎ ঘন্টায় ১০০০ মাইল বেগে) লোকটি ছুটিয়া চলিয়াছে।

লোকটির প্রকৃত গতি তাহা হইলে কত?

গ. গতির উপর থাকিলে সময় অস্বাভাবিকরূপে খাটো হইয়া যায় :

"Suppose you decided to visit one of the satellites of Sirius which is at a distance of nine light-year from the solar system, and use for your trip a rocket-ship that can move practically with the speed of light. It would be natural for you to think that the round trip to Sirius and back would take you at least eighteen years and you would be inclined to take with you a very large food supply. That precaution, however, would be also lutely unnecessary if the mechanism of your rocket-ship made it possible for you to travel at nearly the velocity of light. In fact, if you move, for example, at 99,99999999 per cent of the speed of light, your wrist-watch,your heart, your lungs, your digestion and your mental process will be slowed down by a factor of 70,000 and the 18 years (from the point of view of people left on the earth) necessary to cover the distance from earth to Sirius and back to earth again would seem to you as only a few hours. In fact, starting from earth right after breakfast, you will just feel ready for lunch when your ship lands on one of the Sirius planets. If you are in a hurry and start home right after lunch, you will, in all probability, be back on earth in time for dinner. But, and here you will get big surprise if you have forgotten the laws of relativity, you will find on arriving home that your friends and relatives have given you up as lost in the interstellar

www.pathagar.com

paces and have eaten 6570 dinners without you. Because you were travelling at a speed close to that of light, eighteen terrestrial years have appeared to you as just one day. (Ibid, p. 104)

ভাবার্থ : মনে করুন, আপনি 'সাইরিয়াস' গ্রহে বেড়াইতে যাইবেন। পৃথিবী হইতে সাইরিয়াসের দূরত্ব ৯ আলোক বৎসর, অর্থাৎ ৫৪ লক্ষ কোটি মাইল। অন্য কথায় : যদি আপনি রকেটশিপে যান, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছিতে পৃথিবীর সময়ানুসারে আপনার নয় বৎসর লাগিবে। ফিরিয়া আসিতেও আর নয় বৎসর লাগিবে। এত দীর্ঘ প্রবাসে, প্রচুর রসদপত্র নিশ্চয়ই আপনি সঙ্গে লইতে চাহিবেন। কিন্তু তাহার কোনই প্রয়োজন হইবে না। সময় এত সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে যে, এই ১৮ বৎসর আপনার ঘড়িতে ১২/১৩ ঘন্টার বেশী বলিয়া মনে হইবে না। আপনি যদি পৃথিবী হইতে সকালবেলার চা খাইয়া রওয়ানা হন, তবে সাইরিয়াস গ্রহে পৌঁছিয়া আপনি দুপুরে লাঞ্চ খাইবেন। লাঞ্চ খাইয়াই যদি পৃথিবীর দিকে যাত্রা করেন, তবে গৃহে ফিরিয়া আপনি ডিনার খাইতে পারিবেন; অর্থাৎ আপনি রাত্রি ৮/৯ টায় ফিরিয়া আসিবেন। আপনার বেলায় ত এইরূপ। কিন্তু পৃথিবীতে পরিত্যক্ত আপনার স্ত্রী-পুত্র দেখিবে, তাহাদের ১৮ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহারা ইত্যবসরে ৬৫৭০ টি ডিনার খাইয়া ফেলিয়াছে।

এইসব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্যের কথা শুনিয়া অনেকেই হয়ত অবাক হইবেন। কিন্তু ইসলামের কাছে ইহা কোনই নূতন কথা নহে। ১৪০০ বৎসর আগেই পবিত্র কুরআনে সময় সম্বন্ধে আল্লাহ্ ঠিক অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন, দেখুন :

"তুমি কি ভাবিয়াছ সেই ব্যক্তির কথা যে একটা গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সে গ্রামটি ধ্বসিয়া পড়িল। লোকটি বলিল, কিরূপে আল্লাহ্ পুনরায় এর অধিবাসীদিগকে জীবিত করিবেন? তখন আল্লাহ্ লোকটির মৃত্যু ঘটাইলেন এবং একশত বৎসর সেই অবস্থায় রাখিয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া বলিলেন : তুমি কতদিন এইরূপ (মৃত) অবস্থায় ছিলে? লোকটি উত্তর দিল : একদিন বা তারও কম। আল্লাহ্ বলিলেন : না তুমি একশত বৎসর মৃত অবস্থায় ছিলে। কিন্তু তোমার খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি তাকাও; উহা অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। অথচ তোমার গাধার প্রতি চাহিয়া দেখ। ইহা এই উদ্দেশ্যে যাহাতে আমি তোমাকে অন্যান্য লোকদের জন্য নিদর্শন করিতে পারি। এবং গাধার অস্থিগুলির প্রতি তাকাও, দেখ কি প্রকারে আমি সেগুলিকে জুড়ি এবং উহাতে মাংস পরাই। যখন এই ঘটনাগুলি তাহাকে স্পষ্ট দেখানো হইল, সে বলিয়া উঠিল, আমি বুঝিলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান।"

(২ : ৫৯)

সূরা 'কাহ্ফে' বর্ণিত 'আস্হাব্-কাহ্ফের' কাহিনীটিও এখানে স্মরণীয়। গুহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ৩৭৫ বৎসরের উর্ধ্বকাল ঘুমাইয়াছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় তাহাদের কাছে একদিনের বেশী বলিয়া মনে হয় নাই।

এইসব সাঙ্কেতিক ঘটনা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বা জ্ঞান আপেক্ষিক (relative) এক এক অবস্থায় সময় এক এক

www.pathagar.com

রূপ ধারণ করে; কাজেই সময় সম্বন্ধে কাহারও ধারণা কাহারও সহিত মিলে না; অন্য কথায় : সময়ের প্রভাব সকলের উপর সমান নহে। এই জন্যই আইনষ্টাইন বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বলিয়া কোন টাইম নাই, সব টাইম লোকাল—There is no standard time, all time is ocal.

বস্তুত স্থান, কাল, মহাকর্ষ বা গতির প্রশ্ন লইয়া রসূলুল্লাহ্‌র সশরীরে মি'রাজ আর এখন অবিশ্বাস করা চলে না। বরং অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মি'রাজ বিশ্বাস না করিলে বর্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যই আর বুঝা যাইবে না। এখন নভোভ্রমণের বা গ্রহবিহারের (interplanatory flight বা space travel-এর) যুগ আসিয়াছে। পৃথিবী হইতে space-ship-এ চড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা চন্দ্রালোকে এবং মঙ্গলগ্রহে যাত্রা করিবে–ইহাই বিজ্ঞানের নবতম সাধনা। এই 'স্পেস-শিপ ও রফ্‌রফ্' বা 'রকেটের' সঙ্গে 'বোরাকের' কত নিকট সম্বন্ধ। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, 'বোরাকের' কথা বলিলে তাহা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস হয়, আর 'রকেটের' কথা বলিলেই তাহা নিরেট বৈজ্ঞানিক সত্য হইয়া দাঁড়ায়।

"Let us suppose that a hollow projectile, helding a man such a Jules Verne and Wells used on their voyage to the moon, should be sent off into pace with a velocity one twenty thousandth less than light. If at the end of a year the projectile should be caught like a comet by the gravitation of some star and be swung around and sent back to earth, the man on stepping out of his shell would be two years older, but he would find the world two hundred years older." (Easy Lessons in Einstein, by Edwin E Slosson)

অর্থাৎ : মনে করুন, একটা ফাঁপা চোঙের ভিতরে একটি মানুষ পুরিয়া আলোকের বিশ-সহস্রাংশের এক ভাগ কম গতিতে উর্ধ্বে ছুঁড়িয়া দেওয়া হইল। এক বৎসর চলিবার পর চোঙটি যদি কোন তারকার আকর্ষণে পড়ে এবং ধূমকেতুর মত সে যদি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিয়া পুনরায় সেই চোঙটিকে পৃথিবীতে নামাইয়া দেয়, তবে লোকটি চোঙটি হইতে নামিয়া দেখিতে পাইবে তাহার বয়স মাত্র দুই বৎসর বাড়িয়াছে, কিন্তু ইত্যবসরে পৃথিবীর ২০০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

এই রূপহীন জগৎকে দেখিবার জন্যই হযরতকে বস্তু-জগৎ হইতে বহু দূরে যাইতে হইয়াছিল। সে জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা কি বলিতেছে দেখুন:

In that extra-mundance reaim time ceases to flow gravitation no longer drages downward, matter is non-existent, light is immovable and change is impossible. Thus the new mathematics leads to a state curiously like the conventional conception of heaven." (Easy Lessons in Einstein)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : সেই অ-পার্থিব জগতে সময় বহে না, মহাকর্ষ নিচের দিকে টানিয়া নামায় না, পদার্থ বলিয়া সেখানে কিছুই নাই, আলোক সেখানে অচল, পরিবর্তন সেখানে অসম্ভব। কাজেই নূতন গণিত আমাদের স্বর্গের প্রচলিত ধারণার কাছেই লইয়া যাইতেছে।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, স্থান ও কাল সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণাই মি'রাজকে বিশ্বাস করিবার প্রধান অন্তরায়। স্থান-কালের ধারণা পরিবর্তিত হইলেই মি'রাজ সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কোন সন্দেহই জাগিবে না।

মি'রাজের তাৎপর্য

পূর্বেই বলিয়াছি : জগৎ জুড়িয়া সসীম ও অসীমের লীলাখেলা চলিয়াছে। সান্তের মধ্যে অনন্ত এবং অনন্তের মধ্যে সান্ত আসিয়া লুকোচুরি খেলা করিতেছে। সান্ত ও অনন্ত চায় পরস্পরকে উপলব্ধি করিতে। মি'রাজ হযরতের জীবনে সেই মহা উপলব্ধি। কেবলমাত্র সীমার মধ্যে বসিয়া আমরা যেমন অসীমকে সত্য করিয়া চিনিতে পারি না, শুধু অসীমের মধ্যে থাকিয়াও সেইরূপ সসীমকে চেনা যায় না। আমরা যখন কোন ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকি, তখন ঘরকে কি সত্য চিনি? সম্পূর্ণ চেনা চিনিতে হইলে ঘরটিকে ভিতর হইতেও দেখিতে হয়, বাহির হইতেও দেখিতে হয়। অসীমের পরিপ্রেক্ষণায় সসীমকে না দেখিলে এবং সসীমের পরিপ্রেক্ষণায় অসীমকে না দেখিয়া কাহারও পরিচয়ই সম্পূর্ণ হয় না। স্রষ্টাকে চিনিবার জন্য তাই হযরতকে সৃষ্টিতে আসিতে হইয়াছিল, আবার সৃষ্টিকে চিনিবার জন্য তাঁহাকে স্রষ্টার নিকটে যাইতে হইয়াছিল। এই জন্যই সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান একেবারে সম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছিল। মি'রাজের ইহাই তাৎপর্য।

অবশ্য অসীমকে কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। এ এক অদ্ভুত রহস্য। সীমার মাঝেই অসীম তাহার সুর বাজায়, রূপসাগরের মধ্যেই অরূপ-রতন ডুবিয়া থাকে। সেই অপরূপ যে কিরূপ, কিরূপে তাহা বুঝাইব। একই সীমাহীন মহাকালের মধ্যে যেমন দিনক্ষণে সপ্তাহ-মাস, বৎসর-শতাব্দী এক একটি স্বতন্ত্র রূপ লইয়া দেখা দেয়, অথচ একে একে সকলেই মহাকাল-বক্ষে মিলাইয়া যায়, অসীমের মধ্যে সসীমও ঠিক তেমনি করিয়া প্রকাশ পায়। সমুদ্র তরঙ্গ যেমন করিয়া নানা বৈচিত্র্যে লীলায়িত হইয়া পুনরায় সমুদ্রের বুকেই মিলাইয়া যায়, সসীমও তেমনি নানারূপে দেখা দিয়া অসীমের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়।

মি'রাজের সার্থকতা

মি'রাজের সার্থকতা কি? কেহ কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারেন। হযরত মুহম্মদের জীবনালোচনার প্রারম্ভেই আমরা দাবী করিয়া আসিয়াছি যে, তিনি হইতেছেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক ও আদর্শ। পাঠক সেই দাবীর কথা মি'রাজ রজনীতে একবার স্মরণ করুন এবং মনে মনে চিন্তা করুন : হযরত বাস্তবিকই আমাদের আদর্শ কি-না। সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহাকেই বলি—যাহার পূর্ণতা বা উৎকর্ষ একেবারে চরম। হযরতের আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা এই মি'রাজ রজনীতেই সম্পন্ন হয়

www.pathagar.com

নাই কি? এতবড় সত্যোপলব্ধির পর মানুষের আর কি কামনার থাকিতে পারে? কি সাধনার থাকিতে পারে? মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার শেষ সীমায় গিয়া তিনি পৌঁছিয়াছেন। কাজেই আধ্যাত্মিক জীবনে যখন কাহারও আলোর প্রয়োজন হয়, এ-পথের চরম বিশেষজ্ঞরূপে এই মরুভাস্করের চরণ শরণ লইতেই হয়।

স্থান, কাল এবং গতির উপর মানুষের যে অপরিসীম শক্তি ও অধিকার আছে, জড়-শক্তিকে সে যে অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে; মানুষের মধ্যেই যে বিরাট অতি মানুষ ঘুমাইয়া আছে, মি'রাজ সেই কথাই প্রমাণ করে।

আধ্যাত্মিক জগতে হযরতকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে স্বতঃসিদ্ধভাবে এ সিদ্ধান্তও মানিয়া লইতে হয় যে, ইহলৌকিক ব্যাপারেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ; কারণ ইহজীবনের আদর্শ পরজীবনের কল্যাণ দ্বারাই পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া চলিলে পরকালে মানুষের শাশ্বত কল্যাণ হইতে পারে, হযরত তাহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। কাজেই তিনি যে বিধান দিয়া গিয়াছেন, তাহা সেই পরমার্থ লাভের সহায়ক না হইয়াই পারে না। কেমন করিয়া কোন্ পথ ধরিয়া গেলে মক্কা-শরীফে পৌঁছিতে পারা যায়, সে নির্দেশ নির্ভুলভাবে একমাত্র তিনিই দিতে পারেন, যিনি নিজে তথায় গিয়াছেন। ধর্ম জগতেও ঠিক তাহাই। কেমন করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিলে মানুষ পরকালে অনন্ত সুখ ও শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা একমাত্র তিনিই বলিয়া দিতে পারেন-যিনি ব্যক্তিগত জীবনে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। কাজেই, হযরত মুহম্মদের নির্দেশিত সমাজ রাষ্ট্রবিধান অভ্রান্ত না হইয়াই পারে না।

এইখানে আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি। হযরতের 'মুহম্মদ' এবং 'আহমদ' নামকরণের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাও এই মি'রাজের মধ্যে নিহিত আছে। 'চরম প্রশংসিত' (মুহম্মদ) এবং 'চরম প্রশংসাকারী' (আহমদ)-হযরতের এই দুইটি নাম যে বাস্তবিকই সত্য, তাহা কি আজ নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে না? মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্‌তায়ালা মুহম্মদকে কি চরম যোগ্যতা এবং পরম গৌরব দান করেন নাই? কোন ফেরেশ্‌তা বা কোন পয়গম্বর যেখানে উঠিতে পারেন নাই, হযরত মুহম্মদ সেখানে উঠিয়াছিলেন। স্বয়ং ফেরেশ্‌তা জিব্রাইলও 'সিদ্‌রাতুল্‌মনতাহা' পর্যন্ত গিয়া তদূর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু হযরত তাহা অপেক্ষাও বহু উর্ধ্বে উঠিয়াছেন এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁহার আপন মহিমা এবং সৃষ্টিলীলার যাবতীয় রহস্য তাঁহাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এর চেয়ে বড় সম্মান, বড় প্রশংসা এবং বড় যোগ্যতা মানুষ বা পয়গম্বরের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে মুহম্মদ ছাড়া বিশ্বভুবনে আল্লাহ্‌তায়ালার চরম প্রশংসাকারীই বা কে? আল্লাহ্‌র চরম প্রশংসা তিনিই করিতে পারেন—যিনি তাঁহাকে চরমভাবে চিনিয়াছেন। চরমভাবে চিনিতে হইলে চরম নৈকট্যের প্রয়োজন। এই চরম নৈকট্য কি একমাত্র মুহম্মদের ভাগ্যেই ঘটে নাই? মুহম্মদের পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বর বা কোন মহাপুরুষ কি স্রষ্টার এত নিকটে পৌঁছিতে পারিয়াছেন? কাজেই একমাত্র মুহম্মদই যে আল্লাহ্‌র প্রকৃষ্ট পরিচয়দাতা বা চরম প্রশংসাকারী হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

www.pathagar.com

মি'রাজের সার্থকতার আর একটা দিকও আছে। হযরতের বিশ্বজনীন রূপও এই মি'রাজ রজনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এই রাত্রে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের সহিত হযরতের পরিচয় ঘটিয়াছে। হযরত প্রথমত জেরুজালেম গিয়া হযরত ঈসা-মূসা-সুলায়মানের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন মস্‌জিদে দুই রাকাত নামাজ পড়িয়াছেন এবং এইরূপে জবুর, তাওরাত ও ইঞ্জিলের সত্যকে শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তারপর সেখান হইতে বিভিন্ন আসমান পরিভ্রমণ করিয়া হযরত আদম, ঈসা, দাউদ, ইব্রাহিম প্রমুখ অতীতের যাবতীয় সত্যপ্রচারকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে সালাম জানাইয়াছেন। তাঁহারাও হযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বররূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। অতীতের সমস্ত ধর্মপ্রচারকদিগের সহিত এই যে যোগ-স্থাপন, ইহা হযরতের বিশ্বজনীন রূপেরই এক সুস্পষ্ট পরিচয় এবং ইসলামের সনাতনত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পূর্ববর্তী সমস্ত পয়গম্বরের প্রচারিত সত্যই যে ইসলামের মধ্যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সকল পথ ও মত যে হযরত মুহম্মদের মধ্যে আসিয়াই এক পরম ঐক্যে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, মি'রাজের মধ্য দিয়া সেই কথাটিই আমরা জানিতে পারি।

মি'রাজ আমাদের লক্ষ্য ও গন্তব্য পথেরই সন্ধান দেয়। আমাদিগকে অসীম অনন্তের পথে উধাও হইতে হইবে এবং অজানাকে জানিতে হইবে, এই বাণীই সে আমাদের কানে কানে বলে। মি'রাজের স্মৃতি অহরহ মনে জাগিলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব এবং তাঁহার নৈকট্য লাভ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন হয়; অসীম অব্যক্ত এবং অনির্বচনীয়ের একটা ছাপ আপনাআপনি মনের উপর দাগ কাটিয়া বসে। ফলে আমাদের চিন্তা ও কল্পনা উর্ধ্বমুখী হয়; জড়-জীবনের পঙ্কিলতার মধ্যে আমরা নিজদিগকে একেবারে হারাইয়া ফেলি না। বস্তুত মি'রাজ আল্লাহ্‌র ধারণাকে এবং আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের সম্পর্ককেই খাঁটি ইসলামী রং-এ রূপ দেয়। নিরাকারের ধ্যান ধারণাকে সে সহজ করিয়া আনে, মনের দিকচক্রবালকে সে সম্প্রসারিত করে।

মি'রাজ মানবাত্মার জয় ঘোষণা করিয়াছে। আত্মার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আল্লাহ্‌র মধ্যে যে সে বিলীন হইয়া যাইবে না, চিরকাল যে সে বাঁচিয়া থাকিবে, এই মহাসত্যই মি'রাজের মধ্য মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এইখানে ইসলামের জীবনদর্শন সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দর্শনের মতে আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়া যাওয়াই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু ইসলামের দর্শন অন্যরূপে। আল্লাহ্ মানুষকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে চাহেন না; অনন্ত জীবনে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন। আল্লাহ্‌তে লয়প্রাপ্তিই যদি আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য ও শেষ পরিণতি হইত তবে রসুলুল্লাহ্ আর মি'রাজ হইতে দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতেন না। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়া আমরা তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইব বটে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে নিজেকে বিলীন করিয়া দিব না; অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। মি'রাজে এই সত্যই প্রকটিত হইয়াছে।

ইহাই মি'রাজের স্বরূপ। সন্দেহবাদীরা ইহাকে নিছক কল্পনা বলিতে চাহেন বলুন, কিন্তু তাঁহারা জানিয়া রাখুন কল্পনারও এখানে একেবারে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

মানুষের কল্পনা ইহার চেয়ে আর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কাজেই কল্পনার দিক দিয়া ইহা একেবারে অতুলনীয়।[১]

বস্তুত যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, মি'রাজ সত্যই এক অপূর্ব ঘটনা। এই সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও হৃদয় পবিত্র হয়; মনের দিকচক্রবাল সম্প্রসারিত হইয়া যায়; মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বুকে বল ও ভরসা জাগে, অসীম ও বিরাট ধারণা মনের মধ্যে আপনাআপনি ঘনীভূত হইয়া উঠে।

সেই মহামানবের প্রতি সহস্র বার দরূদ ও সালাম—যিনি সমগ্র মানব জাতিকে এমন অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার বাণী দান করিয়াছেন এবং জ্ঞানের পরিধিকে সম্প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন।

---

১. মহাকবি দান্তে (Dante) তাঁহার 'Divine Comedy' নামক মহাকাব্যের পরিকল্পনা যে এই মি'রাজ হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষজ্ঞরা তাহা এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। এই সম্বন্ধে যাঁহারা বিশদরূপে জানিতে চাহেন, তাঁহারা Miguel Asin নামক প্রখ্যাত লেখকের 'Islam and the Divine Comedy নামক পুস্তকটি পাঠ করুন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১০
থিওসফী ও মি'রাজ

এইবার আমরা নূতন আর একটি দিক দিয়া মি'রাজের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য বিচার করিব। কিছুদিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশে 'থিওসফী' নামক নূতন এক অধ্যাত্মবিদ্যার খুবই প্রচলন হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগতের বহু বিষয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীরা আলোচনা করিয়াছেন এবং কার্যত অনেক কিছু অলৌকিক ব্যাপার সিদ্ধ করিয়াছেন। সেই 'থিওসফী'র আলোকে মি'রাজকে একবার পরীক্ষা করা যাউক।

'থিওসফী'র মতে মানুষের এই জড়দেহই (physical body) একমাত্র দেহ নহে; স্থূল দেহ ছাড়া তাহার আরও তিন প্রকার দেহ আছে; যথা–astral body (জ্যোতিদেহ), mental body (মানব দেহ) এর casual body (নিমিত্ত-দেহ)। এই অ-জড় দেহগুলিকে etheric double (ইথারিক ডবল) বলা হয়। স্থূল দেহের সঙ্গে ইথারিক দেহ মিশিয়া থাকে- যেমন থাকে মোটা পর্দার সাথে সরু পর্দার স্তর। স্থূল দেহ গঠিত হয় জড়জগতের উপাদান দ্বারা (যেমন-মাটি, পানি, আগুন, বাতাস ইত্যাদি) আর ইথারিক দেহ গঠিত হয় জ্যোতিঃ বা ইথার দ্বারা। সার্ট কোট যেমন আমাদের দেহের পোশাক, দেহগুলি তেমনি আমাদের আত্মার পোশাক। আসল বস্তু হইল আত্মা বা রূহ্ আর দেহ তাহার ঘর বা পোশাক। আমরা যেমন প্রয়োজন হইলে মোটা পোশাক ছাড়িয়া পাতলা বা হালকা পোশাক পরি; আত্মাও তেমনি প্রয়োজনবোধে ইথারিক দেহ ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

সব দেহই আত্মার বশ। যে মানুষের আত্মিক মুক্তি যত প্রবল, সে তত সহজেই দেহগুলিকে বশ করিতে পারে। ইহা করিলে সে যে- কোন দেহ ধারণ করিয়া নিজ কার্য সাধন করিতে পারে। জড়দেহের জাগ্রত অবস্থাতেও সে অপর যে কোন দেহ লইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা রাখে।

সূক্ষ্ম দেহকে ইচ্ছা করিলে সে অপরের দৃষ্টিগোচরও করাইতে পারে। এই জন্যই একই সময়ে একই মানুষ ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় তাহার নিজের চেহারায় অন্যত্র দেখা দিতে পারে। কেমন করিয়া পারে তাহা থিওসফীর ভাষাতেই শুনুন :

"If any person be observed who is much more developed, say one who is accustomed to function in the astral world and to use the astral body for that purpose, it will be seen that when the physical body goes to sleep and the astral body slips out of it, we have the man himself before us in full consciousness; the astral body is clearly outlined and definitely organised, bearing likeness of the man and the man is able to use it as a vehicle, a vehicle far more convenient than the physical"

(Man and His Bodies, by Annie Besant p. 49)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : জ্যোতির্দেহ লইয়া আধ্যাত্মিক জগতে কার্যক্ষম যদি কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার স্থূল দেহ যখন ঘুমায় এবং জ্যোতির্দেহ লইয়া সে যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখন আসল মানুষটাই সজ্ঞানে আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হয়; জ্যোতির্দেহটি সেই মানুষটিরই হুবহু প্রতিকৃতি লইয়া পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে। মানুষটি তখন সেই দেহকেই তাহার বাহনস্বরূপ ব্যবহার করে। এই বাহন স্থূল দেহের বাহন অপেক্ষা শতগুণে সুবিধাজনক।

বলা বাহুল্য, এই বিচ্ছিন্ন স্থূল দেহেরও তাহাতে কোন অসুবিধা হয় না, জ্যোতির্দেহের সহিত তাহার যোগসূত্র অক্ষুণ্ন থাকে। এই জ্যোতির্দেহ লইয়া মানুষ যে কোন দূরবর্তী স্থানে অপর কাহারও সম্মুখে উদয় হইতে পারে :

"A person who has complete mastery over the astral body can, of course, leave the physical at any time and go to a friend at a distance. If the person thus visited by clairvoyant, i. e. has developed astral sight, he will see his friends astral body; if not such a visitor might slightly densify his vehicle by drawing into it from the surrounding atmosphere particles of matter and thus materialise sufficiently to make himself visible to physical sight."

(Ibid. p. 55)

অর্থাৎ : কোন ব্যক্তি যদি তাহার জ্যোতির্দেহের উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে তবে সে যে-কোন সময়ে তাহার জড়দেহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্তী কোন বন্ধুর সম্মুখে দেখা দিতে পারে। বন্ধুটির জ্যোতির্দৃষ্টি যদি খুব প্রখর থাকে, তবে সে তাহাকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে, যদি তাহা না হয়, তবে আগন্তুক তখন তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ জড়প্রকৃতি হইতে কিছু কিছু জড় উপাদান আকর্ষণ করিয়া এমনভাবে ঘনীভূত হইয়া দাঁড়ায় যে, তখন তাহার বন্ধু তাহাকে চর্মচক্ষেই চিনিতে পারে।

জ্যোতির্দেহ (astral body) অপেক্ষা মানস-দেহ (mental body) আরও ক্ষমতাশালী। এই দেহ লইয়া মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ স্তরে বিচরণ করিতে পারে :

"The man fashions his mind-body into likeness of himself. Shapes it into his own image and likeness and is then in its temporary and artificial body, free to traverse the three planes at will and rise superior to the ordinary limitations of man."

অর্থাৎ : মানস-দেহ ধারণের ক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তি তাহার মানসমূর্তিকে নিজের আকৃতিবিশিষ্ট করিয়া লয়। এই কৃত্রিম দেহ লইয়া সে তখন যদৃচ্ছাক্রমে ত্রিভুবন বিহার করিতে পারে এবং মানুষের সাধারণ ক্ষমতার সীমারেখার ঊর্ধ্বে চলিয়া যায়।

এ-হেন শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছে পদার্থ বা স্থান কালের (matters, space and time) কোন বাধা-বন্ধন থাকে না।

"In this way, matter, time and space are conquered and barriers cease to exist for the unified man". (Ibid)

www.pathagar.com

অর্থাৎ : এই উপায়ে জড়, কাল এবং স্থানকে সে জয় করে; তাহার কাছে কোন বাধাই আর থাকে না।

এই অবস্থায় তাহার গতিশক্তিও অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া যায় ;

"Travelling in the astral body is so swift that the space and time may be said to be practically conquered for although the man knows be is passing through space, it is passed through so rapidly that the power to divide friend from friend is lost. All things that are seen are at once the moment attention is turned towards them: all that is heard at a single imprassion: space, matter and time as known in the lower world, have disappeared, sequence no longer exists in the eternal now." (Ibid)

অর্থাৎ : জ্যোতির্দেহে ভ্রমণ এত ক্ষিপ্র গতিতে সম্পন্ন হয় যে, স্থান-কাল প্রকৃতপক্ষে হার মানে; কারণ যদিও সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে যে স্থানকে অতিক্রম করিয়া সে চলিতেছে, তবু তাহার গতিবেগ এত ক্ষিপ্র হয় যে, বন্ধু হইতে বন্ধুকে পার্থক্য করিবার তাহার আর ক্ষমতা থাকে না। যাহা কিছু দেখিতে হয়, এক নিমেষেই দেখে, যাহা কিছু শুনিতে হয়, এক নিমেষেই শুনে। নিম্নজগতের স্থান, কাল এবং পদার্থ তখন দূরীভূত হয় এবং সেই চিরবর্তমানের মধ্যে ঘটনাপ্রবাহ বিলীন হইয়া যায়।

এইবার পাঠক মি'রাজের কথা আর একবার ভাবুন। নভোভ্রমণ যখন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব, তখন জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর এবং আল্লাহ্‌র রসূলের পক্ষে অসম্ভব কিসে?

অস্বাভাবিকতার দোহাই দিয়া এতদিন যাহারা শারীরিক মি'রাজকে বিশ্বাস বা অস্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, আশা করি এবার তাহারা নূতনভাবে চিন্তা করিবেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ: ১১
'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নাম কি সার্থক হইয়াছে

এই পুস্তকের প্রারম্ভেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি, বিশ্বনবী মুহম্মদের জীবন এবং কার্য কতদূর সফল হইয়াছে, তাহার বিচার হইবে-তাঁহার 'মুহম্মদ' ও 'আহমদ' নামের সার্থকতা দেখিয়া; অন্য কথায় : তিনি সত্যই 'মুহম্মদ' (চরম প্রশংসিত) এবং 'আহমদ' (চরম-প্রশংসাকারী) ছিলেন কিনা-এই বিচার হইবে তাঁহার মূল্য নিরূপণের কষ্টিপাথরে। এ-কথাও বলিয়া রাখিয়াছি, 'চরম প্রশংসিত' হইতে হইলেই তাহাকে চরম-পূর্ণ বা আদর্শ হইতে হয়, কেননা, 'চরম-পূর্ণ বা আদর্শ না হইলে কেহ কখনও চরম প্রশংসিত হইতে পারে না। কাজেই আল্লাহ্ যখন মুহম্মদকে 'চরম প্রশংসিত' আখ্যা দিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তায়ালা মুহম্মদকে 'আহ্মদ' অর্থাৎ 'চরম-প্রশংসাকারী' বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এই কথাই বুঝা যায় যে, মুহম্মদ আল্লাহ্র যে প্রশংসা করিয়াছেন, অর্থাৎ আল্লাহ্কে তিনি যেরূপ চিনিয়াছেন এবং চিনাইয়াছেন, তাহা মানুষের পক্ষে একেবারে চরম বা চূড়ান্ত হইয়াছে, অন্য কথায়, উহাই আমাদের নিকট আল্লাহ্র একমাত্র সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয়।

এখানে প্রশ্ন জাগিতে পারে : তবে কি হযরত মুহম্মদের পূর্বে কেহই আল্লাহ্কে সঠিকভাবে চিনিতে পারেন নাই, অথবা আল্লাহ্ কি অন্য কাহারও নিকট সম্পূর্ণ আত্মপরিচয় দেন নাই? বেদ-উপনিষদ, জিন্দাবেস্তা, জবুর, তওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ্র যে পরিচয় আমরা পাইয়াছি তাহা কি সত্য নহে? উত্তর : সে পরিচয় অনেকাংশে সত্য বটে, তবে সম্পূর্ণ ও ব্যাপক নহে, তাহা আংশিক। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন : হযরত মুহম্মদের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। এক ব্যক্তি বলিল : "হযরত মুহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লাহ। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" আর এক ব্যক্তি বলিল : "হযরত মুহম্মদের পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার তারিখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষ নবী ছিলেন।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল : "হযরত মুহম্মদ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আউয়াল, সোমবার সুবেহ সাদিকের সময় আরব দেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ। মাতার নাম আমিনা। জন্মের ছয়মাস পূর্বেই তাঁহার পিতা ইন্তেকাল করেন। কাজেই তাঁহার দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁহার লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ধাত্রী হালিমার নিকট তাঁহার শৈশব অতিবাহিত হয়-ইত্যাদি ইত্যাদি।" এইরূপভাবে পরিচয়ের গণ্ডিকে ধীরে ধীরে বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনা যায় যে, তখন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে জানবার আর কিছুই বাকী থাকে না। তাঁহার জন্ম, বংশ-পরিচয়, শিক্ষা, কর্মপ্রতিভা চরিত্র-মহিমা ইত্যাদি সমস্তই নিঃশেষিত রূপে বলা হইলে তবেই বলা যায় যে, সেই পরিচয় সম্পূর্ণ এবং চরম। আল্লাহ্র পরিচয় সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। হযরত মুহম্মদের পূর্বে যাঁহারা

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌কে চিনিয়াছিলেন এবং চিনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিচয় পূর্ণ ছিল না, অনেক ক্ষেত্রে সত্যও ছিল না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ আল্লাহ্‌র যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মানুষের জন্য একাধারে সঠিক এবং সম্পূর্ণ।

যাহাই হউক, আমাদিগকে এখন বিচার করিতে হইতেছে : হযরত সত্যই 'মুহম্মদ' এবং 'আহমদ' ছিলেন কি-না। অন্য কথায় : আমাদিগকে দেখিতে হইবে : (১) হযরত আদর্শ সৃষ্টি কি-না; (২) হযরতের প্রদত্ত আল্লাহ্‌-পরিচিতি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ কি-না। এই দুইটি পরীক্ষায় তিনি যদি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তবেই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী অক্ষুণ্ন থাকে। আমরা এখন সেই বিচারেই প্রবৃত্ত হইব।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১২

মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কি—না

মুহম্মদ 'মুহম্মদ' ছিলেন কি—না, অন্য কথায় তিনি আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি—না, তাহা প্রমাণ করিতে হইলে দুই উপায়ে তাহা সম্ভব : (১) যুক্তিজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা ভাবগতভাবে (subjectively). (২) জীবনের ঘটনাবলীর দ্বারা বস্তুগতভাবে (objectvely)। আমরা ভাবগতভাবেই অগ্রসর হইব।

১. ভাবগতভাবে

সর্বপ্রথম একটি কথা আমাদিগকে জানিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ কাহাকে বলিব? শ্রেষ্ঠত্বের সংজ্ঞা কিঃ মাপকাঠি কি?

বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় শ্রেষ্ঠত্বের মূলে আছে সত্য , সুন্দর এবং মঙ্গলের ধারণা। প্রকৃত শ্রেষ্ঠ হইতে হইলে তাহাকে সত্য হইতে হয়, সুন্দর হইতে হয় এবং মঙ্গল হইতে হয়। এই তিনটি কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করি। যে যতখানি সত্য, যতখানি সুন্দর, যতখানি মঙ্গল, সে ততখানি শ্রেষ্ঠ।

অপূর্ণতাই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিপন্থী। শ্রেষ্ঠ হইতে হইলেই তাহাকে সর্বপ্রকারে পূর্ণ হইতে হয়। কিন্তু সেরূপ পূর্ণ হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই যদি কেহ প্রকৃত শ্রেষ্ঠ থাকে, তবে সে হইতেছে সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের চিরনিলয়–সকল পরিপূর্ণতার একমাত্র অধিকারী—সেই পরমপূর্ণ আল্লাহ্। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র ধ্রুব আদর্শ। এই আদর্শের পাশে আনিয়াই আমরা অন্য সকলের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করিয়া থাকি।

তাহা হইলে এই কথা এখন সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ যখন আমাদের সকল শ্রেষ্ঠত্বের চিরন্তন আদর্শ, তখন অন্য যে কেহই আদর্শ বা শ্রেষ্ঠ হইতে চেষ্টা করুক না কেন, আল্লাহ্র গুণাবলীই তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। ইহা ছাড়া শ্রেষ্ঠ হইবার অন্য কোন পন্থা নাই। এই জন্যই হযরত মুহম্মদ সকল মানুষকে আল্লাহ্র গুণাবলীর অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন :

"তাখাল্লাকু বি আক্লাকিল্লাহ্"

অর্থাৎ : তোমরা আল্লাহ্র গুণাবলী অনুসরণ কর।

অতএব, আমরা এখন এ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, যিনি আল্লাহ্র গুণাবলী যতটা অনুকরণ করিতে পারিবেন, অর্থাৎ আল্লাহ্র যত নৈকট্য লাভ করিবেন, তিনি হইবেন আমাদের মধ্যে ততই শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ স্থানীয় এবং সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে যিনি আল্লাহ্র নিকটবর্তী বলিয়া পরিগণিত হইবেন তিনিই হইবেন আমাদের সকলের অনুকরণীয়। কাজেই হযরত মুহম্মদকে যদি আমরা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া দাবী করি, তবে আমাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, তিনিই আল্লাহ্র গুণাবলীকে সর্বাপেক্ষা অধিক আয়ত্ত করিয়াছেন। অন্য কথায় : তিনিই আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই বিচারের সামর্থ আমাদের খুব বেশী নাই। আল্লাহ্র গুণাবলী কে সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ত্ত করিয়াছেন, অথবা কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী

www.pathagar.com

হইয়াছেন, সে কথা আমরা কেমন করিয়া বলিব? এই যোগ্যতার সার্টিফিকেট দিবার একমাত্র অধিকারী স্বয়ং আল্লাহ্। কাজেই এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, সর্বাগ্রে আমাদিগকে তাহাই দেখিতে হইবে।

মি'রাজ রজনীর ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ পাক তাঁহার প্রিয় রসুল সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন :

"অতঃপর তিনি (মুহম্মদ) আল্লাহ্র নিকটবর্তী হইলেন এবং বিনীত হইলেন, দুইটি ধনুকের জ্যা অথবা তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী হইলেন।" (৫৩ : ৮–৯)

উপরোক্ত আয়াত হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হযরতই সর্বাপেক্ষা আল্লাহ্র নিকটবর্তী হইয়াছিলেন। 'দুইটি ধনুকের জ্যা' একটি আরবী প্রবাদবাক্য, ঘনিষ্ঠতম নৈকট্য হইতেছে উহার তাৎপর্য। কাজেই হযরত মুহম্মদ যদি আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠতম নৈকট্য লাভ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তিনিই ছিলেন আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি; অন্য কথায় : তিনিই সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সত্য, সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সর্বাপেক্ষা মঙ্গল। বলা বাহুল্য, বিশ্বনবীর মধ্যে আমরা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে দেখিতে পাই। তিনি প্রকৃতই ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের আধার। তিনি যে সত্য ছিলেন তার প্রমাণ : আপামর সাধারণের নিকট তিনি 'আল্‌মোমিন' বা সত্যময় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি যে সুন্দর ছিলেন, তাহার প্রমাণ আল্লাহ্ তাঁহাকে 'ওসওয়াতন হাসানা' (অর্থাৎ সুন্দর শ্রেষ্ঠ আদর্শ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর তিনি যে মঙ্গল ছিলেন, তাহার প্রমাণ : তিনি ছিলেন 'রহমতুল্লিল আলামিন' অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মূর্তিমান কল্যাণ ও আশীর্বাদ। বস্তুত বিশ্বমানবের মুক্তি ও কল্যাণই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র সাধনা।

কাজেই দেখা যাইতেছে, হযরত ছিলেন সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের মূর্তিমান আদর্শ। আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের ইহাই হইল তাৎপর্য।

কিন্তু কাহারও নৈকট্য লাভ করিতে হইলে, অর্থাৎ কাহারও আদর্শের অনুকরণ করিতে হইলে, একজন শিক্ষক বা পথ-প্রদর্শকের প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই। হযরতের শিক্ষক বা পথ-প্রদর্শক কে ছিলেন? এই প্রশ্ন এখানে উঠা স্বাভাবিক।

আল্লাহ্ নিজেই এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন:

"অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তাঁহাকে (মুহম্মদকে) শিক্ষা দিয়াছেন।" (৫৩ : ৫)

মানুষ নহে, ফেরেশ্‌তা নহে, স্বয়ং আল্লাহ্ হইতেছেন হযরতের শিক্ষক। কাজেই, এই শিক্ষা নির্ভুল এবং সম্পূর্ণ না হইয়াই পারে না। কোন শিল্পী নিজেই একটা মডেল বা আদর্শ কল্পনা করিয়া নিজেই যদি তাঁহার রচনা-কৌশল তাঁহার শিষ্যকে শিখাইয়া দেন, তবেই সে শিষ্য গুরুর অনুরূপ হইতে পারে, অন্যথায় নহে। বিশ্বশিল্পী আল্লাহ্ তাই তাঁহার প্রিয় হাবীবকে নিজে শিক্ষা দিয়াছেন। অন্য কোন মানুষের নির্দেশ বা শিক্ষাক্রমে যদি রসুলুল্লাহ্ তাঁহার জীবন-শিল্প রচনা করিতে যাইতেন, তবে তাহা কিছুতেই নির্ভুল বা সম্পূর্ণ হইতে পারিত না, কারণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও শক্তি লইয়া কোন মানুষই নির্ভুল পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে না এই জন্যই ত হযরত ছিলেন 'উম্মি' অর্থাৎ নিরক্ষর। তিনি যে জগতের কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করেন নাই, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। আল্লাহ্ নিজেই হযরত মুহম্মদকে শিক্ষা দিয়া

www.pathagar.com

পরিপূর্ণ আদর্শরূপে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করাইবেন বলিয়াই তাঁহাকে 'উম্মি' করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোন মানুষের নিকট হইতে কোনদিন শিক্ষা করা বিশ্বগুরুর পক্ষে শোভা পায় না। রসূলুল্লাহ্‌র কোন শিক্ষাগুরু থাকিলে তাঁহার বিশ্বগুরুর দাবী ত অচল হইতই, সঙ্গে সঙ্গে কুরআন শরীফের বিরুদ্ধে একটা প্রবল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারিত যে, কুরআনের অমুক অমুক মতবাদ হযরত মুহম্মদ অমুকের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন।

অতএব, দেখা যাইতেছে, স্বয়ং আল্লাহ্ ছিলেন হযরত মুহম্মদের শিক্ষা-দাতা এবং এই কারণেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হইতে পারিয়াছিল।

হযরত যে সত্য সত্যই পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিতেছেন :

"শক্তির অধিকারী তিনি (আল্লাহ্) কাজেই তিনি (মুহম্মদ) পূর্ণতা লাভ করিলেন।" (৫৩ : ৬)

অতএব, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন তিনি যে আমাদের আদর্শ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আল্লাহ্ তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতেছেন :

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রহিয়াছে। (৩৩ : ২১)

তিনি যে আমাদের পথ-প্রদর্শক, সতর্ককারী এবং পথের আলোকস্বরূপ তাহাও আল্লাহ্ বলিয়া দিতেছেন :

"হে রসূল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীস্বরূপ, সংবাদদাতাস্বরূপ, এবং সতর্ককারীস্বরূপ এবং আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণকারীস্বরূপ এবং আলোক-বিচ্ছুরণকারী মশালস্বরূপ।" (৩৩ : ৪৫-৪৬)

তাহা হইলে স্বয়ং আল্লাহ্‌র স্বীকারোক্তি হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং নিখিল বিশ্বের পরিপূর্ণ আদর্শ বা পথ-প্রদর্শক।

তাহা যদি হয় তবে এই কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, হযরত মুহম্মদ বিশ্বনিখিলের জন্য একটি মূর্তিমান করুণা বা আশীর্বাদও বটেন। দিশাহারা মানুষ, সীমাবদ্ধ তাহার জ্ঞান, পদে পদে ভ্রান্তি, পদে পদে প্রলোভন, পথ অতি বন্ধুর, আলো নাই, সাথী নাই—সর্বোপরি শয়তান তাহার প্রকাশ্য দুশমন। কেমন করিয়া সে তাহার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে। সে চায় তাই একজন উপযুক্ত পথ-প্রদর্শকের সাহায্য—চায় একটা নিখুঁত আদর্শ—যাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে তাহার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে। এরূপ একটা বিশ্বজনীন ধ্রুব আদর্শ মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই প্রয়োজন। সুতরাং সেরূপ আদর্শ যদি মিলে, তবে তাহাকে সৃষ্টির বুকে আল্লাহ্‌র দেওয়া একটা মূর্তিমান করুণা বা আশীর্বাদ ছাড়া আর কি বলা যায়? আশ্চর্যের বিষয়, আল্লাহ্ হযরতকে ঠিক এই বেশেই আমাদের নিকট পাঠাইতেছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন :

"এবং আমরা তাহাকে (মুহম্মদকে) নিখিল বিশ্বের জন্য মূর্তিমান করুণাস্বরূপ পাঠাইয়াছি।" (২১ : ১০৭)

এইরূপে যেদিক দিয়াই দেখি না কেন, আমরা দেখিতে পাইতেছি-হযরত মুহম্মদ আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও পরিপূর্ণ আশীর্বাদ। কাজেই, আমাদের জীবন তাঁহারই

www.pathagar.com

অনুকরণে গঠিত করিতে হইবে। কিন্তু সন্দেহবাদী প্রশ্ন করিবেন : আদর্শের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে? তবে ত আমাদের জীবন গঠনও ত্রুটিপূর্ণ হইবে। কাজেই আমাদের আদর্শ নির্ভুল ও চিরনির্ভরযোগ্য কি-না, সে সম্বন্ধে আমাদের স্থিরনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ কী বলিতেছেন, দেখুন :

"তোমাদের বন্ধু (মুহম্মদ) কখনও ভুল করেন না বা কখনও অকার্যকরী হন না।"

ইহার তাৎপর্য এই যে, হযরত মুহম্মদ চির অভ্রান্ত এবং চিরনির্ভরযোগ্য আদর্শ। হযরত যদি চির-অভ্রান্তই হন, তবে ইহা দ্বারা এ-কথাও বলা যায় যে, তিনি 'মাসুম' বা চিরনিষ্পাপ; কেননা ভুল-ভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেই হয় পাপের জন্ম। যিনি কখনও ভুল করেন না, তিনি নিশ্চয়ই চির-নিষ্পাপ।

কিন্তু এই চিরনিষ্পাপ হওয়া ত সহজ কথা নহে। মানুষ কিরূপে চিরনিষ্পাপ হইতে পারে? এইরূপ হওয়া সম্ভব হয় যখন কাহারও বচন বা কর্ম, ধ্যান ও ধারণা সেই চিরপবিত্র আল্লাহ্র দ্বারা চালিত হয়। নবীর বেলায় আমরা ঠিক তাহাই পাইতেছি। তিনি নিজে কিছুই করেন নাই বা বলেন নাই। সারাটা জীবনই তাঁহার আল্লাহ্র ইঙ্গিতে চালিত হইয়াছে; আল্লাহ্ যেরূপ নির্দেশ দিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই চলিয়াছেন বা বলিয়াছেন :

"তিনি (মুহম্মদ) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না।" (৫৩ : ৩)

অন্যত্র :

"তাহারা (পয়গম্বর) তাঁহাকে (আল্লাহ্কে) অতিক্রম করিয়া কোন কথা বলেন না এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্র আদেশানুসারেই কার্য করেন।" (২১ : ২৭)

অতএব আমরা এবার চূড়ান্তরূপে দেখিতে পাইতেছি যে, নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হইবার সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যই আছে হযরত মুহম্মদের মধ্যে।

হযরত মুহম্মদকে আমরা নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিলাম। কিন্তু এই কথা বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র পরেই হইতেছে মুহম্মদের স্থান; অর্থাৎ আল্লাহ্র ও মুহম্মদের মধ্যে কোন তৃতীয় ব্যক্তি নাই। অন্য কথায় : মুহম্মদ হইতেছেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি (viceroy) বা খলিফা।

এদিক দিয়াও আল্লাহ্ আমাদিগকে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ দেন নাই। হযরতকে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি (খলিফা) রূপেই পাঠাইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

হযরত আদমকে সৃষ্টি করিবার প্রাক্কালে আল্লাহ্ এবং ফেরেশ্তাদিগের মধ্যে যে কথাবার্তা হইয়াছিল, পাঠক তাহা এখানে স্মরণ করুন। আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"এবং যখন তোমার প্রভু ফেরেশ্তাদিগকে বলিলেন, আমি দুনিয়াতে আমার খলিফা পাঠাইব, তখন ফেরেশ্তারা বলিল : সে কি? আপনি দুনিয়াতে এমন জীব পাঠাইবেন-যাহারা ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও খুন-খারাবী করিবে? আমরাই আপনার পবিত্রতার গুণগান করিতেছি। তখন আল্লাহ্ বলিলেন : নিশ্চয়ই আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না।" (২ : ৩০)

এখানে সাধারণ মানুষ বা আদমকেই খলিফা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু গূঢ় অর্থের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে হযরত মুহম্মদকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জান না" এ-কথার গূঢ় রহস্য এই। আমরা

www.pathagar.com

যখন বলি : "পানি আমাদের জীবন ধারণের উপায়," তখন যেমন আদর্শ পানিকেই বুঝি, দূষিত পানিকে বুঝি না, সেইরূপ মানুষকে খলিফা বলিলে আদর্শ মানুষকেই বুঝায়, নিকৃষ্ট বা পশু প্রকৃতির মানুষকে বুঝায় না। সেই আদর্শ–মানুষই যখন হযরত মুহম্মদ তখন তিনিই হইতেছেন আল্লাহ্‌র খলিফা বা প্রতিনিধি।

একটি হাদিস হইতেও আমাদের এই কথার সমর্থন মিলে :

"আবু হোবায়রা বলিতেছেন : লোকে জিজ্ঞাসা করিল, হে রসূলুল্লাহ্, আল্লাহ্ আপনাকে কখন নবুয়ত দান করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন, আদম যখন রুহ্ এবং দেহের মধ্যবর্তী ছিলেন, অর্থাৎ আদমের যখন সৃষ্টিই হয় নাই।"[১] ইহা দ্বারাই বুঝা যায়, হযরতই সেই খলিফা বা প্রতিনিধি এবং ইহারই প্রেরণের ইঙ্গিত আল্লাহ্ ফেরেশ্‌তাদিগের নিকট দিয়াছিলেন।

কথা উঠিতে পারে : হযরত মুহম্মদই যদি সেই প্রতিনিধি হন, তবে তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ? তাঁহাদের অপেক্ষা তবে কি তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন?

"এবং নিশ্চয়ই আমরা কোন কোন পয়গম্বরকে কোন কোন পয়গম্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছি?"

বলা বাহুল্য, এখানে মুহম্মদের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। (১৭ : ২৫)

আল্লাহ্‌র রসূল মুহম্মদ

হযরত মুহম্মদ যে অন্যান্য পয়গম্বরদিগের অপেক্ষা সত্যই শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে যে কোনরূপ ত্রুটি–বিচ্যুতি বা অপূর্ণতা ছিল না, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, সমস্ত পয়গম্বরের মধ্যে তিনি ছিলেন একমাত্র রসূল। সকল পয়গম্বরই নবী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের "কেহই রসূলুল্লাহ্" নামে অভিহিত হন নাই। হযরত আদমকে বলা হইয়াছে 'আদম সফিউল্লাহ্', হযরত নূহকে বলা হইয়াছে 'নূহ নবীউল্লাহ্,' হযরত ইব্রাহিমকে বলা হইয়াছে 'ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্,' হযরত ইসমাইলকে বলা হইয়াছে 'ইসমাইল জবিহুউল্লাহ্,' হযরত মূসাকে বলা হইয়াছে 'মূসা কলিমুল্লাহ্,' হযরত ঈসাকে বলা হইয়াছে 'ঈসারূহ্‌আল্লাহ্; কিন্তু হযরত মুহম্মদকে বলা হইয়াছে 'মুহম্মদ রসূলুল্লাহ্'। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্'–সৃষ্টির এই মূল কলেমায় একমাত্র মুহম্মদের নামই আল্লাহ্‌র রসুলরূপে বিঘোষিত হইয়াছে। কুরআন–পাকেও আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছেন 'মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্,' (মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল) (৪৮ : ২৯) অন্যত্র তিনি তাঁহার হযরতকে ডাকিয়া বলিতেছেন, হে আমার রসূল' (৫ : ৬৭); কিন্তু অন্য কোন পয়গম্বরকেই আল্লাহ এরূপভাবে নিজের রসূল বলিয়া পরিচয় দেন নাই। 'ইব্রাহিম রসূলুল্লাহ্' 'মূসা রসূলুল্লাহ্,' বা ঈসা রসূলুল্লাহ'–এই ধরনের উক্তি কোথাও নাই। পক্ষান্তরে কুরআনের যেখানেই 'আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূল', 'আল্লাহ্‌র রসূল' অথবা শুধু 'রসূল' উল্লেখ আছে, সেখানে হযরত মুহম্মদকে বুঝানো হইয়াছে। ইহার কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই। ইহা দ্বারা বুঝা যায় : হযরত মুহম্মদকে যে অর্থে 'রসূল' বলা

১. "কুন্‌তু নাবীয়ান অ আদামো বাইনাররূহে অলজাসাদে।"

www.pathagar.com

হইয়াছে, তাহার একটা বিশেষ অর্থ আছে এবং ইহা অনন্যসাধারণ একটি খিতাব যাহা একমাত্র হযরত মুহম্মদের জন্যই সঞ্চিত ছিল।

এখানে কিছুটা তর্কের অবকাশ আছে হযরত মুহম্মদই যে একক রসূল ছিলেন, একথা অনেকে মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, কুরআন শরীফে বহু এমন আয়াত আছে যাহা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, হযরত মুহম্মদই একমাত্র রসূল ছিলেন না, তাহার ন্যায় আরও অনেকেই রসূল ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় :

১. "(হযরত নূহ বলিলেন) : হে আমার লোকসকল, আমার মধ্যে কোন ভুলভ্রান্তি নাই। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন রসূল।" (৭ : ৬১)

২. "(হযরত লূৎ বলিলেন) : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন বিশ্বস্ত রসূল।" (২৬ : ১৬২)

৩. "এবং কিতাবে মূসার কথা স্মরণ কর। নিশ্চয়ই তিনি একজন নবী ও রসূল ছিলেন।" (১৯ : ৫১)

এরূপ আরও আয়াত উদ্ধৃত করিয়া দেখানো যায় যে, অন্যান্য অনেক নবীও রসূল ছিলেন। "সৈয়দুল মোরসেলিন। 'আশরাফুল আম্বিয়া'–ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে রসূলের বহু বচন সূচিত হইতেছে।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমি বলিতে চাই যে, যে অর্থে 'মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল' সেই অর্থে তিনি একক এবং অনন্য। সব ভাষাতেই শব্দের একাধিক অর্থ বা প্রয়োগ–রীতি থাকে। একই শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে না। 'সালেহার স্বামী' আর 'গৃহস্বামীর' একই অর্থ নহে। সেইরূপ 'রাজপ্রতিনিধি (representative of the crown) শব্দটি দ্বারা বড়লাটকেও বুঝানো যায়, আবার একজন চৌকিদারকেও বুঝানো যায়। কারণ উভয়েই সম্রাটের প্রতিনিধিত্ব করে।

'রসূল' শব্দটিও তদ্রূপ। এর এক অর্থ রাজপ্রতিনিধি (vicegerent) বা[২] খলিফা, অন্য অর্থ বাণীবাহক বা messenger (দেখুন : লেসানুল আরব) এই শেষোক্ত অর্থেই বলা যায় যে, বহু রসূলই যুগে যুগে আল্লাহ্‌র বাণী বহন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ অর্থে হযরত মুহম্মদই ছিলেন আল্লাহ্‌র একমাত্র রসূল। (vicegerent) । এই জন্যই বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তাঁহার মূল কলেমায় সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহই উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্)।

কুরআন পাকে আল্লাহ্ যেখানে বহু রসূলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রসূলদিগের মধ্যে তারতম্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেখানকার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, সব বাণীবাহকই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আসিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের পদমর্যাদা সমান। এই তালিকায় হযরত মুহম্মদকেও গণ্য করিলে দোষ হয় না, কারণ প্রকৃতপক্ষে তিনিও ত আল্লাহ্‌রই বাণীবাহক। কিন্তু সমগ্র সৃষ্টির মোকাবেলায় কে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, সে বিচারে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একমাত্র মুহম্মদই সেই

---

২. রসূল শব্দের সাধারণ অর্থ যে দূত, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বেশীদূরে যাইতে হইবে না। পণ্ডিত নেহরু যখন সৌদী আরব পরিদর্শন করিতে যান, তখন তাঁহাকে 'রসূলুস সালাম' (শান্তির দূত) বলিয়া অভিনন্দিত করা হইয়াছিল।

www.pathagar.com

ব্যক্তি। সেই জন্যই আল্লাহ্ তাঁহাকে 'আর রসূল' (The Appostle) বলিয়াছেন। এই 'রসূল' একক এবং অনন্য।

হযরত মুহম্মদ যদি অন্যান্য সকলের ন্যায় সাধারণ একজন রসূলই হইতেন, তবে মূল কলেমার ভঙ্গি অন্যরূপ হইত। আল্লাহ্ তখন নিশ্চয়ই বলিতেন, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই এবং মুহম্মদ আল্লাহ্র একজন রসূল অথবা মুহম্মদ রসুলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেরূপ কোন ইঙ্গিত না দিয়া অথবা সেরূপ কোন অনুমানের অবসর না দিয়া আল্লাহ্ সোজাসুজি বলিয়া দিয়াছেন 'মুহম্মদ আল্লাহ্র রসূল'। বলা বাহুল্য, আর রসূলের (The Appostle) মধ্যেই তাঁহার অনন্যতার দাবী প্রতিপন্ন হইতেছে।

হযরত মুহম্মদকে যে আল্লাহ্ বিশেষ অর্থেই রসূলরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা কুরআন শরীফের একটি আয়াত হইতেও প্রতিপন্ন হয়। আয়াতটি এই :

"এবং আল্লাহ্ সমস্ত নবীদিগকে সম্মুখে রাখিয়া এই চুক্তি করিলেন যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে যে সব কিতাব এবং হিকমৎ দান করিয়াছি তাহা সত্য। অতঃপর একজন রসূল তোমাদের মধ্যে আসিবেন এবং তোমাদের মধ্যে যাহা যাহা আছে তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিবেন। তোমরা তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে এবং অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিবে।" (৩ : ৮৩)

এখানে আল্লাহ্ অন্য সমস্ত পয়গম্বরকে নবী বলিতেছেন, কিন্তু হযরত মুহম্মদকে রসূল বলিয়া বিশিষ্ট করিতেছেন।

অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মুহম্মদ ছিলেন অনন্যসাধারণ একজন রসূল। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয়।

আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অন্যান্য পয়গম্বর আসিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, কিন্তু হযরত মুহম্মদকে পাঠানো হইয়াছিল বিশ্বমানুষের মুক্তির জন্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে আল্লাহ্ হযরত নূহ সম্বন্ধে বলিতেছে :

"নিশ্চয়ই আমরা নূহকে তাঁহার লোকদিগের নিকট পাঠাইয়াছিলাম।" (৭ : ৫৯)

হযরত হূদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং আদ বংশের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা হূদকে পাঠায়াছিলাম।" (৭ : ৬৫)

হযরত সালেহ্ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং সমূদ জাতির প্রতি তাহাদের ভ্রাতা সালেহ্কে পাঠাইয়াছিলাম।" (৭ : ৭৩)

হযরত শোয়েব সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং মিদীয়দিগের প্রতি তাহাদের ভ্রাতা শোয়েবকে পাঠাইয়াছিলাম।" (৭ : ৮৫)

হযরত মূসা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং নিশ্চয়ই আমরা মূসাকে আমাদের বাণীসহ এই বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম : তোমার লোকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইস।" (১৪ : ৫)

হযরত ঈসা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং তিনি (আল্লাহ্) তাঁহাকে (ঈসাকে) ইসরাইল বংশীয়দিগের জন্য পয়গম্বর করিবেন।"[৩]

---

৩. বাইবেলে যিশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে- "I am not sent but into the lost sheep of the house of Israel."

www.pathagar.com

কিন্তু হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং আমরা তোমাকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে ছাড়া পাঠাই নাই।" (৩৪ : ২৮)

তাহা হইলে একথা এখন জোর করিয়া বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ ছিলেন নিখিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ।

যুক্তিবাদী তার্কিক এখানে বলিবেন : হযরত মুহম্মদ পূববর্তী পয়গম্বরদিগের মধ্যে না হয় শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পরে যে তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কোন পয়গম্বর আসিবেন না, তাহার প্রমাণ কী?

আমাদের কথা এই, ভবিষ্যতে যে আসিবেই তারই বা প্রমাণ কি?

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ

হযরত মুহম্মদ যদি সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর হন, একই কারণে তিনি সর্বশেষ পয়গম্বরও বটেন।

দার্শনিক ভঙ্গিতে দেখিতে গেলে দেখা যায়, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ ঠিক একই বিন্দুতে না মিশিয়া পারে না। অন্য কথায়, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকেই সর্বশেষ হইতে হয়। আবার যিনিই সর্বশেষ হইবেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ না হইয়া পারেন না। পরিপূর্ণতার মধ্যেই চরমত্ব নিহিত। চন্দ্র ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া অবশেষে যখন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে, তখন সে সর্বশ্রেষ্ঠ বটে। সর্বশেষও বটে পূর্ণচন্দ্রের পরের যে অবস্থা তাহার মধ্যে আর কোন অভিনবত্ব নাই; চন্দ্রের ক্রমবিকাশের চরম অবস্থা ঠিক পূর্ণচন্দ্রেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। কাজেই বলিতে হইবে, পূর্ণচন্দ্রেই চন্দ্রের শেষ অবস্থা (lastphase)। অতএব, এ কথা বুঝা এখন কঠিন নহে যে, বিকাশের শেষ যেখানে শ্রেষ্ঠত্বও সেখানে। শ্রেষ্ঠত্বের পরে যদি কিছু আসে, তবে সে তাহার অনুকরণ, অতিকরণ নহে। একবার যাহা পূর্ণত্ব লাভ করে, তাহা আর অধিকতর পূর্ণ হইতে পারে না। কোন বৃত্ত সত্যই যদি গোল হয়, তবে তাহা আর অধিকতর গোল হইতে পারে না, আবার কোন সরলরেখাই অধিকতর সরল হইতে পারে না। সেইরূপ হযরত মুহম্মদ যদি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকেন তবে একথা স্বয়ংসিদ্ধ যে, তদপেক্ষা পূর্ণতর বা শ্রেষ্ঠতর আর কেহই আসিতে পারে না।

শরিয়ত বা শাস্ত্রবাণীর দিক দিয়া আমরা হযরতকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু হযরতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের আরও একটি দিক আছে। সেটি হইতেছে সৃষ্টিতত্ত্বের দিক। সৃষ্টির দিক দিয়া ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলেও দেখা যাইবে, হযরত মুহম্মদই হইতেছেন সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আদিতে অন্য কিছু ছিল না। ছিলেন কেবল নিরাকার নির্বিকার এক আল্লাহ্। সুতরাং, সৃষ্টির উৎপত্তি একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া হইতেই পারে না। কিন্তু আল্লাহ্ নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন :

"কুলহু আল্লাহ আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লামইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ্ওয়ান আহাদ।"

অর্থাৎ : বল, আল্লাহ্ এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন না, অন্য কাহারও দ্বারা জাতও নহেন, তাঁহার মত এক আর নাই।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ এখানে 'আহাদ' রূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই আহাদ শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ ও নির্বিকার এক (Absolute One) –যে একের সহিত বহুত্বের বা ভিন্নত্বের কোন সম্বন্ধই নাই। অথচ সৃষ্টি হইতেছে বহু বা ভিন্নত্ব-বোধক। কেমন করিয়া তবে 'আহাদ' হইতে এই সৃষ্টির উৎপত্তি হইতে পারে? একটা মাধ্যম তার চাই-ই চাই।

আল্লাহ্র মনে সৃষ্টির ব্যগ্রতা যখন জাগিল, তখন সুনির্দিষ্ট একটা জ্যোতির্ময় ধ্যান নিশ্চয়ই বিচ্ছুরিত হইয়া আসিল। ইহারই নাম নূরে মুহম্মদী। সেই নূর হইতেই বস্তু জগতের (Objective World) সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

সৃষ্টির আদিতেই ছিল মুহম্মদের পরিকল্পনা। কেননা, মুহম্মদই ছিলেন সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু বা মূল লক্ষ্য। কাজেই সর্বপ্রথমেই সে জ্যোর্তিমূর্তি আল্লাহ্র ধ্যানে জন্মলাভ করিবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। এই অর্থেই বলা যায় যে, মুহম্মদ তাহার জন্মের আগেই জন্মিয়াছিলেন। শিল্পী যেমন তাহার মনের সেই চৈতন্য চিত্রটিকে ধীরে ধীরে রূপ দেয়, বিশ্বশিল্পী আল্লাহ্ ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহার প্রধান পরিকল্পনাটিকে ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছিলেন।

এইজন্য মুহম্মদকে সবার শেষে আসিতে হইয়াছিল। মুহম্মদকে প্রকাশ করিবার জন্যই অন্যান্য সব কিছুকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। মুহম্মদই হইতেছেন সৃষ্টিনাট্যের প্রধান চরিত্র। এই মূল লক্ষ্যবস্তুটি না হইলে আল্লাহ্ হয়ত আদৌ কোন-কিছু সৃষ্টি করিতেন না। ইহা আমাদের কল্পনার বিলাস নয়, হাদিস কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ্ই একথা বলিতেছেন :

"তুমি না হইলে আমরা আকাশ-মণ্ডলী (গ্রহ-নক্ষত্র) সৃষ্টি করিতাম না।"

কিন্তু শুধু প্রধান পরিকল্পনাটিকে সোজাসুজি রূপ দিলেই সে ছবি কখনও আদর্শ শ্রেণীর হইতে পারে না, তাহার জন্য চাই back ground-চাই একটা পারিপার্শ্বিকতা। সাদা কাগজের উপর শিল্পী যদি খুব সুন্দর একটা ছবি আঁকেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে না। তাহাকে দাঁড় করাইতে হইবে আলো-আঁধারের পশ্চাদ্ভূমিতে—যেখানে নাচিয়া চলিবে একটা গিরি-নির্ঝর,—হাসিয়া উঠিবে একটা ফুল-বিতান—গাহিতে থাকিবে কোয়েল-পাপিয়া, মাথার উপরে শোভা পাইবে মুক্ত নীলআকাশ—ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিবে পূর্ণিমার চাঁদ আর তারা। রূপে-রসে-বর্ণে-গন্ধে এমনি করিয়া সাজাইয়া দিতে হয় মনের কেন্দ্রীয় ভাববস্তুটিকে। আল্লাহ্তায়ালাও ঠিক তাহাই করিয়াছেন। সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে আগেই প্রকাশ করিয়া দেন নাই; সর্বাগ্রে তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার ব্যাকগ্রাউণ্ড। উর্ধ্বে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রশোভিত নীল আকাশ, নিম্নে সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা শ্যামল ধরণী—কোথাও বা ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা কুঞ্জবন, কোথাও বা নদ-নদী, কোথাও বা বিশাল বারিধি, কোথাও বা গগনচুম্বী পর্বতমালা। এইরূপে যেখানে যাহা সাজে তাহাই সাজাইয়া দিয়া অবশেষে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন তাঁহার সেই ধ্যানের ছবি মুহম্মদকে। বর আসিবার বহু পূর্ব হইতেই যেমন বিবাহ-বাড়িতে নিশিদিন বরের জন্য তাহারই ধ্যানমূর্তি, সমস্ত উপকরণে যেমন জড়াইয়া যায় তাহারই রূপ ও রং, উৎসব-আয়োজনের প্রত্যেক নরনারীই যেমন জানে সে বরের পরিচয়—হযরত মুহম্মদের বেলাও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গিরি-নদী, ফুল-ফল, জীব-জন্তু-সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল কাহার জন্য এই বিশ্বনিখিলকে এমন পরিপাটি করিয়া সাজানো হইতেছে; কাহার

www.pathagar.com

রং-এ তাহাদের ভিতর-বাহির এমন রাঙাইয়া যাইতেছে। সেই চিরবাঞ্ছিত অনাগত অতিথির আশাপথ চাহিয়া তাই পরীক্ষা করিতেছিল কুল্-মাখ্লুকাৎ; তাঁহারই ধ্যান, তাঁহারই স্বপ্ন জাগিয়াছিল তাহার নয়নতারায়, তাঁহারই চরণধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল তাহার প্রাণের গোপন গহনে। ফুল ফুটিবার পূর্বেই যেমন ফুলতরুর শাখায়-শাখায় পল্লবে-পল্লবে জাগে সেই ফুলের স্বপন, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব হইতে তেমনি ভুবন ভরিয়া জাগিতেছিল তাঁহার ধ্যান, তাঁহার ছায়া, তাঁহার রূপ, তাঁহার মায়া। মাটি-জল, রৌদ্র-বৃষ্টি, আলো-বাতাস সবাই যেমন ফুল ফুটাইবার জন্য ফুলতরুর অন্তরে-বাহিরে তাহাদের প্রাণের সমস্ত সম্পদ উজাড় করিয়া দেয়, বুলবুল যেমন সেই ফুলের আশাতেই নীরবে কুঞ্জতলে অপেক্ষা করে, হযরত মুহম্মদের আশাপথ চাহিয়া বিশ্বপ্রকৃতি তেমনি অপেক্ষা করিতেছিল। সকলেই জানিত হযরত মুহম্মদ আসিবেন। বেদ-পুরাণে, জবুর-তাওরাতে তাই ছিল তাঁহার আগমনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত; আদম, মুসা, ইব্রাহিম, ঈসা প্রমুখ পয়গম্বরগণ তাই শুনাইয়াছিলেন তাঁহার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী। এইরূপে না-জন্মিবার পূর্বেই তিনি জন্মিয়াছিলেন, না আসিবার পূর্বেই তিনি আসিয়াছিলেন। ভুবনে-ভুবনে, গগনে-গগনে তাই ত খেলিয়া বেড়াইতেছিল তাঁহার নূর—তাঁহারই জ্যোতির আভা।

সৃষ্টি-তত্ত্বের আর একদিক দিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে, মুহম্মদ ছিলেন আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ সৃষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতিতে আমরা দেখিতে পাই : প্রত্যেক বস্তুরই উৎপত্তি (origin), বিকাশ (development) এবং অবসান (end) আছে। শিশু ভূমিষ্ঠ হয় অতি ক্ষুদ্র অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া এমন একটি চরম বিকাশ-বিন্দুতে (culminating point) আসিয়া পৌছায়—যাহার পর আর তাহার বৃদ্ধি হয় না; তখন আসে তাহার অবরোহণের সময়। তখন হইতে সে দিনে দিনে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে একদিন সে চিরবিদায় গ্রহণ করে। বৃক্ষ প্রথম অঙ্কুরিত হয় ক্ষুদ্র অবস্থায়, তারপর ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে, বৃদ্ধির চরম অবস্থায় পৌছিলে সে আর বাড়ে না, তখন হইতেই সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া দেয়। চন্দ্র বাড়িতে বাড়িতে যখন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন আর বাড়ে না। তখন হইতেই আসে তাহার অপচয়ের পালা, ধীরে ধীরে সে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে অমাবস্যায় তাহার অবসান ঘটে। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুই একটা বৃত্ত (circle) ঘুরিয়া আসে। সেটিকে তাহার জীবন-চক্র বলা যাইতে পারে।

বহিঃপ্রকৃতিতে স্বতন্ত্র বস্তু সম্বন্ধে যাহা সত্য, সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধেও তাহা তদ্রূপই সত্য। সৃষ্টির আদি আছে, বিকাশের চরম বিন্দু আছে, অবসান আছে, প্রভাত-সূর্য যেমন পূর্ব-গগনে উদিত হইয়া ধীরে ধীরে বাড়িতে বাড়িতে মধ্য-গগনে আসিয়া পূর্ণতার রূপ পায়, তারপর নিস্তেজ হইয়া পশ্চিম-গগণে ঢলিয়া পড়ে এবং অবশেষে সন্ধ্যাকালে অস্তসাগরে ডুবিয়া যায়, নিখিল সৃষ্টিও তেমনি চলিয়াছে তাহার চক্রপথ ধরিয়া। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া সে চলিয়াছে পূর্ণতার দিকে; এই পূর্ণতা লাভ হইলেই বিবর্তনের ধারা পরিবর্তিত হইবে, তখন হইতে সে চলিবে অবসানের পথে। অবশেষে আসিবে একদিন মহাপ্রলয়—রোজ কিয়ামত। ইহাই সৃষ্টির নিয়তি।

এখন কথা এই : সৃষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়া গিয়াছে, না এখনও পৌছায় নাই?

www.pathagar.com

আমার মতে সৃষ্টি তাহার চরম পূর্ণতার বিন্দুতে পৌছিয়া গিয়াছে; এখন তার অধোগতির সময়।

কবে, কখন পৌছিল?

মধ্যযুগে—৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

কোথায়, কেমন করিয়া, কাহার মধ্য দিয়া?

বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়া। সৃষ্টির পরিপূর্ণ বিকাশের প্রতীকই হইতেছেন হযরত মুহম্মদ। এই সত্যই আল্লাহ্‌তায়ালা কী সুন্দরভাবেই না ব্যক্ত করিয়াছেন :

"এবং তিনি (মুহম্মদ) দিঙ্‌মণ্ডলের সর্বোচ্চস্থানে পৌছিয়াছেন।" (৫৩ : ৭)

হযরত মুহম্মদকে মধ্যাহ্ন সূর্যের সহিত তুলনা করাই সব দিক দিয়া সঙ্গত ও শোভন হইয়াছে। সৃষ্টির গগন-আঙ্গিনায় মধ্যাহ্ন-সূর্যের মতই ত তিনি দীপ্তিমান।

বস্তুত হযরত মুহম্মদ সমগ্র সৃষ্টিরই পরম প্রিয়। প্রত্যেকেই তাঁহার মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান পায়। জড়-চেতন প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি বিজড়িত। আলো-বাতাস-মাখা ঘাস ও পানি খাইয়া গরু দুধ দেয়, সেই দুধ হইতে হয় সর, সর হইতে হয় মাখন, মাখন হইতে হয় ঘি। ঘি-এর ভিতর থাকে তাই মাখন, সর, দুধ, ঘাস, পানি, আলো, বাতাস প্রত্যেকেরই অংশ বা দান। হযরতের সঙ্গেও আছে তেমনি সৃষ্টির সমস্ত উপাদানের সম্বন্ধ; প্রত্যেকেই তাই তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার দাবী করিতে পারে। এই সৃষ্টির মূলে ছিল পানি, তারপর আসিল মাটি, তারপর আসিল উদ্ভিদজগৎ, তারপর জিন-ফেরেশ্‌তা ও পশু-পক্ষী, সর্বশেষে আসিল মানুষ। মানুষই হইল "আশ্‌রাফুল-মাখ্‌লুকাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা-সৃষ্টি। কিন্তু এই মানুষের মধ্যেও আবার চলিল সাধনা। মানুষ ক্রমেই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এই অবস্থায় সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একজনকে না-একজনকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পূর্ণ হইতেই হইবে। কে সেই পরিপূর্ণ মহামানব?-ইনিই সেই হযরত মুহম্মদ। মুহম্মদের মধ্যে প্রত্যেকেই খুঁজিয়া পাইয়াছে তাহার জীবনের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতা। মুহম্মদের জন্ম-মুহূর্তে গ্রহে-গ্রহে লোকে-লোকে যে এমন পুলক শিহরণ লাগিয়াছিল, জিন-ফেরেশ্‌তা পশু-পক্ষী, তরুলতা, ফুল-ফল, আকাশ-বাতাস সকলেই যে দুলিয়া উঠিয়াছিল, সে আর কিছু নয়, সে প্রত্যেকেরই ধন্য হইবার আনন্দ,-প্রত্যেকেরই আত্মোপলব্ধির আনন্দ।

ইহাই হইতেছে হযরত মুহম্মদের প্রকৃত স্বরূপ। হযরত মুহম্মদ শুধু আরবের নহেন, এশিয়ার নহেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের; শুধু মুসলমানের নহেন, মানুষের নহেন-তিনি সমগ্র সৃষ্টির। তিনি শুধু আদর্শ মানব নহেন, আদর্শ পয়গম্বর নহেন-তিনি হইতেছেন আদর্শ সৃষ্টি। হযরতের মধ্যে তাই দেখি আমরা এক বিশ্বজনীন রূপ। মুসলমানেরা যদি বলে মুহম্মদ শুধু তাহাদের পয়গম্বর, অথবা যদি বলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, তবে সে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় নয়-সে কথার দ্বারা বরং হযরতকে খাটো করাই হয়। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে : তিনি শুধু মুসলমানদিগের পয়গম্বর নন-তিনি 'রহমতুল্লিল আলামিন'-তিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য পরিপূর্ণ কল্যাণ ও আশীর্বাদ। মুসলমানও যেমন করিয়া তাঁহাকে আপনার বলিতে পারে, হিন্দু-পার্শী-খ্রীষ্টানও ঠিক তেমনি করিয়া তাঁহাকে আপনার বলিতে পারে। সবার জন্যই তিনি আদর্শ—সবার জন্যই তিনি পথপ্রদর্শক। ধর্ম ও জাতির অভিমান এবং যুগসঞ্চিত সংস্কারের মোহে পড়িয়াই

www.pathagar.com

মানুষ আজ তাঁহাকে গণ্ডিভূত করিয়া দেখিতে শিখিয়াছে,–অনাত্মীয়ের মত তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতেছে; কিন্তু ইহা তাহাদের মস্তবড় ভুল। এ ভুল কবে ভাঙিবে?

হযরত মুহম্মদকে আমরা শ্রেষ্ঠ মানব বলিয়া দাবী করিলাম। যুক্তিজ্ঞান এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণাদিও দেখাইলাম। কিন্তু তিনি কল্পনার মানুষ নহেন, ঐতিহাসিক ব্যক্তি; কাজেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এ-দাবী টিকে কি-না, তাহাও আমাদের দেখা উচিত। হযরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিলে তাঁহার সহিত অন্যান্য মহাপুরুষদিগের একটা তুলনামূলক সমালোচনা করিতেই হয়। আমাদিগকে দেখাইতে হয়, তাঁহার পূর্বে এবং পরে যে সমস্ত পয়গম্বর বা মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বা পরিপূর্ণ (perfect)।

এইবার সেই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

হযরতের পূর্বে যে-সমস্ত পয়গম্বর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইহারাই ছিলেন প্রধান : হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইব্রাহিম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা প্রমুখ। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ছিলেন : মহাত্মা বুদ্ধ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, জোরোষ্টার, কনফুসিয়াস, সক্রেটিস ইত্যাদি। ইঁহাদের অপেক্ষা হযরত মুহম্মদ সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন কি-না-ইহাই আমাদের বিচার্য।

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া উচিত ছিল : কিন্তু তাহার স্থান এ নহে। সংক্ষেপে এই কথাই বলিতে চাই যে উপরে যে সমস্ত মহাপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহাদের একজনও হযরত মুহম্মদের মত পরিপূর্ণ (perfect) নহেন। তাঁহাদের পূর্ণ পরিচয়ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ নাই। অথচ হযরত মুহম্মদ হইতেছেন খাঁটি ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার জন্মমুহূর্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয়েরই বিবরণ মৌজুদ রহিয়াছে।

জীবনের প্রতি স্তরে, প্রতি পদক্ষেপে আমরা যে-সমস্যার সম্মুখীন হই, তার সবগুলির সমাধানই দেখিতে পাই এই আদর্শ মহাপুরুষের মধ্যে। যে-কোন অবস্থায় আমরা তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই আমাদের জিজ্ঞাসার উত্তর। কিন্তু হযরতের পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের মধ্যে সব জিজ্ঞাসার উত্তর নাই। মানব-জীবনের কোন কোন সমস্যার সমাধান তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন বটে, অথবা কোন কোন বিষয়ে নির্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু গোটা মানব-সমাজের পথ-প্রদর্শক বা আদর্শরূপে তাঁহাদের কাহাকেও আমরা দেখিতে পাই না। কে কেমনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে বিবাহ করিয়াছিলেন, কেমনভাবে ঘরসংসার পাতিয়াছিলেন, কেমনভাবে প্রতিবেশীদের সহিত কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কেমনভাবে যুদ্ধ করিয়া দেশ জয় করিয়াছিলেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি কেমনভাবে আচরণ করিয়াছিলেন; নারীকে কতখানি মর্যাদা দিয়াছিলেন, দাসদাসীদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, জীবন ও জগৎকে তাঁহারা কি চোখে দেখিতেন, কেমনভাবে তাঁহারা জাতি-গঠন করিয়াছিলেন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তাঁহাদের কেমন ছিল, যুগ সমস্যার কোন সমাধান তাঁহারা করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বিশ্বমানবের প্রতি তাঁহারা কোন বাণী দান করিয়া গিয়াছেন কিনা—ইত্যাদি দিক বিচার করিতে গেলে তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোন অভাব বা ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যাইবেই। হযরত মুহম্মদের

www.pathagar.com

ন্যায় অত সুস্পষ্ট জীবন তাঁহাদের কাহারও নহে। দয়া, ক্ষমা, দান, মহত্ত্ব, জ্ঞানানুরাগ, ত্যাগ, সেবা, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা, উদারতা-ইত্যাদি যাবতীয় গুণেরই বিকাশ দেখিতে পাই আমরা হযরত মুহম্মদের জীবনে। ধর্ম ও কর্মের, দীন ও দুনিয়ার এমন সুষ্ঠু সমন্বয় আমরা আর কাহার মধ্যে পাই?

এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের এখানে সম্ভব হইল না। পাঠককে আমরা আলোচনার সূত্রটি ধরাইয়া দিলাম মাত্র। পাঠক ইচ্ছা করিলে উপরোক্ত মহাপুরুষদিগের প্রত্যেককে হযরত মুহম্মদের পার্শ্বে আনিয়া এক একটি দিক দিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারেন, তারপর তাহার ফলাফল একত্র করিয়া হযরতের মূল্য নির্ধারণ করিতে পারেন। হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা পরিপূর্ণ আদর্শ বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিবেন না, তাহাদের প্রতি আমাদের আর্য : হযরতের পূর্ববর্তী মহাপুরুষদিগের কাহাকে লইবেন লউন, তুলনামূলক সমালোচনা করুন : তারপর বিচারে প্রবৃত্ত হউন। নিম্নলিখিত পয়েন্ট (Points)-গুলি লইয়া বিচার আরম্ভ করিতে পারেন :

বিচার-বিন্দু

১. জন্মমৃত্যুর সঠিক তারিখ, বংশ-পরিচয় এবং সমগ্র জীবনের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ আছে কিনা।

২. মানবীয় উপাদান কতখানি আছে; অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-পরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিয়াছিলেন কিনা; সামাজিক, নাগরিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনের কোন আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন কিনা এবং জীবন-যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিনা।

৩. মানব-জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিয়া গিয়াছেন কিনা।

৪. সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

৫. জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের খুঁটিনাটি প্রত্যেক কার্যের আদর্শ বা বিধান দিয়া গিয়াছেন কিনা।

৬. নারীজাতি, দাস-দাসী, শত্রু-মিত্র, স্বদেশী-বিদেশী, স্বধর্মী-বিধর্মী-শ্রেণীর লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন বা করিতে বলিয়াছিলেন।

৭. কি কি জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

৮. সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-নীতি, স্নেহ, মমতা, প্রীতি, প্রেম, ক্ষমা, ত্যাগ, সেবা, সংযম, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, উদারতা, সৎসাহস, নির্ভীকতা, তেজস্বিতা, বীরত্ব, আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, মানবপ্রেম, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা, বিশ্বমানবতা-ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কি কি পরিচয় পাওয়া যায়।

৯. আপন ধর্ম মত প্রচার করিবার জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার এবং বিপদ-বরণ করিয়াছিলেন।

১০. আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উৎকর্ষ কাহার কতখানি হইয়াছিল।

১১. কোন ঐশীগ্রন্থ লাভ করিয়াছিলেন কিনা এবং করিলে তাহা অদ্যাবধি অবিকৃত অবস্থায় আছে কিনা।

১২. শিষ্যদিগের উপর কে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন; শিষ্যদিগের মধ্যেই বা কে কতখানি গুরুভক্তি এবং ধর্মনিষ্ঠা দেখাইতে পারিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

১৩. কাহার ধর্মবিধান বিশ্বমানুষের উপর সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইয়াছে। অন্য কথায়; বিশ্বজনীন আবেদন (Universal appeal) কোন্ ধর্মে বেশী।

১৪. ধর্ম ও কর্মের অথবা ইহকাল ও পরকালের মিলিত আদর্শ তাঁহার মধ্যে পাইতে পারি কিনা।

১৫. জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারী তাঁহার মধ্যে জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পায় কিনা, অন্য কথায় বিশ্বমানবের তিনি পথ-প্রদর্শক কিনা।

১৬. যুগসমস্যার সমাধানকল্পে কে কতখানি সহায়ক।

১৭. বহির্জগতের সহিত নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার গুণ কাহার ধর্মে কত বেশী।

১৮. কাহার ধর্ম কত উদার আর কত ব্যবহারোপযোগী (practical) ।

১৯. জ্ঞান-সভ্যতায় কোন্ ধর্মের দান কতখানি।

২০. ইহজীবন ও পরজীবনের ব্যাপক পরিচয় কোন্ ধর্মে আছে।

২১. মানুষের অপরিসীম শক্তি এবং সম্ভাবনার বাণী কে মানবজাতিকে দান করিয়াছেন।

আপাতত এই পয়েন্ট (points)-গুলি লইয়া তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে।

আমরা একটি দৃষ্টান্ত লইয়া পরীক্ষা করিব। উপরোক্ত পয়েন্টগুলির ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া হযরত মুহম্মদের সহিত এইখানে আমরা বুদ্ধদেবের তুলনা করিয়া দেখিব। অবশ্য কোন মহাপুরুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; ইসলামে তাহা নিষিদ্ধও বটে। শুধু হযরত মুহম্মদকে যথার্থরূপে বুঝিবার বা বুঝাইবার জন্যই এই তুলনার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

বুদ্ধ	মুহম্মদ
১। জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ, বংশ-পরিচয় অথবা ঐতিহাসিক বিবরণ আংশিক পাওয়া যায়।	১। সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। হযরত মুহম্মদ একজন পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ও লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।
২। মানবীয় উপাদান খুব বেশী নাই; বুদ্ধ সারাজীবন সংসারী ছিলেন না; সামাজিক বা রাষ্ট্র-জীবনের কোন সুস্পষ্ট আদর্শ তিনি রাখিয়া যান নাই। জীবন-সংগ্রামে নামেন নাই।	২। মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ। হযরত বাল্য-জীবনে আমাদেরই মত মানুষ ছিলেন। পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রজীবনেরও সকল আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। জীবন-সংগ্রামে বীরের মত যুদ্ধ করিয়াছেন।
৩। মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার উপর কোন আলোকপাত তিনি করেন নাই। বরং সমস্যাকে এড়াইয়া তিনি নির্বাণের পথে গিয়াছেন।	৩। বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। রাখাল হইতে সম্রাট পর্যন্ত সকল অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

www.pathagar.com

	বুদ্ধ	মুহম্মদ
৪।	সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে বুদ্ধ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন বিস্তৃতরূপে জানা যায় না।	জানাযায়।
৫।	জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্যের কোন বিধান বা আদর্শ বুদ্ধের জীবনে অল্পই পাওয়া যায়।	বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে কি করিতে হয়, কিরূপভাবে তাহাকে লালন-পালন করিতে হয়, কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়, বিবাহ দিতে হয়, ঘর-সংসার করিতে হয় মৃত্যুকালে কি করিতে হয়-প্রত্যেকটি বিধান হযরত দিয়াছেন।
৬।	নারী জাতির প্রতি বুদ্ধের খুব উচ্চ ধারণা ছিল বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-পুত্রকে তিনি সাধন-পথের বিঘ্ন স্বরূপ মনে করিতেন। দাস-দাসী সম্বন্ধেও তাঁহার মনোভাব অজ্ঞাত। অন্যান্য সকলের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে-না-হইবে, তাহার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ তিনি দেন নাই।	নারী-জাতিকে হযরত পুরুষের সম-অধিকার দিয়াছেন। ইসলাম প্রচারে তাঁহার স্ত্রীই ছিলেন তাঁহার প্রধান সহায়। দাস-দাসীর প্রতিও আদর্শ ব্যবহার করিয়াছেন। দাস-মুক্তির তিনি ছিলে ন অগ্রদূত। শত্রু-মিত্র বা স্বধর্মী-বিধর্মীদিগের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল আদর্শ।
৭।	বুদ্ধ মানুষের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, কিন্তু সে অন্যরূপ। জরা-মৃত্যু ও শোক--দুঃখ হইতে মানুষ কিসে মুক্তিলাভ করিতে পারে, ইহাই বুদ্ধের সাধন। জাতিগঠনের বা সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের মধ্য দিয়া মানুষকে প্রেম করিয়া বা সেবা করিয়া-সমাজ বা রাষ্ট্র হইতে দূরে থাকিয়া আত্মচিন্তায় বিভোর হইয়া মুক্তি লাভ করাই ছিল বুদ্ধের ধর্ম-পদ্ধতি।	হযরত সমাজে বাস করিয়া মানুষের পাশে দাঁড়াইয়া ভাইয়ের মত, প্রতিবেশীর মত সকলকে সাহায্য ও সেবা করিয়াছেন। মানব-কল্যাণই তাঁর প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বমানুষের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। সারাটি জীবন ব্যাপিয়াই তিনি মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।

www.pathagar.com

বুদ্ধ	মুহম্মদ
৮। অহিংসা, জীবে প্রেম, সততা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়নীতি সামাজিক সাম্য ইত্যাদি অনেক মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, তবে মানব-জীবনের সম্পূর্ণ গুণাবলীর একত্র সমাবেশ তাঁহার মধ্যে ঘটে নাই। কোন কোন দিক অতি উজ্জ্বল বটে।	৮। সম্পূর্ণ গুণাবলীই হযরতের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়- কোনটিরই অভাব নাই। প্রত্যেক গুণেরই তিনি পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।
৯। আপন ধর্মমত প্রচার করিতে গিয়া বুদ্ধ বিশেষ কোন বাধা বা সংগ্রামের সম্মুখীন হন নাই। কাজেই তাঁহার বিশেষ কোন পরীক্ষা হয় নাই।	৯। হযরতকে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং সেই পরীক্ষায় তিনি গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।
১০। বুদ্ধের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অন্য প্রকারের ছিল। তিনি ছিলেন সংশয়বাদী অথবা নিরীশ্বরবাদী; কাজেই তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নয়ন কোন পথে কতখানি হইয়াছিল বলা কঠিন। অবশ্য নৈতিক উৎকর্ষ যথেষ্ট ছিল। ঐরূপ ত্যাগী ও সিদ্ধ পুরুষ পৃথিবীতে খুব অল্প জন্মিয়াছে।	১০। হযরতের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবন একবারে পূর্ণ পরিণত হইয়াছিল।
১১। ঈশ্বরকেই যখন পান নাই, তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, কোন ঐশ্বরিক গ্রন্থও তিনি পান নাই।	১১। আল্লাহ্‌র কুরআন তিনি লাভ করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ইহা অবিকৃত অবস্থায় আছে।
১২। শিষ্যদিগের উপর বুদ্ধের প্রভাব খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। শিষ্যদিগকে নূতন ধর্মমতের জন্য কঠোর কোন অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই। তবে সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে জগতে বুদ্ধের শিষ্যরাই সর্বাপেক্ষা বেশী।	১২। শিষ্যদিগের উপর অসাধারণ প্রভাব ছিল। হযরতের জন্য শিষ্যেরা অকাতরে প্রাণদান করিয়াছেন; কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে দাঁড়াইয়াও কেহ হযরতকে বা তাঁহার ধর্মকে পরিত্যাগ করেন নাই। এখন পর্যন্ত এ প্রভাব সমভাবে বলবৎ রহিয়াছে।

www.pathagar.com

বুদ্ধ	মুহম্মদ
১৩। বুদ্ধের ধর্ম-বিধান মানব সমাজের উপর খুব বেশী কার্যকরী হইতে পারে নাই। বুদ্ধের অহিংসবাদ বা সন্ন্যাস জগতের কোন জাতিই পালন করিতেছে না-এমন কি তাহার আপন শিষ্যেরা পর্যন্ত না। তবে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধের মানব-প্রেম, ত্যাগ ও অহিংসার বাণী যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দেবদেবীবাদকে অস্বীকার করিয়া এবং মানুষে মানুষে সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধ মানব-সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।	১৩। জগতের সমস্ত চিন্তাধারা আজ ইসলামমুখীন। ইসলামের তৌহিদ, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, বিশ্বমানবতা, নারী—প্রগতি, দাসমুক্তি, সমাজতন্ত্র-সমস্তই এখন বিশ্বের সাধারণ সম্পদ।
১৪। বুদ্ধের মধ্যে ধর্ম ও কর্মের মিলিত আদর্শ নাই।	১৪। হযরতের মধ্যে দুইটিই পুরামাত্রায় আছে। ধর্ম ও কর্মকে তিনি এক সাথে মিলাইয়া দিয়াছেন।
১৫। বুদ্ধের জীবনে মানব-জীবনের সর্বস্তরের দৃষ্টান্ত নাই।	১৫। হযরতের জীবনে কিশোর, যুবক, গৃহী, সেনাপতি, রাষ্ট্রনেতা ইত্যাদি সকল স্তরের দৃষ্টান্ত বা আদর্শ আছে।
১৬। যুগে যুগে মানব-সমাজে যে সব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সমাধান-কল্পে বুদ্ধ কোন আদর্শ বা বিধান রাখিয়া যান নাই।	১৬। হযরতের জীবনে সব সমস্যারই সমাধানের দৃষ্টান্ত বা ইঙ্গিত রহিয়াছে। যে কোন যুগ-সমস্যার সমাধান তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।
১৭। বহির্জগতের সহিত কেমন করিয়া নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে হইবে তাহার কোন নির্দেশ বা নিদর্শন বুদ্ধের জীবনে পাওয়া যায় না।	১৭। বাহিরের সহিত খাপ খাওয়ানো (adaptability) ইসলামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

www.pathagar.com

বুদ্ধ	মুহম্মদ
১৮। বুদ্ধের ধর্ম অনেকাংশে ইসলামের মতই উদার। অন্য ধর্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্মে প্রবেশাধিকারই তাহার প্রমাণ। জাতিভেদ ছিল না, ইহাও উল্লেখযোগ্য। তবে, বৌদ্ধধর্ম খুব যে ব্যবহারোপ-যোগী ছিল তাহা মনে হয় না। কর্মজ্ঞ বুদ্ধের বাণী অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে।	১৮। উদার-বিশ্ব-মানবের সমন্বয় সাধনই ইসলামের লক্ষ্য- মহামানবতাই তাহার বাণী। ইসলামই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারোপযোগী সাম্য ও মৈত্রীর ধর্ম। বস্তুজগতের সহিত ইসলামের আদর্শের চমৎকার সুসঙ্গতি আছে।
১৯। বিশ্বসভ্যতায় বৌদ্ধ ধর্মের দান অপরিসীম। নালন্দার ইউনিভার্সিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ভারতের লিপিজ্ঞান বৌদ্ধদেরই দান। চীনাদের দানও যথেষ্ট আছে। তবে কোন বিপ্লবী চিন্তা বা প্রগতিশীল মতবাদ বৌদ্ধ ধর্মে প্রায় অনুপস্থিত।	১৯। বিশ্বের জ্ঞানসভ্যতা হযরতের কাছে বহু পরিমাণে ঋণী- বর্তমান যুগ (Modern Age) ইসলামেরই সৃষ্টি। নানাভাবে ইসলাম জগতের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।
২০। বুদ্ধ ইহজীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু পরজীবনের উপর কোনই আলোকপাত করেন নাই।	২০। ইসলাম উভয় জীবন সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা ও নির্দেশ দিয়াছে। বর্তমান যুগের প্রায় সমস্ত আন্দোলনই ইসলাম দ্বারা প্রভাবান্বিত। ইসলাম বিপ্লবী ধর্ম। বিশ্বমানবতা, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, গণতন্ত্র, আন্ত-র্জাতিকতা সমস্তই ইসলামের দান।
২১। মানুষের কোন অন্তর্নিহিত শক্তি সম্ভাবনা বা মর্যাদার কথা বুদ্ধ বলেন নাই।	২১। মানুষের শক্তি ও সম্ভাবনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ইসলামেই রহিয়াছে। মানুষের আত্মা অমর, তাহার শক্তি অসীম, গ্রহে-গ্রহে তারায়-তারায় সে ফিরিতে পারে—আল্লাহ্‌র নিচেই তাহার আসন-ইহাই ইসলামের বাণী।

বস্তুত আমাদের দাবী এই যে, হযরত মুহম্মদ তাঁহার পূর্ববর্তী সমুদয় মহাপুরুষদিগের অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাঁহারা এই দাবী মানিবেন না, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের দাবী পেশ করুন এবং প্রমাণ করিয়া দেখান যে, তাঁহাদের মনোনীত মহাপুরুষই হযরত মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। এই প্রমাণের দায়িত্ব আমাদের নহে, তাঁহাদের।

www.pathagar.com

সৃষ্টির আদিকাল হইতে হযরত মুহম্মদের সময় পর্যন্ত যত মহাপুরুষ জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করিলাম এবং দেখিলাম, তুলনায় তাঁহাদের কেহই হযরত মুহম্মদের সমকক্ষ অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। এইবার হযরত মুহম্মদের মৃত্যু হইতে আজ পর্যন্ত যে-সমস্ত মহাপুরুষ বা ধর্ম প্রচারক আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করা যাউক।

হযরত মুহম্মদের মৃত্যুকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দশত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; এই সময়ের মধ্যে কোন পয়গম্বর যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ইতিহাসই তাঁহার সাক্ষী; মার্টিন লুথার, চৈতন্য, কবীর, রামমোহন রায়, কেহই পয়গম্বর ছিলেন না। ছোট ছোট কোন মতবাদ তাঁহারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের জীবনের কার্যও তত ব্যাপক নহে। অনেকে আবার ইসলামের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই স্বীয় মত প্রচার করিয়াছিলেন। কাজেই হযরত মুহম্মদের সহিত তাঁহাদের কোন তুলনাই চলে না।

আর কাহাদের কথা তবে বলিব? নেপোলিয়ান, পিটার, আকবর, হিটলার, মুসোলিনী, কার্লমার্কস্-ইঁহাদের কথা ত আসিতেই পারে না, কারণ ইঁহারা রাজনৈতিক নেতা। মানব-চরিত্রের দুই-একটা দিক ইঁহাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে মাত্র; ইঁহারা কোন ধর্ম বা নীতির বাস্তব আদর্শ স্থাপন করেন নাই।

অতএব, দেখা যাইতেছে, চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি মুহম্মদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁহার সমকক্ষ।

বাকী রহিল ভবিষ্যৎ। সংশয়বাদীরা অপেক্ষা করিতে থাকুন।

২। বস্তুগতভাবে

যুক্তিজ্ঞান ও শরীয়তের দিক দিয়া আমরা নানাভাবে হযরত মুহম্মদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম। এইবার আমরা তাঁহার বাস্তব জীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইব এবং দেখিব, কার্যতও তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কিনা।

হযরতের বিশ্বজনীন রূপ

সর্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে হযরতের বিশ্বজনীন রূপের প্রতি। এমন সর্বগুণসমন্বিত অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানব বিশ্বজগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। হযরত মুহম্মদ যে কেবলমাত্র মানুষের জন্য পূর্ণ আদর্শ ছিলেন, তাহা নহে; সমগ্র সৃষ্টির (creation) জন্যই তিনি ছিলেন চিরন্তন আদর্শ। জড়জগৎ, উদ্ভিদজগৎ, প্রাণিজগৎ, মানবজগৎ, অধ্যাত্মজগৎ, সৌরজগৎ, ফেরেশ্‌তাজগৎ-ইত্যাদি মিলিয়া যে বিশ্বজগৎ (universe) সেই বিশ্বজগতেরই তিনি আদর্শ। অন্য কথায় তিনিই হইতেছেন সমগ্র সৃষ্টির একমাত্র প্রতিনিধি (representative)-তাঁহার মধ্যে সকলেই নিজ নিজ আদর্শ ও প্রেরণা খুঁজিয়া পাইতে পারে। হযরতের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যত ঘটনা ঘটিয়াছে, সমস্তই মিলাইয়া দেখা যাইবে, নিখিল সৃষ্টি তাঁহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই জন্যই ত হযরতের জীবনের পরিসর ছিল এত ব্যাপক। ধূলার ধরণী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত সপ্ত-আসমানের সর্বত্র ছিল তাঁহার কর্মভূমি। একদিকে যেমন দেখিতে পাই রাখাল বেশে তিনি মাঠে মাঠে মেষ চরাইতেছেন, অপরদিকে তেমনি দেখি সম্রাট বেশে তিনি রাজ্য চালনা করিতেছেন; একদিকে তিনি কুলি-মজুর সাজিয়া মাটি কাটিতেছেন, গৃহ নির্মাণ করিতেছেন, জুতা

www.pathagar.com

সেলাই করিতেছেন, পিরহান তৈয়ার করিতেছেন, মেথরের কাজ করিতেছেন; অন্যদিকে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেছেন, দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন, সেবাসংঘ গঠন করিয়া আর্ত-পীড়িতের সেবা করিতেছেন। একদিকে তিনি বিবাহ করিয়া সংসার পাতিয়াছেন, স্বামী, পিতা ও প্রতিবেশীর কর্তব্য পালন করিতেছেন, দুনিয়ার সবকিছু উপভোগ করিতেছেন, অপরদিকে নিভৃত গিরিগুহায় বসিয়া কঠোর সাধনায় মগ্ন রহিতেছেন—রোজা রাখিয়া পেটে পাথর বাঁধিয়া দিন কাটাইতেছেন। একদিকে হিযরত করিয়া অত্যাচারীদিগের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, অপরদিকে যালিমকে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন; একদিকে সেনাপতি বেশে বীরের মত যুদ্ধ করিয়া শত্রুজয় করিতেছেন; অপরদিকে পরম শত্রুকে ক্ষমা করিয়া বক্ষে স্থান দিতেছেন; একদিকে সঞ্চয় করিতেছেন, অপরদিকে সর্বস্ব বিলাইয়া দিতেছেন; একদিকে দুনিয়ার খবর রাখিতেছেন, অপরদিকে অসীম রহস্যলোকে প্রবেশ করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত কথা কহিতেছেন। বস্তুত রাখাল, ভিখারী, দাস-দাসী, পিতা-পুত্র, ভ্রাতা-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রী, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, গৃহী, প্রতিবেশী, নাগরিক, কর্মী, জ্ঞানী, সন্ন্যাসী, স্বধর্মী-বিধর্মী, স্বদেশী-বিদেশী, যোদ্ধা-সেনাপতি, শত্রু-মিত্র, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, জিন-ফেরেশ্‌তা, গওস-কুতুব, ফকীর-দরবেশ, নবী-রসূল-সকলের জন্যই তিনি ছিলেন আদর্শ। কর্মজগতেও তিনি যেমন আদর্শ, আধ্যাত্মিক জগতেও ছিলেন তেমনি আদর্শ। পূর্ণ আদর্শের বৈশিষ্ট্যই ত এই। যে আদর্শের মধ্যে বিশেষ বিশেষ লোক বা বিশেষ বিশেষ প্রাণী মাত্র প্রেরণা পায়, সে আদর্শ কখনও সম্পূর্ণ নহে। বিশ্বনিখিলের আদর্শ হইতে হইলে সমস্ত উপাদানই তাহার মধ্যে থাকা চাই। হযরত মুহম্মদের মধ্যে ছিল ঠিক তাহাই।

এইজন্যই হযরতকে যাঁহারা আমাদেরই মত সাধারণ মানবরূপে কল্পনা করেন, আবার তাঁহাকে পূর্ণ আদর্শও বলেন, তাঁহাদের কথা আত্মবিরোধী। শুধু রক্তমাংসের মানুষ হইলে তিনি কিছুতেই বিশ্বনিখিলের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিতেন না। কাজেই হযরতের জীবন হইতে সমস্ত অলৌকিকত্বকে কাটিয়া ছাঁটিয়া যাঁহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র 'মাটির মানুষ' বেশেই দাঁড় করাইতে চাহেন তাঁহারা দস্তরমত হযরতকে খাটো করেন। হযরত মুহম্মদকে একান্তরূপে মানুষের মত করিয়া যিনি দেখিতে চাহেন দেখুন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যদি বলেন যে, হযরত সাধারণ একজন মানুষ বৈ আর কিছু নহে, তবে সেখানেই হইবে তাঁহার গলৎ। একজন রাখাল বালকের হাতে যদি একখানি ক্ষুরধার তরবারি দেওয়া যায়, তবে সে তাহা দিয়া ঘাস কাটিবে, লাঠি চাঁচিবে, আম ছুলিবে, গর্ত খুঁড়িবে—ইত্যাদিভাবে তাহার জীবনের ছোট-খাটো অভাবগুলি মিটাইয়া লইবে; কিন্তু তাই বলিয়া তরবারির সত্য পরিচয় ত ইহা নহে। উপযুক্ত সৈনিকের হাতে পড়িলে উহা দিয়াই সে উৎপীড়িতকে রক্ষা করিবে বা দেশ জয় করিবে। তরবারির এই পরিচয় রাখালের নিকট অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কিন্তু সে জোর করিয়া বলিতে পারে না যে, তরবারির কাজ শুধু ঘাস কাটা। একই সূর্যের আলোকে ভিখারী শীত নিবারণ করিতেছে, গৃহিণী ধান শুকাইতেছে, তরুলতা নিজেদের জীবন-শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া কত গবেষণা করিতেছে, শিল্পী তাহার সাহায্যে আলোকচিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে, ডাক্তার তাহার মধ্য হইতে রোগ নিবারণের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে, কবি-দার্শনিক তাহার

www.pathagar.com

মধ্যে আল্লাহ্‌র মহিমা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছে, আবার হিংস্র পশুর দল সেই আলোককেই ভয় করিয়া বিজন বনে আত্মগোপন করিতেছে। হযরত মুহম্মদ ঠিক সূর্যরশ্মির মত। যাহার যেরূপ প্রয়োজন, সে তাঁহার মধ্যে তাঁহাই পাইবে।

ফেরেশ্‌তা বা অন্যান্য অশরীরী প্রাণীদিগেরও তিনি যে আদর্শ ছিলেন, তাহার প্রমাণ আমরা কোরআন-হাদিস হইতে পাই। কোরআন বলিতেছে :

"বল (হে মুহম্মদ), ইহা (কোরআন) আমার কাছে অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহা একদল জিন শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিল : নিশ্চয়ই আমরা এক অপূর্ব কালাম শ্রবণ করিলাম। উহা সত্য পথে চালিত করে; কাজেই আমরা উহাকে বিশ্বাস করি এবং আমরা আমাদের প্রভুর পার্শ্বে কাহাকেও স্থাপনা করি না।" (২৭ : ১ - ২)

হযরত নিজেও বলিতেছেন :

"ইন্না কাফ্‌ ফাতাল্‌লিন্নাসে ফা আরসালাহু ইলালজিন্নি ওয়াল ইন্‌সে।"

অর্থাৎ : তাঁহাকে (হযরতকে) জিন এবং মানুষ উভয়ের জন্য পাঠান হইয়াছে।

ফেরেশ্‌তারা যে হযরতের অনুরক্ত ভক্ত ছিল, তাহা বহু ভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে। এমনি কি তাহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌ আদমকে সিজদা পর্যন্ত করাইয়াছেন। আদম সম্বন্ধে যখন এই, তখন হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে ত কথাই নাই। জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা মানুষের চেয়ে মর্যাদায় বড় নহে।

শুধু-জিন-ফেরেশ্‌তা নহে, সমস্ত পয়গম্বরও হযরত মুহম্মদকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর পশুপাখী, তরুলতা, চাঁদসুরুজ, মেঘবিদ্যুৎ ইত্যাদি সৃষ্ট জগতের প্রত্যেকেই হযরতকে আদর্শ জ্ঞানে তাজিম করিত, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। মেঘ যে তাঁহাকে ছায়া দান করিয়া লইয়া গিয়াছিল, শুষ্ক তরুশাখা যে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছিল, মূর্তি যে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই- স্বাভাবিকভাবেই ইহা হইয়াছিল। কেন? তাহা বলিতেছি :

হাদিস শরীফ হইতে জানা যায়—হযরত বলিতেছেন :

"কুল মওলুদুন ইউলাদো আলাল্‌ ফিৎরাতে।"

অর্থাৎ : প্রত্যেকেই স্বভাবের উপর সৃষ্টি হইয়াছে।

এই স্বভাবের (Nature) স্বভাব কি? স্বভাবের স্বভাব হইতেছে আল্লাহ্‌র হুকুমে চালিত হওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। পীর-পয়গম্বর অলি-আল্লাহ্‌ বা গওস-কুতুব আল্লাহ্‌রই নিয়োজিত দূতবিশেষ; আল্লাহ্‌র শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই তাঁহারা আসেন। কাজেই ইচ্ছা করিলে তাঁহারা (আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে) স্বভাবকে আয়ত্ত করিতে পারেন। যেহেতু স্বভাব আল্লাহ্‌কে মানিতে বাধ্য, কাজেই পয়গম্বরদিগকে মানিতেও সে বাধ্য।

হযরতকে এইরূপ সর্বব্যাপী আদর্শ হইতে হইয়াছিল বলিয়াই আমরা তাঁহাকে বহুরূপে দেখিতে পাই। শুধু প্রথম শ্রেণীর নীতিপূর্ণ ঘটনাবলী দ্বারাই তাঁহার জীবন গঠিত হয় নাই। মানুষের বাস্তব জীবনে প্রতিদিন যাহা ঘটে—হাসি কান্না, দ্বন্দ্ব- কোলাহল, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজ্য-চালনা-সবকিছুর আদর্শই আছে হযরতের জীবনে। শুধু অলৌকিক বা আভিজাত্যপূর্ণ ঘটনা দ্বারাই যদি তাঁহার জীবন গঠিত হইত তবে তিনি চিরদিন আমাদের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা তিনি হইয়া যাইতেন 'দেবতা'—মানুষ তাঁহার দিকে শুধু অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া

www.pathagar.com

থাকিত, বন্ধু বলিয়া হাত ধরিয়া আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া বসাইতে পারিত না, অথবা তাঁহার নিকট হইতে কোন-কিছু গ্রহণ করবারও ভরসা পাইত না। এইজন্যই হযরতকে আল্লাহ্‌র দূত হইয়াও মাটির মানুষ হইতে হইয়াছে। ইহাতে মানুষেরই মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মানুষের শক্তি যে কত ব্যাপক ও অসীম, তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। কাজেই কেহ যেন মনে না করেন যে, হযরত আমাদের মতই সাধরণ মানুষ ছিলেন। অনেকে এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই আয়াতটির উল্লেখ করেন ·

"কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিস্‌লুকুম ইউহা এলাইয়া।"

অর্থাৎ : বল, আমি তোমাদেরই মত মানুষ আমার উপর অহি-নাযিল হয়।

এই আয়াত দ্বারা এই কথা বলা হয় নাই যে, হযরত আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। যাঁহারা এই অর্থ করেন তাঁহারা উপরোক্ত আয়াতটির দুইটি অংশ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করেন; তাই এই ভুল হয়। উহা একটি মিশ্র বাক্য; অখণ্ডরূপে ইহার অর্থ করিতে হইবে। "আমি তোমাদের মতই মানুষ। আমার উপর অহি নাযিল হয়।"– এইরূপ করিলে চলিবে না। "আমি তোমাদের মতই মানুষ যাহার উপর অহি নাযিল হয়''–ইহাই হইবে উহার প্রকৃত অর্থ। "যাহার উপর অহি নাযিল হয়" এই অংশটুকু "মানুষ'' শব্দের বিশেষণজ্ঞাপক। অতএব বাক্যটির অর্থ প্রকারান্তরে এইরূপ দাঁড়ায় : "আমি একজন অহি-নাযিল-হওয়া মানুষ।" 'অহি-নাযিল হওয়া মানুষ'' নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক; কারণ সাধারণ মানুষের উপর অহি নাযিল হয় না। অথবা অহি নাযিল হইলেই সে আর তখন সাধারণ মানুষ থাকে না, পয়গম্বরের স্তরে উন্নীত হইয়া যায়।

হযরত যে আমাদের মত সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন :

"লাস্‌তো কা আহাদিকুম ইন্নি আবিদো ইনদা রাব্বি ইউৎমিনি অইউসকিনি।"

অর্থাৎ : (হযরত বলিতেছেন) আমি তোমাদের কাহারও মত নই আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে রাত্রি যাপন করি, তিনি আমাকে পানাহার করান।

ইহাই যখন হযরতের সত্যরূপ, তখন কেমন করিয়া তাঁহাকে আমরা শুধুই 'আমাদের মত মানুষ' বলিতে পারি? জাতে (genus) তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতিমানুষ (superman) বা পূর্ণ মানুষ (ইন্‌সান্-ই-কামিল।)

শেষোক্ত অর্থে হযরতকে আমরা অতিমানুষ নাও বলিতে পারি। মানুষকে ছোট করিলেই অতিমানুষকে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোরআনের নির্দেশ অনুসারে মানুষের সংজ্ঞা নির্ণয় করিলে আর এই অতিমানবতা দাঁড়াইতে পারে না। মানুষকে বলা হইতেছে 'আশরাফুল মাখ্‌লুকাৎ' অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। জিন-ফেরেশ্‌তা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা-সব কিছু অপেক্ষা মানুষ শ্রেষ্ঠ। মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা; অন্য কথায় আল্লাহ্‌র নিচেই মানুষের স্থান। সেই মানুষের মধ্যেই হযরত হইলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। এইরূপ ধরিলে হযরতকে আর অতিমানব বলিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। তখন যুক্তিধারা এইরূপ দাঁড়ায় :

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ,
মানুষের মধ্যে হযরত মুহম্মদ শ্রেষ্ঠ,

www.pathagar.com

অতএব, হযরত মুহম্মদ সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ।

এই হিসাবে হযরতকে মানুষ বলিতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। যদি আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের ভিতরে অসীম শক্তি ও অনন্ত সম্ভাবনা লুক্কায়িত রহিয়াছে, তবে এই কথা সহজেই বলা যায় যে, হযরত মুহম্মদ যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই মানবীয় আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহাকে আমরা মো'জেজা বা অলৌকিক বলি, অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃতিক বলি, তাহাও আর তখন মানবগণ্ডির বাহিরে পড়িয়া থাকে না। তখন অতিমানবতাকেও মানবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা যায়।

শুধু ইহজগতে নহে, পরজগতেও হযরত মুহম্মদ নেতৃত্ব করিবেন। মহা-বিচারের দিন মানুষের মুক্তির জন্য অন্য কোন পয়গম্বরের সুপারিশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, সে ক্ষমতা থাকিবে শুধু হযরত মুহম্মদের। এই সম্বন্ধে কোরআন বলিতেছে : "তিনি (আল্লাহ্) জানেন তাঁহাদের (পয়গম্বরদিগের) সম্মুখে এবং পশ্চাতে কি আছে এবং তাঁহারা শাফায়াৎ করিতে পারিবেন না-কেবলমাত্র একজন ছাড়া যাহাকে আল্লাহ্ মনোনীত করিয়াছেন এবং তাঁহার (আল্লাহ্‌র) ভয়ে তাঁহারা কাঁপিতে থাকিবেন।"

(২১ : ২৮)

অন্যত্র :

"এবং যাঁহাদিগকে তাহারা (মানুষেরা) ডাকিবে তাঁহারা কেহই শাফায়াৎ করিতে পারিবেন না—কেবল তিনিই পারিবেন যিনি সত্যের সাক্ষী এবং তাহারা তাঁহাকে চিনে।"

আশান বর্ণিত একটি হাদিসেও অবিকল এই কথারই প্রতিধ্বনি আছে।

(দেখুন : মেশ্‌কাত)

অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি : ইহলোক-পরলোক, জড়-জগতে আধ্যাত্মিক জগতে মানুষ বেশে—পয়গম্বর বেশে, সর্বক্ষেত্রেই এবং সর্ব অবস্থাতেই হযরত মুহম্মদ কুল্‌মাখলুকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাঁহাকে এমন সর্বব্যাপী হইতে হইয়াছে। পূর্ণ আদর্শ যিনি হইবেন, তাঁহাকে সকলের ডাকেই সাড়া দিতে হয়, সকলের জিজ্ঞাসারই জবাব দিতে হয়; সকলের কাছেই ধরা দিতে হয়।

হযরতের জীবন তাই মধ্যদিনের সূর্যালোকের ন্যায় একেবারে সুস্পষ্ট। ইহার কোনখানে কোন হেঁয়ালী নাই, অস্পষ্টতা নাই, অনুমানের বা কল্পনার অবসর নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনে যাহা কিছু ঘটে, সমস্তই তাঁহার মধ্যে আছে। শিশু জন্মিলে কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিতে হইবে, শিক্ষা দিতে হইবে, কেমন করিয়া সে মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনকে ভক্তি করিবে, কেমন করিয়া সে বিবাহ করিবে, কেমন করিয়া ঘর-সংসার পাতিবে, কেমন করিয়া ধর্ম-কর্ম করিবে, কেমন করিয়া খাইবে, পরিবে, শুইবে, বসিবে-সর্ববিষয়ের আদর্শই তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

শুধু মানুষের বাহিরের দিক নহে, ভিতরের দিক দিয়াও আমরা সেখানে নিরাশ হই না। মানুষের দাম্পত্য জীবনের যে-অংশ অতি গোপন, সেখানেও তাঁহার সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারি। এই সুস্পষ্টতা শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ, সন্দেহ নাই। অন্যান্য পয়গম্বরদিগের সহিত হযরতের পার্থক্য এইখানে। এই জীবনের কোনখানে কোন

www.pathagar.com

তিলিসমাতের খেলা নাই, খানিকটা দেখাইয়া খানিকটা লুকাইয়া দর্শকবৃন্দকে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার প্রয়াস নাই। জীবনের সবখানি উন্মুক্ত করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে আলো-বাতাসের মধ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; যখন খুশি, যেখানে খুশি, দেখুক এবং শিখুক। কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে আদর্শস্থানীয় বা নিখুঁত না হইলে দিবারাত্রি এইরূপভাবে খোলা জায়গায় ফেলিয়া রাখা সম্ভব নহে।

বস্তুত হযরত মুহম্মদ সত্যই এক অপরূপ সৃষ্টি। আল্লাহ্ তাঁহাকে বিশ্বনিখিলের জন্য পরিপূর্ণ বাস্তব আদর্শরূপে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছেন। অবশ্য কোরআন শরীফে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়; কিন্তু সে ভাবগতভাবে—বস্তুগতভাবে নহে। শুধু মুখে উপদেশ দিলে কাজ হয় না; আদর্শও দেখাইয়া দিতে হয়। রাসায়নিক যেমন শিক্ষার্থীদিগকে তাঁহার কর্তব্য বলিয়া অবশেষে হাতে-কলমেও (demonstration) দেখাইয়া দেন, হযরত মুহম্মদের মধ্য দিয়াও আল্লাহ্ ঠিক তাহাই করিয়াছেন। আল্লাহ্ যাহা কোরআনে বলিয়াছেন হযরতের জীবনের মধ্যে তাহার বাস্তব রূপও দেখাইয়াছেন। হযরত মুহম্মদ তাই আমাদের মূর্তিমান কোরআন অথবা কোরআনের বাস্তব রূপায়ণ।

সর্ব ধর্মের প্রতি উদারতা

হযরতের জীবনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে : সর্বধর্মের প্রতি তাঁহার উদারতা। এই দুনিয়ায় কত ধর্ম এবং কত জাতিই না আছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হইতে স্বতন্ত্র। ইসলামের সহিত তাহাদের কোনটিরই প্রায় কোন মিল নাই, কারণ ইসলাম হইতেছে বিশুদ্ধ তৌহিদবাদ; অথচ অন্যান্য সব ধর্মই অল্প-বিস্তর পৌত্তলিকতায় বা নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম একেবারে শান্ত ও শান্তিকামী। প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে পূর্ববর্তী নবী-রসূলদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে— ইহা কোরআনের আদেশ। বিশ্বাসীদিগের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"বল, আমরা আল্লাহ্তে বিশ্বাস করি এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুবের প্রতি এবং অন্যান্য গোত্রের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা ঈসার প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা (অন্যান্য) পয়গম্বরদিগের প্রতি তাহাদের প্রভুর তরফ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে; আমরা তাঁহাদের কাহারও ভিতরে কোন ভেদাভেদ করি না এবং আল্লাহ্র প্রতি আমরা আত্মসমর্পণ করি।" (২ : ১৩৬)

অন্যত্র :

"এবং যাহারা তোমার প্রতি যাহা (যে ঐশী গ্রন্থ) অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তোমার পূর্বে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করে, তাহাদের পরকাল সম্বন্ধে কোন ভয়নাই।"

অন্যত্র :

"আল্লাহ্র রসূল তাঁহার উপর যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে বিশ্বাস করেন, বিশ্বাসীরাও ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস করে; তাহারা সকলে আল্লাহ্কে তাঁহার ফেরেশ্তাদিগকে, তাঁহার কিতাবসমূহকে এবং তাঁহার পয়গম্বরদিগকে বিশ্বাস করে।" (২ : ২৮৫)

www.pathagar.com

ইহাই হইতেছে কোরআনের শিক্ষা। আল্লাহ্‌তায়ালা আরও বলিতেছেন :

"এমন কোন জাতি নাই—যেখানে আমি আমার সতর্ককারী পাঠাই নাই।" (৩৫ : ২৪)

অন্যত্র বলিতেছেন :

"এবং প্রত্যেক জাতিরই এক একজন পয়গম্বর ছিল।" (১০ : ৪৭)

তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কথার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে, সর্বদেশ এবং সর্বজাতির মধ্যেই কোন-না কোন পয়গম্বর আসিয়াছেন। কাজেই ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে পয়গম্বর আসিবার কথা। তাহা যদি হয়, তবে ব্যাস, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রমুখ মহাপুরুষেরা (অথবা অন্য কেহ) পয়গম্বর হইলেও হইতে পারেন। আর পয়গম্বর হইলেই কোরআনের শিক্ষা অনুসারে মুসলমান তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য।

ধর্মনীতি হিসাবে ইসলামের এই বিধান কত উদার, কত সহনশীল। বস্তুত ইসলামের ধাতুগত অর্থই হইতেছে 'শান্তি'। সকল বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়া শান্তিতে বাস করাই হইতেছে তাহার লক্ষ্য। ধর্ম প্রচারে যে বলপ্রয়োগ নাই, আল্লাহ্ তাহা বলিয়া দিয়াছেন :

"ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ নাই। নিশ্চয়ই সত্য মিথ্যা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।" (২ : ২৫৫)

"(হে মুহম্মদ, কাফিরদিগকে বল), তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে, আমার ধর্ম আমার কাছে।" (১০৬ : ৬)

এমন কি পৌত্তলিকদিগের আরাধ্য দেবদেবীদিগকে পর্যন্ত গালাগালি দিতে আল্লাহ্ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন :

"এবং তাহারা (পৌত্তলিকরা) আল্লাহ্‌র' পার্শ্বে যে সমস্ত দেবতাদিগকে স্থাপন করিয়া পূজা করে, তাহাদিগকে গালাগালি দিও না।" (৬ : ১০৯)

উপরের উদ্ধৃতি হইতে এই কথাই বুঝা যাইতেছে যে, প্রকৃত মুসলমান হইতে হইলে আপন আদর্শকে বজায় রাখিয়া, অথচ অপরের ধর্ম ও সংস্কারকে অশ্রদ্ধা না করিয়া চলিতে হইবে এবং পরস্পরের প্রতি সহনশীল হইয়া শান্তিতে বাস করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, হযরত মুহম্মদ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে ঠিক এই আদর্শই পালন করিয়া গিয়াছেন। মক্কা হইতে হিযরত করিয়া তিনি যখন মদিনায় যান, তখন তিনি মদিনার ইহুদী ও পৌত্তলিকদের সহিত সন্ধি করিয়া যে সনদ দিয়াছিলেন, তাহাতে এই আদর্শই প্রতিফলিত ছিল। পৌত্তলিক তায়েফবাসীদিগের প্রতিনিধিগণ যখন মদিনাতে হযরতের নিকট উপস্থিত হন, তখন তাহাদিগকে মদিনার মসজিদ প্রাঙ্গণে স্থান দিয়াছিলেন। আবার নজরানের খ্রীষ্টানদিগের এক প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় আসেন, তখন হযরত তাহাদিগকে সান্ধ্য উপাসনার জন্য মদিনা মস্‌জিদেই স্থান দান করেন। একই ছাদের নিচে একই সময়ে খ্রীষ্টানেরা পূর্বদিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে থাকেন, মুসলমানেরা হযরতের পিছনে দাঁড়াইয়া কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে থাকেন। পরধর্মের প্রতি এত বড় উদারতা সত্যই বিরল নহে কি? ভিন্ন ধর্মের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিধান বা দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। হযরত মুহম্মদের পূর্বে অন্য ধর্ম প্রচারকের মধ্যে এই আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

www.pathagar.com

বিধর্মীদিগের সহিত ব্যবহার

বিধর্মীদিগের সহিত হযরতের ব্যবহার ছিল একেবারে অনবদ্য। এমন উদার মনোভাব আর কোন মহাপুরুষের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই না। ইসলামের বিরোধী জানিয়াও তিনি কোন লোককে অযথা তিরস্কার করেন নাই, ঘৃণা করেন নাই বা শাস্তি দেন নাই। অবিশ্বাসী কোরেশ-ইহুদী, খ্রীষ্টান-পারসিক প্রভৃতি কাহারও প্রতিই তাঁহার জাতক্রোধ ছিল না। ইসলাম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তধারণা আছে : 'কাফির' হইলেই মুসলমানদিগের নিকট তাহার আর রক্ষা থাকিত না; 'কাফির' দেখিলেই তাহারা হত্যা করিয়া ফেলিত। বলা বাহুল্য এ প্রবাদের মূলে কোন সত্য নাই। কাফির কাহাকে বলে তাহা জানিলে এই ভ্রান্ত ধারণা তৎক্ষণাৎ সকলের মন হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

কাফিরের অর্থ হইতেছে অবিশ্বাসী। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্"- এই কলেমাই হইতেছে বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্ণয়ের মাপকাঠি। যাহারা এই কলেমা ও তাহার ভাবপুষ্ট জীবনাদর্শে কার্যত বিশ্বাস করে তাহারাই মুসলমান, যাহারা তাহা করে না, তাহারা 'কাফির'। মানবজাতির এই দুই প্রশস্ত শ্রেণী-বিভাগ। মুসলমান হইলেই যে সব সময়ে সে ভাল কাজ করিবে, আর কাফির হইলেই যে মন্দ কাজ করিবে, তাহাও নহে। মুসলমান হইয়াও সে মন্দ কাজ করিতে পারে, কাফির হইয়াও সে ভাল কাজ করিতে পারে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্যের ফল ভোগ করিবে, ইহাই ইসলামের বিধান। কাফির বা মুনাফিক হইলেই যে মুসলমান তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে, তাহাও নহে। দুনিয়ার কাজকর্ম কাফিরের সঙ্গেও করা চলে। খাজ্-রাজ্ নেতা আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই হযরতের সহিত অনেক মুনাফিকি করিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত কোন দিন তাঁহাকে কাফির রূপে ঘোষণা করেন নাই। তিনি মারা গেলে হযরত তাঁহার জানাজা কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্যও আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। হযরতের পিতৃব্য আবুতালিব কোনদিন ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু হযরত তাঁহাকে সেই কারণে কখনও অশ্রদ্ধা দেখান নাই; মৃত্যুকালে তাঁহার জন্যও তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করিয়াছিলেন। আপন জামাতা আবুল আ'স যতদিন বিধর্মী ছিলেন ততদিনও হযরত তাঁহার প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করেন নাই। ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত যে-সব সন্ধি হইয়াছে, অথবা হযরত তাহাদিগকে যে সনদ দান করিয়াছেন তাহাতেও এই কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহাদের ধর্মে কখনও হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতায়

হযরত মুহম্মদের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য : বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মহামানবতার আদর্শ প্রচার। শুধু আরববাসীদিগের জন্যই তিনি আসেন নাই, শুধু মুসলমানদিগের মধ্যেই তিনি একতা ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক মিলন প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। ধর্ম, জাতি এবং দেশ বিভিন্ন হইলেও মানুষই যে মূলত এক পরিবারভুক্ত, সকলেরই উৎসমুখ যে এক, সকল মানুষের অন্তরে যে একটা নিগূঢ়

www.pathagar.com

আত্মীয়তার যোগসূত্র আছে এবং তাহারা যে পরস্পর ভাই ভাই—এই কথা দুনিয়ার একজন মহাপুরুষই হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন এবং তিনি হইতেছেন মুহম্মদ।

এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র বিধানও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোরআন বলিতেছে :

"সমস্ত মানবমণ্ডলী এক জাতি।" (২ : ২১৩)

অন্যত্র আছে :

"হে লোকসকল, নিশ্চয়ই তোমাদিগকে একই পুরুষ ও একই নারী হইতে সৃজন করিয়াছি, এবং বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারে বিভক্ত করিয়াছি যাহাতে তোমরা পরস্পরকে চিনিতে পারো। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিকতর সম্মানার্হ যিনি অপরের প্রতি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ।" (৪৯ : ১৩)

বস্তুত ইসলামকে যাঁহারা একটুও চিনেন, তাঁহার বলিবেন, মহামানবতাই তাহার আদর্শ, বিশ্বভ্রাতৃত্বই তাহার স্বপ্ন। হিন্দী, আরবী, আফগানী, কাফ্রী, নিগ্রো, চীনা, ইউরোপীয়—বিশ্বের সর্বদেশের সর্বজাতীয় লোককে একত্র করিয়া একই মিলন সূত্রে আবদ্ধ করিবার মত বিরাট মন এবং পরিকল্পনা জগতে আর কাহার হইয়াছে? এত বড় শক্তিই বা কাহার? ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য! আজ পর্যন্ত কাবা-শরীফে প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই মহামিলন সাধিত হয়। পবিত্র হজের দিনে সকলেরই এক ধ্যান, এক ধারণা; এক বেশ, এক ভূষা, এক বাণী, এক লক্ষ্য—সবাই মিলিয়া সেদিন এক। হযরত মুহম্মদের পূর্বে এই বিশ্বমানবতাবোধ একেবারেই অচিন্ত্য ছিল না কি?

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে

স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ইসলামের মজ্জাগত। অবশ্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে ইসলমের ধারণা একটু স্বতন্ত্র। যে অর্থে সধারণত আমরা এই দুইটি কথাকে বুঝি, ইসলামের ধারণা ঠিক তাহা নহে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক হিসাবে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্র চালনা করিবার নামই স্বাধীনতা নহে, অথবা ভোট দ্বারা সভ্য নির্বাচন করিবার নামও গণতন্ত্র নহে। মানুষের মনোরাজ্যে যেখানে থাকে শত প্রকারের বন্ধন, ছোট-বড় ইতর-ভদ্রের প্রভেদ, জঘন্য জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ, সেখানে গণতন্ত্রের বুলি একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপের মতই মনে হয়। এমন মাথাগনতি গণতন্ত্র ইসলামের কাম্য নহে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের গোড়ার কথা হইল ধর্ম ও কর্মে মানুষের সমঅধিকার প্রদান। সব মানুষই সমান এবং সকলের ধর্মে-কর্মে সমঅধিকার আছে, এই নীতি গ্রহণ না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা বা গণতন্ত্র লাভ করা অসম্ভব। মুক্তি সাধনার পথে সর্বাগ্রে তাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় আল্লাহ্‌র একত্ববাদকে। আমাদের উৎপত্তি বা উৎস মুখ যে এক, এই কথা না মানিলে মানুষে মানুষে কখনো সমতা আসিতে পারে না। এক পিতার সন্তানদের মধ্যে যেমন আপনা-আপনি ভ্রাতৃত্ববোধ জন্মে, তেমনি আমরাও যদি স্বীকার করি যে, আমাদের সকলের 'রব' এক, তবে আমরাও পরস্পর ভাই-ভাই হইতে পারি। ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এই সত্য বুনিয়াদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ এক এবং প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার সমান। ইসলাম এই দুইটি কথাই মানুষকে শিখাইয়াছে। ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাহার কাছে কোন বর্ণবৈষম্য নাই; কৌলিন্যপ্রথা নাই;

www.pathagar.com

এখানে কর্ম দ্বারা, সাধনার দ্বারা মানুষকে বড় হইতে হয়—বংশ-মর্যাদা বা জাতিভেদ দ্বারা নহে।

কিন্তু ইহাও ইসলামের স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে। "Freedom is our bright-right" স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার অথবা "Man is born free and every where he is in chains"—মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মে, কিন্তু সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত, এ ধরনের ভূয়া কথা ইসলাম বলে না। জন্ম হইতেই আমরা কখনও স্বাধীন নইও, হইতেও পারি না। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই সে তাহার মায়ের সম্পূর্ণ অধীন, বড় হইলে সে তাহার গুরুজনের অধীন, পারিপার্শ্বিকতার অধীন, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন—কোন্খানে তবে তাহার স্বাধীনতা? বস্তুত স্বাধীনতার অর্থ তাহা নহে। কোন নিয়ম-নিগড়কে না-মানার নাম স্বাধীনতা নহে—উচ্ছৃঙ্খলতা। সৃষ্টিধর্মী স্বাধীনতা নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ। নৈতিক শৃঙ্খলার অধীন হইয়াই সৃষ্টি চালিত হয়। বিশ্ব প্রকৃতিতে তাই দেখা যায় আন্তনির্ভরতার (Inter-dependence) নীতি। পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীলতা তাই সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে অপরিহার্য। ফুলের সৌরভ পাপড়ি-দলে আবদ্ধ থাকে, মেশ্কের খোশ্বু মৃগনাভির আধারে বদ্ধ থাকে। স্বাধীনতার পদযুগলও তেমনি থাকে নিয়ম-নীতির স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ইসলামের স্বাধীনতা ঠিক এইরূপ। সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং শক্তি লইয়া মানুষ কখনও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে না; পারিলেও তাহাতে অকল্যাণ ঘটে। আল্লাহ্ যেখানে স্রষ্টা সেখানে তিনি নৈতিক নিয়মে আবদ্ধ। বস্তুত পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে কোন কিছু সৃষ্টি অসম্ভব।

ইসলামের গণতন্ত্রই তাই একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ধর্মে ও কর্মে সে সকলকেই সমান অধিকার দিয়াছে। একজন দীন্ ভিখারীও মস্জিদে আসিয়া বাদশার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে পারে, যে কোন লোক যে-কোন কর্মে আত্মনিয়োগ করিতে পারে; সাধনা দ্বারা যে-কোন দিক দিয়া জগতে বড় হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া ইসলাম স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেয় না। যাহার যাহা খুশি সে তাহাই করিবে বা বলিবে, অথবা কোন গুরুতর ব্যাপারে যোগ্য -অযোগ্য নির্বিশেষে প্রত্যেকেই মতামত দিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি করিবে, ইসলাম তাহা বলে না। এইরূপ বিকৃত গণতন্ত্রের সে সমর্থক নহে। স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার তাহার যেমন অধিকার আছে, নেতৃ-আদেশ মানিবারও সেইরূপ কড়া তাগিদ আছে। ইসলামে স্বেচ্ছাতন্ত্র যেমন নাই, তেমনি উৎকট গণতন্ত্রও নাই।

এই সম্বন্ধে কোরআন বলিতেছে :

"আল্লাহ্কে মানো, তাঁহার রসূলকে মানো এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহাদিগকে মানো।" (৪ : ৫৯)

স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র সম্বন্ধে উপরে যাহা বলিলাম, হযরত মুহম্মদ ঠিক সেই আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। আল্লাহ্র একত্বকে ভিত্তি করিয়া সমস্ত মুসলমানকে তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, ধর্মে ও কর্মে সকলকে সম-অধিকার দান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে নেতৃ-আদেশ মানিয়া চলিবার জন্যও ভীষণ তাকিদ দিয়াছেন। যিনি নেতা হইবেন, আমীরুল মু'মিনীন হইবেন, তাঁহার হুকুম পালন করিতেই হইবে। সেখানে কোন ভিন্ন মত সৃষ্টি করিলে চলিবে না। হযরতের ব্যক্তিগত জীবনেই এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন নেতা, ভক্তবৃন্দের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত

www.pathagar.com

করিবার অধিকার তিনি দিয়াছিলেন, অনেক সময় তাঁহারা কোন কোন কার্যে হযরতের কথার প্রতিবাদও করিয়াছেন, কিন্তু একবার তিনি যেই কোন একটি আদেশ দিয়াছেন অমনি সকলেই তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে মানিয়া লইয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন :

ক্রীতদাস জায়েদ। হযরত তাহাকে মুক্তি দিয়া স্বাধীন মানুষের মর্যাদা দিলেন। তাহাকে তিনি আপন পুত্রের মত লালন-পালন করিলেন, নিজ ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ দিলেন, অবশেষে তাহাকে মুতা অভিযানে সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। অনেক সাহাবা ইহাতে আপত্তি তুলিলেন, কিন্তু হযরত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া ইহাতে আপন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেন, অমনি সমস্ত মুসলমান সেই ক্রীতদাস সেনাপতির অধীনেই অম্লানবদনে যুদ্ধ করিতে চলিলেন। এমন কি আবুবকর, আলী, ওমর প্রমুখের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি—যাঁহারা হযরতের মৃত্যুর পর মুসলিম জগতের খলিফা হইয়াছিলেন—তাঁহারাও জায়েদের অধীনে সাধারণ সৈনিকবেশে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পরবর্তীকালে ক্রীতদাস কুতবুদ্দীন যে ভারতের সর্বপ্রথম মুসলমান সম্রাট হইয়াছিলেন, তাহাতেও কোন মুসলমান কোনরূপ আপত্তি করে নাই।

ইসলাম তাই 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' (controlled democracy) সমর্থক। রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পর খেলাফতের আমলে হযরত ওমর 'মজলিস-ই-শো'রা'র (পরামর্শসভা) প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহাকে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বলা যাইতে পারে।

ইহাই ইসলামের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বরূপ। মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সঙ্গে সঙ্গে দলগত ঐক্য ও শৃঙ্খলাই তাহার প্রধান লক্ষ্য। এখানে কেহ যেন মনে না করেন : তবে কি ইসলামের জন্য রাষ্ট্র স্বাধীনতার প্রয়োজন নাই? নিশ্চয়ই আছে। পূর্বেই বলিয়াছি ইসলামের যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে বাস্তবরূপ দিতে হইলে তাহার পশ্চাতে চাই শক্তির সাধনা। কাজেই রাষ্ট্র-স্বাধীনতাও তাহার পূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্র-স্বাধীনতা না থাকিলে অনেক সময় ধর্ম-স্বাধীনতার অস্তিত্বই থাকে না। ইসলামে রাষ্ট্র ও ধর্ম তাই একসঙ্গে বাঁধা। বস্তুত পরাধীন রাষ্ট্রে ইসলামের পূর্ণ রূপায়ণ কল্পনা করাই অসম্ভব।

নারীজাতির উন্নয়নে

হযরতের অন্যতম প্রধান সংস্কার : নারীজাতির মর্যাদা ও মূল্যদান। নারীকে দিয়েছেন তিনি কল্যাণময়ী; পুণ্যময়ী রূপ। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের সর্বত্র নারীকে অস্থাবর সম্পত্তির মতই মনে করা হইত। কি ভারতবর্ষ, কি চীন, কি, মিসর, কি আরব, কি ইউরোপ-কোথায়ও নারীর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। নারীকে দাসীর মতই মনে করা হইত এবং তাহাকে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা চলিত। এমন কি সভ্যতার প্রাচীন লীলাভূমি ভারতবর্ষেও নারীর মর্যাদা খুব উন্নত ছিল না। বৈদিক যুগে কোন বিষয়ে নারীর অধিকার থাকলেও সাধারণত তাহারা পুরুষের কৃপার পাত্রীরূপেই পরিগণিত হইতেন। সে যুগে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদবাণী' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :

www.pathagar.com

"বৈদিক যুগে বহু যুবতীর বিবাহ হইত না, তাহারা কুমারী অবস্থাতেই পিতৃগৃহে থাকিত। বিকলাঙ্গ কন্যাদের বিবাহ হইত না। বিবাহ হইয়া গেলে কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকিত না। এইজন্য কন্যার ভ্রাতারা ভগিনীর বিবাহ দিতে চেষ্টিত থাকিত—বিধবা প্রায়ই স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিত। এইজন্য স্বামীর ভ্রাতার নাম হইয়াছিল দেবর (দ্বিতীয় বর)। পুরুষেরা বিবাহ করিত। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ব্যভিচারই নিন্দনীয় ছিল—কন্যা হরণ করিয়াও বীরগণ বিবাহ করিত।-বিধবা হইলে পত্নী পতির চিতায় শয়ন করিয়া দেবরের আহ্বানে উঠিয়া আসিত ও পতির শব দাহ করিত।" (বেদরাণী, ৩২৪-৩২৭)

ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ভারতীয় নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রম খুব বেশী ছিল না; নানাভাবে তাহারা লাঞ্ছনা ভোগ করিত। অবশ্য গার্গী উত্তর-ভারতী, সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি মহিমময়ী ও বিদূষী নারীও যে ছিলেন না, তাহা নহে; তবে সাধারণত নারীজাতির অবস্থা খুব উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না।

নারীর এই লাঞ্ছনা চরমে উঠিয়াছিল খ্রীষ্টানদের হাতে। নারী যে চির অভিশপ্ত, নারীই যে সকল পাপ ও সকল অকল্যাণের মূল, ইহা শুধু সংস্কার নহে—ইহা তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা বলে : Adam (আদম) এবং Eve (হওয়া) যখন স্বর্গে ছিলেন, তখন Eve-ই শয়তানের প্ররোচনায় প্রথম মুগ্ধ হন, আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নিজে জ্ঞান-বৃক্ষের (Tree of knowledge) ফল ভক্ষণ করেন এবং Adam- কে দিয়াও ভক্ষণ করান।[৪] সেই পাপের জন্যই আল্লাহ্ Adam এবং Eve- কে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দুনিয়ায় পাঠাইয়া দেন। Adam-এর এই পতনে সমগ্র মানবজাতির পতন হইয়াছে, আর এই পতনের মূল কারণই হইতেছে Eve, Adam নহে। অন্য কথায়, নারীজাতিই হইতেছে সকল পাপের মূল। এই জন্যই খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ নারীকে "শয়তানের যন্ত্র" (organ of the devil), "কামড় দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত বিচ্ছু" (a scorpion ever ready to sting) , "বিষাক্ত বোলতা" (the poisonous asp) ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু মানব-পতনের এই কাহিনী ইসলামের নহে। এই পতনের জন্য ইসলাম বিবি হাওয়াকে কোনদিনই দায়ী করে নাই। এই সম্বন্ধে কোরআন বলিতেছে :

"এবং (আমরা বলিলাম) হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী এই উদ্যানে (স্বর্গোদ্যানে) বাস কর; খুশিমত সব ফল-ফলারি খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটে যাইও না, কারণ তাহা হইলে তোমরা অন্যায়কারীদিগের মধ্যে গণ্য হইবে।"

"কিন্তু তাহাদের ভিতরকার কু-প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে বাহির হইয়া আসে সেই উদ্দেশ্যে সে (শয়তান) বলিল : তোমাদের প্রভু (আল্লাহ্) এই গাছের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন কেন জানো? তোমরা উভয়ে দুইটি ফেরেশ্‌তা না বনিতে পার অথবা যাহাতে অমর না হইতে পার। এবং সে উভয়ের নিকটেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের হিতৈষী বলিয়াই উপদেশ দিতেছি।"

---

৪. And the man said. The Woman thou gavest to be with me she gave me of the tree and I did eat. (Genesis) 3

www.pathagar.com

"তখন সে তাহাদিগকে ধোঁকা দিয়া পতন ঘটাইল; কাজেই যখন তাহারা সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, তাহাদের কু-প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইয়া উঠিল এবং তখন উভয়ের বৃক্ষের পত্রদ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তখন তাহাদের প্রভু বলিলেন : 'আমি কি তোমাদিগকে ঐ বৃক্ষের নিকট যাইতে নিষেধ করি নাই এবং বলি নাই যে শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?" তাহারা বলিল : "হে আমাদের প্রভু, আমরা নিজেদের প্রতি নিজেরাই অন্যায় করিয়াছি, যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব।" (৭ : ১৯-২৩)

শয়তান যে তাহার কু-প্রস্তাব প্রথমত আদমের নিকটেই করে, এবং আদমই যে প্রথম প্রলুব্ধ হইয়া বিবি হাওয়ার সহিত একত্রে মিলিয়া নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেন, কোরআন তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতেছে :

"কিন্তু শয়তান তাহার নিকট (আদমের নিকট) কু-প্রস্তাব করিল, বলিল : "হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরতা বৃক্ষের কাছে এবং অনন্তকালস্থায়ী একটি রাজ্যে লইয়া যাইব'?"

"তখন তাহারা উভয়েই সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিল, কাজেই তাহাদের কু-প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের নয়ন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল এবং তাহারা তখন উভয়েই বৃক্ষপত্রের দ্বারা নিজদিগকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিল। এইরূপে আদম তাহার প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিল এবং তাহার জীবন দুঃখময় হইল।"[৫] (২০ : ১২০-১২১)

অতএব দেখা যাইতেছে, মানব জাতির এই পতনের জন্য নারী দায়ী নহে। ইসলাম নারীকে এই অপবাদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। নারীকে সে দিয়াছে এক মহিমময়ীর রূপ। সুখে-দুঃখে, দুর্দিনে-সুদিনে নারী যে পুরুষের চিরসঙ্গিনী, এই আদর্শই দেখিতে পাইতেছি আমরা বিবি হাওয়ার মধ্যে। আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর ন্যায়ই তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া হাত ধরা-ধরি করিয়া বেহেশ্ত হইতে বিদায় হইয়াছেন। এখানে ইসলাম নারী পুরুষের দাম্পত্য জীবনের যে মহান চিত্র আঁকিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এত বড় সর্বনাশের পরও কাহারও প্রতি কেহ অনুযোগ করিতেছে না, বা সে সম্বন্ধে কোন একটি কথাও উঠিতেছে না। স্বামীর অপরাধ হইলেও হইয়াছে, স্ত্রী অপরাধ হইলেও হইয়াছে—উভয়ের উভয়েই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুঃখ-বেদনাকে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইয়া পথে বাহির হইতেছে। ইহা দাম্পত্য জীবনের কী পবিত্র উজ্জ্বল আদর্শ।

ইসলামে নারীর জন্মের যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেও দেখা যাইবে, নারী-পুরুষ মূলত কোনই পার্থক্য নাই; একই উপাদান দ্বারা আল্লাহ্ উভয়কেই সৃষ্টি করিয়াছেন :

"হে লোকসকল তোমাদের প্রভুর প্রতি (কর্তব্য সম্বন্ধে) সজাগ হও-তিনি তোমাদিগকে একটি প্রাণী (আদম) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গিনীকে (হাওয়াকে) একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৪ : ১)

---

৫. ফায়াসওয়াসা ইহাইহি শাইতানো কালা ইয়া আদামো হাল আদুল্লুকা আলা শায়ারাহিল খুলিদে ওয়া মুলকিল লাই ইয়াবলা। (২০ : ১২০)

"ফা আকালা মিনহা ফারাদাৎ লা হুমা সাওআতহুমা। ওয়া তাফেকা ইয়া সেফানে আলাইয়াহিমামিন ওয়ারাফে উল জানাতে ওয়া আসা আদামো। রাব্বাহু ফাগাওয়া। (২০ : ১২১)

www.pathagar.com

বিবি হাওয়া যে হযরত আদমের পার্শ্বদেশ হইতে সৃষ্টি হইয়াছিলেন অন্যকথায় পুরুষ ও নারীর উপাদান যে একই, এই কথাও কোরআনে স্পষ্ট উল্লেখিত হইয়াছে :

"এবং আল্লাহ্‌র একটা নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগের মধ্য হইতে তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন— যাহাতে তোমরা মনের শান্তি পাইতে পার।" (৩০ : ২১)

অতএব দেখা যাইতেছে, উৎপত্তির দিক দিয়া ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে নাই—উভয়কেই তুল্য মর্যাদা দান করিয়াছেন।

স্ত্রীরূপে নারীর মর্যাদা এবং অধিকার সম্বন্ধে কোরআন কি বলিতেছে দেখুন :

"তাহারা (তোমাদের স্ত্রীগণ) তোমাদের অঙ্গাবরণ এবং তোমরা তাহাদের অঙ্গাবরণ।" (২ : ১৮৭)

অন্যত্র :

"এবং পুরুষের উপর তাহাদের ঠিক সেইরূপ ন্যায্য অধিকার আছে—যেমন তাহাদের উপর পুরুষদের আছে।" (২ : ২২৮)

অন্যত্র :

পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে নারীর যে কতখানি অধিকার আছে সে কথাও এখানে স্মরণীয়। এই সম্বন্ধে ইসলাম নারীকে যাহা দান করিয়াছে আজ পর্যন্ত অন্য কোন ধর্ম তাহা করিতে পারে নাই।

বিবাহকালীন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর দেনমহর-দানও মুসলিম নারীর সম্ভ্রমের আর একটি দৃষ্টান্ত। ইসলামে শুধু যে পুরুষই স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে তাহা নহে, স্ত্রীও প্রয়োজন হইলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করাইতে পারে। নারী জাতির অধিকারের ইহা এক চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নাই।

নারীদের আত্মা আছে কিনা এবং তাহারা স্বর্গে যাইবার অধিকারী কি-না, ইহা খ্রীষ্টান জগতে আজও তর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। বহু গবেষণার পর পাদ্রীগণ স্থির করিলেন : স্ত্রীলোকেরা স্বর্গে যাইতে পারিবে বটে, কিন্তু তখন তাহাদের নারীত্বের কোন চিহ্ন থাকিবে না।

ঠিক ইহারই পার্শে ইসলাম কি বলিতেছে দেখুন :

"এবং যে কেহই ন্যায় কার্য করিবে—স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক-এবং যদি সে বিশ্বাসী হয়—স্ত্রীই হউক, পুরুষই হউক-তাহারা সকলেই বেহেশ্‌তে যাইবে।

(৪০ : ৪০)

"একই ফল মিলিবে সেথায়
পাবে তারা পবিত্র সঙ্গিনী
একসাথে তারা সেথা রবে চিরকাল।" (২ : ২৫)

অনন্তকাল স্থায়ী বেহেশ্‌তের সেই উদ্যান— যেখানে তাহারা (পুণ্যবানেরা) প্রবেশ করিবে তাহাদের সৎকার্যশীল মাতাপিতার সহিত এবং তাহাদের স্ত্রীদিগের সহিত এবং পুত্রকন্যাদিগের সহিত এবং ফেরেশ্‌তাগণ প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের নিকট হাজির হইবে।" (১২ : ২৩)

নারীজাতি সম্বন্ধে কোরআনের তথা হযরত মুহম্মদের-ইহাই হইতেছে অভিমত। হযরত নিজে যে এইসব নির্দেশ সর্বতোভাবে মনিয়া চলিতেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। নারীদিগের সম্বন্ধে তিনি নিজে কি বলিতেছেন, দেখুন :

www.pathagar.com

'তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন শাসনকর্তা কাজেই আল্লাহ্ প্রত্যেক্কে তাহাদের প্রজাদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন। আমির (রাজা) দেশের শাসনকর্তা, পুরুষ তাহার বাড়ির সকলের উপর শাসনকর্তা স্ত্রী তাহার স্বামীর এবং তাহার পুত্রকন্যাদের শাসনকর্ত্রী এবং এই জন্যই তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইবে।"

"তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে।"

"কোন মুসলিম তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিবে না। সে যদি তাহার স্ত্রীর একটি দোষের জন্য অসন্তুষ্ট হয় তবে অন্য আর একটি গুণের জন্য তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবে।"

"তোমাদের স্ত্রীকে সদুপদেশ দাও, ক্রীতদাসীর মত তোমার সম্ভ্রান্ত স্ত্রীকে প্রহার করিও না।"

তোমরা যখন খাইবে, তোমাদের স্ত্রীদিগকেও খাইতে দিবে। তোমরা যখন নূতন বসন-ভূষণ পরিবে, তোমাদের স্ত্রীদিগকেও পরিতে দিবে।"

হযরত শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। নিজের স্ত্রীদিগের প্রতি তিনি এই শ্রেষ্ঠ ব্যবহারই করিয়া গিয়াছেন। হযরত যখন ২৫ বৎসরের যুবক তখন তিনি ৪০ বৎসর বয়স্কা বিধবা খাদিজাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর সহিত তিনি ২৫ বৎসর একত্র বাস করেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, তখন হযরতের বয়স ৫০ বৎসর। কাজেই বলা যাইতে পারে জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ তিনি এই বৃদ্ধা স্ত্রীকে লইয়াই কাটাইয়া দেন। তবু কী মধুর সম্বন্ধই না ছিল এই দম্পতি যুগলের মধ্যে! হযরত যে বিবি খাদিজাকে কত গভীরভাবে ভালবাসিতেন এবং কত যে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন, তাহা এই কথা হইতে প্রামাণিত হয় যে, বিবি খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কাহাকেও বিবাহ করেন নাই। ইহার পরেও যে-সমস্ত নারীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল একেবারে অনবদ্য। তিনি কাহাকেও নিগ্রহ কাহাকেও অনুগ্রহ করেন নাই; সকল স্ত্রীর প্রতিই সমান ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।[৬]

অবশ্য হযরত যে নারীকে অবাধ স্বাধীনতা দান করিয়া গিয়াছেন, তাহাও নহে। আদর্শচ্যুত বিকৃত নারী-প্রগতিকে তিনি কখনও সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি জানিতেন, উহা নারীর প্রগতি নহে—অধোগতি। সমাজে যাহাতে দুর্নীতি না ঢুকে, সেইজন্য তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীকে সর্বপ্রথম স্বাধীনতা দান করিলেও তাহাকে তাহার স্বামীর অধীন করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার নিজের ইচ্ছা নহে, স্বয়ং আল্লাহ্‌র বিধান :

"এবং তোমাদের উপর তাহাদের (স্ত্রীদের) ন্যায্য অধিকার আছে, তবে পুরুষ নারী অপেক্ষা একধাপ উর্ধ্বে।" (২ : ২২৮)

"পুরুষ স্ত্রীদিগের রক্ষাকর্তা, কারণ আল্লাহ্ একজনের অপেক্ষা আর একজনকে (কোন কোন বিষয়ে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন।" (৪ : ৩৪)

---

৬. হযরতের বহুবিবাহের গূঢ় কারণ এবং উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রভাবেই আলোচিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য এই বিধান খুবই সঙ্গত হইয়াছে। পুরুষ নারী অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও শক্তিমান; কঠোর জীবন-সংগ্রামের জন্য সে উপযোগী। পক্ষান্তরে নারী দয়ামায়া, স্নেহমমতা ও প্রীতিপ্রেমের জীবন্ত মূর্তি। এইজন্য উভয়ের কর্মক্ষেত্র বিভিন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ কাহারও চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, প্রত্যেকের কার্যই মহৎ এবং অপরিহার্য। সৃষ্টির মূলে দেখিতে পাওয়া যায় দুইটি শক্তি : সংরক্ষণ এবং প্রতিপালন (Protection and preservation) সংরক্ষণের কার্য পুরুষের আর প্রতিপালনের কার্য নারীর। সৃষ্টিকে রক্ষা করিতে হইলে আগে সংরক্ষণের প্রয়োজন। এই হিসাবেই নারী পুরুষের অধীন। অন্যান্য কতকগুলি স্বাভাবিক প্রতিবন্ধকও নারীকে পুরুষ অপেক্ষা 'একধাপ নিচে' নামাইয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা সম্বন্ধেও ইসলাম সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। ইসলামে নারীর অবরোধের ব্যবস্থা নাই সত্য, কিন্তু পর্দার ব্যবস্থা আছে। কোরআন বলিতেছে :

"বিশ্বাসী পুরুষদিগকে বল, তাহারা তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গুপ্ত স্থানগুলি আচ্ছাদিত রাখুক; ইহাই তাহাদের পক্ষে পবিত্রতা এবং বিশ্বাসী নারীদিগকেও বল তাহারাও তাহাদের দৃষ্টি নত করুক এবং গোপনীয় অংশগুলি আবৃত রাখুক এবং যেটুকু না-বাহির করিলে চলে না, সেইটুকু ছাড়া (অর্থাৎ হাত, পা ও মুখ) অন্য কোন অংশের অলঙ্কার প্রদর্শন না করে।" (২৪ : ৩০-৩১)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলিতেছেন :

"হে রসুল, তোমার স্ত্রী-কন্যাদিগকে এবং বিশ্বাসীদিগের স্ত্রী-কন্যাদিগকে বল, তাহারা যেন তাহাদের গায়ের উপর একটি অঙ্গাবরণ (over-garment) দেয় ইহাই অধিকতর সঙ্গত হইবে, কারণ তাহা হইলে লোকে তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া বলিয়া চিনিতে পারিবে এবং পীড়া দিবে না।" (৩৩ : ৪৯)

ইহা দ্বারা এই কথা যেন কেহ মনে না করেন : তবে আর নারীর স্বাধীনতা রহিল কোথায়? রহিল বৈকি! উচ্ছৃঙ্খলতা বা বাড়াবাড়ি দমন করিলেই যে স্বাধীনতার লোপ হয়, তাহা নহে। মুসলিম নারী অবাধে মস্‌জিদে গিয়া নামাজ পড়িতে পারে, ঈদ্-উৎসবে যোগ দিতে পারে, হজে যাইতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদিগের সেবা করিতে পারে, নিজে যুদ্ধ করিতে পারে, জ্ঞানচর্চা করিতে পারে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনভাবে বহু কাজ করিতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই নারীর প্রবেশাধিকার আছে। ইসলামের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ।

সমাজে যাহাতে ব্যভিচার ও দুর্নীতির প্রসার না হয়, তজ্জন্যও ইসলাম কঠোর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। এই সম্বন্ধে কোরআনের বিধান দেখুন :

"ব্যাভিচারকারিণী এবং ব্যভিচারকারী সম্বন্ধে প্রত্যেককে ১০০টি দোর্‌রা (চাবুক) মার এবং কোনরূপ অনুকম্পা দ্বারা চালিত হইয়া আল্লাহ্‌র বিধান পালনে শৈথিল্য করিও না—যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং রোজকিয়ামতে বিশ্বাস কর, এবং একজন বিশ্বাসীকে তাহাদের শাস্তির সাক্ষী করিয়া রাখ। ব্যভিচারকারী অথবা কোন পৌত্তলিক নারীকে বিবাহ করিবে না এবং ব্যভিচারিণী সম্বন্ধে বিধান এই : যে তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সে অথবা কোন পৌত্তলিক ছাড়া অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না বিশ্বাসীদিগের এই কার্য করা নিষেধ। এবং যাহারা স্বাধীন-স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করে, অথচ চারিটি সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে

www.pathagar.com

না, তাহাদিগকে ৮০টি চাবুক মার এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না; ইহারাই সীমা লঙ্ঘনকারী; শুধু তাহারা ছাড়া যাহারা অনুতপ্ত হয় এবং ন্যায় কার্য করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়াময়! এবং যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের (চরিত্র) সম্বন্ধে দোষারোপ করে, কিন্তু নিজে ছাড়া অপর কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে না, তাহাদের উভয়ের মধ্যে (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) একজনের সাক্ষ্য চারিবার লইতে হইবে; আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া তাহাকে বলিতে হইবে যে, সে নিশ্চয় সত্যবাদী। এবং পঞ্চম বার তাহাকে এই বলিতে হইবে যে, আল্লাহ্‌র অভিশাপ যেন তাহার শিরে নামিয়া আসে—যদি সে মিথ্যাচারী হয়। এবং তাহার (স্ত্রী) শাস্তি মাফ হইবে—যদি সে চারিবার আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলে যে সে (পুরুষ) মিথ্যা কথা বলিতেছে। এবং পঞ্চম বার যদি বলে যে, আল্লাহ্‌র গজব তাহার (নিজের) উপর পড়িবে—যদি পুরুষটি সত্যবাদী হয়।" (২৪ : ২-৯)

আল্লাহ্ এবং রসুলের এই বিধান নারীজাতির মর্যাদাকে যে কতদূর বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। মুসলিম নারীর সহিত একজন অ-মুসলিম নারীর তুলনামূলক সমালোচনা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। এই প্রগতির যুগেও অন্য সমাজে নারী জাতির দুর্গতির অন্ত নাই। পতিতা বা অধঃপতিত নারীর সংখ্যা দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, মুসলিম সমাজে ঐ শ্রেণীর নারী নাই বলিলেই চলে। ইহার কারণ এই যে, মুসলিম সমাজে এই জঘন্য পরিস্থিতি ঘটিবার কোন অবসর নাই। মুসলমান পুরুষ কোন নারীর উপর যত অত্যাচারই করুক না কেন, নারীকে কখনও গৃহ বা সমাজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয় না—আপন পায়েই সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। সমাজও তাহাকে সাহায্য করে। পক্ষান্তরে ইসলামের শিক্ষার গুণে কোন পুরুষ কোন নারীকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার মত নির্মম হইতে পারে না; কারণ সে কোরআনের বিধানকে ভয় করে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা তাহার মজ্জাগত। এমন কি নারী-হরণের মত এমন জঘন্য পাপ কার্যের মধ্যেও ইসলাম পথভ্রষ্টদিগকে পুণ্য ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। অ-মুসলমান গুণ্ডা নারী-হরণ করিলে সে নিজে ত অধঃপাতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অপহৃতা নারীটির সমগ্র জীবনকে ব্যর্থ করিয়া দেয়। হতভাগিনীর ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হইয়া যায়। তাহার সারা জীবন ধরিয়া বাজে শুধুই একটা ব্যর্থতার সুর। মহিমময়ী কুলবধূর মর্যাদা সে কিছুতেই পায় না। কাজেই কোন অ-মুসলমানের নারী-হরণের মধ্যে শুধু থাকে পাপ, শুধু থাকে ছলনা, শুধু সর্বনাশের পরিকল্পনা। মনুষ্যত্বের নাম গন্ধও সেখানে নাই-কোন কল্যাণ জিজ্ঞাসা নাই-আছে কেবল পশু জীবনের ঘৃণিত সুখভোগের উদগ্র কামনা। কিন্তু মুসলমানের নারী-হরণের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব আছে; পাপপথে নামিলেও পুণ্যের প্রতি তাহার আকর্ষণ আছে। অ-মুসলমান গুণ্ডার মত কিছুতেই সে অপহৃতা নারীকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে না; সে চায় প্রকাশ্য দিবালোকে সমাজ জীবনের মধ্যে আনিয়া মানুষের মর্যাদা দিয়া তাহাকে উপভোগ করিতে। বাহিরের সকল ভ্রূকুটি এবং সকল বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া যখন কোন পতিতাকে বা কোন অপহৃতা নারীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে গৃহিণীর গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করে, তখন একটা সবল মনুষ্যত্বই তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে। সে নিজে বাঁচে, নারীটিকেও বাঁচায়। একটা নারীর ব্যর্থ জীবন যখন এইরূপ সার্থকতার

www.pathagar.com

ফলপুষ্পে পল্লবিত হইতে দেখি, তখন অন্তরের সকল শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় সেই গুণ্ডার পদতলে, আর মনে জাগে সে মহাপুরুষের শিক্ষা ও আদর্শের কথা–যাঁহার জন্য এমন জঘন্য পাপ-কার্যের মধ্যে দিয়াও এতবড় কল্যাণ সম্ভব হয়।[৭]

মাতৃভক্তিতে

"বেহেশ্‌ত জননীর চরণ তলে অবস্থিত"–এই অমর বাণী হযরত মুহম্মদের। মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে কি? মাতাপিতাকে সেবা করিবার সুযোগ তাঁহার জুটে নাই, তবু আপন মৃতা জননীর প্রতি এবং দুধ-মা হালিমার প্রতি তিনি যে ব্যবহার দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পরিণত বয়সে হযরত একবার বিবি আমিনার সমাধি ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কবর জিয়ারৎ করিয়াছিলেন এবং নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। দুধ-মা হালিমার প্রতিও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। একবার হালিমা মদিনায় হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, হযরত তখন সাহাবাবৃন্দের মধ্যে বসিয়াছিলেন। হালিমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়ান এবং তাঁহার বসিবার জন্য নিজের শিরস্ত্রাণ বিছাইয়া দেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলের নিকট পরিচয় দেয় : "ইনি আমার মা।" হালিমা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি তাঁহাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। হোনায়েনের যুদ্ধে তাঁহার দুধ- বোন শায়েমার খাতিরেই তিনি ৬০০০ বন্দীকে বিনাপণে মুক্তিদান করেন।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র যে-সব উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

"পিতার সন্তোষই আল্লাহ্‌র সন্তোষ, পিতার অসন্তোষই আল্লাহ্‌র অসন্তোষ।"

মাতাপিতা মারা গেলেই যে তাঁহাদের প্রতি কর্তব্য বা বাধ্যতার শেষ হয়, তাহা নহে। "তাঁহাদের আত্মার মুক্তির জন্য পুত্রকে প্রার্থনা করিতে হইবে, এবং তাঁহাদের নামে দান-খয়রাত ও পুণ্যকার্য করিতে হইবে"–ইহাই হযরতের আদেশ।

সাম্য ও মৈত্রী স্থাপনে

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মানব জাতির এক চিরন্তন অভিশাপ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, প্লেবিয়ান-পেট্রিসিয়ান, শরীফ-আতরাফ-ইত্যাদি ভাবের নানা বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে। মুষ্টিমেয় কতিপয় উচ্চবর্ণের মানুষ সমাজের কোটি কোটি মানুষকে উপেক্ষিত ও নিগৃহীত করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, মানুষও এমন নির্বোধ যে, উচ্চবর্ণের সেই মনগড়া বিধানকে যুগযুগান্তর ধরিয়া অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কে কবে কাহাকে শূদ্র

৭. এখানে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। আমরা এই কথা দ্বারা কিছুতেই নারী-হরণ বা গুণ্ডামিকে সমর্থন করিতেছি না। ইসলামে নারী-হরণ বা ব্যভিচার মহাপাপ এবং ইহার জন্য শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর, তাহা ছাড়া গুণ্ডাদিগের কোন তারতম্য নাই-জাতিভেদ নাই, গুণ্ডা চিরকাল গুণ্ডাই। কোন মুসলিম যদি গুণ্ডামি করে, তবে সে ইসলামের বেইজ্জতিই করে। কাজেই সমাজের উচিত কঠোর হস্তে গুণ্ডাদিগকে শায়েস্তা করা। গুণ্ডাদিগের এই তুলনামূলক সমালোচনার মধ্যে পাঠক শুধু ইসলামের কল্যাণরূপই দেখিবেন, গুণ্ডাদিগকে সমর্থন করিবেন না।

www.pathagar.com

বলিয়া ছাপ মারিয়া গিয়াছে, কে কবে কাহাকে মন্দিরে ঢুকিতে দেয় নাই, কে কবে কাহাকে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, আর যায় কোথায়, যুগযুগ ধরিয়া সে তাহাই মানিয়া চলিবে। বুদ্ধির এমন দৈন্য, মনের এমন ভীরুতা আর দেখা যায় না। এই অন্যায় বিধান মানব জাতির প্রগতির পথে মস্ত বড় এক বাধা। ইহারই ফলে কোটি কোটি মানুষ নিজদিগকে ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, শক্তিহীন ও অপদার্থ মনে করিয়া ব্যর্থ জীবন লইয়া জগৎ হইতে ফিরিয়া গিয়াছে। সেই অবজ্ঞাত বিরাট শক্তিকে কাজে লাগাইতে পারিলে দেশের, জাতির এবং জগতের কি মহাকল্যাণই না সাধিত হইতে পারিত।

মানবাত্মার এই গুরুলাঞ্ছনায় জগতের কয়জন মহাপুরুষের প্রাণ কাঁদিয়াছে? হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কোন দেশের এই অত্যাচারিত পদদলিত মানুষের জন্য কেহ কখনও সত্যকার ব্যথা অনুভব করেন নাই। সব মানুষই যে আল্লাহ্‌র চোখে সমান, সব মানুষেরই ধর্মীয় ও কর্মীয় অধিকার যে সমান, সব মানুষই যে পরস্পর ভাই ভাই—এই কথা শুধু একজন মহাপুরুষই বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—তিনি মুহম্মদ। শুধু মুখে বলেন নাই, আপন জীবন দ্বারা কার্যতও দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বস্তুত ইসলামের সাম্য এত সুপরিচিত যে, নূতন করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ভিখারী-সুলতান, রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন সকলেই এখানে সমান। কোন শূদ্র-মুসলমান কোরআন পাঠ করিলে কেহ তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিবে না; কোন ভিখারী যদি আগে আসিয়া সামনের কাতারে দাঁড়ায় আর তাহার পরে যদি দেশের বাদশাও মস্‌জিদে নামায পড়িতে আসেন, তবু ভিখারীকে আসন ছাড়িয়া পিছনে হটিয়া আসিতে হয় না, সুলতানকেই ভিখারীর পিছনে দাঁড়াইয়া নামায পড়িতে হয়। এক পংক্তিতে বসিয়া সব মুসলমান খানা খাইতে পারে, তাহাতে কাহারও 'জাত' যায় না। কোন শূদ্র-মুসলমান যদি কোন ধর্মোৎসব করে, তবে দেশের বাদশা গিয়া নিজ হস্তে তাহার মাথা কাটিয়া আনেন না। সমসূত্রে গ্রথিত ফুলমালার মত ছোট বড় সকল মুসলমানই এক হইয়া প্রকাশ পায়।

মানুষে মানুষে এতবড় সাম্য জগতে আর কোন ধর্মেই নাই।

ক্রীতদাসদের মুক্তিদানে

ক্রীতদাস-সমস্যা মানবেতিহাসের এক বড় সমস্যা। হযরত এই সমস্যার যে সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা একেবারে চূড়ান্ত। আব্রাহাম লিঙ্কন এবং বুকার ওয়াশিংটন দাস-ব্যবসায় তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আজ জগতের সর্বত্র পূজিত হইতেছেন, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি : হযরত মুহম্মদ ক্রীতদাসের সহিত যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাদের সম্বন্ধে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক কণাও কি পাশ্চাত্য জগৎ কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন? দাসপ্রথা তুলিয়া দেওয়াই বড় কথা নহে, বড় কথা হইতেছে প্রভুত্ববোধকে তুলিয়া দেওয়া। আব্রাহাম লিঙ্কন অথবা বুকার ওয়াশিংটন কি কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকে আপন পালিত পুত্র করিয়াছেন? আপন ফুফাতো বোনের সহিত কোন নিগ্রো-দাসকে বিবাহ দিয়াছেন? একসঙ্গে খানাপিনা করিয়াছেন? গির্জাঘরে বা সমাজে সমমর্যাদা দিয়াছেন? তাহাকে কি কোন যুদ্ধের সেনাপতি পদে বরণ করিয়াছেন? অথবা কোন ক্রীতদাসীকে কি নিজে বিবাহ করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে বলিব : এতবড় আড়ম্বরের মধ্যেও লুকাইয়া

www.pathagar.com

আছে একটা নিষ্ঠুর ছলনা ও প্রবঞ্চনা। ইহার নাম আর যাহা কিছু হউক, মানবপ্রেম নহে। দাস-দাসীর ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইলেই দাস-দাসীদের মর্যাদা বাড়ে না: একসঙ্গে খাওয়া-পরা করিলে, রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিলে অথবা তাহাদের উন্নতির সকল পথ খুলিয়া দিলে তবেই হয় তাহাদের প্রকৃত কল্যাণ।

হযরত দেখাইয়াছিলেন, ধনসম্পদের সমবন্টন ব্যবস্থা (equidistribution of wealth) যখন সম্ভব নহে এবং স্বাভাবিকও নহে, তখন দাস দাসীর প্রথা জগৎ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবার কোন আশা নাই। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা প্রয়োজনের তাকিদে দাস-দাসী রাখিবেই। নিঃস্ব দরিদ্র নর-নারীর পক্ষে এই প্রথা প্রয়োজন; না থাকিলে তাহাদের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থাই বা কেমন করিয়া হইবে। কাজেই, দাস-দাসী প্রথা কোন অকল্যাণকর নহে। ইহা না থাকিলে সমাজ-জীবন অচল হইয়া পড়িত। এই উন্নত সভ্যতার দিনে দাস-দাসী প্রথা একেবারে রহিত হইয়া যায় নাই। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোকই দাস-দাসী রাখিয়া বহু কাজ করিতেছেন। যাঁহারা দাস-প্রথা তুলিয়া দিয়াছেন বলিয়া বাহবা লইতেছেন, সেই ইউরোপ ও আমেরিকাতেও দাস-প্রথা রহিত হইয়া যায় নাই। তবে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। শ্রমের মর্যাদা (dignity of labour) সেখানে বাড়িয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রসুলুল্লাহ্রও লক্ষ্য ছিল তাহাই। দাস-দাসীর মর্যাদা দান এবং শ্রমের মর্যাদা দানই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কাজেই হযরত মুহম্মদ দাস-প্রথা একেবারে তুলিয়া দিবার খেয়াল না করিয়া উহার সংস্কার সাধন করিয়াছেন। দাসের মুক্তিই হইতেছে দাস-প্রথা নিবারণের চরম ব্যবস্থা। হযরত সে আদর্শ কি সুন্দরভাবেই না দেখাইয়া গিয়াছেন।

বস্তুত ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ সাধন যদি কেহ করিয়া থাকে তবে সে ইসলাম; যদি কেহ তাহাদের দরদী বন্ধু থাকেন, তবে সে হযরত মুহম্মদ।

জ্ঞান-সাধনায়

জ্ঞান-সাধনার প্রতি মুহম্মদের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি : ইসলামের সর্বপ্রথম বাণীই হইল : পাঠ কর। কাজেই জ্ঞানচর্চাই যে হইবে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে কথা বলাই বাহুল্য। এক কথায় বলিতে গেলে: বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলই হইতেছে কোরআন। হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত রহস্যকে দুর্জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। কিন্তু ইসলাম সর্বপ্রথম ঘোষণা করিল : সমস্ত জড় প্রকৃতি মানুষের আয়ত্তাধীন।

কোরআন বলিতেছে :

"এবং তিনি (আল্লাহ্) নিজ নিজ কক্ষ পরিভ্রমণকারী সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অধীন করিয়া দিয়াছেন এবং অধীন করিয়াছেন দিবা ও রাত্রিকে।" (১৪ : ৩৩)

এই গুপ্তমন্ত্রই হইতেছে বিশ্বের সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারের কুঞ্জিস্বরূপ। এই সত্য জানিবার পর মানুষের কৌতূহলী মন গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায় সন্ধানীর মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ফলে বিজ্ঞান জগতের অনেক রহস্য আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি এবং নৈসর্গিক অনেক শক্তিকেই কাজে লাগাইতেছি। কাল যাহারা দেবতা ছিল, আজ তাহারা আমাদের পায়ের ভৃত্য হইয়াছে। ইসলাম যদি এই গোপন কথাটি

www.pathagar.com

না বলিয়া দিত, তবে মানুষ হয়ত চিরদিনই বহিঃপ্রকৃতিকে ভয় ও ভক্তিতে দূর হইতে শুধু নমস্কার করিয়াই কতব্য পালন করিত।

জ্ঞান-সাধনার সম্বন্ধে হযরতের বাণী একবারে অতুলনীয়। তিনি বলিতেছেন :

"জ্ঞানানুসন্ধানের জন্য যদি সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত যাইতে হয় যাও।" "জ্ঞান-সাধকের দোয়াতের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র।" "জ্ঞান-সাধনার জন্য যে ঘরের বাহির হয় সে আল্লাহ্‌র পথে চলে।" "এক মুহূর্তের জ্ঞান-চিন্তা সহস্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।" "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর পক্ষে জ্ঞানশিক্ষা করা ফরয।"

জ্ঞান লাভের জন্য শিষ্যবৃন্দের প্রতি হযরতের ছিল এমনি নির্দেশ। পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, বদর-যুদ্ধে যে সমস্ত কোরেশ বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হযরত কাহাকেও বিনাপণে মুক্তি দিয়াছিলেন, কাহারও নিকট হইতে মুক্তিপণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা লেখাপড়া জানিত তাহাদের নিকট হইতে তিনি কোন পণ গ্রহণ করেন নাই। মুক্তিপণের বিনিময়ে তিনি এই নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক বন্দী দশজন মদিনাবাসী মুসলিম বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শিখাইয়া দিবে। ইহা জ্ঞানানুরাগের এক অভিনব দৃষ্টান্ত নহে কি?

পরবর্তীকালে এই মহাপুরুষের শিষ্যবৃন্দই বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া কত অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং নিজেরাও কত মৌলিক অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস বলিবে।

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতার

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা হযরতের জীবনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেক মহাপুরুষেরই ভগবদ্ভক্তির কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু হযরত মুহম্মদের ন্যায় এমনটি আর কোথায়ও দেখি নাই। আল্লাহ্-প্রেমে এ জীবনের আগাগোড়া মণ্ডিত। ইসলামের বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল্লাহ্‌তায়ালার ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে তিনিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য। এই আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই আমরা হযরতের জীবনে। মহাপুরুষের সমগ্র জীবন নিবেদিত হইয়াছিল তাঁহার সেই পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে। আল্লাহ্‌র প্রতি কি গভীর তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা। আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে কি তৎপরতা! আসুক দুঃখ, আসুক বিপদ, আসুক উৎপীড়ন, আসুক মরণ- আল্লাহ্‌র জন্য তিনি সমস্তই বরণ করিতে প্রস্তুত। যেদিন হইতে তিনি সত্য প্রচারে আদেশ লাভ করিলেন, সেইদিন হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সর্বদাই আল্লাহ্‌গতপ্রাণ ছিলেন। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, শয়নে-স্বপনে, জীবনে-মরণে কখনও তিনি আল্লাহ্‌কে ভুলেন নাই। কোরেশগণ শত প্রকারে তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, উৎপীড়ন করিয়াছে, কত প্রলোভন দেখাইয়াছে,তবু মহাপুরুষ তাঁহার আপন সত্যে অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। স্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণা করিতেছেন : "তোমরা যদি আমার এক হাতে চন্দ্র, অপর হাতে সূর্য আনিয়া দাও, তবু আমি আমার সত্য প্রচারে ক্ষান্ত হইব না।" মহাপুরুষ সদলবলে বন্দী অবস্থায় সঙ্কীর্ণ গিরি-সঙ্কটের মধ্যে বাস করিতেছিলেন, অনাহারে ও পিপাসায় সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত—তবু তিনি আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া মানুষের সহিত সন্ধি করেন নাই। মহাপুরুষ দেশত্যাগ করিয়া তায়েফে ধর্মপ্রচার করিতেছেন, পাষণ্ডেরা লোষ্টনিক্ষেপে তাঁহাকে জর্জরিত করিয়া

www.pathagar.com

ফেলিতেছে, তবু তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে আল্লাহ্রই মহিমা ক্ষরিত হইতেছে। কোরেশদিগের অত্যাচারে হযরত দেশত্যাগ করিতেছেন, গিরিগুহায় আবুবকর ও তিনি আশ্রয় লইয়াছেন, শত্রুরা দেখিতে পাইয়া ধাইয়া আসিতেছে, আবুবকর বিচলিত হইয়া বলিতেছেন : 'কী উপায় হইবে আমাদের! আমরা যে মাত্র দুইজন।" হযরত তৎক্ষণাৎ প্রশান্তচিত্তে আবুবকরকে মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন : "তুমি ভুল করিতেছ আবুবকর, আমরা দুইজন নই-তিনজন।" ওহদ-ময়দানে যুদ্ধ হইতেছে, হযরতের জীবনসংশয়; দাঁত ভাঙিয়া গিয়াছে, শত্রুর তরবারি মস্তকে পড়িয়াছে তবু কোন লক্ষ্যচ্যুতি নাই-পরম নির্ভাবনায় তিনি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। মহানবী বৃক্ষতলে ঘুমাইতেছেন, শত্রু সেই সুযোগে শাণিত তরবারি উত্তোলন করিয়া বলিতেছে : "মুহম্মদ এখন তোমাকে কে রক্ষা করে?" হযরত সেই তরবারির নিম্ন হইতেই অকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন : "আল্লাহ্!" অমনি ঘাতকের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িতেছে। মহাপুরুষ ইহুদিনী প্রদত্ত বিষ পান করিয়াছেন। একই বিষে বশর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তবু হযরত তখনও এই বিশ্বাসে অটল হইয়া আছেন যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় এই অবস্থাতেও তিনি বাঁচিয়া যাইবেন। এমনই ভাবে আল্লাহ্র রাহে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিয়া তিনি আল্লাহ্র বাণী প্রচার করিতেছেন। চেষ্টা যেখানে ব্যর্থ হইতেছে, সেখানে তিনি দমিয়া যাইতেছেন না; নিজের দোষত্রুটি বা অক্ষমতার কথা ভাবিয়া আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। আবার সত্য যখন জয়যুক্ত হইতেছে, তখনও তিনি সমস্ত সফলতা আল্লাহ্তে সমর্পণ করিতেছেন। কর্তব্য পালন করিয়া তাঁহার মনে হইতেছে—হয়ত বা কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল।! মীনা-প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাই তিনি সমবেত লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন : "আমি কি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিয়াছি।?" সকলে সমস্বরে বলিতেছেন : "নিশ্চয়ই!" তখন মহাপুরুষ কাতর কণ্ঠে বলিতেছেন : "প্রভু হে সাক্ষী থাকো, ইহারা বলিতেছে, আমি তোমার বাণী ইহাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি।" তারপর তিনি মৃত্যুশয্যায়! কী চমৎকার এই মহাপ্রয়াণ! "হে রফীক্-ই-আলা।- হে আমার পরম বন্ধু, তোমার কাছে"-ইহাই বলিতে বলিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমনি চমৎকার তাঁহার জীবন—প্রারম্ভও যেমন মধুর, অবসানও ঠিক তেমনি মধুর।

ক্ষমায়

ক্ষমা ছিল হযরতের চরিত্রের প্রধান ভূষণ। কোরেশ, ইহুদী ও অন্যান্য বিধর্মীরা কতভাবেই না তাঁহাকে নির্যাতন করিয়াছে, কিন্তু মহাপুরুষ সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন। জীবনে কোনদিন কাহারও উপর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। অত্যাচারীদের অপরাধ যে অজ্ঞানকৃত, এই মনোভাবই তিনি সর্বত্র দেখাইয়া আসিয়াছেন। তাহাদের কোন অপরাধ গ্রহণ করা ত দূরে থাকুক, পাছে তাহাদের উপর আল্লাহ্র কোন অভিশাপ নামিয়া আসে, এই ভয়ে তিনি তাহাদের হইয়া আল্লাহ্র কাছে মার্জনা চাহিয়াছেন। মহাপুরুষের সমগ্র যুদ্ধবিগ্রহের উদ্দেশ্যই ছিলো সংশোধনমূলক-প্রতিশোধমূলক নহে। তাহা না হইলে মক্কা-বিজয়ের পর তিনি তাঁহার জানী-দুশ্মনদিগকে অমনভাবে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। আমরা তাঁহার ক্ষমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি :

www.pathagar.com

১। ইবনে কামিয়া নামক একজন কোরেশ বীর হামজাকে হত্যা করিয়াছিল। মক্কা-বিজয়ের পর সে শাস্তির ভয়ে নানাস্থানে পালাইয়া ফিরিতেছিল। হযরত তাহাকে অভয় দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

২। আবু সুফিয়ানের মত শত্রুকেও হযরত ক্ষমা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার স্ত্রী হিন্দা, যে নাকি বীরবর হামজার হৃদপিণ্ড চিবাইয়া খাইয়াছিল, তাহাকেও তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন।

৩। সাফওয়ান ছিল হযরতের অন্যতম প্রধান শত্রু। মক্কা-বিজয়ের পর জেদ্দায় গিয়া সে আশ্রয় লইয়াছিল। হযরত জানিতে পারিয়া নিজ মাথার পাগড়ী পাঠাইয়া দিয়া তাহাকে অভয় দান করিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

৪। আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই ছিলেন মদিনায় হযরতের প্রধান শত্রু। কিন্তু হযরত কোনদিন তাহাকে কিছু বলেন নাই। আবদুল্লাহ্র মৃত্যুকালে হযরত তাঁহার কাফনের জন্য নিজ দেহের চাদর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

৫। তায়েফবাসীরা হযরতকে যে এত নির্যাতন করিয়াছিল, তবু হযরত কোনদিন তাহাদিগকে কোন শাস্তি দেন নাই। তায়েফবাসীদিগের প্রতিনিধিসংঘ যখন মদিনায় হযরতের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে হযরতের অঙ্গে আঘাতকারীদেরও দুই-একজন ছিল। কিন্তু ক্ষমাসুন্দর মহামানব সেকথা একটুও মনে রাখেন নাই, পরম আদরে তিনি তাহাদিগকে মস্জিদ-প্রাঙ্গণে স্থান দান করিয়াছিলেন।

৬। বিবি আয়েশার চরিত্রে যে সমস্ত লোক কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে মিস্তাহ্ ছিল অন্যতম। হযরত তাহাকেও ক্ষমা করিয়াছিলেন।

৭। শেব গিরি-সংকটে যে সময় হযরত বন্দী অবস্থায় কাল কাটাইতেছিলেন, তখন মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। আবু-সুফিয়ান ইহাতে বিচলিত হইয়া হযরতের নিকট উপস্থিত হয় এবং মুসিবত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ্র নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করে। হযরত অম্লান বদনে তাহাই করেন; ফলে এই বিপদ হইতে মক্কাবাসীরা রক্ষা পায়।

৮। মহাপুরুষ কোনদিন কোন শত্রুকে অভিশাপ দেন নাই, অথবা আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে চাহেন নাই। শত্রুদিগের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া অনেক সময় কোন কোন সাহাবী তাঁহাকে আল্লাহ্র নিকট ফরিয়াদ করিতে বলিয়াছেন এবং যাহাতে শত্রুকুল ধ্বংস হইয়া যায়, এই অভিশাপ দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু দরদী নবী কোনদিন তাহা করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন : "অভিশাপ দিবার জন্য আমি আসি নাই, মানুষের কল্যাণ করিবার জন্যই আসিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি প্রার্থনা করিয়াছেন : " হে আল্লাহ্ অজ্ঞ পথভ্রান্ত মানুষকে তুমি ক্ষমা কর।"

এই রূপ অসংখ্য ক্ষমা ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত মহাপুরুষের জীবনকে মহিমামণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

এইখানে হযরতকে ভুল বুঝিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কেহ যেন মনে না করেন যে, হযরত ছিলেন শুধুই করুণা ও ক্ষমার প্রতীক এবং কাম- ক্রোধ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের অতীত। তাহা ঠিক নহে। মানুষের সকল প্রবৃত্তিই তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তিনি সবগুলিকে লইয়াই তাঁহার জীবন-শিল্প রচনা করিয়াছিলেন। সব প্রবৃত্তিকে

www.pathagar.com

বজায় রাখিয়া মানুষ বেশে কি রূপ করিয়া পথ চলিতে হয়, তাহার আদর্শ দেখানোই ত ছিল হযরতের প্রধান লক্ষ্য। সব প্রবৃত্তিই আল্লাহ্‌র দেওয়া, কাজেই প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। জগতের কোন বস্তুই আল্লাহ্ অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা আছে; তবে তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং সঠিক প্রক্রিয়া জানা চাই। এমন যে সাপের বিষ তাহাও অমৃততুল্য হইতে পারে-যদি ইহার মাত্রা এবং গ্রহণ পদ্ধতি জানা যায়। মানুষের প্রবৃত্তিনিচয়ও ঠিক সেইরূপ। যথাযোগ্যভাবে উহাদিগকে ব্যবহার করিলে উহাদের দ্বারা প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। প্রবৃত্তিনিচয়ের শুদ্ধিকরণ (sublimation) তাই আমাদের প্রয়োজন। কোন প্রবৃত্তিকে একেবারে দমন করিয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু সবগুলিকে সোজা পথে চালানো কঠিন। হযরত এই অসাধ্যই সাধন করিয়াছিলেন। 'কামিনী কাঞ্চন' পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া তিনি বনে যান নাই, অহিংসা পরম ধর্ম বলিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন নাই। ক্রোধ, প্রতিহিংসা, প্রতিঘাত-এইসব প্রবৃত্তিও তাঁহার মধ্যে ছিল, তবে তিনি সমস্ত প্রবৃত্তিকে শুদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। কামকে শুদ্ধ করিলে আমরা পাই প্রেম; ক্রোধকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া যায় তেজস্বিতা; লোভকে শুদ্ধ করিলে সে হয় তখন আকাঙ্ক্ষা; মোহকে শুদ্ধ করিলে পাওয়া যায় মমতা ও আকর্ষণ; মদকে শুদ্ধ করিলে সে হয় নিষ্ঠা বা তন্ময়তা; আর মাৎসর্যকে শুদ্ধ করিলে পাই আমরা সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। হযরতের জীবনে আমরা প্রবৃত্তিনিচয়ের এই খাঁটি রূপেরই পরিচয় পাই।

ন্যায় বিচারে

ন্যায় বিচারে হযরত ছিলেন অপূর্ব আদর্শ। একদিকে যেমন তিনি অতি বড় শত্রুকেও ক্ষমা করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি ন্যায়ের খাতিরে কাহারও প্রাণদণ্ডের বিধানও দিতেছেন; বিধর্মীরা সত্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; ইহুদীরা ষড়যন্ত্র করিতেছে, তিনিও তাহাদিগকে শায়েস্তা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এইরূপে বৃহত্তর কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। অন্যায় করিয়া কোথাও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই। চিরদিন তিনি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। যে ইহুদিনী জয়নবকে ব্যক্তিগতভাবে তিনি ক্ষমা করিতেছেন, তাহাকেই আবার ন্যায়ের খাতিরে ও আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে প্রাণদণ্ডের হুকুম দিতেছেন। বিবি আয়েশার পূত চরিত্রে অযথা কলঙ্ক দান ব্যাপারে আপন শ্যালিকা হামনা যখন অপরাধিনী সাব্যস্ত হইলেন, তখন বিচারানুসারে তাঁহাকেও তিনি শাস্তি দিতে ছাড়েন নাই, আবার শাস্তিদানের পর মিস্‌তাহ্, হাসান প্রভৃতিকে ক্ষমা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। হোদায়বিয়ার সন্ধি হইবার পর আবুজন্দল আসিয়া হযরতের শরণাপন্ন হইল, তখন ন্যায়ের খাতিরে তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন নাই, কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দিয়াছেন। ওৎবার বেলাতেও তিনি ঠিক একইরূপ করিয়াছেন—তাহাকে তিনি কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আসাই যাঁহার জীবন-ব্রত ছিল, তিনি ন্যায়ের খাতিরে আলোক-প্রাপ্তকে পুনরায় অন্ধকারে ফিরাইয়া দিয়াছেন। বস্তুত হযরতের জীবনে এমন কোন ঘটনা কেহ দেখাইতে

www.pathagar.com

পারিবেন না—যেখানে তিনি ন্যায় ও নীতির মর্যাদা রক্ষা করেন নাই। ন্যায়ের অর্থ শুধু ক্ষমা—শুধু করুণা নহে, কঠোরতাও তাহার মধ্যে আছে, অপরাধীর শাস্তিবিধানও তাহার মধ্যে আছে। হযরত এইরূপ ন্যায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

বদান্যতায়

দান-খায়রাত হযরতের জীবনের আর এক বৈশিষ্ট্য। দুঃস্থ নিপীড়িত মানবের সাহায্যকল্পে সতত তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। জীবনে কোনদিন কোন লোক হযরতের নিকট কোন কিছু চাহিয়া বিমুখ হয় নাই। পাঠক জানেন, বিবি খাদিজার অগাধ ধনসম্পদ ছিল। খাদিজার সহিত বিবাহের পর তিনি সেই সমস্ত সম্পদের প্রকৃত অধিকারী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত যুদ্ধলব্ধ ধনরত্নের এক-পঞ্চমাংশ তাঁহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এত ধনদৌলতের অধিকারী হইয়াও মহাপুরুষ ছিলেন একেবারে নিরাসক্ত। তাঁহার গৃহের পরিপাট্য ছিল না; অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা ছিল না, সমস্ত বিলাইয়া দিয়া দরদী নবী কোনদিন অনাহারে পেটে পাথর বাঁধিয়া, কোনদিন বা দুইটি খোর্মা খাইয়া জীবন-যাপন করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি পরম সুখে ভোগ-বিলাসের মধ্যে বসিয়া দিন কাটাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। প্রচুর অর্থ তাহার হাতে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তিন দিনের বেশী সেই অর্থ তিনি গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখেন নাই। একবার শিষ্যবৃন্দের সহিত নামায পড়িতে পড়িতে হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া গৃহে গমন করেন; ক্ষণপরে আবার ফিরিয়া গিয়া নামাযে যোগ দেন। শিষ্যবৃন্দ অবাক হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বলেন, "কতিপয় দিনার দুই তিন দিন হইতে এখনও আমার বিছানায় পড়িয়া আছে, তাহা আজও বিতরণ করা হয় নাই। নামায পড়িতে পড়িতে সেই কথা মনে পড়ায় আমি উঠিয়া যাই; দিনারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।"

এইরূপভাবে সারাটি জীবন ধরিয়াই তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। এমনকি মৃত্যু শয্যায় থাকিয়াও তিনি দান করিতে ভুলেন নাই। মৃত্যুর পূর্বদিন তিনি বিবি আয়েশাকে জিজ্ঞাসা করেন : "তোমার কাছে যে দিনারগুলি রাখিয়া দিয়াছিলাম, সেগুলি কোথায়?" আয়েশা উত্তর দিলেন : "আমার কাছেই আছে।" হযরত বলিলেন, "সেইগুলি শীঘ্রই দান করিয়া দাও।" বলিতে বলিতে তিনি হতচেতন হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : "দিনারগুলি দান করিয়াছ কি?" আয়েশা বলিলেন : "না, এখনও করি নাই।" তখন হযরত সেইগুলি আনিতে বলিলেন। আয়েশা তাহা আনাইয়া হযরতের হাতে দিলেন। দেখা গেল ছয়টি দিনার। হযরত কয়েকটি দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিয়া বলিলেন : "এখন আমার শান্তি হইল। দিনারগুলি রাখিয়া আমার প্রভুর সান্নিধ্যে উপনীত হইলে কী লজ্জার কথাই না হইত।"

হযরতের নিজস্ব তিনটি ভূ-সম্পত্তি ছিল : ফেদাকে একটি, আর দুইটি মদিনায় এবং খায়বারে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তিনটি সম্পত্তিই দরিদ্রদিগের সাহায্যকল্পে ওয়াক্‌ফ্ করিয়া যান; নিজের স্ত্রীদিগের জন্য বিশেষ কিছুই রাখেন নাই। মৃত্যুর পর তাঁহার গৃহে

www.pathagar.com

কোন ধনরত্ন দেখা যায় নাই। কোন দাসদাসীও তিনি রাখিয়া যান নাই। শুধু তাঁহার প্রিয় অশ্ব 'দুলদুল' এবং কয়েকটি যুদ্ধের উপকরণ ছাড়া আর কিছুই তাঁহার ছিল না। তিনি বলিয়া গিয়াছেন : পয়গম্বরদিগের সম্পত্তির কোন উত্তরাধিকারী নাই; যাহা কিছু থাকিবে সমস্তই দানের বস্তু।"

বস্তুত ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভই হইতেছে যখন জাকাত (অর্থাৎ দরিদ্রদিগের সাহায্যকল্পে সঞ্চিত অর্থের শতকরা আড়াই ভাগ বিতরণ) এবং কোরআন শরীফে যখন বহুস্থানে দানের মহিমা বিঘোষিত হইয়াছে, তখন হযরত মুহম্মদ যে আদর্শ দানবীর হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

জীবে দয়ায়

জীবজন্তুর প্রতি—এমন কি তরুলতার প্রতিও—হযরতের দয়ার অন্ত ছিল না। তিনি বলিয়াছেন : "এ সব পশু-পক্ষীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্‌কে ভয় করিও। সুস্থ অবস্থায় তাহাদের উপর চড়িয়া বেড়াও, সুস্থ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখ।" তিনি বলিয়াছেন : "একটি স্ত্রীলোককে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল, কারণ সে একটি বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়া ফেলিয়াছিল।" তিনি বলিয়াছেন : "একটি স্ত্রীলোকের গুনাহ্ আল্লাহ্ মাফ করিয়া দিয়াছিলেন, কারণ সে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি খাওয়াইয়াছিল।" একদা এক ব্যক্তি অনর্থক একটি গাছের পাতা ছিঁড়িতেছিল। হযরত তাহাকে সে কাজ করিতে নিষেধ করিয়া বলেন : "প্রত্যেকটি পাতা আল্লাহ্‌র গুণগান করে।"

এখানে একটি কথা। অ-মুসলিমরা প্রশ্ন করিতে পারেন : জীবের প্রতি যদি হযরতের সত্যিকার দরদই থাকিবে, তবে কুরবানি ও জীবনহত্যার ব্যবস্থা কেমন করিয়া তিনি দিলেন? জীবে দয়া এবং জীবহত্যার ভিতরে সামঞ্জস্য কোথায়?

পূর্বেই বলিয়াছি, ইসলাম ব্যবহার্য ধর্ম; এমন কোন বিধান সে কখনও দেয় নাই-যাহা মানুষ কার্যত পালন করিতে পারে না। 'অহিংসা পরম-ধর্ম' তাহার বাণী নহে। উৎকট পশুপ্রীতিও তাহার ধর্মনীতি নহে। সে বলে : সৃষ্টির মধ্যে মানুষ হইতেছে 'আশরাফুল মাখলুকাত'; মানুষের সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্টির জন্যই আল্লাহ্ অন্যান্য সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। নিখিল সৃষ্টি তাই মানুষকে সেবা করিতে ব্যস্ত। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, পশু-পক্ষী, আগুন-পানি, তরুলতা, ফুল-ফল সমস্তই মানুষের উপভোগের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। কাজেই আত্মসংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হইলে মানুষ যাহাকে খুশি ভোগ করিতে পারে। এইজন্যই ইসলামে প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ নহে, প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণিহত্যা পাপ নহে। অবশ্য বিনা কারণে নিষ্ঠুরতা মহাপাপ।

শ্রমের মর্যাদা দানে

কোন কার্যকেই হযরত ঘৃণা করিতেন না। রাখাল সাজিয়া তিনি বকরী চরাইয়াছেন, মজুর সাজিয়া মাটি কাটিয়াছেন, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করিয়াছেন, পানি টানিয়াছেন,

www.pathagar.com

চামার সাজিয়া জুতা মেরামত করিয়াছেন, দর্জি সাজিয়া জামা সেলাই করিয়াছেন, মেথর সাজিয়া মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। এইরূপে তিনি সকল শ্রমকেই মর্যাদা দান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের এই সব নিম্নস্তরের লোকদিগের প্রাণে বিপুল বল ও ভরসাও জোগাইয়াছেন। অতি নগণ্য লোকও আজ হযরতের জীবন হইতে প্রেরণা লাভ করিতে পারে; হযরত যে তাহাদের মত শ্রমিক ছিলেন, এই জ্ঞান তাহাদিগকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করে।

গৃহী রূপে

সাধারণত মানুষ গৃহসংসার পাতিয়া বাস করে। গৃহধর্ম বড় কঠিন। গৃহীর জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদ, ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা প্রভৃতি শত প্রকারের অভিব্যক্তিতে এই জীবন ভরপুর। এক এক সময় এমন এক একটা সমস্যা আসে যে, মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়ে; কি করিবে ভাবিয়া পায় না। হযরতের জীবনে গৃহধর্মের সব সমস্যারই সামাধান আছে। কেমন করিয়া স্ত্রী-পুত্রপরিজন লইয়া ঘর-সংসার করিতে হয়, সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে কর্তব্য পালন করিতে হয়, সংসারের খুঁটিনাটি কার্যে স্ত্রীকে সাহায্য করিতে হয়, কোন্ জিনিসটি কিরূপভাবে কখন খাইতে হয়, কোন্‌টি ভাল, কোনটি মন্দ, কোন্‌টি হারাম, কোন্‌টি হালাল-ইত্যাদি সব বিষয়েই বিস্তৃত বিবরণ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন— কেমন করিয়া গোসল করিতে হয়,, চুল ছাঁটিতে হয়, দাঁড়ি রাখিতে হয়, কাপড় পরিতে হয়, ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিতে হয়, খানা-মেজবানি করিতে হয়, অতিথি সৎকার করিতে হয়, সঞ্চয় করিতে হয়, দান করিতে হয়—ইত্যাদি যতকিছু আমাদের জীবনে প্রয়োজন সমস্ত কিছুরই আদর্শ আছে হযরতের মধ্যে। এমনকি মানব-জীবনের যে অংশ অতি গোপনীয় তাহার সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট বিধান দিয়া গিয়াছেন।

স্বামীরূপে

হযরত ছিলেন আদর্শ স্বামী। বিবি খাদিজার সহিত তিনি ২৫ বৎসর কাল কাটাইয়াছিলেন। খাদিজা ছিলেন প্রৌঢ়া, তিনি ছিলেন যুবক। অথচ একদিনের জন্যও তিনি খাদিজার উপর বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হন নাই। প্রথম যৌবনের সমস্ত অনুরাগ দিয়া তিনি তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং চিরদিন তিনি খাদিজার স্মৃতিকে শ্রদ্ধাভরে বহন করিয়া গিয়াছেন। খাদিজার প্রতি কত তাঁহার সম্ভ্রম, কত তার প্রেম। তরুণ বয়স্কা আয়েশার প্রতিই বা কী মধুর ব্যবহার ছিল তাঁহার। শুধু আয়েশা কেন, কোন স্ত্রীর প্রতিই তিনি কোনদিন পক্ষপাতিত্ব করেন নাই বা অবজ্ঞা করেন নাই; সবাইকে সমানভাবে ভালবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন।

নিম্নের কয়েকটি হাদিস হইতে জানা যাইবে স্ত্রীর প্রতি হযরতের মনোভাব কিরূপ ছিল :

১. পুণ্যময়ী স্ত্রী-রত্ন লাভ করা জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

২. তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ।

www.pathagar.com

৩. নামায, স্ত্রী এবং সুগন্ধ দ্রব্য- এই তিনটি আমার আছে অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক।
৪. স্ত্রীর সহিত যে-কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ করা জায়েজ।

স্বাবলম্বনে

স্বাবলম্বন হযরত-চরিত্রের একটা প্রধান গুণ। জীবনে কোনদিন তিনি পরমুখাপেক্ষী হন নাই। তাঁহার গৃহে কোনদিন কোন ক্রীতদাস ছিল না। আপন স্নেহের কন্যা ফাতিমা পর্যন্ত নিজ হস্তে গৃহের সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। হযরতও যথাসাধ্য গৃহকর্মে তাঁহার স্ত্রী-কন্যাদিগকে সাহায্য করিতেন। ভিক্ষাকে তিনি সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করিতেন। একবার একজন অভাবগ্রস্ত লোক হযরতের নিকট আসিয়া বলিল : "হযরত, ভিক্ষা করা ছাড়া আমার জীবিকার্জনের আর অন্য পথ নাই।" হযরত বলিলেন : "তোমার ঘরে কি কোন দ্রব্যই নাই?" লোকটি বলিল : "একটি বাঁটহীন কুড়াল আছে মাত্র।" হযরত বলিলেন : "তাহাই লইয়া আইস।" লোকটি গৃহে গিয়া সেই কুড়ালের ফলাটি লইয়া আসিল। তখন হযরত নিজহস্তে একটি গাছের ডাল কাটিয়া কুড়ালের বাট লাগাইয়া দিয়া বলিলেন : "এই কুড়ালটি লও, বনে গিয়া কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু উপার্জন কর, তবু খবরদার ভিক্ষা করিও না।"

বলা বাহুল্য, সেই উপায়েই লোকটি তাহার অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিল।

চরিত্র-মাধুর্যে

হযরত ছিলেন আদর্শ চরিত্রের। মানব-চরিত্রের সকল দিকই আমরা তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। স্বয়ং আল্লাহ্ই বলিয়া দিতেছেন : "হে মুহম্মদ তুমি নিশ্চয়ই উন্নত নৈতিক চরিত্র লাভ করিয়াছ।" (কোরআন, ৬৮ : ৪) সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বীরত্ব, স্বাবলম্বন, সৎসাহস, নির্ভীকতা, সেবা, সাহায্য, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম, বদান্যতা, উদারতা, মহত্ত্ব, ক্ষমতা, সংযম, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সমস্ত গুণেরই তিনি অধিকারী ছিলেন।

বীরবেশে

বীরত্বের দিক দিয়াও হযরত ছিলেন আমাদের আদর্শ। নিঃসহায় অবস্থায় তিনি অত্যাচারীকে বাধা দিতে পারেন নাই সত্য, সে সময়ে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তারপরই আমরা তাঁহাকে দেখি নির্ভীক বীরবেশে। তিনি বুঝিয়াছিলেন : শুধু মিনতি, শুধু ক্ষমা, শুধু নম্রতা, শুধু নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ দ্বারা জীবনকে সবসময় জয়যুক্ত করা যায় না। পৌরুষব্যঞ্জক দৃঢ়তা ও বীরত্ব জীবনে একান্ত প্রয়োজন। এই জন্যই তিনি সত্যের সহিত শক্তির সমন্বয় করিয়া দিয়াছেন। বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বার প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে হযরত যুদ্ধ করিয়াছেন, সর্বত্রই তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছি নির্ভীক বীরবেশে।[৮]

---

৮. ইবনে-ইছাক বলিতেছেন : রসূলুল্লাহ্ মোট ২৭টি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ৯টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা-বদর, ওহুদ, খন্দক, কোরাইজা, মুস্তালিক, খায়বার, মক্কাবিজয়, হুনায়েন ও তায়েফ।

www.pathagar.com

কোন যুদ্ধক্ষেত্রেই কোন অবস্থাতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। শত্রুসেনার সংখ্যা বা অস্ত্রবল দেখিয়া দারুণ সংকটের মধ্যে দাঁড়াইয়াও তিনি স্থিরচিত্তে সৈন্যচালনা করিয়াছেন। যেখানে যুদ্ধের উপকরণ কোন কিছুই নাই—সেখানে নিঃস্ব একজন মানুষ পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র কুড়াইয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় যোদ্ধা লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। তারপর আপন প্রতিভা দ্বারা ধীরে ধীরে শিষ্যবৃন্দকে সমর-বিশারদ ও অজেয় করিয়া তুলিতেছেন, অবশেষে তাহাদিগকে জগতের মধ্যে একটি দুর্বার শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত করিয়াছেন—ইহা কি কম বীরত্বের কথা? জগতের অন্য কোন ধর্মপ্রচারককে এইরূপ বীরবেশে আমরা দেখি নাই। এতবড় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও মনোবলও আর কাহারও মধ্যে পাই নাই।

রাষ্ট্রনায়ক রূপে

হযরতের ন্যায় এতবড় রাষ্টবিদও আর দেখা যায় না। পাঠক একবার বদর-যুদ্ধের অবস্থার সহিত হযরতের মৃত্যুকালীন অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন। এই ১০/১২ বৎসরের মধ্যে কত পরিবর্তন : মাত্র ৩১৩ জন যোদ্ধা লইয়া যিনি বদর-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্বেই তিনিই রোম-সম্রাট, পারস্য-সম্রাট, আবিসিনিয়া-সম্রাট, মিসরাধিপতি প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা রাজশক্তির নিকট সন্ধির শর্ত নির্দেশ করিয়া পত্র লিখিতে পারিয়াছিলেন। কোরেশ, ইহুদী, বেদুঈন, খ্রীষ্টান, পারসিক—সকল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বীরের মত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইয়াছিল। অসভ্য কতিপয় আরব সন্তানের মধ্য দিয়া জগতময় একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করা এবং "পশ্চিমে হিস্পানি দেশ, পূর্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ" পর্যন্ত জয় করা কি সহজ শক্তির কথা। অসাধারণ প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্ব না থাকিলে এত বড় সংগঠন কেহ করিতে পারে না। যে ইসলামী রাষ্টতন্ত্র তিনি গঠন করিয়া গিয়াছেন, আজ পর্যন্ত তাহা কার্যকরী রহিয়াছে, জগতের মধ্যে ইসলাম এখনও একটা জীবন্ত রাষ্টশক্তি বলিয়া পরিগণিত। আলেকজাণ্ডার, হানিবল, নেপোলিয়ান প্রমুখ কোন বীরই এমন চিরস্থায়ী একটা রাষ্টশক্তি গঠন করিয়া যাইতে পারেন নাই। হযরতের রচিত গণতন্ত্রবাদ ও রাষ্টনীতি বিশ্বের রাজনৈতিক দর্শনকে অদ্যাবধি প্রভাবান্বিত করিতেছে। রাজ্যশাসনের যে বিধান তিনি দিয়া গিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উন্নততর কোন বিধানই জগৎ আজ পর্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই।

আদর্শ প্রতিষ্ঠায়

প্রত্যেক মহাপুরুষই এক একটা নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। সেই মতবাদ কতখানি সত্য এবং টেকসই, তাহা প্রমাণিত হয় দুইটি প্রশ্নের বিচারে : (১) মহাপুরুষ নিজের জীবনে সেই আদর্শ কতখানি পালন করিলেন, (২) শিষ্যেরা গুরুর আদর্শ কতখানি গ্রহণ করিতে পারিলেন। কোন্ ধর্ম কতখানি সত্য, এই কষ্টিপাথরে যাচাই করিলেই তাহা সুন্দররূপে ধরা পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য মহাপুরুষেরা মুখে যাহা বলিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে কাজে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। বুদ্ধ মধ্যপথের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু

www.pathagar.com

কাজে তাহা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যরা রীতিমত যুদ্ধ করিয়াই সে বাণীর মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন। যিশুখ্রীষ্ট প্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, এক গালে চড় মারিলে অন্য গাল পাতিয়া দিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যরা কার্যত আগেই চড় মারিয়া বসিতেছেন। কাজেই বুঝিতে হইবে ঐ সব আদর্শ স্বাভাবিক নহে, মানুষের প্রকৃতির সহিত উহারা খাপ খায় না। কিন্তু হযরত মুহম্মদ সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। তিনি যে বাণী ও যে আদর্শ প্রচার করিলেন কার্যতও তাহা দেখাইয়া গেলেন। শত বাধা, শত বিপদ, শত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া তিনি আপন আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শিষ্যারাও যেন গুরুর এক একখানি প্রতিকৃতি হইয়া দাঁড়াইলেন। আল্লাহ্, রসূল, ইসলাম এবং মুসলমান—সবই যেন একসুরে বাঁধা হইয়া গেল। এক কলেমা, এক ধ্যান, এক আদর্শ, এক প্রাণ। এমনটি আর কোথায়ও দেখা যায়?

অন্যান্য ক্ষেত্রে

অন্যান্য ক্ষেত্রেও হযরতকে আমরা আদর্শরূপে দেখিতে পাই। অতিথি-সৎকার, আর্ত, পীড়িত ও দুর্গতদের সেবা ও সাহায্য দানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অন্যান্য কার্যে নাগরিক জীবনের কর্তব্য পালনে, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে কোন বিষয়েই তিনি আমাদিগকে নিরাশ করেন নাই।

বিবাহ-প্রথার উন্নয়নে

বিবাহ-প্রথার উন্নতি সাধন হযরতের একটি প্রধান সংস্কার। ইহা দ্বারা নারীজাতির মহিমা ও মর্যাদাকে তিনি বাড়াইয়া দিয়াছেন। বিবাহকে তিনি একটা পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে জগতের প্রত্যেক জাতিই বিবাহকে অতি হালকাভাবে গ্রহণ করিত। আরবে ত বিবাহের কোন মর্যাদাই ছিল না; যখন খুশি, যাহাকে খুশি বিবাহ করা যাইত। যখন খুশি তালাক দেওয়া যাইত। এক পুরুষ বিভিন্ন নারীকে ত বিবাহ করিতই, এক নারীও একই সময়ে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করিত। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও বিবাহের নামে যথেচ্ছাচার চলিত। বাহিরে এক বিবাহের প্রচলন থাকিলেও ভিতরে ভিতরে বহু প্রকারের অনাচার ও ব্যভিচারের স্রোত বহিত। স্বাধীন প্রেমই ছিল তাহাদের যৌনমিলনের আদর্শ। প্রাচীন ভারতেও বিবাহের কোন মর্যাদা ছিল না। রাক্ষস-বিবাহ, পৈশাচিক বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ ইত্যাদি ত ছিলই, তদুপরি আবার কৌলিন্য প্রথার কল্যাণে বিবাহের নামে যে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা চলিত, তাহা অত্যন্ত ভয়াবহ।

কিন্তু হযরত আসিয়া এই বিবাহ-প্রথাকে মধুর এবং মহিমান্বিত করিয়াছেন। বিবাহকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়া তিনি ইহাকে পবিত্র করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

"যে ব্যক্তি বিবাহ করে, সে তাহার অর্ধেক ধর্ম পালন করে।"

ইসলাম বিবাহকে কি চক্ষে দেখে, কোরআনের আয়াত হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে। কোরআন বলিতেছে :

www.pathagar.com

"হে লোকসকল, তোমাদের প্রভুর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তোমরা সাবধান হও—যে-প্রভু একজন হইতে (হযরত আদম হইতে) তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার সঙ্গিনীকে (হাওয়াকে) একই উপাদান হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের দুই জন হইতে বহু নরনারীকে ছড়াইয়া দিয়াছেন।" (৪ : ১)

অন্যত্র বলিতেছে :

"তিনি তোমাদিগকে একটি প্রাণী হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্য হইতে তাহার সঙ্গিনীকে পয়দা করিয়াছেন—যাহাতে সে (স্বামী) তাহার (স্ত্রীর) প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।" (৭ : ১৮৯)

আর এক স্থানে আছে :

"এবং তাঁহার (আল্লাহ্‌র) একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের সঙ্গিনী পয়দা করিয়াছেন-যাহাতে তোমরা তাহাদের মধ্যে মনের সুখ পাইতে পার।" (৩০ : ২১)

"তাহারা (স্ত্রীরা) তোমাদের (পুরুষদের) ভূষণ এবং তোমরা তাহাদের ভূষণ।" (২ : ১৮৭)

উপরোক্ত আয়াতগুলি হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবাহ শুধু দৈহিক সম্বন্ধ নহে—আত্মিক এবং ইহা এমন দুইটি হৃদয়ের মিলন—যাহারা মূলত এক এবং অভিন্ন।

স্বামী-স্ত্রীর এই অভিন্নতা এবং আত্মিক মিলনের উপরেই ইসলামের বিবাহ-প্রথা সংস্থাপিত। কাজেই এই সম্বন্ধ অতি পবিত্র। ইহজীবনেই ইহার শেষ নহে—অনন্তকাল ইহা স্থায়ী। কোরআন বলিতেছে :

"চিরস্থায়ী সেই জান্নাত-বাগিচা—সেখানে তাহারা (পুণ্যাত্মারা) তাহাদের সৎকর্মশীল মাতাপিতার এবং স্ত্রীপুত্রের সহিত প্রবেশ করিবে; এবং ফেরেশ্‌তারা প্রত্যেক দরজা দিয়া তাহাদের খিদমতে হাজির হইবে।"[৯] (১৩ : ২৩)

সমগ্র জগৎ জুড়িয়া যখন নারীর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, তখন মহামানব মুহম্মদ আনিলেন এই নববিধান। ধূলিধূসরিত অবজ্ঞাত নারীকে তিনি করিলেন মহীয়সী ও গরীয়সী।

বিদায়-হজ্জের সময় হযরত মুসলমানদিগকে যে শেষ উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি নারীকে ভুলেন নাই। বার বার তিনি মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন : "হে মুসলমানগণ তোমাদের স্ত্রীদিগের কথা ভুলিও না। মনে রাখিও, আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ।"

বিবাহকালে স্ত্রীর দেনমহর, যৌতুক ইত্যাদির ব্যবস্থা এবং স্বামী ও পিতার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার দানও স্ত্রীর মর্যাদাকে বাড়াইয়া দিয়াছে।

---

৯. মুসলমান-আইনে বিবাহকে একটি সামাজিক চুক্তি (civil contract) বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা শুধু সামাজিক চুক্তি নহে, আত্মিক চুক্তিও বটে। অনন্তকাল স্থায়ী এই মিলন। পুরুষের পাশে নারীও রহিবে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কাজেই পরকালে স্বামী-স্ত্রীর কল্পনা আদৌ অসংগত বা অস্বাভাবিক নহে। কোরআন তাই বেহেশতেও নারীর স্থান নির্দেশ করিয়াছে।

www.pathagar.com

বহুবিবাহের ব্যবস্থায়

এইখানে ইসলামের বহুবিবাহের প্রশ্ন তুলিয়া কেহ একটা সন্দেহের ছায়াপাত করিতে পারেন। বলিতে পারেন : বহুবিবাহই যদি সমর্থিত হইল, তবে আর একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের স্থান রহিল কোথায়?

ঠিক কথাই বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইসলামে বহুবিবাহ নিয়ম নহে– ব্যতিক্রম। আমরা সর্বক্ষেত্রেই বলিয়া আসিতেছি ইসলাম কোথায়ও এমন বিধান দেয় নাই যাহা বাস্তব জীবনে অচল হয়। প্রত্যেক সম্ভাব্য অবস্থার জন্যই সে পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে। দূরদর্শিতা ও সনাতনত্ব তাহার বৈশিষ্ট্য। পুরুষের চারিটি পর্যন্ত বিবাহ করিবার অধিকার সে দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অবস্থাবিশেষে; সাধারণত এক বিবাহই ইসলামের বিধান। কোরআন বলিতেছে :

"এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর অনাথদিগের (এতিম) প্রতি তোমরা যথাযোগ্য ন্যায়-ব্যবহার করিতে পারিবে না, তখন যাহাদিগকে ভাল মনে কর, তাহাদের মধ্য হইতে দুই, তিন বা চারিটি বিবাহ কর। কিন্তু যদি ভয় কর যে তাহাদের (স্ত্রীদের) প্রতি নম্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে মাত্র একটিই বিবাহ কর।" (৪ : ৩)

ইহা দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, যখন-তখনই আপন খুশি মাফিক চারিটি বিবাহ করিবার আদেশ দেওয়া হয় নাই। মানুষের জীবনে এমন এক একটি অবস্থা আসে, যখন একাধিক বিবাহ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। যুদ্ধে যখন সমাজের পুরুষ-সংখ্যা কমিয়া যায়, অথবা প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা বা চিররুগ্না হয়, অথবা অন্য কোন কারণে যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মহব্বৎ না হয়, তখন দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনুভূত হয় বৈকি। সেইরূপ অবস্থার জন্য ইসলাম পূর্ব হইতেই বিধান দিয়া ভাল করে নাই কি? এই যে ইউরোপের এক-একটা মহাসমরে লক্ষ লক্ষ পুরুষ নিহত হইল, তাহাদের বিধবা স্ত্রী এবং কন্যাদিগের অবস্থা কি দাঁড়াইল? তাহাদের বিবাহ হইল কি? কোথায় অত পুরুষ মিলিবে? পুরুষদিগের একাধিক বিবাহ করিবারও উপায় নাই, কারণ খ্রীষ্টধর্মে বহুবিবাহ (polygamy) নিষিদ্ধ। বাধ্য হইয়া নারী-পুরুষ ব্যভিচার আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে জন্মগ্রহণ করিল লক্ষ লক্ষ অবৈধ সন্তান, আর তাহাদের নাম দেওয়া হইল "War babies"। ইহাই কি সুব্যবস্থা? এই বিধানই কি হইল কল্যাণকর? ইহাই কি হইল নৈতিক জীবনের আদর্শ? তাহার চাইতে ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়াছে তাহা কত সুন্দর। এই অবস্থায় অসহায় নারীরও আশ্রয় মিলে, সমাজও ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষা পায়। ইহাই কি ভাল নহে?

সম্রাট নেপোলিয়ানের কথা ভাবুন। রাজনৈতিক কারণে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে তাঁহার বিবাহ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু কেমন করিয়া করিবেন? তিনি যে বিবাহিত। তখন বাধ্য হইয়া জোসেফিনের ন্যায় অমন সতী-সাধ্বী স্ত্রী-রত্নকে বিনা কারণে তালাক (divorce) দিতে হইল। খ্রীষ্টধর্মে যদি বহুবিবাহের বিধান থাকিত, তবে আর এই নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে দেখাইতে হইত না।

www.pathagar.com

মানুষের বলিষ্ঠ রূপদান

মানুষের বলিষ্ঠ ব্যাপক রূপদান হযরতের আর একটি অবদান। হযরতের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। সে যে কত বড়—কত মহীয়ান, তাহার শক্তি যে কত ব্যাপক এবং অন্তহীন, সে তাহা জানিত না। মেষের মধ্যে থাকিতে থাকিতে সিংহ-শিশু যেমন আত্ম-পরিচয় ভুলিয়া যায়, মানুষও সেইরূপ নিজের স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়াছিল। হযরত মুহম্মদ আসিয়া মানুষকে তাহার আত্মরূপ দর্শন করাইলেন। তিনি বলিলেন : "হে মানুষ, তুমি ছোট নও, তুচ্ছ নও, ঘৃণ্য নও, অস্পৃশ্য নও-তুমি মহান, তুমি শক্তিমান। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-বাতাস, মেঘ-বিদ্যুৎ, পর্বত-নদী, তরুলতা সমস্তই তোমার ভৃত্য, তোমার সেবায় তাহারা নিয়োজিত। আল্লাহ্‌র নিচেই তোমার আসন; তুমি কেন অন্য কাহারও নিকট নতশির হইবে?"

মানুষের ভিতর এতদিন একটা নারীসুলভ ভীরুতাও লুকাইয়া ছিল। শুধু বিনয়, শুধু ক্ষমা, শুধু করুণা ইত্যাদি ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য। সংসারের কঠোরতা হইতে সে রহিত তাই দূরে দূরে—নিজেকে সকলের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সে ভয় ও সংকোচ করিত। হযরত ছিলেন মানুষের জীবনের এক অপূর্ব নূতন ব্যাখ্যা; ভীরু মানুষকে তিনি করিলেন সাহসী। হস্তে দিলেন তরবারি, বুকে দিলেন নববল, নয়নে দিলেন নবজ্যোতিঃ, প্রাণে দিলেন নব আশা, কণ্ঠে দিলেন নবভাষা, অন্তরে দিলেন আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম ও নির্ভরতা। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতই হইল তাহার জীবনের জাগরণ। ধর্মে-কর্মে, প্রেমে-পুণ্যে, জ্ঞান-গরিমায়, শৌর্যে-বীর্যে তাহার অন্তর-মানুষ যখন জাগিয়া উঠিল, তখন দুর্বার বেগে ছুটিল সাগর পানে। স্বর্গমর্ত্য আলোড়ন করিয়া ফিরিতে লাগিল সে। পরিপূর্ণ জীবনের এই যে পুলক-স্পন্দন, এই যে বিশ্বনিখিলের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-জ্ঞান—ইহা মানুষের পক্ষে এক মস্তবড় সম্পদ। এই মহাসম্পদ প্রকৃতপক্ষে হযরতেরই দান।

যুগসমস্যার সমাধান

যুগে যুগে মানবসমাজে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সমাধানের জন্য হযরতই আমাদের একমাত্র ভরসার স্থল। সমস্ত সমস্যার সমাধানই তাঁহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতা, আন্তর্জাতীয়তা, নারী-স্বাধীনতা, নারীজাতির অধিকার, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ, ধনিক ও শ্রমিক-সমস্যা, সুদ-সমস্যা, মুহাজির সমস্যা, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ-সমস্যা, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বলশেভিকবাদ—ইত্যাদি সমস্ত যুগসমস্যার সমাধানই হযরত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাদের কোন কোনটি জগৎ গ্রহণ করিয়াছে, কোন কোন্‌টি এখনও করে নাই বা করিলেও পুরাপুরিভাবে করে নাই। আর এই না-করার দরুনই হইতেছে যত অশান্তি আর যত যুদ্ধবিগ্রহ। ইউরোপের পুঁজিবাদ (capitalism)-কেও ইসলাম সমর্থন করে নাই, আবার

www.pathagar.com

বলশেভিকবাদকেও সমর্থন করে নাই। সমস্ত অর্থ একজন লোক জমা করিয়া সিন্দুকে রাখিয়া দিবে আর দরিদ্রেরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে, ইসলামে তাহার উপায় নাই; পক্ষান্তরে প্রত্যেক মানুষের সঞ্চিত ধন-সম্পদ যে রাজকোষে আনিয়া জড় করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত অধিকারকে খর্ব করিতে হইবে, ইসলামে তাহার বিধানও নাই।[১০] ইসলামের 'জাকাত' ও 'ওশর' প্রথা ধনিক ও শ্রমিক উভয়কেই রক্ষা করিয়াছে। ইসলাম মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তুলিয়া দিয়াছে, অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াছে, দাস-প্রথার মূলোচ্ছেদ করিয়াছে। নারীজাতিকে মর্যাদা ও অধিকার দিয়াছে, বিশ্বমানবতা ও আন্তর্জাতীয়তা সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র জগৎ আজ হযরতের এইসব আদর্শেরই অনুসরণ করিতেছে।

জগতে আজ ভাঙা-গড়ার যুগ আসিয়াছে; এই যুগসন্ধির দুয়ারে দাঁড়াইয়া আজ শুধু এই কথাই মনে জাগিতেছে : জগতে যদি কোন নূতন যুগ (New order) আসে, তবে তাহা হযরত মুহম্মদের আদর্শেই রচনা করিতে হইবে, অন্যথায় এই হানাহানি, এই রক্তারক্তি থামিবে না—শান্তি আসিবে না।

বৈজ্ঞানিক রূপে

আজ আমরা এক নূতন বৈজ্ঞানিক যুগে আসিয়া পৌছিয়াছি। এইযুগ নভোভ্রমণের (space-flight) যুগ। রকেট-শিপে চড়িয়া বৈজ্ঞানিকেরা আজ গ্রহে-গ্রহে ভ্রমণ করিবার আয়োজন করিতেছে। এই নূতন বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রপথিক রূপে আমরা দেখিতে পাই হযরত মুহম্মদকে। পৌরাণিক কাহিনী নহে, কিংবদন্তী নহে-ঐতিহাসিক সত্য রূপেই সশরীরে তিনি 'মিরাজ' করিয়াছিলেন। আজিকার নভোভ্রমণ সেই মি'রাজেরই প্রেরণাদীপ্ত বৈজ্ঞানিক রূপ। কাজেই বলা যাইতে পারে, এ যুগের পূর্বাভাষ রসূলুল্লাহ্ই জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন। অন্য কথায় তিনিই ছিলেন প্রথম নভো-বৈমানিক।

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সফল মানুষরূপে

বিশ্বনবীর জীবনকে আমরা নানাদিক হইতে দেখিলাম। আমরা কি এখন এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না যে, জগতে যদি কোন সর্বাঙ্গসুন্দর ও সর্বতোভাবে সফল মহামানব আসিয়া থাকেন, তবে তিনি হযরত মুহম্মদ। মানুষের তিনটি মৌলিক সম্বন্ধ আছে : আল্লাহ্র সহিত সম্বন্ধ, মানুষের সহিত সম্বন্ধ, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ। রসূলুল্লাহ্ তিনটি সম্বন্ধই পুরাপুরি স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তিন দিক দিয়াই তিনি সফলতা অর্জন করিয়াছেন। কর্মজীবনে, ধর্মজীবনে ইহজীবনে, পরজীবনে, দৈহিক জীবনে, আধ্যাত্মিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, পারিবারিক জীবনে, নৈতিক জীবনে, দার্শনিক ও

---

১০. এ সম্বন্ধে লেখকের 'ইসলাম ও কমিউনিজম' পুস্তক দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক জীবনে, সংস্কার সাধনে, জাতিগঠনে, রাষ্ট্র-রচনায়, জ্ঞানে, পুণ্যে, প্রেমে, বীরত্বে, সৎসাহসে, সংযমে, ত্যাগে, মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাবলম্বনে, সততায়, সত্যবাদিতায়, ন্যায়নিষ্ঠায়, উদারতায়-যে কোন দিক দিয়াই দেখি না কেন, এমন পরিপূর্ণ আদর্শ মহামানব আর কে আছেন? সর্বদিক দিয়া এমন সার্থক জীবনই বা কাহার? যে জীবনের সাধনার ফলে সমগ্র জগতে আজ চিরকল্যাণের উৎস বহিয়া চলিয়াছে-যাহার চরণ-পরশে মরুসাহারায় ফুল ফুটিয়াছে, বিরান মুলুক আবাদ হইয়াছে আলোকে-পুলকে হাসি-গানে সমগ্র জগৎ মুখরিত হইতেছে, গৃহে গৃহে সুখ-শান্তির বাতাস বহিতেছে, তাঁহার জীবন নিশ্চয়ই ধন্য, তিনি নিশ্চয়ই রহমতুল্লিল্ আলামিন-তিনি নিশ্চয়ই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের চিরন্তন আদর্শ তিনি নিশ্চয়ই চরম প্রশংসার যোগ্য—তিনি নিশ্চয়ই মুহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হে অসাল্লাম)।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৩
হযরতের বহুবিবাহের তাৎপর্য

এইবার একটি গুরুতর প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। হযরত মুহম্মদ তেরটি[১] বিবাহ করিয়া গিয়াছেন, ইহার ব্যাখ্যা কি? ইহা কি তাঁহার পক্ষে কোন গৌরবের কথা?

হযরত মুহম্মদকে যাঁহারা একটুও চিনিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি যাঁহাদের একটুও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এই প্রশ্ন করিবেন না নিশ্চয়ই। দুষ্টবুদ্ধি কতিপয় বিধর্মী লেখকই হযরতের মহিমাকে এইখানে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, নাওজুবিল্লাহ, মুহম্মদ ছিলেন কপট (impostor) ও কামুক (profligate) ; কামপ্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল; তাই অতগুলি বিবাহ করিয়া তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিয়া গিয়াছেন।

হযরতের প্রতি এতবড় নিষ্ঠুর আঘাত আর হয় না। সততা, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা যাঁহার জীবনের ভূষণ; ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা ও কপটতাকে যিনি সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন; আদর্শ ও নীতির জন্য যিনি জীবনপণ করিয়া শত দুঃখ-দৈন্য ও আপদ-বিপদকে বরণ করিয়াছেন; সাধনা, সংযম ও মিতাচার দ্বারা যাঁহার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তিনি হইবেন কামুক, তিনি হইবেন লম্পট, তিনি হইবেন কপট?

লম্পট ও কামুকের স্বভাব আমাদের জানা আছে। যে কামুক বা লম্পট প্রকৃতির হয়, তাহার মনের গতিও হয় সেইরূপ। লাম্পট্য কখনও একা আসে না, আরও অনেককে সঙ্গে লইয়া আসে। তাই আমরা দেখিতে পাই, যে লম্পট হইবে, সে বিলাসী হইবে, মিথ্যাবাদী হইবে, ভোগলিপ্সু হইবে, অত্যাচারী হইবে, নিষ্ঠুর হইবে, ছলনাময় হইবে, পানাসক্ত হইবে, চরিত্রহীন হইবে, ধর্মবিমুখ হইবে—ইত্যাদি ইত্যাদি; কাজেই হযরতকে যাঁহারা লম্পট বলিবেন তাঁহাদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, তিনি মিথ্যাবাদী ছিলেন, ভোগবিলাসী ছিলেন, অত্যাচারী ছিলেন, বদমায়েশ ছিলেন ধর্মবিমুখ ছিলেন, পানাসক্ত ছিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরতের জীবন হইতে কেহ এমন কোন একটি প্রমাণও দিতে পারিবেন কি?

লাম্পট্য ও কামুকতা যৌবনের সহচর। কাজেই, হযরতের যৌবনকাল কেমন করিয়া কাটিল, তাহাই আমাদিগকে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে। সাধারণত ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্তই মানুষের কামপ্রবৃত্তি প্রবল থাকে। এই সময়টাই মানুষের পদস্খলনের সময়। কিন্তু হযরতকে আমরা এই সময়ে কী বেশে দেখিতে পাই? ২৫ বৎসর বয়সে তিনি বিবাহ করিলেন ৪০ বৎসরের প্রৌঢ়াকে। একাদিক্রমে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে তিনি এই বর্ষীয়সী স্ত্রীর সঙ্গে কাল কাটাইলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদিজার মৃত্যু হয়, হযরতের বয়স তখন ৫০ বৎসর। অতএব, জীবনের প্রথম ৫০ বৎসর তিনি কাটাইলেন বিগত-যৌবনা এক প্রৌঢ়া নারীর সহিত। ইহাই কি লাম্পট্য

---

১. মতান্তরে বারোটি।

www.pathagar.com

বা কামুকতার লক্ষণ? তারপর ৩৫ বৎসর বয়স হইতেই তিনি হেরা গিরিগুহায় কঠোর সাধনায় মগ্ন। ৪০ বৎসর বয়সে যখন তিনি নবুয়ত লাভ করিলেন, তখনও তিনি বাহিরের সকল চিন্তা ভুলিয়া সত্য প্রচারে ব্যাকুল; গৃহসুখ বিসর্জন দিয়া শত অত্যাচার ও নিপীড়ন সহিয়া মহাপুরুষ চলিয়াছেন সত্যের পতাকা বহন করিয়া। এই মহৎ জীবনের সহিত ভোগ-বিলাসের সামঞ্জস্য কোথায়?

বিবি খাদিজা ছাড়া হযরত আরও ১২টি বিবাহ করিয়াছিলেন। সবগুলিই বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর, অর্থাৎ ৫১ বৎসর হইতে ৬৩ বৎসরের মধ্যে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, জীবনের শেষ ১৩ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার চরিত্রর এই লাম্পট্য ও কামুকতা দোষ ঘটিয়াছিল। মানুষের কামপ্রবৃত্তি ও ভোগ-লালসা প্রশমিত হইয়া মানুষ যে-বয়সে আরও পরহেজগার ও ইন্দ্রিয়বিমুখ হয়, চরিত্র যখন অধিকতর নির্মল জ্যোতির্দীপ্ত হয়, ঠিক সেই সময়েই হযরত হইতেছেন লম্পট ও কামুক। এই কথা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন?

বস্তুত হযরতের বহুবিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। এক সুমহান আদর্শ ও প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। নিছক মানব কল্যাণের প্রেরণা ও তাগিদেই তাঁহাকে অসময়ে এতগুলি বিবাহ করিতে হইয়াছিল, অন্য কোন উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ছিল না। নিম্নের আলোচনা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে হযরত মুহম্মদ জীবনে যে-সকল নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল। হযরত কোন্ বয়সে কাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাও দেখান হইল :

১. খাদিজা (বিধবা)	হযরতের বয়স তখন ২৫ বৎসর
২. সওদা (বিধবা)	" ৫১ "
৩. আয়েশা (কুমারী)	" ৫২ "
৪. হাফসা (বিধবা)	" ৫৪ "
৫. জয়নব-বিন্তে-খোজাইমা (বিধবা)	" ৫৫ "
৬. উম্মে সালমা (বিধবা)	" ৫৫ "
৭. জয়নব (জায়েদের পরিত্যক্তা স্ত্রী)	" ৫৬ "
৮. জওয়ায়েরা (বিধবা, বনি-মুস্তালিক গোত্র)	" ৫৬ "
৯. রায়হানা (ইহুদিনী, বিধবা)[২]	" ৫৭ "
১০. মেরী (খ্রীষ্টান, অপহৃতা, বিধবা)	" ৫৭ "
১১. সফিয়া (কিনানার স্ত্রী, বিধবা ইহুদিনী)	" ৫৮ "
১২. উম্মে হাবিবা (আবুসুফিয়ানের কন্যা, বিধবা)	" ৫৮ "
১৩. মায়মুনা (বৃদ্ধা, বিধবা)	" ৫৯ "

---

[২]. রায়হানার সঙ্গে হযরতের বিবাহ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং রায়হানাকে বাদ দিলে হযরত খাদিজা ছাড়া আরও এগারটি বিবাহ করেন। এইটাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নবম সংস্করণ, সংশোধনী দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

এই তালিকা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে, মাত্র একজন (আয়েশা) ছাড়া অবশিষ্ট সকলেই ছিলেন বিধবা।[৩] কাজেই এই কথা নিশ্চয় যে, এই বিবাহগুলির কারণ আর যাহাই হউক, কামুকতা নহে— বিলাসও নহে।

পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। পরিপূর্ণ জীবন, সাহাবীদের জীবন এবং স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গের জীবনের মধ্যে তিনি আমাদের জন্য যাবতীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহাকে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। বিবাহ ব্যাপারেও তাই। বিভিন্ন আদর্শ স্থাপনের জন্য হযরত এতগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। সে আদর্শগুলি এই :

১. নারীত্বের মর্যাদা দান : হযরতের সময় নারীত্বের কোনই মর্যাদা ছিল না। যখন খুশি বিবাহ করা যাইত; যখন খুশি যাহাকে খুশি তালাক দেওয়া যাইত। বিধবাদিগের দুর্গতিই ছিল সবচেয়ে বেশী। তাহাদিগকে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না, ভদ্রভাবে বাঁচিয়া থাকিতেও দিত না। মহানুভব হযরত তাই এই শ্রেণীর বিধবা নারীকে বিবাহ করিয়া এবং চিরদিন তাহাদিগকে সমানভাবে স্ত্রীর অধিকার ও মর্যাদা দিয়া আরববাসীদের সম্মুখেই মনুষ্যত্বের এক উন্নত আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সওদা, জয়নব-বিন্‌তে-খোজাইমা ও উম্মে-সালমাকে এই কারণেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

২. প্রেমের বিস্তার : মানুষের প্রতি প্রেম ছিল হযরতের অপরিসীম। এত যে আঘাত, এত যে লাঞ্ছনা, এত যে বেদনা তিনি পাইয়াছেন মানুষের হাতে, কোনদিন কাহাকেও তিনি অভিশাপ দেন নাই বা কাহারও ধ্বংস কামনা করেন নাই। তিনি জানিতেন, মানুষ না বুঝিয়া তাঁহাকে আঘাত হানিতেছে। আল্লাহ্‌র নিকট শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ত দূরের কথা, পাছে অত্যাচারী যালিমগিদগের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসে, এই ভয়ে মহাপুরুষ ছিলেন সদা শঙ্কিত। সব সময়ে তিনি এই প্রার্থনা করিতেন : "হে আল্লাহ্, এই মূঢ় পথভ্রান্তদিগকে ক্ষমা কর। ইহারা না বুঝিয়া আমাকে আঘাত দিতেছে।" প্রয়োজনের তাগিদে বিধর্মীদিগের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা আত্মরক্ষামূলক, সংহারমূলক নহে; সংশোধনমূলক (corrective) প্রতিহিংসামূলক (vindictive) নহে। কোরেশ, ইহুদী, বেদুঈন, খ্রীষ্টান, পারসিক—কাহারও প্রতিই তাঁহার কোন জাতক্রোধ ছিল না। যে-মুহূর্তে তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে বা শান্তির প্রস্তাব করিয়াছে, সেই মুহূর্তেই তিনি অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন; সেই মুহূর্তেই তিনি তাহাদিগকে আপন বুকে টানিয়া লইয়াছেন। বিধর্মীদিগের সহিত শান্তিতে বাস করাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। অতিবড় শত্রুর জন্যও যে তাঁহার অন্তরে করুণা ও প্রেম সঞ্চিত হইয়া আছে, এই কথা কার্যত প্রমাণ করিবার জন্য হযরতকে কয়েকটি বিবাহ করিতে হইয়াছিল; ইহার ফলে শত্রুদিগের অন্তর্লোক তিনি অলক্ষ্যে জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ব্যাপক মানবতাবোধ ও রাজনৈতিক

৩. "She was the only virgin that he married (Ibn Ishaq)

www.pathagar.com

দূর[illegible]হের মূল প্রেরণা। দীর্ঘদিনের বংশগত শত্রুতা অনেক স[illegible] তিরোহিত হয়। উম্মে হাবিবা (আবুসুফিয়ানের কন্যা) মায়মুনা [illegible] খালা), জওয়ায়েরা (বনি-মুস্তালিক নামক বেদুঈন গোত্রের কন্যা)—ইঁহাদিগকে হযরত এই উদ্দেশ্যেই বিবাহ করিয়াছিলেন। এই তিনটি বিবাহের ফলেই কোরেশ ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরা হযরতকে আত্মীয় ও বন্ধু মনে করিতে পারিয়াছিল এবং হযরতের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। উম্মে হাবিবাকে বিবাহ করিয়া তিনি আবুসুফিয়ানকে জয় করিয়াছিলেন, বৃদ্ধা মায়মুনাকে বিবাহ করায় তিনি খালিদকে পাইয়াছিলেন, জওয়ায়েরাকে বিবাহ করায় তিনি বনি মুস্তালিক ও অন্যান্য গোত্রকে পাইয়াছিলেন। এইরূপে মক্কা-বিজয়ের পথ তাহার সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল। সম্মান দিয়া, প্রেম দিয়া, কোন জ্ঞানী দুশমনকে এমনভাবে জয় করিবার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখি নাই। মনুষ্যত্বের কত বড় আদর্শ এইখানে।

হযরত বলিয়াছেন : "বিবাহ-সম্বন্ধই অন্যান্য সব কিছু অপেক্ষা মানুষের মধ্যে মহব্বত বৃদ্ধি করে।" এই নীতি তিনি কার্যতও দেখাইয়া গিয়াছেন। শুধু মৌখিক ভালবাসা দেখাইয়া, শুধু ক্ষমা ও করুণা করিয়া তিনি শত্রুদিগকে জয় করেন নাই, রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তিনি সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। এই বিরাট মনুষ্যত্ব ও মহানুভবতার তুলনায় তাঁহার বহুবিবাহের কল্পিত দোষত্রুটি দাঁড়াইতে পারে কি?

৩. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের কন্যাগ্রহণের আদর্শ স্থাপন : হযরত তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে সারা জগতে ছড়াইয়া পড়িতে হইবে এবং নানাজাতীয় লোকের সংস্পর্শে আসিতে হইবে; কাজেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করা যায় কি-না, এই প্রশ্ন একদিন জাগিবেই। ইহার আদর্শ দেখানো হযরতের পক্ষে তাই ছিল অপরিহার্য। অবশ্য ইসলাম বিধান দিয়াছে যে, যাহারা 'আহলেকিতাব' (অর্থাৎ যাহাদের নিকট কোন ঐশীগ্রন্থ নাযিল হইয়াছে) তাহাদের সহিত মুসলমানদিগের বিবাহ-শাদী চলিতে পারে। কিন্তু শুধু বিধান দিয়া রাখিলেই হয় না, বাস্তব আদর্শও দেখান চাই। এই কারণেই হযরতকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে হইয়াছে। মেরী (খ্রীষ্টান) এবং সফিয়া ও রায়হানা (ইহুদী) এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া হযরত খ্রীষ্টান ও ইহুদী জাতির প্রতি আপন হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন; হযরত যে ইহুদী খ্রীষ্টান বা অন্যান্য ঐশীগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিকে ঘৃণা করেন না, তাহাদিগকেও যে তিনি ভালবাসেন-এই তিনটি বিবাহ দ্বারা তিনি তাহাই প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক দেখিয়াছেন, মেরী, সফিয়া বা রায়হানা কেহই হযরতের অন্যান্য স্ত্রী অপেক্ষা মর্যাদায় কোন অংশে কম ছিলেন না। হযরতের পুত্র ইব্রাহীম এই মেরীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণ ঠিক এই আদর্শ আজও বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, হযরতের অনুসরণে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইহুদী বা অন্য যে কোন জাতির নারীকে শরীয়তের বিধান অনুসারে বিবাহ করিতে মুসলমানদের কোন বাধা নাই।

www.pathagar.com

৪. পরিজনবর্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন : হযরতের পরিবারবর্গকে 'আহলেবায়েত' বলে। আবুবকর, ওমর, আলি ও ওসমান—ইসলামের এই প্রথম খলিফা চতুষ্টয় 'আহ্‌লে-বায়েতে'র অন্তর্ভুক্ত। হযরত এই চারিজন খলিফাকে রক্তের সম্বন্ধ দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। হয় কন্যা দিয়া, না হয় কন্যা গ্রহণ করিয়া হযরত এই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছিলেন। আয়েশা এবং হাফসাকে বিবাহ করিবার গূঢ় কারণ ইহাই।

৫. অনুরোধ রক্ষা : অনেক স্ত্রীলোক নিজেরা ইচ্ছা করিয়া পয়গম্বরের সহধর্মিণী হইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। তাঁহারা ইহকাল ও পরকালে হযরতের সাহচর্যে কাল কাটাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কাজেই বিবাহ দ্বারাই হযরতকে তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইয়াছিল। কোন কোন সাহাবাও নিজেদের কন্যা বা ভগিনীকে দিয়া হযরতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই কারণেও হযরতকে ২/১টি বিবাহ করিতে হইয়ছিল। বিবি সওদা, জয়নব ও মায়মুনা এই পর্যায়ভুক্ত। স্ত্রীদিগের কেহ কেহ নিজেদের 'বারী' (পালা) ত্যাগ করিয়াও শুধু পত্নীত্বের সম্বন্ধটুকুর জন্যই হযরতের স্ত্রী হইয়াছিলেন। বিবি সওদা বিবি আয়েশার অনুকূলে তাঁহার বারী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

৬. আদর্শের পূর্ণতা সম্পাদন : পূর্বেই বলিয়াছি, হযরত ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। আমাদের জীবনে যত কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, সবগুলিরই পূর্ব ধারণা করিয়া তাহাদের সমাধান বা তাহার ইঙ্গিত তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন-শুধু আদেশ-নিষেধ দ্বারা নহে, বাস্তব আদর্শ দ্বারা। আদর্শের পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাই তাঁহাকে এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এক স্ত্রীর দ্বারা বিভিন্ন আদর্শ দেখান কিরূপে সম্ভব হইত? তিনি যদি শুধু খাদিজাকে বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে আমরা কুমারী স্ত্রীর সহিত স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে জানিতে পরিতাম না; যদি শুধু কুমারী আয়েশাকেই বিবাহ করিতেন, তবে বিধবা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে, জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি স্বগোত্র বা স্বধর্মাবলম্বীদিগের কন্যাকেই বিবাহ করিতেন, তবে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগকে বিবাহ করা যায় কি-না এবং তাহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি সম্ভ্রান্ত বংশ হইতেই বিবাহ করিতেন বে ক্রীতদাসীকে যে বিবাহ করা যায় বা সেও যে সম্ভ্রান্ত ঘরের ঘরণী হইতে পারে, এই আদর্শ আমরা পাইতাম না। শুধু যদি সন্তানদায়িনী নারীকে বিবাহ করিতেন, তবে বন্ধ্যা নারীর মনের খবর আমরা পাইতাম না। স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন চিত্র দেখাইবার জন্যই এবং বিভিন্ন নারীপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই হযরত বিভিন্ন অবস্থার নারীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক জীবনে সমস্ত আদর্শ ও পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়াই হযরতকে বিচিত্র ধরণের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শেষ বয়সে কুমারী আয়েশাকে বিবাহ করিবার একটা সুফল এই হইয়াছিল যে, রসুলুল্লাহ্‌র ইন্তিকালের পর বিবি আয়েশা দীর্ঘদিন বাঁচিয়াছিলেন এবং রসুলুল্লাহ্‌র বহু জীবনস্মৃতি ও হাদিসের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি সাহাবাদিগকে দিতে পরিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

৭. কুসংস্কারের উচ্ছেদ সাধন : মৌখিক সম্বন্ধকে ইসলাম স্বীকার করে না। কিন্তু হযরতের সময়ে এই প্রথা আরবে বিদ্যমান ছিল। অনেকেই পিতা, ভ্রাতা, ধর্ম-মা ইত্যাদি সম্বন্ধ পাতাইয়া বিবাহ-শাদী ব্যাপারে অনেক কুসংস্কার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য হযরত তাঁহার পালিত পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তালাক-দেওয়া স্ত্রীলোককে সেকালে কেহ বিবাহ করিতেও চাহিত না। বিবাহ করিলেও ইসলামী প্রথানুসারে কিরূপ করিয়া করিতে হইবে তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। বিবি জয়নবের দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কি বলিতেছেন, দেখুন :

"কিন্তু জায়েদ যখন তাহাকে (জয়নব) পরিত্যাগ করিল, তখন আমরা তাহাকে তোমার স্ত্রীরূপে দান করিলাম, যাহাতে পালিত পুত্রের স্ত্রী সম্বন্ধে বিশ্বাসীদিগের মনে কোনরূপ খটকা না লাগে।" (৩৩ : ৩৭)

"রসূলকে যাহা করিতে আদেশ দিয়াছি, তাহা করিলে কোনই অন্যায় হয় না।" (৩৩ : ৩৮)

ক্রীতদাসী, নিঃসহায়া, বিধবা, ভিন্নধর্মাবলম্বী নারী-ইত্যাদিদিগকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিলে কিভাবে তাহাদের সহিত ঘর-সংসার করিতে হয়, অথবা তাহাদিগকে কিরূপভাবে সামাজিক মর্যাদা দিতে হয়, তাহার আদর্শও আমরা পাই অন্যান্য স্ত্রীদিগের মারফৎ। কাজেই বলা যাইতে পারে, হযরতের স্ত্রী-সংখ্যা ১৩ হইলেও ধ্যানত : তাঁহারা সংখ্যায় এক। ১৩ জনকে মিলাইয়া যে নারীমূর্তি, হযরত ছিলেন তাহারই স্বামী। এক স্ত্রী বিবাহ করিলে এসব আদর্শ আমরা কোথায় পাইতাম?

সপত্নীদিগের সহিত স্ত্রীগণ পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, অথবা একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিলে স্বামীর কর্তব্যই বা কিরূপ হইবে, সে আদর্শস্থাপনও এতগুলি বিবাহের অন্যতম কারণ।

৮. আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন : এক-বিবাহ দাম্পত্য জীবনের আদর্শ বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু বহুবিবাহ যে সর্বদা নিন্দনীয়, তাহাও ত নহে। বহুবিবাহের মধ্যে একটা বিরাট মহত্ত্ব লুকাইয়া আছে। এক-বিবাহের মধ্যে আছে খানিকটা স্বার্থপরতা ও মানসিক সঙ্কীর্ণতা। আমার স্ত্রী, আমি এবং আমাদের দুইজনের পুত্র-কন্যা—এই সংকীর্ণ গণ্ডি সৃষ্টিই হইতেছে এক-বিবাহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এক স্ত্রীকে লইয়া পুরুষের অন্তরে বহু মহদ্বৃত্তি তাই খেলা করিতে পারে না। প্রেম কোন নির্দিষ্ট পাত্রে সীমাবদ্ধ থাকিলে তাহা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে, সে প্রেম মানুষকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলে, বহির্মুখী করে না, ভোগী করিয়া তুলে, ত্যাগী করে না। নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার মধ্যেই হইতেছে প্রেমের চরম সার্থকতা। একাধিক স্ত্রী হইলে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বাড়িয়া যায়। কর্তব্য এবং দায়িত্ব যেখানে বহুমুখীন হয়, সেইখানেই হয় মানুষের সত্যিকার পরীক্ষা। একাধিক স্ত্রী থাকিলে পুরুষ এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

www.pathagar.com

সকল পত্নীর প্রতি বা সকল সন্তানের প্রতি সে তুল্যরূপে তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে কিনা, এই কথা তখন তাহাকে ভাবিতে হয়। বহুর মধ্যে নিজেকে বিলাইয়া দিয়া ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সে তখন আত্মোপলব্ধি করিবার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে পত্নীদিগের অন্তরের বহু সুপ্ত বৃত্তিরও জাগরণ হইতে পারে। একক স্ত্রী আত্মসর্বস্ব হয়, কেমন করিয়া পরের জন্য কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সে তাহা জানে না। কিন্তু সপত্নীর মধ্যে বাস করিলে তাহার দৃষ্টি প্রসারিত না হইয়া পারে না। যে ত্যাগ তাহাকে করিতে হয়, যে বঞ্চনা তাহাকে সহিতে হয় তাহা একদিক দিয়া পীড়াদায়ক হইলেও উহাই তাহার অন্তরের মহত্ত্বকে জাগাইয়া তুলে। সপত্নীদিগের মধ্যে সচরাচর যে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোন নারীর পক্ষে গৌরবের কথা নহে। স্বামীর যথাসর্বস্ব একা অধিকার করিতে পারিলাম না, সব সুখ-সম্পদ একা ভোগ করিতে পারিলাম না, এই চিন্তা ও মনোবৃত্তি মানুষকে কখনও বড় করে না। সতীনের প্রতি এবং সতীনের সন্তান-সন্ততির প্রতি যে-স্ত্রী প্রেম ও স্নেহ-মমতা দেখাইতে পারে, তাহার অন্তঃকরণ মহৎ না হইয়াই যায় না। এইরূপ নারীকে যেখানে পাইবেন, সেখানেই দেখিবেন তিনি মহীয়সী। হযরত মুহম্মদ বিচিত্র ধরনের বহু স্ত্রীর মধ্য দিয়া মানব-চরিত্রের এই দিকটা উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। মহানুভবতা, আত্মত্যাগ, পরার্থপরতা, উদারতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মানব-প্রেম প্রভৃতি নানা গুণের দৃষ্টান্ত তাঁহার এই বহুবিবাহের মধ্য দিয়া আমরা দেখিতে পাইয়াছি।

পরিশেষে আর একটা কথা বিশেষভাবে আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে। এক বিবাহ (monogamy) যে সর্বত্রই দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ এবং বহুবিবাহ (polygamy) যে মানব-সমাজের অকল্যাণকর, এই কথাই বা কে বলিল? একটা মিথ্যা, অস্বাভাবিক ও অবৈজ্ঞানিক নীতিবোধের উপর দাঁড়াইয়া বহুবিবাহকে সর্বদা নিন্দা করা আমাদের উচিত নহে। ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিদ এবং যৌনবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তিরা বলিতেছেন : এক বিবাহ স্বাভাবিক ও বিজ্ঞানসম্মত নহে, মানব জীবনে বহুবিবাহের প্রয়োজন রহিয়াছে। এক বিবাহ সর্ব অবস্থায় দাম্পত্য জীবনের আদর্শও হইতে পারে না। এক বিবাহ বহু মানুষের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে তিক্ত ও বিষাক্ত করিয়াছে এবং বহু দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে। এক বিবাহ যে সমাজের বা জাতির আদর্শ অথবা বহু বিবাহ যেখানে আইনত নিষিদ্ধ, সেখানে নরনারীর নৈতিক চরিত্র অত্যন্ত শিথিল। আইনের ভয়ে পুরুষেরা প্রকাশ্যে সেখানে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু গোপনে গোপনে তাহারা বহু উপপত্নী রক্ষা করে এবং অন্যান্য বহু দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। সেক্ষেত্রে বহুবিবাহই নৈতিক ধ্বংস হইতে নরনারীকে রক্ষা করে।

যে-যে দেশে বা যে-যে সমাজে এক-বিবাহের প্রচলন রহিয়াছে, সেখানে মুহুর্মুহু বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভ্রূণ হত্যা এবং অন্যান্য শত প্রকারের যৌন বিভ্রাটে সমাজ-জীবন বিড়ম্বিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকা- কোথাও দাম্পত্য জীবন আদর্শ নহে। কুমারী জননীর সংখ্যা সেখানে অত্যন্ত বেশী। মানব জাতির স্বাভাবিক যৌন-চেতনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দূরদর্শী হযরত মুহম্মদ স্থান-কাল-পাত্র

www.pathagar.com

ভেদে বহুবিবাহের বিধান দিয়া নারী জাতিরও কি কল্যাণ সাধন করেন নাই? বহুবিবাহ না থাকিলে নারীর দুর্গতির সীমা থাকিত না। 'সতীন' না হইয়া 'রক্ষিতা' বা 'পতিতা' হইলে কি নারী জাতির সম্মান বাড়ে? এই ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ্ বহুবিবাহের বিধান দিয়া নিশ্চয়ই নারীদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। বর্তমানে পুরুষেরা যাহাতে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে না পারে, সেইজন্য নারীদের তরফ হইতে কোন কোন স্থানে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু একবিবাহের আন্দোলন নারীদের পক্ষে সর্বদা কল্যাণপ্রসূও নহে, সমর্থনযোগ্যও নহে। বহুবিবাহের প্রকাশ্য দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবৈধ প্রেম ও অনাচারের গুপ্ত দুয়ার খুলিয়া যাইবে। কাজেই নারীরা যদি নিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহও রোধ করিতে চাহেন, তবে বুঝিতে হইবে দুর্নীতির গোপন দুয়ার উদঘাটনে তাহাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে। যৌন-অপরাধ কখনও একতরফা নহে, পুরুষের অপরাধে নারী জড়িত থাকে। অবৈধ প্রেম বা ব্যভিচার তাই যৌগিক অপরাধ। তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বহুবিবাহ অপেক্ষা অবৈধ প্রেম বা ব্যভিচারই বেশী ভয়াবহ। দূরদর্শী ও মনস্তাত্ত্বিক হযরত মুহম্মদ তাই দ্বিতীয় পথটি বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পথটি কিছুটা প্রশস্ত করিয়া দিলেন। বহুবিবাহ তাই মানুষের স্বাভাবিক যৌন-কামনার নিয়ন্ত্রিত ও আইন-সম্মত বহির্দুয়ার। বলা বাহুল্য, বহুবিবাহ নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম না থাকিলে কোন আইন সম্পূর্ণ হয় না। ব্যতিক্রম তুলিয়া দিলে রূঢ় বাস্তবতার প্রহারে অনাচার ও ব্যভিচারের পথ মুক্ত হইয়া যায়। দুই পথের কোন্‌টি আমাদের বরণীয়?

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ : ১৪

মুহম্মদ 'আহমদ' ছিলেন কি–না

এইবার আমরা হযরত মুহম্মদকে 'আহমদ' রূপে দেখিব, অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌র চরম পরিচয়দাতা ছিলেন কি–না, পরীক্ষা করিব।

আল্লাহ্‌র প্রকৃত পরিচয় মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। আল্লাহ্ কে, তাঁহার স্বরূপ কি, গুণাবলী কি ইত্যাদি বিষয় না জানিলে মানুষের জীবনের লক্ষ্য, পরিণতি ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনই চেতনা আসিতে পারে না।

কিন্তু হযরত মুহম্মদ আল্লাহ্‌র কি পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন না দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার পূর্ববর্তী অন্যান্য মহাপুরুষগণ আল্লাহ্ সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিয়া গিয়াছেন, অথবা অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্‌র কি পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, জানা দরকার। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহাই আগে আলোচনা করিব।

আলোচনার প্রারম্ভেই বলিয়া রাখা ভাল : বিশুদ্ধ একত্ববাদের আলোকেই আমরা আল্লাহ্‌র স্বরূপ–নির্ণয়ে প্রয়াস পাইব। আল্লাহ্ যে আছেন এবং তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয়, এইকথা স্বতঃসিদ্ধভাবেই আমাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। আল্লাহ্ আছেন কি নাই, তিনি এক কি বহু–এইসব প্রশ্নের আর নূতন করিয়া আমরা মীমাংসা করিব না। কোন্ ধর্মে আল্লাহ্‌র একত্ব সর্বাপেক্ষা সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আল্লাহ্ মানুষ এবং বিশ্বজগৎ—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কাহার কোন্ সম্বন্ধ, ইহাই হইবে আমাদের এই আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরতত্ত্ব

সর্বপ্রথমেই হিন্দুধর্মের আলোচনা করা হউক।

হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মশাস্ত্র বেদ, পুরাণ, উপনিষৎ ও গীতা।

বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বেদ চারিটি : ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ। বেদই আদিম গ্রন্থ। ইহার পরিণতি উপনিষৎ বা বেদান্ত।

প্রথমেই বেদের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। বেদ যে ঈশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়াছে এই কথা বলা কঠিন। বেদের ধর্ম বহুদেববাদ। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিয়া ঋষিগণ তাহাদিগকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন। ইন্দ্র, অরুণ, মিত্র, অগ্নি, সবিতা, বিষ্ণু, আদিত্য, পূষা, ঋতু, বায়ু রুদ্র, মরুৎ, বেন, সরস্বতী, উষা, দ্যাবাপৃথিবী, গো, অশ্ব, মণ্ডক ইত্যাদিই ছিল বৈদিক যুগের আরাধ্য দেবতা। আর্যঋষিরা এইসব দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে স্তোত্র পাঠ করিয়া হোমাগ্নিতে সোমরস আহুতি দিতেন। বেদে প্রধান দেবতার সংখ্যা ৩৩।

বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্রই প্রধান। ইন্দ্রের স্বরূপ এবং পরিচয় বেদে নিম্নলিখিতভাবে উল্লিখিত আছে :

"ইন্দ্রের জন্ম আছে, জনয়িতা ও জনয়িত্রী আছে। তাঁহার মাতার নাম নিষ্টিগ্রী। তাঁহার পিতা অদিতি।–তাহার স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী–সকল দেবতার মধ্যে ইন্দ্রই

www.pathagar.com

অত্যধিক সোমাসক্ত ও সোমপায়ী–ইন্দ্র ২০টি বৃষের মাংস ও ৩০০টি মহিষের মাংস ভক্ষণ করেন।"[১]

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বেদে আমরা একেশ্বরবাদ খুঁজিয়া পাইতেছি না। অবশ্য বেদের কোন কোন সূক্তে 'শুদ্ধম অপাপবিদ্ধম' 'অবাঙ্‌মানসগোচরম' ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা মনে হয় ঋষির সেই চিরজ্যোতির্ময়ের দীপ্তিরেখা কোন কোন সময়ে কোন কোন মুণিঋষির অন্তর্লোকে প্রতিভাত হইয়াছিল, তবে সেই পরম একের সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা তখনও তাহারা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পুরাণ

বেদেই যখন ঈশ্বরের একত্ব বিরল, তখন পুরানে ত নাই–ই, কারণ পুরাণ শুধু দেব–দেবীর কাহিনীতেই পরিপূর্ণ।

ষড়্‌দর্শন

এইবার হিন্দুদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাউক।

হিন্দুদর্শন ছয়ভাগে বিভক্ত : ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর–মীমাংসা বা বেদান্ত। ন্যায়–দর্শনের প্রণেতা গৌতম, বৈশেষিক–দর্শনের প্রণেতা কনাদ, সাংখ্য–দর্শনের প্রণেতা কপিল, পাতঞ্জলের প্রণেতা পতঞ্জলি, পূর্ব–মীমাংসার প্রণেতা জৈমিনী এবং উত্তর–মীমাংসা বা বেদান্তের প্রণেতা বাদসায়ন বা ব্যাস।

হিন্দুদর্শনের গোড়ার কথাই হইতেছে দুঃখবাদ। এই সংসার দুঃখের আলয়, এখানে প্রকৃত সুখ নাই; এই দুঃখ হইতে মানুষ কিরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে—এই তত্ত্বই ষড়্‌দর্শনে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,এক বেদান্তদর্শন ছাড়া অন্য পাঁচটি দর্শনেই এই দুঃখনাশের প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্বন্ধে কি বলিতেছেন দেখুন।

"দর্শন–শাস্ত্রের আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক উত্তর–মীমাংসা বা বেদান্ত–দর্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনের উদ্ভাবিত দুঃখহানির প্রণালীর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ নহে। সাংখ্য ও পূর্ব–মীমাংসায় ত ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন; ন্যায় ও বৈশেষিক–দর্শন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের উপদিষ্ট উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। পাতঞ্জল–দর্শন যদিও ঈশ্বরকে যোগপ্রণালীর সহিত সংযুক্ত করিয়াছে, কিন্তু সে দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরই বেদান্ত–দর্শনের প্রতিপাদ্য বটেন, তথাপি বেদান্তের প্রণালীতে এবং গীতার প্রণালীতে প্রভেদ অল্প নহে।" (গীতায় ঈশ্বরবাদ, ৭–৮)

কোন্‌ দর্শনের কি মত, দেখা যাউক : কোন দর্শনের কি মত দেখা যাউক ন্যায়দর্শনের মতে তত্ত্ব–জ্ঞানলাভই হইতেছে মোক্ষ লাভের উপায়। কিন্তু কিসের তত্ত্বজ্ঞান? ঈশ্বর সম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান? না। সংশয়, প্রয়োজন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ষোড়শ

---

১. বেদবাণী–চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই মানুষের মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে। ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে ন্যায়দর্শনের কিছুই যায় আসে না। ঈশ্বরকে অবলম্বন না করিয়াই মানুষের মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে।

বৈশেষিক-দর্শনের মতেও মুক্তির উপায় এই তত্ত্বজ্ঞান। এখানেও কর্ম ইত্যাদি ছয়টি বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলেই মানুষ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে।

(গীতায় ঈশ্বরবাদ, ২০ পৃষ্ঠা)

সাংখ্য-দর্শন রীতিমত একখানি নিরীশ্বরশাস্ত্র। দুঃখমুক্তি বা কৈবল্যলাভের ২৫টি উপায় উহাতে নির্দেশিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ : -অর্থাৎ ঈশ্বর অসিদ্ধ-ইহাই তাহার মত। বলা বাহুল্য, ইহা বৌদ্ধ দর্শনেরই প্রকার-ভেদ মাত্র। সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে Max Muller বলিতেছেন :

"There is a place in his system in any number of subordinate Devas, but there is none of God, whether as the Creator or as the Ruler of all things." (Indian philosophy : Atheism of kapila p 397)

পাতঞ্জল-দর্শনও মূলত সাংখ্য-দর্শনেরই অনুরূপ। সাংখ্যের সমস্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তকেই পতঞ্জলি মানিয়া লইয়াছেন; পুরুষ-প্রকৃতিকেই তিনি জগতের একমাত্র নিত্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে একটা বিশেষত্ব তাঁহার এই যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নাই এবং যোগসাধনাই মুক্তিলাভের উপায়, এই কথা বলিয়াছেন।

পতঞ্জলি ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বর-প্রণিধান দ্বারা কৈবল্য লাভ ঘটিতে পারে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানই যে যোগসিদ্ধির সর্বপ্রধান ও একমাত্র উপায়, এই কথা বলেন নাই। শ্রীযুক্তপরমানন্দ দত্ত তাঁহার "হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয়-দর্শন" গ্রন্থে বলিতেছেন :

"পাতঞ্জল-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান অতিশয় গৌণ। ঈশ্বরকে বাদ দিলেও এই মতে যোগসিদ্ধির কোন বিশেষ বাধা হয় না; কারণ ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র। আর ইহাও দ্রষ্টব্য যে, পাতঞ্জলের মতে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণ নহে, ঈশ্বরে কর্মার্পণ মাত্র। ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাহাকে কর্ম-সন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র।" (১৫ পৃষ্ঠা)

পূর্ব-মীমাংসাও নিরীশ্বরবাদের সমর্থক। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলিতেছেন :

"মীমাংসকেরা নিরীশ্বরবাদী; তাঁহারা বেদকে নিত্য ও অভ্রান্ত বলেন বটে, কিন্তু বেদ যে ঈশ্বরবাক্য, তাহা স্বীকার করেন না। বস্তুত মীমাংসা-দর্শনের কোথাও ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই জন্য 'বিদ্বোন্নাদতরংগিনী' গ্রন্থকার মীমাংসকদিগের পরিচয় স্থলে বলিয়াছেন 'তাহারা ঈশ্বর মানে না, জগতের যে কেহ স্রষ্টা, পালয়িত বা সংহর্তা আছেন, এই কথা স্বীকার করে না।' (গীতায় ঈশ্বরবাদ : ২৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

এইবার বেদান্ত-দর্শন কি বলে, দেখা যাউক।

বেদান্ত-দর্শনের প্রচারক শঙ্করাচার্য। তিনি যে দার্শনিক মতবাদের প্রচার করেন, তাহা বেদান্ত বা উপনিষৎ-এর উপর সংস্থাপিত। কাজেই তাঁহার কথা আলোচনা কবিরার পূর্বে বেদান্তে ঈশ্বর সম্বন্ধে কি কথা বলা হইয়াছে আমাদের জানা দরকার।

বেদান্ত বা উপনিষৎ

বেদের সারাংশ বা শেষাংশের নামই বেদান্ত। বেদান্তের অপর নাম উপনিষৎ। উপনিষৎ-এর সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কাহারও কাহারও মতে উপনিষৎ-এর মোট সংখ্যা ১০৮। তন্মধ্যে ঈশোপনিষৎ, কোপোপনিষৎ, কঠোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপনিষৎ-এর প্রতিপাদ্য বিষয় কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার ধারণা কি? উপনিষৎ-এর ধর্ম কি একেশ্বরবাদ?

বলা কঠিন। উপনিষৎ আমাদিগকে কি যে শিক্ষা দিতে চাহে, পরিষ্কার বুঝা যায় না। ইহাতে একেশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, নিরীশ্বরবাদ-সব কিছুই আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে এক একটা শ্লোক এমন আছে যে, তাহাতে একেশ্বরবাদই প্রতিপন্ন হয়; আবার বেদের বহুদেববাদ ও বুদ্ধের সংশয়বাদ বা নিরীশ্বরবাদও ইহাতে পাওয়া যায়। উপনিষৎ বেদকে একবার অভ্রান্ত বলিতেছে, আবার বেদজ্ঞান যে অতি নিম্নস্তরের এবং উহা দ্বারা যে মোক্ষলাভ হইতে পারে না, তাহাও বলিতেছে। উপনিষৎ-এ এত বিভিন্ন প্রকারের মত আছে যে, যে-কোন মতাবলম্বীই স্বীয় মতের সমর্থন উপনিষৎ-এ পাইতে পারেন।[২]

Prof. S. Radhakrishnan তাই বলিতেছেন :

"It is not easy to decide what the Upanishads teach. Modern students of the Upanishads read them in the light of this or that preconceived theory." (Indian philoshy, p 139)

ঈশ্বর সম্বন্ধে উপনিষৎ কি বলে?

'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ছাড়া দুই নাই) এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সব-কিছুই ব্রহ্ম) ইহাই হইতেছে উপনিষৎ-এর বাণী। উপনিষৎ-এর মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। 'তত্ত্বমসি' (তুমিই তিনি) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম), 'সোহহং' (সে-ই আমি), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম)-এই শিক্ষাই উপনিষৎ দিয়াছে।

এই ব্রহ্ম কে? তাঁহার স্বরূপ কি?

উপনিষৎ বলিতেছে :

সপর্যগাচ্ছুক্রমকায়ব্রণ-

---

২. There is no important form of Hindu thought, heterodox Buddhism included, which is not rooted in the Upanishads. "-Bloomfield, —The Religion of the Vedas-P. 51.

www.pathagar.com

মস্বাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম।
কবির্মনীষী পড়িভূং স্বয়ম্ভূ
যাযাতথ্যতোহর্থান বেদধাচ্ছাশ্বতীভ্য সমাভ্য : ।। ঈশোপনিষৎ

অর্থাৎ : তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীরী, নির্মল, সর্বদর্শী, মনের চিয়ন্তা, সর্বোত্তম, স্বয়ম্ভূ এবং নিত্যকালস্থায়ী।

কোন কোন স্থানে ব্রহ্মকে 'মহতোমহীয়ন' 'সচ্চিদানন্দ,' 'আনন্দরূপমৃতং' প্রভৃতি বিশেষণেও বিশেষিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত গুণাবলী কোরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র গুণাবলীর অনুরূপ, সন্দেহ নাই।

কিন্তু হইলে কি হয়। যে উপনিষৎ ব্রহ্মের এমন সুন্দর ধারণা করিয়াছে, সেই উপনিষৎই আবার বলিতেছে :

ওঁ ব্রহ্ম দেবনাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
সব্রহ্মবিদ্যাং সর্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম্
অর্থবায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ।।১ (মুণ্ড কোপনিষৎ)

অর্থাৎ : নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও ভুবনের পালয়িতা পিতামহ ব্রহ্ম দেবগণের অগ্রণী স্বয়ম্ভূরূপে অভিব্যক্ত হইলেন। তিনি অর্থবা নামক জ্যেষ্ঠপুত্রকে সর্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম বিদ্যাউপদেশ দিয়াছিলেন।

মুণ্ডকোপনিষৎ–এ আছে :
সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম–অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম।
শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ–এ আছে :
তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্র তব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।।

অর্থাৎ : সেই পরমাত্মাই (ব্রহ্মই) অগ্নি, তিনিই সূর্য, তিনিই বায়ু, তিনিই চন্দ্র, তিনিই দীপ্তিমান নক্ষত্রাদি, তিনিই জল এবং তিনিই বিরাট।

উপরোক্ত শ্লোকগুলি একসঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে দানা বাঁধিয়া উঠে না। আল্লাহ্ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, হিন্দুশাস্ত্রে কোন্ নামের দ্বারা সেই বস্তুকে বুঝান হইতেছে, বলা কঠিন। ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, ব্রহ্মা, মহেশ্বর—ইহাদের কে সেই আল্লাহ্ স্থানীয়? যদি বলি ঈশ্বর তবে ভুল করা হইল। ঈশ্বরের আভিধানিক অর্থ এই : "ঈশ্বর, শিব, ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, ভগবান, কামদেব ইত্যাদি। স্ত্রী–ঈশ্বরা, ঈশ্বরী।"

আবার, 'ঈশ্বরী'র অর্থ হইতেছে : "দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী" ইত্যাদি।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ঈশ্বরকে যদি সেই পরম 'এক' বলিয়া ধরা হয়, তবে তাহা দ্বারা শিব, ব্রহ্মা ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝায়; পক্ষান্তরে ঈশ্বরের আবার স্ত্রী-পুত্রাদিও আছে। স্ত্রীপুত্রসমন্বিত ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই 'এক' বলা চলে না।

ঈশ্বর অর্থে যদি ব্রহ্মা হয়, তবে দেখা যাউক ব্রহ্মা কে।

www.pathagar.com

"ব্রহ্মা-বিরিঞ্চি, বিধাতা; সৃষ্টিকর্তা, ব্রাহ্মণ"-

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মার এইরূপ বিবরণ সংগ্রহ করা যায় :

"ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে সমুদয়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মারূপে অবস্থান করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া একভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবীরূপে সৃষ্টি হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, যথা—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজাপতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টিকার্যের ভার অর্পণ করেন, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসাধনার (ঈশ্বর তবে কে?) ব্যাঘাতাশংকায় নারদ ইহাতে অস্বীকৃত হইলে ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে তাঁহাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্যার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা দুই কন্যা। (সুবল চন্দ্রের 'সরল বাংলা অভিধান')

এখানেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছি না। ব্রহ্মাকে একবার সৃষ্টিকর্তা বলা হইল, আবার দেখিতেছি তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে জন্মলাভ করিলেন। কাজেই একবার তিনি স্রষ্টা, আর একবার তিনি সৃষ্ট। অথচ তাঁহাকে স্বয়ম্ভূও বলা হইতেছে। পক্ষান্তরে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, দশ জন প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা) কর্তৃকই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এর উপর আবার ব্রহ্মার স্ত্রীও আছেন, সন্তান-সন্ততিও আছেন। এইরূপ মতবাদকে একেশ্বরবাদ বলা সহজ নহে।

'ভগবান', 'নারায়ণ', 'বিষ্ণু' ইত্যাদির অর্থও অনুরূপ (অভিধান দেখুন)। অতএব দেখা যাইতেছে, আল্লাহ্ ও ঈশ্বর দ্বারা একই বস্তুকে বুঝা যাইতেছে না। অথবা ঈশ্বর, ভগবান, ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ইত্যাদি দ্বারাও একবস্তু বুঝাইতেছে না।

উপনিষৎকে আমরা দেখিলাম। এইবার বেদান্ত-দর্শন কি বলে, দেখা যাউক।

বেদান্ত দর্শন

উপনিষৎ-এর শিক্ষার উপরেই বেদান্ত-দর্শন দাঁড়াইয়া আছে। 'একমেবাদ্বিতীয়ম'-এক ছাড়া দুই নাই—ইহাই হইতেছে বেদান্ত-দর্শনের সার কথা। শঙ্করের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যা। চন্দ্র-সূর্য, আকাশ-পৃথিবী, দেব-দেবী, মানুষ-গরু, পাহাড়-পর্বত, ইহাদের কোন স্ব-অস্তিত্ব নাই; ইহারা ব্রহ্মেরই প্রকাশ বা ব্রহ্মেরই অংশ। কাজেই পরিণামে ইহারা ব্রহ্মেই লীন হইবে।

এই মতবাদের নাম 'অদ্বৈতবাদ'।

অদ্বৈতবাদ আবার দুই প্রকার : (১) অদ্বৈতবাদ, (২) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

আচার্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মতে জীব ও ব্রহ্ম স্বতন্ত্র। শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, রামানুজের মতে সগুণ ব্রহ্মই সত্য—নির্গুণ নহেন।

www.pathagar.com

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, উপনিষৎ বা বেদান্ত-দর্শন বিশেষ কোন নূতন কথা বলে নাই। অদ্বৈতবাদ সর্বত্রই সমানভাবে অক্ষুণ্ন রাখা হইয়াছে।

গীতা

গীতা কি বলে?

গীতা উপনিষৎ হইতে ভিন্ন নহে। গীতাতেও বহুদেববাদই সমর্থিত হইয়াছে, তবে গীতায় ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গীতার মতে "পুরুষোত্তমই শ্রেষ্ঠ সত্ব, তাহার উপরে আর কেহই নাই। সগুণ এবং নির্গুণ-এই দুইভাব লইয়া পরব্রহ্ম এবং তিনিই গীতার 'পুরুষোত্তম'।-ভগবান পুরুষোত্তম চৈতন্যস্বরূপ, আর তাঁহার এই চৈতন্যের যে সক্রিয়তার দিক, তাহাই তাহার প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি মূলত: অভিন্ন।"
(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা, অনিলবরণ রায়)

কিন্তু গীতার এই ভগবান বা পুরুষোত্তমের স্বরূপ কি?

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সেই পূর্ণব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম। অবতাররূপে তিনি স্বয়ং ভগবান। বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই তাঁহার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত ঃ সনাতনঃ।"

অর্থাৎ : জীবলোকে সনাতন জীবই আমারই অংশ।

প্রপূজ্য পুরুষং দেহে দেহিনং চাংশরূপিণ।

অর্থাৎ : ভগবানের অংশরূপী দেহী (জীবকে) দেহে পূজা করিবে।

অতএব, আমরা দেখিতেছি, গীতাও অদ্বৈতবাদই মানিয়া লইয়াছে। জীব এবং ব্রহ্ম এক-ইহাই গীতার শিক্ষা।

ঈশ্বর সম্বন্ধে গীতার ধারণা এই। ইহার উপর আবার অবতারবাদ আসিয়া ঈশ্বরকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

গীত বলিতেছে :

"পবিত্রাণায় সাধু নাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে যুগে।"

অর্থাৎ : ভগবান ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই ভগবানের পূর্ণাবতার।

ইহাই মোটামুটিভাবে গীতার ঈশ্বরবাদ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে আমরা কি দেখিলাম? দেখিলাম : হিন্দুধর্মে ঈশ্বরবাদ সুস্পষ্ট নহে। কোন একটি বিশিষ্ট মতবাদ এখানে নাই, বিভিন্ন মতবাদের ইহা একটি সমষ্টি মাত্র।

বলা বাহুল্য, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুণি-ঋষিরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করিবার ফলেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

বেদ, পুরাণ উপনিষৎ, গীতা ইত্যাদি যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত এবং প্রত্যেকটির মধ্যেই যে নানা প্রক্ষেপ ও বিকৃতি বিদ্যমান সে সম্বন্ধে এখন প্রায় সকল পণ্ডিতই একমত। আমরা নিম্নে কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

www.pathagar.com

"উপনিষৎ-এর সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, কেননা দেখা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবল হইয়া স্বমতকে শ্রুতিসম্মত বলিয়া প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে এবং উহাকে দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে বিভিন্নকালে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহা উপনিষৎ নামে সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে সম্রাট আকবরের কালে অল্লোপনিষৎ বিরচিত হয়।" (উপনিষৎ গ্রন্থাবলী, উদ্বোধন কার্যালয়-১৮ পৃ:)

"কি গীতা, কি ব্রহ্মসূত্র উভয়ই কালসহকারে রূপান্তরিত হইয়াছে। বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রে পরবর্তীকালে তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ নূতন নূতন সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপ বেদব্যাস রচিত প্রাচীন ভারত-সংহিতার অন্তর্গত গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক সংযোজন দ্বারা পরিবর্ধিত হইয়াছে।"

(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঈশ্বরবাদ" ২০৫ পৃ:)

"বঙ্গের পণ্ডিতাগ্রগণ্য উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রমাণে সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে যে, পদ্মনাভ ঋষিই (ব্যাস নহেন?) গীতা রচনা করিয়া মহাভারত কাব্যগ্রন্থে যোগ করিয়া দিয়াছেন। মৈথিলী মহামহোপাধ্যায় কাঞ্চ পদ্মনাভ দত্ত জাতিতে গোপাল ছিলেন, তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। তিনি নিজ ব্যাকরণ (কলাপ) মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায়, হর্ষবর্ধনের জীবনালেখ্য (হর্ষচরিত) প্রণেতা বাণভট্টের পরে পদ্মনাভ দত্ত বর্তমান ছিলেন। রাজা হর্ষবর্ধন ৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কান্যকুব্জে রাজত্ব করিয়াছিলেন। চীন দেশীয় লেখক মাতনলীনের মতে খ্রীষ্টীয় ৫৪৮ অব্দে হর্ষবর্ধন ইহলোক ত্যাগ করেন। সুতরাং বলিতে হইতেছে : ভাগবদগীতা সপ্তম শতাব্দীর শেষে রচিত। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এবং খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বোপদেব গীতার টীকা রচনা করিয়াছেন। আরও প্রমাণ দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, গীতা আধুনিক; গীতার বহু নূতন শব্দ পাওয়া যায়। এমন কি গীতা কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতিরও সমসাময়িক।"

(হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন, একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

গীতায় কেন্দ্রীয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না, অথবা তিনি যে ভগবানের অবতার নহেন, তাহাও অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন।

পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত 'ধর্মজিজ্ঞাসা' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ৪২২ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :

"শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম অথবা পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি : শ্রীকৃষ্ণ কোন স্থানে কি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম বা পূর্ণব্রহ্মের অবতার? এই কথার উত্তরে কৃষ্ণোপাসক সহজেই বলিবেন : কেন, গীতায় তিনি আপনাকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মরূপে ব্যক্ত করিতেছেন। এই কথার উত্তরে প্রথমত এই বলি যে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং অর্জুন শ্রোতা। শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যক্ত করিতেছেন, ইহাই সত্য। কিন্তু বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন অথবা গীতাকার তাঁহাকে বক্তা করিয়া অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, অথবা গীতাকার তাঁহাকে বক্তা করিয়া অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা

www.pathagar.com

কে মীমাংসা করিবে? একদিকে পাণ্ডবসৈন্য, অপর দিকে কুরুসৈন্য। এই উভয়ের মধ্যে অর্জুনের রথ। সকলেই যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। এমন সময় অর্জুনের সংশয় নিরাকরণের জন্য তাঁহার প্রশ্নোত্তরে তিনি তাঁহাকে এত উপদেশ দিলেন যে, তাহাতে একখানি গ্রন্থ হইয়া গেল। ইহা কি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে? যদি কেহ বলেন : কোন মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব, ঈশ্বরের পক্ষে তাহাই সম্ভব; ঐশী শক্তি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। তাহা হইলে যাহা প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি-না, ইহাই ত প্রশ্ন। সুতরাং ইহা প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে স্বীকার করিয়া লইলে চলিবে কেন? বক্তা ও শ্রোতা কল্পনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা আমাদের দেশের চিরন্তন প্রথা। মহাভারতাদি প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থ ঐ প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রসমূহে মহাদেব বক্তা, পার্বতী শ্রোতা। বাংলা ভাষাতেও অনেক স্থলে উক্ত প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। এমন কি প্রতি বৎসর যে শ্রীরামপুর পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে উহার বক্তা মহাদেব এবং শ্রোতা পার্বতী। যথা :—

হর প্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।
কোন্ গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রীবর
প্রকাশ করিয়া কহ শুনি দিগম্বর।
ভব কন ভবানীকে কহি বিবরণ
বৎসরের ফলাফল করহ শ্রবণ

এইস্থলে জিজ্ঞাসা করি, শ্রীরামপুরের পঞ্জিকাকে কি শিবোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? হিন্দুমাত্রেই বলিবেন, না ইহা কল্পনা মাত্র।"(হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন, (৪২৬-৪২৭ পৃ:)

নগেন্দ্র বাবু আরও বলেন :

"কৃষ্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন, এই কথা ভাগবতে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ অবস্থায় দেখিলেন, তাহার এইরূপ বর্ণনা আছে :

ক্বাপি সন্ধ্যামুপাসানী নং .... প্রকৃতে পরং।

অর্থাৎ : কোথাও সন্ধ্যা করিতেছেন, কোন স্থলে মৌন হইয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথাও বা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ যে পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন।

এইরূপে কৃষ্ণকে নারদ দেখিলেন। কৃষ্ণ যদি নিজেই পূর্ণব্রহ্ম, তবে তিনি অপর কোন্ ব্রহ্মের উপাসান করিতেন?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাবতার বলা হইয়াছে। এই অবতারবাদও যে হিন্দুধর্মের নিজস্ব মত নহে,উহা যে ধার করা, ইহাও অনেক পণ্ডিতের মত :

উপনিষৎ-এ ও বৈদিক সময়ে অবতারবাদ ছিল না। –দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় তৎকৃত "খ্রীষ্ট ধর্ম নামক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম ও তাহার

www.pathagar.com

ভিত্তি উৎপত্তি, বিস্তৃতি খ্রীষ্টধর্ম হইতে হইয়াছে। প্রথম শতাব্দীতে খ্রীষ্টধর্ম হইতে অবতারবাদ লওয়া হইয়াছে। গীতায় পরে উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।-প্রথম শতাব্দীতে সাধু টমাস এবং সাধু বার্থালমিউ ভারতভূমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পাঞ্জাব প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং অনেক লোককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহারাই এই দেশে অবতারের কথা আনিয়াছিলেন। -যীশু খ্রীষ্টের বাল্যলীলা অবলম্বনে ভারতীয় বালকৃষ্ণ উপাখ্যান রচিত হয়।"

শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার ছিলেন না, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ আর একটি প্রমাণ দেখাইতেছেন—

"শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পূর্ণব্রহ্মের অবতার বলিয়া কখনই মনে করিতেন না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে তিনি স্পষ্ট করিয়া অর্জুনকে বলিতেছেন : 'পূর্বে আমি তোমার নিকট যাহা যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় এক্ষণে আর আমার স্মৃতি পথে উদিত হইবে না।' তিনি পূর্ণব্রহ্মের অবতার তিনি তার আপন কথা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন- আর উহা স্মৃতিপথে উদিত হইবে না-ইহা বড় চমৎকার কথা! তারপর আবার বলিতেছেন : এক্ষণে আমি তাহা সমগ্ররূপে কীর্তন করিতে পারি না, আমি তৎকালে যোগযুক্ত হইয়াই পরব্রহ্মপ্রাপক বিষয় কীর্তন করিয়াছিলাম।"(হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন)

শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব এবং ঐতিহাসিক সত্তা সম্বন্ধেও অনেকের সন্দেহ আছে। শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে বেদ, উপনিষৎ, মহাভারত এবং গীতা-কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই :

"বেদে দুই কৃষ্ণ, একজন মন্ত্র-রচয়িতা ঋষি, আর একজন যোদ্ধা। মহাভারতে ও পুরাণে এই দুই বৈদিক কৃষ্ণ মিলিত হইয়াছেন। মহাভারতে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, কিন্তু অনার্য, গোপকুলে প্রতিপালিত। বেদের ঋষি—কৃষ্ণও আঙ্গিরস অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ আঙ্গিরা বংশোদ্ভব, কিন্তু যোদ্ধা-কৃষ্ণ অনার্য। বৈদিক অনার্য-কৃষ্ণ ইন্দ্রের ঘোর শত্রু কিন্তু বেদে ইন্দ্রেরই নিকট কৃষ্ণ পরাস্ত, পুরাণে আবার সেই পরাজয়ের যথেষ্ট প্রতিশোধ— প্রতিপদেই ইন্দ্র কৃষ্ণের নিকট পরাজিত ও অপমানিত। ছান্দোগ্য উপনিষৎ-এ 'দেবকী-নন্দন কৃষ্ণের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার গীতায় সেই শ্রীকৃষ্ণকে সারথি, মিথ্যাবাদী, শঠ ও প্রতারক সাজাইয়াছেন, তিনিই আবার গীতায় তাঁহাকে ভগবানের অবতার করিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। সুতরাং আমরা বলিতে বাধ্য যে, বেদব্যাস গীতা রচনা করেন নাই।" (হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন)

পুনশ্চ : বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, প্রণীত 'পাগলা-ঝোরা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে 'গীতায় প্রক্ষিপ্তবাদ' (৯৩ পৃ:) নিবন্ধে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, গীতা গ্রন্থ প্রক্ষিপ্ত। লেখক বলেন:

"কথায় কথায় গীতার কথা উঠিল। বঙ্কিম বাবু বলিলেন, আমি যতই ভাল করিয়া দেখিতেছি, ততই বুঝিতেছি যে, গীতা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে বোঝাই। ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয় কেন, অর্জুনও প্রক্ষিপ্ত। একটু সমঝাইলে আপনারাও ইহা ধরিতে পারিবেন। দেখুন উভয়ের

www.pathagar.com

কথোপকথন স্থলে উপদেশ দান—এই নাটকীয় কৌশল মহাভারতের সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং গীতা প্রথমে তন্ত্রোপদেশের আকারে লিখিত হয়, পরে যখন ব্যাস, সৌমিল্ল, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ নাটক লেখা শুরু করেন, তখন তদ্দৃষ্টে কোন অজ্ঞাতনামা কবি 'গীতা' খানির একঘেঁয়ে ধরন দূর করিবার মানসে প্রশ্নোত্তরের (catechism) আকারে পুনর্লিখিত করিলেন। অর্জুনকৃত বিশ্বরূপস্তব আদিম ও অকৃত্রিম, কিন্তু উহা গ্রন্থকার কৃত স্তবাকারে গ্রন্থারম্ভেই ছিল, অর্জুনের নাম-গন্ধও ছিল না। বিশ্বরূপদর্শনের প্রসঙ্গও ছিল না। পরে খুব একটা জমকালো দৃশ্য (scenic effect) দেখাইবার জন্য বিশ্বরূপদর্শন প্রক্ষিপ্ত হয়।-সাহিত্যে এই থিয়েটারী ভাব প্রবেশ করিলে গীতার প্রচলিত নাটকীয় সংস্করণ হইল। ইহাই গীতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস।" (হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন)

অতএব দেখা যাইতেছে বিশুদ্ধ একত্ববাদ হিন্দুধর্মে প্রায় অনুপস্থিত। যেটুকু আছে, তাহাও নানা মুণির নানা মত দ্বারা বারিত ও খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। অদ্বৈতবাদের যে একত্ববাদ, তাহা ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ নহে; সর্বভূতে ঈশ্বরত্ব কল্পনা করিলে যে একত্ব পাওয়া যায়, তাহাও তৌহিদ নহে। ইসলামে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি পৃথক। সৃষ্টি বহু কিন্তু স্রষ্টা এক। ইহাই ইসলামের একত্ববাদ বা তৌহিদ।

বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বর ধর্ম। ইহাও দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের পন্থাই হইতেছে 'নির্বাণ'।

বৌদ্ধধর্ম কোন নূতন ধর্ম নহে; উপনিষৎই হইতেছে ইহার ভিত্তি।৩

Max Muller বলিতেছেন :

"Many of the doctrines of the Upanishads are no doubt pure Buddhism or rather Buddhism is on many points the consistent carrying out of the principle laid down in the Upanishads."

বুদ্ধের নির্বাণ সম্বন্ধে Dr. Radhakrishnan বলিতেছেন :

"At any rate, Nirvan, according to buddhism, is not the blessed fellowship with God for that is a perpetuation of the disire for life."

বৌদ্ধধর্মে যখন ঈশ্বরই অঙ্গীকৃত হয় নাই, তখন তাহাতে একেশ্বরবাদ আছে কি-না সে কথা আসিতেই পারে না। সুতরাং আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৌদ্ধধর্মের আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তবে বৌদ্ধধর্মের সপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, তাহারা ঈশ্বর মানে না বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবদেবীবাদও মানেনা।

---

৩. উপনিষৎই বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি, অথবা বৌদ্ধধর্মই উপনিষৎ-এর ভিত্তি, ইহা নিশ্চিত বলা কঠিন।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টধর্ম

ত্রিত্ববাদ (Trinity) খ্রীষ্টধর্মের বৈশিষ্ট্য। পবিত্র পিতা (God the Holy Father), পবিত্র পুত্র (God the Holy Son) এবং পবিত্র আত্মা (God the Holy Ghost) এই ত্রয়ীর মিলিত রূপই হইতেছে খ্রীষ্টানদের ঈশ্বর। যিশুকে খ্রীষ্টানগণ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া জানেন এবং বলেন যে, তিনি ঈশ্বরের অবতার (Incarnation of God)।

কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের আদিতেও যে ঈশ্বরের স্বরূপ এইরূপ ছিল, তাহা নহে। তিনি একে-তিন—এই অভিনবত্ব পরবর্তীকালের সৃষ্টি, Old Testament-এ ইহা নাই। সেখানে ঈশ্বর একক এবং অদ্বিতীয় রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছেন।[৪]

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, মূল বাইবেলে হযরত ঈসা আলায়হিসসালাম আল্লাহ্‌র যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা ইসলামের ন্যায় সম্পূর্ণ না হইলেও মিথ্যা ছিল না। সে পরিচয় প্রত্যেক মুসলমান মানিয়া লইতে পারে। প্রকৃত বাইবেল (ইঞ্জিল) কখনও মুসলমানের নিকট অশ্রদ্ধার বস্তু নহে। সুতরাং খ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টের ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করাও আমাদের শোভা পায় না। কিন্তু ইহুদী জাতির হাতে এবং মথি, লুক, যোহন প্রমুখ খ্রীষ্টান পুরোহিতদের হাতে আসল বাইবেল বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং এই ত্রিত্ববাদ তাহাদেরই সৃষ্টি—ইহাই আমাদের কথা, আর এখানেই আমাদের আপত্তি।

খ্রীষ্টনেরা যিশুখ্রীষ্ট এবং পবিত্রাত্মাকেই শুধু ঈশ্বরত্বে উন্নীত করেন নাই, যিশুখ্রীষ্টের মাতা মেরীতেও ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, মুসলমানেরা যিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে এই মত স্বীকার করেন না। যিশুখ্রীস্টকে তাঁহারা একজন পয়গম্বর বলিয়াই জানেন। কোরআন এই সম্বন্ধে কি বলিতেছে দেখুন :

"হে গ্রন্থধারীগণ, তোমরা ধর্মের গণ্ডি লংঘন করিও না। মরিয়মপুত্র ঈসা আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন রসূল এবং মরিয়মের নিকট প্রেরিত আল্লাহ্‌র কালাম ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছুই নহেন; অতএব, তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসূলকে বিশ্বাস কর এবং 'তিন' বলিও না। ক্ষান্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম কার্য। আল্লাহ্‌ মাত্র একজন; তাঁহার কোন পুত্র আছে—ইহা তাঁহার পক্ষে মস্ত বড় অগৌরবের কথা; স্বর্গে-মর্ত্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তই তাঁহার এবং রক্ষকের পক্ষে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।" (৪ : ১১৭)

অন্যত্র আছে :

"নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী—যাহারা বলে : অবশ্যই আল্লাহ্‌ তিন জনের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।" (৫ : ৭৩)

মরিয়মের (Mary) পুত্র মসিহ্‌ (যিশু) একজন পয়গম্বর মাত্র; তাঁহার পূর্ববর্তী পয়গম্বরেরা মারা গিয়াছেন; এবং তাঁহার মাতা একজন সত্যবাদিনী নারী ছিলেন; তাঁহারা উভয়েই খাদ্য গ্রহণ করিতেন। দেখ, আমরা তাহাদিগের নিকট কিরূপে সুস্পষ্ট বাণী প্রেরণ করিলাম এবং কিরূপে তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া গেল।" (৫ : ৭৫)

---

৪. Hear, O israel, The Lord, our God is one Lord-Deut (41 : 6)

www.pathagar.com

সুতরাং দেখা যাইতেছে, হযরত মুহম্মদের সমসময়ে খ্রীষ্টান জগৎ আল্লাহ্‌র স্বরূপ ও একত্ব সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিত; পথের দিশা পাইয়াও তাহারা পথহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

পারসিক, গ্রীক চীন, রোমান ও অন্যান্য জাতিও যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা পোষণ করিত, একথা সর্বজনবিদিত। একেশ্বরবাদ কোথাও ছিল না। সকলেই দেবদেবীবাদে বিশ্বাসী ছিল। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে-সকল আলোচনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম

হযরত মুহম্মদের আল্লাহ্‌

এইবার হযরত মুহম্মদ আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে কি পরিচয় আমাদিগকে দিয়াছেন দেখা যাউক : আল্লাহ্‌ শব্দটি অতুলনীয়। অন্য কোন ধাতু বা শব্দ হইতে ইহা উদ্ভূত নহে। ভগবান ঈশ্বর, God ইত্যাদি শব্দের বহুবচন আছে, স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ শব্দের সেইরূপ কোন রূপান্তর নাই। ইহা সর্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত একক ও অনুপম এক নাম। এসব কথা ইসলামের আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে বলা যাইবে না। আমরা যাহা, আল্লাহ্‌ তাহা নহেন। আমাদের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, আল্লাহ্‌র তাহা নাই; আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কাম-ক্রোধ আছে, আল্লাহ্‌র তাহা নাই; আমাদের সন্তান-সন্ততি আছে, আল্লাহ্‌র তাহা নাই; এমন কি আমরা যে অবস্থান করি-এই অবস্থানের (existence-এর) গুণ হইতেও তিনি মুক্ত; অর্থাৎ অবস্থান না করিয়াও তিনি অবস্থান করেন। ইহাই আল্লাহ্‌র 'জাতি' রূপ।

আল্লাহ্‌, যে আমাদের সকল পরিচয় ও বিশেষণের উর্ধ্বে আল্লাহ্‌ তাহা নিজেই বলিয়া দিতেছেন :

"কোন কিছুই তাঁহার (আল্লাহ্‌র) মত নহে।" ৪২ : ৮১)

কাজেই তুলনা দিয়া বা মূর্তি কল্পনা করিয়া তাহাকে বুঝিবার বা বুঝাইবার উপায় আমাদের নাই। যতই বলি, যতই বুঝাই আল্লাহ্‌ সমস্ত কিছুরই অতীত।

এই বিশুদ্ধ চির-পবিত্র একের নামই আল্লাহ্‌।

ইসলামে আল্লাহ্‌র ৯৯ টি নাম আছে কিন্তু সেগুলি আল্লাহ্‌র গুণ, আল্লাহ্‌র প্রকৃত স্বরূপ নহে; কেননা গুণ হইতে বস্তু পৃথক। শিখার জ্যোতি ঃ যেমন শিখা নহে, আল্লাহ্‌র গুণও তেমনি আল্লাহ্‌ নহেন। "আল্লাহ্‌" হইতেছেন সেই আসল বস্তুটির নাম (ইস্‌মে জাত); বাকী নামগুলি তাঁহার বিশেষণ (ইস্‌মে সিফাৎ); আল্লাহ্‌কে কেন্দ্র করিয়াই এই নামগুলি চতুর্দিকে ছড়াইয়া আছে।

আল্লাহ্‌র আসলিয়াৎ বুঝিবার শক্তি মানুষের নাই; গুণ দ্বারা তাঁহাকে বুঝিতে হইবে। কাজেই আল্লাহ্‌র স্বরূপ বুঝিবার জন্য এই নামগুলি আমাদের জানা দরকার।

অবশ্য প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল : এই নামগুলির মধ্যে মানবোচিত বিশেষণই প্রকাশ পাইয়াছে : আল্লাহ্‌ ' 'শ্রোতা' 'জ্ঞাতা' ইত্যাদি ধরনের অনেক কথা আছে। ইহা দ্বারা পাঠক যেন মনে না করেন যে, আল্লাহ্‌ বুঝি আকার-বিশিষ্ট। তাহা নিশ্চয়ই নহে। আল্লাহ্‌ পরিষ্কারভাবে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন :

"দৃষ্টি তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না, তিনি সকল দৃষ্টিকে আছন্ন করিয়া আছেন।" (৬ : ১০)

www.pathagar.com

কাজেই যদি বলা হয় : তিনি 'দেখেন' বা 'শুনেন' তবে এই কথার অর্থ এই নয় যে, তাঁহার চোখ আছে বা কান আছে। চোখ ছাড়াও তিনি দেখেন, কান ছাড়াও তিনি শোনেন। আরশ্, কুর্সী, লওহ্ মাহফুজ—ইত্যাদি ব্যাখ্যাও অনুরূপ।

আল্লাহ্‌র ৯৯ নাম

ইসলামের আল্লাহ্‌র আর একটি বৈশিষ্ট্য—তাঁহার ব্যক্তিত্ব। নানা গুণে তিনি গুণান্বিত।

আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের মধ্যে ৪টি সমধিক প্রসিদ্ধ : 'রব', 'রহমান', 'রহিম' ও 'মালিক'। সূরা ফাতিহায় এই চারিটি নামের উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। 'রব' অর্থে সৃজনকারী ও পালনকারী মহাপ্রভু, 'রহমান' অর্থে পরম করুণাময়, 'রহিম' অর্থে পরম দাতা ও দয়ালু এবং 'মালিক' অর্থে বিচারক। স্রষ্টা, প্রেমময়, দাতা এবং বিচারক–এই চারিটি গুণের মধ্যেই মোটামুটিভাবে আল্লাহ্‌র সমস্ত পরিচয় নিহিত আছে। আল্লাহ্ই একমাত্র সৃজনকর্তা, পালনকর্তা ও ধ্বংসকর্তা; তিনি প্রেমময়—সৃষ্টির প্রতি তাঁহার অফুরন্ত প্রেম ও করুণা; তিনি সব কিছু দান করেন—তিনি পরম দাতা; যাহা আমরা ভোগ করি সব তাঁহার নিকট হইতে আসে, পক্ষান্তরে অন্যায় করিলে অন্যায়ের ন্যায্য বিচার করিয়া তিনি অন্যায়কারীর শাস্তিবিধানও করেন। মোটামুটি এই ধারণাই আল্লাহ্‌কে চিনিবার পক্ষে যথেষ্ট।

অন্য নামগুলি এই :

১. আত্মপরিচয় সম্বন্ধীয় :

আল্-আহাদ (এক), আল্-হক (সত্যময়), আল্-কুদ্দুস (পবিত্র), আস্-সামাদ (সকলের নির্ভরস্থল), আল্–গনি (নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট), আল্–আউয়াল (আদি), আল্–আখির (অন্ত), আল্-হাই (চিরকাল স্থায়ী), আল্-কাইউম (অন্যনিরপেক্ষ)।

২. সৃষ্টি বিষয়ক :

আল্-খালিক (স্রষ্টা), আল্-বারী (আত্মার স্রষ্টা), আল্-মুসাব্বির (আকারদাতা) আল্-বদী (প্রথম আবিষ্কারক)।

৩. প্রেম ও করুণা বিষয়ক :

আর্-রহমান (করুণাময়), আর্-রহীম (অদ্বিতীয় দাতা), আল্-গফুর (ক্ষমাকারী), আর্–রউফ (স্নেহময়), আল্-অদুদ (প্রেমময়), আল-লতিফ (অনুগ্রহশীল), সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইসলামের আল্লাহ্ তাঁহার নামের মধ্যেই ব্যাখ্যাত হইয়া আছেন।

এই আল্লাহ্‌কে বুঝিতে হইলে দুই উপায়ে বুঝিতে হইবে : (১) আল্লাহ্ কি নহেন, (২) আল্লাহ্ কি।

আমরা প্রথমে আল্লাহ্ কি নহেন, সেই দিক দিয়া আরম্ভ করিব। বিভিন্ন ধর্মে আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে সব ধারণা করা হইয়াছে, দেখা যাউক, সেগুলি গ্রহণযোগ্য কি-না। প্রকৃতিবাদ, অদ্বৈতবাদ, ত্রিত্ববাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আল্লাহ্ কি বলিতেছেন, দেখুন :

"এবং যাহারা তাঁহাকে (আল্লাহ্‌কে) ছাড়িয়া অপর কাহাকেও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের সহায়তা করিবে বলিয়াই আমরা তাহাদিগকে পূজা করি, আল্লাহ্ তাহাদের বিচার করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, কোথায়

www.pathagar.com

তাহাদের পার্থক্য। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাকে সত্যপথে চালিত করেন না—যে মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ।" (৩৯ : ৩)

এখানে পৌত্তলিকতা ও দেবদেবীবাদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা হইতেছে এবং এসব মতবাদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে। আল্লাহ্র প্রকৃত পরিচয় যে ইহা নহে, এই কথাই এখানে বুঝা যাইতেছে। যাহারা প্রকৃতি-পূজক তাহাদের সম্বন্ধেও বলা হইতেছে :

"—এবং তাঁহারা (আল্লাহ্র) নিদর্শনের মধ্যে রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি, (কাজেই) চন্দ্রকে বা সূর্যকে আল্লাহ্ বলিও না, (কারণ) তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (৪১ : ৩৭)

পারস্যবাসীরা জগতে মঙ্গল ও অমঙ্গল দৃষ্টে দুইজন খোদার কল্পনা করিয়াছিলেন; মঙ্গলের খোদা অরমুজদ, অমঙ্গলের খোদা আহরিমন। আল্লাহ্ যে তাহা নহেন, তাহাও তিনি বলিয়া দিতেছেন :

"এবং আল্লাহ্ বলিয়াছেন : দুইজন আল্লাহ্ আছেন—একথা বিশ্বাস করিও না, আল্লাহ্ শুধুই একজন, এবং কেবলমাত্র আমাকেই ভয় করিবে।" (১৬ : ৫১)

খ্রীষ্টানদিগের ত্রিত্ববাদ সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার পয়গম্বরদিগকে বিশ্বাস কর এবং বলিও না যে, (আল্লাহ্) তিনজন; ক্ষান্ত হও, ইহাই তোমাদের পক্ষে উত্তম, আল্লাহ্ মাত্র একজন।" (৪ : ১৭১)

আল্লাহ্র যে স্ত্রী-পুত্রাদি নাই, সে সম্বন্ধে বলিতেছেন :

"এবং তাহারা বলে, করুণাময় আল্লাহ্ একটি পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই তোমরা একটি ঘৃণিত ধারণা করিতেছ; আকাশ-পৃথিবী বিদীর্ণ হউক যদি তাঁহারা আল্লাহ্তে পিতৃত্ব আরোপ করে।" (২ : ১১৬)

"—নিশ্চয়ই তাহারা অবিশ্বাসী, যাহারা বলে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তিনের মধ্যে একজন। একজন আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন আল্লাহ্ নাই এবং তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা হইতে যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে সেই সব অবিশ্বাসীদিগের উপর ভীষণ শাস্তি হইবে।" (৫ : ৭৩)

অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দু, খ্রীষ্টান, পার্শী বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যে-রূপে আল্লাহ্কে কল্পনা করিয়াছে, আল্লাহ্, তাহা নহেন। আল্লাহ্ তবে কে বা কি?

সূরা এখ্লাসে অতি অল্প কথায় আল্লাহ্ কী সুন্দরভাবেই না আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম্-ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফ্ওয়ান আহাদ।"

অর্থাৎ: বল (হে মুহম্মদ) আল্লাহ্ এক—আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর নির্ভর, তিনি জন্ম দেন না, জন্মগ্রহণও করেন না; তাঁহার সমতুল্য আর কেহই নাই।

এখানে আল্লাহ্ তাঁহার পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলিতেছেন : (১) তিনি বিশুদ্ধ এক, (২) তিনি সব কিছুর নির্ভর, (৩) তিনি জন্ম দেন না, (৪) তিনি জন্মগ্রহণ করেন না, (৫) তাঁহার সমতুল্য অন্য কিছুই নহে।

www.pathagar.com

এই পাঁচটি কথার মধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্বের সমস্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা লুক্কায়িত আছে। আল্লাহ্ যে বিশুদ্ধ এক, সমস্ত সৃষ্টি যে তাঁহা হইতেই উৎসারিত হইয়াছে, আল্লাহ্র যে স্ত্রী-পুত্রাদি নাই, পুত্ররূপে বা অবতাররূপে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেন না এবং কোনরূপ প্রতীক দ্বারাই যে তাঁহাকে বুঝান যায় না, এই কথাই এখানে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই অতি-উর্ধ্ব ভাবই হইতেছে ইসলামের আল্লাহ্র বিশেষত্ব। 'আল্লাহ্ কাহারও মত নহেন'—ইহাই আল্লাহ্র পরিচয়। তাঁহার সহিত সাদৃশ্য থাকিতে পারে—এমন কিছুই নাই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', 'সোহহং বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' অথবা 'জীবই ঈশ্বর'—আততাওয়াব (পুনঃ পুনঃ দয়ায় প্রত্যাবর্তনশীল), আল্-হালীম (ধৈর্যশীল), আল্-আফু (ক্ষমতাশীল), আশ্-শাকুর (বহুগুণ পুরস্কারদাতা), আস্-সালাম (শান্তিদাতা), আল্-মুমীন (অভয়দাতা), আল্-বারর্ (সদাশয়) রফিউদ-দারাজাত (সম্মানদাতা), আর্-রাজ্জাক (জীবিকা-দাতা), আল্-ওহাব (চরম দাতা), আল্-অসী (প্রচুর দাতা), আল্-করীম (অনুগ্রহকারী)।

৪. গৌরব ও মহত্ত্বসূচক :

আল্-আজীম (মহান), আল্-আযীজ (সর্বশক্তিমান), আল্-আনী (সুউন্নত), আল্-কা'কী (সবল), আল্-কাহ্হার (শাস্তিদাতা), আল্-জাব্বার (ক্ষতিপূরণকারী), আল্-মূতাকাব্বীর (মহত্ত্বের অধিকারী), আল্-কবীর (মহৎ), আল্-হামীদ (প্রশংসার্হ), আল্-মজীদ (গৌরবান্বিত), আল্-মতীন (সক্ষম), আল্-যাহীর (সুপ্রকট) , জূলজালালে আল্-ইকরাম (গৌরব ও সম্মানের প্রভু)।

৫. জ্ঞান সম্বন্ধীয় :

আল্-আমীন (জ্ঞাতা), আল্-হাকীম (জ্ঞানী), আল-আকীল-জ্ঞানময় আস্-সামী (শ্রোতা) আল্-খবীর (সজাগ), আল্-বশীর (দ্রষ্টা) আশ-শহীদ (সাক্ষী), আর-রকীব, (পাহারাদার) আল্-বাতীন (গুপ্ত বিষয়ের জ্ঞাতা), আল্-মুহাইমীন (সকলের অভিভাবক)

৬. শক্তি ও শাসন—ক্ষমতা সম্বন্ধীয় :

আল্-কাদীর (শক্তিময়), আল্-আলীহ (সব বিষয়ের অভিভাবক), আল্-হাফীজ (রক্ষক), আল্-মালীক (সম্রাট), আল্-ফাতাহ্ (বিচারক), আল্-হাসীব (হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী), আল্-মুস্তাকীম (সরল পথ প্রদর্শক), আল্-মুকীৎ (সব বিষয়ের নিয়ন্তা)।

অন্যান্য নামগুলির দ্বারাও আল্লাহ্র এইরূপ কোন-না কোন গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সবগুলির উল্লেখ করিলাম না।

এখানে কেহ যেন মনে না করেন, তবে কি আল্লাহ্র পরিচয় মাত্র এই ৯৯টি নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নিশ্চয়ই নহে। গুণের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া দিলেও ত আল্লাহ্ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। আল্লাহ্ তাই এই গুণগুলির মধ্যেই সীমিত নহেন। ইহারও বাহিরে তিনি আছেন। মানুষের জ্ঞান সসীম; কাজেই আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি যতদূর নাগাল পায়, ততদূর পর্যন্তই আল্লাহ্ নিজের পরিচয় দিয়াছেন। মানুষের পক্ষে এই পরিচয়ই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং সম্পূর্ণ। ইহার উর্ধ্বে বা অতীতে আসলে তিনি কি,

www.pathagar.com

তাহা মানুষের বোধগম্য নহে। মানুষের যাহা ধারণার বাহিরে, তাহা বলিয়া লাভ কি? আল্লাহ্ তাহা বলেন নাই। সেই হিসাবে এখনও আল্লাহ্ আত্মগোপন করিয়াই আছেন। তবু বলা যাইতে পারে, আঁ-হযরতের নিকটই তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি

আল্লাহ্র পরিচয় সংক্ষেপে দিলাম। তিনিই যে-বিশ্ব-নিখিলের স্রষ্টা ও পালয়িতা এবং আমাদের জীবন-মরণের প্রভু, আশা করি সেকথা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

স্রষ্টা ও সৃষ্টি (খালিক ও মাখলুক)-এর মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কি, সে কথাও আমাদের জানা দরকার, নতুবা আল্লাহ্র পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

আল্লাহ্ স্রষ্টা। জগৎ তাঁহার সৃষ্টি । আল্লাহ্ চিরসত্য-ও চিরঞ্জীব, ইহা সর্ববাদীসম্মত। জগৎ সত্য কিনা তাহাই লইয়া যত মতভেদ। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এরিষ্টটল বলিয়াছেন যে, একমাত্র সেই পরম সত্তা (The Absolute Idea)-ই সত্য, জগৎ মিথ্যা, মায়া বা মরীচিকা (Illussion)। এই যে সুন্দর পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহার কোন স্থায়ী মূল্য নাই; স্বপ্নের মত একদিন ইহা মিলাইয়া যাইবে; জাগিয়া রহিবে শুধু সেই পরম ধ্যান বা পরম সত্তা। বলা বাহুল্য, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তবে মানুষও মিথ্যা হইয়া যায়। প্লেটোনিক দর্শনে তাই মানুষেরও কোন স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেও চরম সত্তার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের মত। এই দর্শন মানিলে চির-নিরাশায় মানুষের মন ভরিয়া উঠে, সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ বা অনুরাগ খুঁজিয়া পায় না; স্বাভাবিকভাবেই মানুষ উদাসীন সন্ন্যাসী হইয়া উঠে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের পরিচয় বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যখন চিরতরে লোপ পাইবেই, তখন কিসের সংসার, কিসের ঘরকন্না, কিসের ব্যবসা-বাণিজ্য, কিসের যুদ্ধ-বিগ্রহ? মহামৃত্যুর চিন্তা তখন মানুষকে হয় কর্মবিমুখ করে, না হয় ত লম্পট, স্বেচ্ছাচারী বা ইহ্জীবনসর্বস্ব জড়বাদী করিয়া তুলে। পরকাল নাই, অমর জীবনের আশা নাই, কর্মফলের ভয় নাই—এমনই এক অদ্ভুত জীবনবোধ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বলা বাহুল্য, হযরত মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে ইউরোপের চিন্তাধারায় এই বৈশিষ্ট্যই প্রকট হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনেও একই মায়াবাদ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। ঈশ্বর সেখানে অঙ্গীকৃত হয় নাই। ষড়দর্শনের প্রায় সবগুলিই নাস্তিকতা; সংশয়বাদের উদ্গাতা। একমাত্র বেদান্ত দর্শনেই ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু সেখানেও সেই প্লেটোর দর্শনই ক্রিয়া করিতেছে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—ইহাই বেদান্ত-দর্শনের সার কথা। প্লেটোর মায়াবাদে এবং বেদান্ত-মতে তাই বিশেষ কিছুই পার্থক্য নাই। মূলত তাহারা একই। উভয় দর্শনেই সেই পরম সত্তাকে (Idea বা ব্রহ্মকে) একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। পরম সত্তার একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে দুই উপায়ে করা যায় : হয় জগৎকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে হয়, না হয় ত জগৎও ব্রহ্মময়-এই কথা বলিতে হয়। বেদান্ত-দর্শন এই দ্বিতীয় পথের অনুসারী। বেদান্তের মতে জগৎ ব্রহ্মময় বা জীবনই শিব : অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের সবকিছুই ব্রহ্মের অংশ,

www.pathagar.com

সবাইকে মিলাইয়া যে পরম এক, তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম। এই মতবাদকে ইংরেজীতে Panthesim (সর্বব্রহ্মবাদ) বলে। এই মতানুসারেই বলা হইয়া থাকে, 'অহম ব্রহ্মস্মি' (আমিই ব্রহ্ম) 'সোহহং' (সে-ই আমি) বা 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (এই আত্মাই ব্রহ্ম)।

বৌদ্ধদর্শনও অনুরূপ। 'নির্বাণ' বা মহাপ্রস্থানই বৌদ্ধদের কাম্য। মানবজীবন দুঃখ-কষ্ট, দ্বন্দ্ব-কলহ ও জরামৃত্যুতে পরিপূর্ণ। কর্ম করিতে গেলেই পাপ হয়, আর সেই কর্মফলেই বারে বারে জন্মলাভ করিয়া অশেষ দুঃখের ভাগী হইতে হয়। জীবন তাই একটি দুর্বিষহ অভিশাপবিশেষ। এই অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এমন মহামৃত্যু লাভ করা চাই—যাহার পর আর কোন প্রত্যাবর্তন নাই। ইহাই হইল নির্বাণের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য। বলা বাহুল্য, ইহাও সন্ন্যাস ও জীবনবিমুখিতার ধর্ম; ইহার মধ্যেও ধ্বনিত হয় চির মৃত্যুর সুর।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, খ্রীষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধ সব ধর্মেই জীবনকে কোন স্থায়ী মূল্য দেওয়া হয় নাই, মৃত্যুকেই বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। জগৎ মিথ্যা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবনের অবসান ঘটিবে অথবা পরব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে—ইহাই ছিল প্রাক-ইসলামিক যুগের ধর্মবিশ্বাস। মানুষের যে স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা আছে এবং সে যে অমর জীবনের অধিকারী-এই কথা তাহাকে শোনান হয় নাই।

ঠিক এই পরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বনবী মুহম্মদ আনিলেন এক নূতন জীবন-দর্শন। তিনি শুনাইলেন নূতন বাণী। তিনি বলিলেন : আল্লাহ্ সত্য বটে কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট এই জগৎও মিথ্যা নহে। এই জগৎ আমাদের কর্মক্ষেত্র বিশেষ। মানবজীবন অলীক নহে, স্বপ্ন নহে; ইহা বাস্তব, ইহা সত্য। তবে ইহাই পূর্ণসত্য নহে; এই জীবনের শেষে আমাদের পরজীবন আছে। উভয়কে মিলাইলে তবেই আমরা পূর্ণসত্য লাভ করিব। আমরা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যাইব না, অথবা আল্লাহ্তে লয়প্রাপ্ত হইব না।

ইসলাম জগৎকে দিল এই বলিষ্ঠ পয়গাম।

কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয়, রসূলুল্লাহ্র ইন্তিকালের তিন-চারি শতাব্দীর মধ্যেই মুসলিম জগতে এক অভিশাপ নামিল। গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় দর্শনের সংস্পর্শে আসিয়া মুসলমানেরাও নিজেদের বলিষ্ঠ আদর্শ হইতে বিচ্যুৎ হইল; তাহাদের মধ্যে গ্রীক মায়াবাদ ও ভারতীয় অদ্বৈতবাদ বাসা বাঁধিল। একদল মুসলিম সাধক সূফী মতবাদ প্রচার করিলেন। প্লেটো ও শঙ্করের ন্যায় তাঁহারা বলিলেন : এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র আল্লাহ্ই সত্য; সুতরাং তাঁহারা দুনিয়াদারী ত্যাগ করিয়া শুধু আল্লাহ্র ধ্যানে তন্ময় হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও তাঁহারা বলিলেন, জগতের সবকিছুই আল্লাহ্ময়। শঙ্কর যেমন বলিলেন : 'অহংম ব্রহ্মাস্মি' (আমিই ব্রহ্ম); সূফী মনসুর হাল্লাজও তেমনি বলিলেন : 'আনাল হক' (আমিই আল্লাহ্) কাজেই দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদ এবং সূফীবাদে বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশীয় ইবনে আরাবী এই সূফী মতবাদকে একটা বিশিষ্ট দার্শনিক রূপ দেন। তিনি ইহার নাম দেন 'ওয়াহাদাতুল অজুদ' (অদ্বৈতবাদ)। ইংরেজীতে ইহাকে Sufistic Pantheism বা Pantheistic Sufism বলা যায়।

www.pathagar.com

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানি এই 'ওয়াহাদাতুল-অজুদ' মতবাদের খণ্ডন করে। তিনি সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেন যে, খালিক-মাখলুকের অভিন্নতা ও একাত্মবোধ সাধনমার্গের একটা স্তর বিশেষ; ইহা চরম সত্য নহে। আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইলে এমন একটা পর্যায়ে আসিয়া সাধক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়—যেখানে মনে হয় স্রষ্টা এবং সৃষ্টিতে কোনই পার্থক্য নাই। সর্বভূতে সে শুধু আল্লাহ্‌কে দেখিতে পায়। এই উপলব্ধির ফলেই সে বলিয়া উঠে 'আনাল হক' কিন্তু এখানে আসিয়া স্তব্ধ বা সম্মোহিত হইয়া গেলে চলিবে না। এই স্তরও অতিক্রম করিয়া আরো উর্ধ্বে উঠিতে হইবে। তখন দেখা যাইবে—উপরে আরও দুইটি স্তর আছে : তাহাদের নাম 'জিল্লিয়াৎ' ও 'আবদিয়াৎ'। ওয়াহাদতুল-অজুদ স্তরকে অতিক্রম করিলে দেখা যাইবে সারা সৃষ্টি আল্লাহ্‌র নূরের তরঙ্গে দোল খাইয়া ফিরিতেছে। ইহাই 'জিল্লিয়াতের' অবস্থা। সর্বশেষে আসিবে আবদিয়াতের স্তর। এই স্তরে আসিলেই সাধক বুঝিতে পারিবে আল্লাহ্‌ মহতোমহীয়ান চিরগরীয়ান। বিশ্বনিখিলের তিনিই পরম প্রভু আর আমরা তাঁহার করুণার দান। জ্ঞান দ্বারা, প্রেম দ্বারা, অনুভূতি দ্বারা—কোনক্রমেই তাঁহাকে ধরা যায় না; সকল চিন্তা সকল অনুভূতি ব্যর্থ হইয়া তাঁহার দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসে।

এই সত্যকে হযরত আবুবকর চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :

"আল-ইজ্‌জো আন্‌ দারকেল এদরাকুন ফহূয়া
সুব্‌হানো মানলাম ইয়াজ আল্‌ লিল্‌খাল্‌কি
ইয়ায়হি সাবিলা ইলা বিল্‌ ইজ্‌জি আন্‌ মারিফাতিহি।

অর্থাৎ : তাঁহাকে জানা যায় না—ইহাই জানা হইতেছে তাঁহাকে চরম জানা। চির পবিত্র সেই আল্লাহ্‌—যিনি তাঁহার নিকট পৌছিবার কোন পথই তাঁহার সৃষ্ট জীবের জন্য উন্মুক্ত রাখেন নাই; শুধু একটি পথই খোলা আছে—সেটি হইতেছে : তাঁহাকে জানা যায় না।-এই জানার পথ।

মুজাদ্দিদ আল্‌ফসানি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া এই মূল্যবান সংস্কার সাধন করেন। ইহার পর বিংশ শতাব্দীর মহাকবি ইকবাল দার্শনিকতার দিক দিয়া বিকৃত সুফীবাদের কবল হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করেন। ইসলামী দর্শনকে তিনি কাব্যের ভিতর দিয়া অপরূপ বেশে ফুটাইয়া তুলেন। মায়াবাদ এবং অদ্বৈতবাদের অসারতা তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জগৎ যে মিথ্যা নহে, মানুষ যে মৃত্যুর সঙ্গেই চিরনির্বাণ লাভ করিবে না, অথবা আল্লাহ্‌তে বিলীন হইয়া যাইবে না; তাহার আত্মা যে অমর, সীমাহীন শক্তি ও সম্ভাবনার সে যে অধিকারী, তাহার খুদীকে বা আত্মশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে জাগাইয়া দিলে সে যে আল্লাহ্‌র 'খলিফা' রূপে তাঁহার পার্শ্বেই স্থান লাভ করিবে—এই কথা ইকবাল অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য, ইকবালের এই দর্শন নূতন কিছু নহে—ইসলামের অন্তর্নিহিত মর্মকথারই প্রতিধ্বনি মাত্র। পুন্যাত্মারা যে বেহেশ্‌তে অনন্তকাল ধরিয়া বাস করিবে (আসহাবুল জান্নাত ওয়াহুম ফিহা খালেদুন) ইহা আল্লাহ্‌রই প্রতিশ্রুতি। এমন কি যাহারা পাপী তাহাদিগকেও আল্লাহ্‌ ধ্বংস করিবেন না, তাহারাও চিরকাল দোজখে বাস করিবে (আসহাবন-নার ওয়াহুম ফিহা খালেদুন)। এখানেও দেখা যাইতেছে যে, মানুষের আত্মার বিনাশ নাই। অনেকের মতে জাহান্নাম চিরস্থায়ী নহে। পাপীদের

www.pathagar.com

আত্মার ইহা শোধনাগার বিশেষ। সংশোধনের পর আল্লাহ্ গুনাহগারদিগকেও বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন এবং অনন্তকাল তাহারা তথায় বাস করিবে।

বস্তুত মানুষ ছোট নহে, তুচ্ছ নহে, সে আল্লাহ্‌র খলিফা। চন্দ্র-সূর্য-আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, বন-উপবন, পশু-পক্ষী, তৃণ-লতা সবই মানুষের সেবায় নিয়োজিত। মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—আল্লাহ্‌র নিচেই তাহার স্থান।

ইকবালের দর্শন তাই বলিষ্ঠ জীবনের দর্শন—দুর্জয় আত্মশক্তির দর্শন। নিজে শক্তিমান হইয়া বিশ্বকে জয় করিয়া আমরা আমাদের প্রগতির পথে অগ্রসর হইব, মৃত্যুর দুয়ার পার হইয়া অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিব, ইহাই তাঁহার বাণী। একটা সুদৃশ্য ইমারত গঠন করিতে হইলে তাহার প্রতিটি ইট বা উপাদানকে মজবুত করিতে হয়, অন্যথায় গোটা ইমারতটাই দুর্বল হইয়া পড়ে। এই জন্যই 'খুদীকে' বলিষ্ঠ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই আত্মশক্তিকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলিলে চলিবে না; সমাজের অবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া তাহাকে কার্য করিতে হইবে; কেননা মানুষ হইতেছে সামাজিক জীব। আত্মোন্নতির কথাও তাহাকে যেমন ভাবিতে হইবে, সমাজ বা বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর উন্নতির কথাও তাহাকে ঠিক তেমনি ভাবিতে হইবে।

উপরের আলোচনা হইতে এই কথা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, ইসলামের জীবনদর্শন হইতেছে : আল্লাহ্‌কে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করা, পরকালে এবং অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করা, দুনিয়াকে মিথ্যা বলিয়া বর্জন না করা, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করা এবং আল্লাহ্‌র খলিফার গৌরবময় পদমর্যাদা লাভ করিবার সাধনা করা। এই আদর্শই আমাদের মূল কলেমায় নিহিত রহিয়াছে :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসূলুল্লাহ্

আল্লাহ্‌র নামের পাশেই মানুষের নাম! ইহা মানুষের চরম জয় ঘোষণা নহে কি?

এখানে কলেমাটির কিছু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সাধারণত বাক্যটির এইরূপ অর্থ করা হয় : "আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ উপাস্য নাই। মুহম্মদ আল্লাহ্‌র রসূল।" কিন্তু এইরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। ইহা যৌগিক বাক্য (Compound Sentence) নহে, মিশ্র বাক্য (Complex Sentence), কাজেই ইহার অর্থ হইবে এইরূপ : সেই আল্লাহ্ ছাড়া কেহ উপাস্য নাই যাঁহার রসূল হইতেছে মুহম্মদ। বাক্যটি ভাঙিয়া দিলে উহার মূঢ় অর্থে তারতম্য ঘটিয়া যায়। কেহ বলিতে পারে, একত্ববাদই যদি স্বীকার করিবার কথা হয়, তবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পর্যন্ত মানিলেই ত চলে; "মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্" এই অংশের কি প্রয়োজন? এইটুকু অনাবশ্যক। কিন্তু তাহা নহে। 'মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ' সঙ্গে লইয়া আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা করিতে হইবে। এই অংশ বাদ দিলেই আল্লাহ্‌র একত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। কাজেই এই অংশ আমাদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। কেমন করিয়া বলিতেছি :

শুধু আল্লাহ্‌র একত্ব স্বীকার করিলেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। তৌহিদের পক্ষে উহা নিরাপদ নহে। 'আল্লাহ্‌কে মানি' বলিলেই প্রশ্ন জাগে, সেই আল্লাহ্‌র স্বরূপ কি? সেই আল্লাহ্ কি এক ও লা-শরীক? সেই আল্লাহ্ কি দুই-এ মিলিয়া এক? না তিনে মিলিয়া এক? অথবা তিনি বহু? আবার এইরূপও প্রশ্ন জাগিবে, সেই আল্লাহ পুরুষ না নারী? তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি আছে? সে কি কাহারও ঔরসজাত? অথবা সে কি কাহারও জন্মদাতা? পক্ষান্তরে মুখে শুধু আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করিলেও চলে না; তোমার জীবনে

www.pathagar.com

সে বিশ্বাসকে কতটুকু তুমি রূপ দাও? জীবন ও জগৎকে তুমি কি সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখ? ইত্যাদি প্রশ্নও অনিবার্য হইয়া উঠে। এইসব প্রশ্ন হয়ত জাগিত না; কিন্তু শয়তানের কারসাজির ফলেই জাগে। আল্লাহ্ সম্বন্ধে নানা জাতি নানা ধারণা করিয়া বসিয়া আছে। পারসিকেরা মনে করে দুইজন আল্লাহ্ আছেন : একজন মঙ্গলের আল্লাহ্, আর একজন অমঙ্গলের আল্লাহ্। খ্রীষ্টানেরা মনে করে : আল্লাহ্ তিনজন–God the Holy Father, God the Holy Son এবং God the Holy Ghost, God-এর আবার স্ত্রী–লিঙ্গ (Goddes) আছে, বহুবচন (Gods)-ও আছে। ঈশ্বর সম্বন্ধে হিন্দুদের মধ্যে নানা ধারণা বিদ্যমান। শুধু ঈশ্বর নহে, ঈশ্বরীও আছে; ব্রহ্মার পুত্র–কন্যা আছে, ভগবানেরও ভগবতী–আছে, আবার বৈদান্তিক মতে প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মের অংশ। অসংখ্য ও খণ্ড ঈশ্বরকে মিলাইয়া সেখানে এককে (অদ্বৈতবাদ) কল্পনা করা হইয়াছে। কাজেই ঈশ্বর মানি বা God মানি বলিলেই তৌহিদ বা একত্ববাদ মানা হয় না। কিরূপ আল্লাহ্‌কে মানো–সেই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়।

আল্লাহ্‌র দিক দিয়াও বিপদ কম নহে। মানুষের কারসাজিতে জগৎময় মেকী আল্লাহ্‌র বাজার বসিয়াছে। 'আমাকে মানো' বলিয়া তাই আর আল্লাহ্ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তিনি দেখেন মাটিতে গিয়া লোকেরা তাঁহাকে একদম বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহারা যেরূপ সেই রূপেই সে তাঁহার মূর্তি গড়িয়া জগতের হাটে বিকিকিনি করিতেছে। প্রত্যেকেই বলে আমার আল্লাহ্ই খাঁটি বাদবাকী সব নকল। আল্লাহ্ তাই বাধ্য হইয়াই নিজের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিবার জন্য আপন নামের শেষে একটি সিলমোহর মারিয়া দিয়াছেন। ঠিক যেন একটি ট্রেড–মার্ক। সেই সিলমোহরটি কি? সে হইতেছে মুহম্মদের নাম—সেটি হইতেছে 'মুহম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'। আল্লাহ্ তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মুহম্মদ সম্বন্ধে বলিয়াছে : মুহম্মদ হইতেছে 'খাতামান্নাবী'[৫] অর্থাৎ নবীদের মধ্যে তিনি (আমার) সিলমোহর বা ট্রেড মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন : সত্য বা খাঁটি আল্লাহ্‌কে যদি চাও, তবে মুহম্মদের সিল দেওয়া আল্লাহ্‌কে কিনিও, নতুবা ঠকিবে। এই জন্যই আমাদের মূল কলেমা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মুহম্মদ–মার্কা আল্লাহ্ ছাড়া আর উপাস্য নাই। মুহম্মদের পক্ষে ইহা কত বড় গৌরব।

অতএব একথা এখন আমরা বলিতে পারি যে, মুহম্মদের মধ্য দিয়া আমরা আল্লাহ্‌কেও চিনিলাম, নিজেকেও চিনিলাম, জীবন ও জগৎকেও চিনিলাম।

কোরআনের আলোকে পরীক্ষা করিলেও এই কথার সত্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। আল্লাহ্ বলিতেছেন : 'রসূলকে মানিলেই আল্লাহ্‌কে মানা হয়" (৪ : ৮৯)। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ও রসূলের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন।

তাহা হইলে আমাদের সিদ্ধান্ত হইল এই যে, মুহম্মদই আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশংসাকারী, তিনিই আল্লাহ্‌র সত্যতম, পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম পরিচয়দাতা এবং এই কারণেই তাঁহার 'আহমদ' নাম সার্থক হইয়াছে।

এইখানে আসিয়া সমস্ত চিন্তা স্তব্ধ হইয়া যাইতেছে। লেখনী আর অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। সমস্ত জ্ঞান ও অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করিয়া শুধুই একটা জ্যোতির্ময়ী বাণী

---

৫. ওয়ালাকিন্‌–রাসূলাল্লাহিল ওয়া খাতামান্নাবীন।

www.pathagar.com

মনের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে। আল্লাহ্ ও রসূলের সমস্ত পরিচয় যেন সেই ক্ষুদ্র চুম্বকবাণীর মধ্যে ঘনীভূত হইয়া আছে। সেটি রাখিলে সব যেন রাখা হয়, সেটি হারাইলে সব যেন হারাইয়া যায়। সেটি হইতেছে আমাদের রক্ষা কবচ—আমাদের ইস্‌মে আযম—ইসলামের সেই চির-সনাতন কলেমা-ই-তৌহিদ : (৩৩ : ৪০)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্।

এস বিশ্বের নরনারী! এস, আজ হাতে হাত রাখি আর সেই বিশ্বমানুষের চিরন্তন আদর্শ বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি-অসাল্লামকে জানাই আমাদের দরুদ ও সালাম :

ইয়া নবী সালাম আলাইকা
ইয়া রসূল সালাম আলাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা
সালাওয়া তুল্লাহ্ আলাইকা।। ...

তুমি যে নূরের রবি
নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায়
আঁধারে ডুবিত সবি।। ...

চাঁদ-সুরুয আকাশে আসে
সে আলোয় হৃদয় না হাসে
এলে তাই হে নব রবি
মানবের মনের আকাশে।।...

তোমারি নূরের আলোকে
জাগরণ এল ভূলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল
হাসিল কুসুম পুলকে।...

নবী না হয়ে দুনিয়ার
না হয়ে ফেরেশ্‌তা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার
তার তরে শোকর হাজার বার...

www.pathagar.com

প্রমাণপঞ্জী

১। The Holy Quran—by Moulana Muhammad Ali & Allama Yousuf Ali.
২। মিশকাতুল-মুসাবিহ্ (Al-Hadis)—By F. Karim
৩। বোখারী শরীফ
৪। তফসীরে হাক্কানী
৫। তফসীরে কাশ্‌শাফ
৬। The Ideal Prophet—by Khawja Kamal uddin
৭। The Prophet of the Desert—by sir K. L. Gauba
৮। Life of Mahomet—by Sir william Muir
৯। The life of Muhammad—by Washington Irving
১০। The Decline and Fall of the Roman Empire—by Gibon
১১। সীরাৎ-উন্-নবী (উর্দু)—by Moulana Shibli Nomani
১২। মোস্তফা চরিত—by Moulana Md. Akram khan
১৩। Muhammad—by Margoliouth
১৪। Muhammad—by Moulana Muhammad Ali
১৫। Essays on Muhammad & Islam—by Sir Syed Ahmed
১৬। ইবনে-হিশাম—(আরবী গ্রন্থ)
১৭। মা'রেজুম-নবুয়ত
১৮। মাদারেজুন-নবুয়ত
১৯। আসাহোস্-সীয়ার (উর্দু)—by Moulana Abdur Rouf Danapuri
২০। Muhammad—by Golam Sarwar
২১। Spirit of Islam—by Syed amir Ali
২২। The Religion of Islam—by Moulana Muhammad Ali
২৩। Prophet in the world Scriptures—by A. Huq. Vidyarathi
২৪। Mujaddid's Conception of Towhid—by Dr. Faruqi
২৫। Islam and the Divine Comedy—by Miguel Asin
২৬। History of Philosophy in Islam
২৭। The Philosophy of the Fakirs—Sir Ahmed Hossain
২৮। Mystical Elements in Muhammad—by John Clerk Archer
২৯। Arabia—by Sarder Iqbal Ali shah
৩০। Mecca—by C. Snouck Hurgranje
৩১। The Mysterious Universe—by Sir James Jeans
৩২। The Universe Around Us—by Sir James Jeans
৩৩। The New Background of Science—by Sir James Jeans.
৩৪। The Growth of physical Science—by sir James Jeans

www.pathagar.com

৩৫। Bases of Modern Science—by J. W. N. Sullivan
৩৬। The Expanding Universe—by Arther Edington
৩৭। The nature of the Physical World—by Arther Edington
৩৮। Science and the Modern World—by A. N. Whitehead
৩৯। Limitations of Science—by J. W. N. Sullivan
৪০। The Theory of Relativity—by Albert Einstein
৪১। The A. B. C. of Relativity—by Bertrand Russell
৪২। Easy Lessons in Einstein—by E. Slosson
৪৩। Evidence for the Supernatural—by Ivor L. Tuckett
৪৪। The Holy Bible
৪৫। বেদবাণী—by charuchandra Banerjee
৪৬। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী-উদ্বোধন কার্যালয়
৪৭। Indian Philosophy—by Sir Radhakrishnan
৪৮। The Six Systems of Indian Philosophy—by Max Muller
৪৯। গীতায় ঈশ্বরবাদ—by Hirendranath Dutta
৫০। হিন্দুদর্শন ও খ্রীষ্টীয় দর্শন—by Swami paramananda
৫১। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা—by Anilbaran Roy
৫২। Encyclopaedia Britanica
৫৩। Zend-Avesta (English Translation)—by Max Muller
৫৪। TheStatus of Woman in Ancient India—by Prof. Indra
৫৫। Manu Samhita— ?
৫৬। One, Two, Three.........Infinity—by George Gamow
৫৭। New Handbook of the Heavens—by Bernard-bennett Rice
৫৮। The Exploration of Space—by arthur C. Clarke
৫৯। Space Travel—by Harold Leland Goodwin
৬০। Flight into Space—by J. N. Leonand
৬১। Man on the Moon—by Von Braun and Whipple
৬২। সীরাতে রসূলুল্লাহ্-ইবনে-ইসহাক (ইংরেজী অনুবাদ)

www.pathagar.com

'বিশ্বনবী' সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলা জনাব **মাওলানা আবু নসর, মুহম্মদ আবদুল হাই সাহেব** :— "কবি মৌলভী গোলাম মোস্তফা সাহেবের লিখিত হুজুরের (সঃ) জীবনী 'বিশ্বনবী' পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। উহার ভাব, ভাষা ও দার্শনিকতা কোরআন ও হাদিস শরীফ এবং তাছাউফের সম্পূর্ণ অনুকূল ও ছুন্নাতুল জামায়েতের আকায়েক মোয়াফক। যাঁহারা বাংলা ভাষায় হযরত রসূলে করিমের (সঃ) সঠিক জীবনী ও সত্যস্বরূপ জানিতে চাহেন, তাহাদিগকে 'বিশ্বনবী পাঠ, করিতে' অনুরোধ করি।"

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : —"মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁহার নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলা বাহুল্য, ইহা 'বিশ্বনবী' হযরত মুহম্মদের (সঃ) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনচরিত। এই গ্রন্থকার আঁ-হযরত সম্বন্ধে তাঁহার দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি অতুলনীয় হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত মনোজ বসু :—"আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। মহামানুষেরা সর্বকাল ও সর্বদেশের সম্পত্তি। ভক্তির অন্ধ আবেগ অনেক সময়েই নিখিল নর-নারীর নিকট থেকে তাঁদের আড়াল করে রাখতে চায়। কিন্তু মহানবীর পরমাশ্চর্য বৃত্তান্ত লিখবার সময় আপনার কবি ধর্ম সর্বদা আপনাকে গণ্ডিসঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে রেখেছে। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হযরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর কাছে পৌছবার এই সেতু রচনা আপনার অতুলনীয় সাহিত্য-কীর্তি। ভাষা কবিত্বঝঙ্কার ও ভাবলালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে। এই অনন্য অবদানের জন্য সাহিত্যসেবী হিসেবে আপনি আমার আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN984-11-0302-8

প্রচ্ছদ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত